নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র
ইসলাম ও আমাদের জীবন-৩

ইসলামী মু'আমালাত

ইসলামী অর্থব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব, আয়-ব্যয় ও লেনদেনের ইসলামী বিধান

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম

নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৩

ইসলামী মু'আমালাত

মূল: শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা : ০৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
ষষ্ঠ মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০২২ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ: ইবনে মুমতায ❖ গ্রাফিক্স: সাঈদুর রহমান

মুদ্রণ : মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স ❖ ৩/২ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN: 978-984-8950-39-5

মূল্য : চারশত আশি টাকা মাত্র

ISLAMI MUAMALAT
By: Shaikhul Islam Mufti Muhammad Taqi Usmani
Translated by: Maulana Muhammad Muhiuddin
Price: Tk. 480.00 US$ 20.00

ইনতেসাব

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর প্রতি যিনি মুসলিম মিল্লাতের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কামাই-রুজী ও লেনদেন থেকে হারিয়ে যাওয়া ইসলামী উসূলকে পূণর্জীবিত করার মানসে সমগ্র জীবন চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এ বিষয়ে বহু ওয়াজ করেছেন। রচনা করেছেন 'সাফাইয়ে মু'আমালাত' নামক অনবদ্য পুস্তিকাটি। যা আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এ সংক্রান্ত মৌলিক বিধান অধিকাংশই তাতে স্থান পেয়েছে।

আল্লাহপাক তাঁর কবরকে জান্নাতের টুকরো বানিয়ে দিন। আমাদের এ প্রয়াসকে কবুল করুন এবং এর ছওয়াবও হযরত থানভী রহ.সহ উম্মাহর জীবিত-মৃত সকল মুসলিহকে পৌছে দিন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

-প্রকাশক

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম কর্তৃক রচিত অনবদ্য কয়েকটি গ্রন্থ

তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন • রমযানুল মুবারকের সওগাত
ইসলাহী মাজালিস • ফুরাত নদীর তীরে
দুনিয়ার ওপারে • উহুদ থেকে কাসিয়ুন
ইসলাম ও আমাদের জীবন • হারানো ঐতিহ্যের দেশে
ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি • অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক
দরসে নেযামী - পাঠদান পদ্ধতি • দুনিয়াজোড়া বিস্ময়কর সফর
ইসলাম ও আধুনিকতা • রাতের সূর্য
অভিশাপ ও রহমত • পৃথিবীর দেশে দেশে
জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ • আহকামে যাকাত
আপন ঘর বাঁচান • খৃষ্টধর্মের স্বরূপ
মাযহাব ও তাকলীদ ঃ কি ও কেন • ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস
মুমিন ও মুনাফিক • ইবাদাত বন্দেগী
নূরানী কাফেলা • বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের স্মৃতিচারণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ اَمَّا بَعْدُ!

বছরের পর বছর ধরে কলম ও যবান নিজ সামর্থ অনুযায়ী কসরত করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের যে কালজয়ী দিকনির্দেশনা রয়েছে, তা দ্বারা নিজেও উপকৃত হওয়া এবং অন্যদের কাছেও সে দিকনির্দেশকে পৌঁছিয়ে দেয়া। বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে এ জাতীয় লেখাজোখা ও বক্তৃতা-বিবৃতি যেমন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তেমনি স্বতন্ত্র পুস্তক-পুস্তিকা কিংবা বিশেষ সংকলণের অংশরূপেও প্রকাশিত হয়েছে। এবার স্নেহের ভাতিজা জনাব সউদ উসমানী সেগুলোর একটি 'বিষয়ভিত্তিক সমগ্র' প্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করলেন এবং জনাব মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেবকে সেটি তৈরি করে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি অত্যন্ত মেহনতের সাথে বিক্ষিপ্ত সেসব রচনা ও বক্তৃতাসমূহ, বিভিন্ন বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা থেকে খুঁজে-খুঁজে সংগ্রহ করেন এবং বিষয়ভিত্তিক আকারে সেগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করেন, যাতে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত একই জায়গায় জমা হয়ে যায়। তাছাড়া বক্তৃতাসমূহে যেসব কথা বিনা বরাতে এসে গিয়েছিল, তিনি অনুসন্ধান করে তার বরাতও উল্লেখ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং এ সংগ্রহটিকে তাঁর, অধম বান্দার ও প্রকাশকের জন্য আখেরাতের সঞ্চয়রূপে কবূল করুন আর পাঠকদের জন্য একে উপকারী বানিয়ে দিন।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

বান্দা
মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দারুল উলূম করাচী
৩০ রবিউল আউয়াল, ১৪১৩

ইসলাম ও আমাদের জীবন

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যতসব জটিলতা ও দুর্ভাবনার সম্মুখীন হই, কেবল কুরআন-হাদীছেই আছে তার নিখুঁত সমাধান। সে সমাধান অবহেলা ও সীমালংঘন উভয়রূপ প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত। ইসলামের সেই অমূল্য শিক্ষা মোতাবেক আমরা কিভাবে পরিমিত ও ভারসাম্যমান পথে চলতে পারি? কিভাবে যাপন করতে পারি এমন এক জীবন, যা দ্বীন দুনিয়ার পক্ষে হবে স্বস্তিদায়ক ও হৃদয়-মনের জন্য প্রীতিকর? এসব মুসলিমমাত্রেরই প্রাণের জিজ্ঞাসা। 'ইসলাম ও আমাদের জীবন' সরবরাহ করে সেই জিজ্ঞাসারই সন্তোষজনক জবাব।

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব
দামাত বারাকাতুহুম-এর নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র

ইসলাম ও আমাদের জীবন ১-১০

সিরিজ পরিচিতি

প্রথম খণ্ড : ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস

দ্বিতীয় খণ্ড : ইবাদাত-বন্দেগী
হাকীকত, ফযীলত ও আদব

তৃতীয় খণ্ড : ইসলামী মু'আমালাত
আয়-ব্যয় ও লেনদেনের ইসলামী বিধান

চতুর্থ খণ্ড : ইসলামী মু'আশারাত
পরস্পরের প্রতি কর্তব্য ও অধিকার
সুন্দর ও সুখী সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামের কালজয়ী আদর্শ

পঞ্চম খণ্ড : ইসলাম ও পারিবারিক জীবন

ষষ্ঠ খণ্ড : ইসলাহ ও তাসাওউফ
আত্মশুদ্ধির পথ ও পন্থা

সপ্তম খণ্ড : ইসলামী জীবনের সোনালী আদাব

অষ্টম খণ্ড : অসৎ চরিত্র ও তা সংশোধনের উপায়

নবম খণ্ড : উত্তম চরিত্র ও তার ফযীলত ও বিকাশ

দশম খণ্ড : দৈনন্দিন জীবনের সুন্নাত, আদাব ও দু'আ

সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। সন্ধ্যায় হাঁটতে গেলেন ঢাকার একটি পার্কে। এসময় আমাদের এক সাথী আমাকে দেখিয়ে হযরতকে বললেন, 'হযরত! আমাদের হাবীব ভাই তার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে আপনার সফরনামাসহ অনেক কিতাবের খুবই উন্নত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। মাশাআল্লাহ সারাদেশের উলামায়ে কেরাম এ সকল কিতাবকে খুবই পছন্দ করছেন। হযরত একথা শুনে খুব দু'আ দিলেন। সেসময় থেকেই হযরতের সাথে সম্পর্ক আরো মজবুত হলো। এ সফরেই অথবা অন্য কোন সফরে আমি হযরতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ পর্যন্ত হযরতের যত কিতাবের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলো ছিলো আমাদের নির্বাচন, হযরতের দৃষ্টিতে কোন্ কিতাবের অনুবাদ হলে এদেশের সাধারণ মুসলমানের জন্য বেশি উপকারী হবে? হযরত সামান্য সময় চিন্তা করে উত্তর দিলেন, আমার মতে 'আসান নেকীয়াঁ' ও 'ইসলাহী খুতবাত'-এর অনুবাদ সাধারণ লোকদের জন্য বেশী উপকারী হবে।

হযরতের এ পরামর্শের পর থেকেই আমরা হযরতের খুতবাত অনুবাদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। কিন্তু মূল খুতবাত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর আমার মনে হলো, এসকল বয়ানকে যদি বিষয়ভিত্তিক সাজানো যেতো তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য এ কিতাব থেকে উপকৃত হওয়াটা তুলনামূলক সহজ হতো। এ চিন্তা থেকেই আমাদের কয়েকজন অনুবাদক বন্ধুকে খুতবাতসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করতে বলি। কেউ কেউ কিছু কিছু কাজ করলেও তাকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানো হয়ে ওঠেনি। ইতোমধ্যে আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবানীতে পাকিস্তানের স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'ইদারায়ে ইসলামিয়্যাত'-এর তত্ত্বাবধানে জনাব মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেব, হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুমের সকল উর্দূ রচনা হতে সাধারণ মুসলমানের জন্য উপকারী বিষয়সমূহ এবং ইসলাহী বয়ানসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করেন এবং আপাতত দশ খণ্ডে তা প্রকাশ করেন। এ কিতাবের প্রথম খণ্ড 'ইসলামী আকীদা বিষয়ক', দ্বিতীয় খণ্ড 'ইবাদাত-বন্দেগী-এর স্বরূপ', তৃতীয় খণ্ড 'ইসলামী মু'আমালাত', চতুর্থ খণ্ড 'ইসলামী মু'আশরাত', পঞ্চম খণ্ড 'ইসলাম ও পারিবারিক জীবন', ষষ্ঠ খণ্ড 'ইসলাহ ও তাসাওউফ', সপ্তম খণ্ড

'ইসলামী জীবনের সোনালী আদাব', অষ্টম খণ্ড 'অসৎ চরিত্র ও তার সংশোধন', নবম খণ্ড 'উত্তম চরিত্র ও তার ফযীলত' এবং দশম খণ্ড 'দৈনন্দিন জীবনের সুন্নাত ও আদাব' বিষয়ক।

গ্রন্থনাকালে হযরত মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেব এমন কিছু বিশেষ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন যাতে কিতাবের মান আরো উন্নত হয়েছে।

ক. তিনি সকল কুরআনী আয়াতের সূরার নাম উল্লেখপূর্বক আয়াত নম্বর লাগিয়েছেন।

খ. সকল আয়াত ও হাদীসে হরকত লাগিয়েছেন।

গ. হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে কিতাবের নাম, পৃষ্ঠা ও হাদীস নম্বর দিয়েছেন।

ঘ. এ সংকলনে এমন অনেক খুতবা আছে যা পূর্বে ছাপা হয়নি।

আল্লাহপাক তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমরা সবগুলো খণ্ডই অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ!

প্রথম খণ্ড 'ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস' এবং দ্বিতীয় খণ্ড 'ইবাদাত-বন্দেগী : হাকীকত ফযীলত ও আদব' নামে পূর্বেই প্রকাশিত হয়ে সম্মানিত পাঠকের ভূয়সী প্রসংশা কুড়িয়েছে। আমাদের বর্তমান আয়োজন এ ধারারই তৃতীয় খণ্ড **'ইসলামী মু'আমালাত : ইসলামী অর্থব্যবস্থা, আয়-ব্যয় ও লেনদেনের ইসলামী বিধান'** প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহপাক অবশিষ্ট খণ্ডসমূহও দ্রুত প্রকাশ করার তাওফীক দান করুন।

আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এ গ্রন্থকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও কোন ভুল-ত্রুটি (বিশেষত হরকতের ভুল) থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তি সংস্করণে সংশোধন করে নিবো।

আমাদের ধারনা উলামা-তলাবা, খতীব-ইমাম, ওয়ায়েয ও সাধারণ মুসলমানসহ সকলের জন্য এ গ্রন্থ অতীব উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। এ গ্রন্থ প্রকাশে অনেকেই অনেকভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহপাক তাঁদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এবং মূল গ্রন্থকার, সংকলক, অনুবাদক ও প্রকাশক, পাঠকসহ সকলের জন্য নাজাতের উসীলা বানান। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তারিখ
২২ রবিউস সানী ১৪৩৫ হিজরী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
৭ এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

ব্যবসা দ্বীনও, দুনিয়াও

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

وَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلتُّجَّارُ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنِ اتَّقَى اللّٰهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ

ইসলামী জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর

বুযুর্গানে মুহতারাম ও বেরাদারানে আযীয!

আগেও একবার আমানুল্লাহ ভাইয়ের দাওয়াতে এখানে আমার আসা হয়েছিল। এটি তার ও তার বন্ধুদের আন্তরিকতার বিষয় যে, তারা আবারও এখানে অনুরূপ একটি মাহফিলের আয়োজন করেছেন। আমার ধারণা ছিল, আগে যেমন আমাকে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল আর আমি আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুসারে সে সবের উত্তর প্রদান করেছিলাম, এবারও এই মাহফিল তেমনই একটি প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানের রূপ ধারণ করবে। ফলে আজ এখানে আমার বয়ান করার কোনো মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। কিন্তু ভাই ছাহেব বললেন, শুরুতে দ্বীন ও ঈমানের কিছু আলোচনা হোক। আর দ্বীন ও ঈমান এমন দুটি বিষয়, যার আলোচনার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা যায় না। কারণ, দ্বীন হলো একজন মুসলমানের ইসলামী জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর। আল্লাহপাক আমাদের এই পাথরটিকে শক্তভাবে আকড়ে ধরার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ব্যবসায়ীদের হাশর নবীগণের সঙ্গে

আজকের এই মাহফিলে আমার যেসব বন্ধু উপস্থিত আছেন, আপনাদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী। সেই সূত্রে আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করতে বসার পর আল্লাহর রাসূলের দুটি হাদীস আমার মনে পড়েছে। সেই দুটি হাদীসই আমি আপনাদের সামনে পাঠ করেছি। আবার পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও তিলাওয়াত করেছি, যার মাধ্যমে এই দুটি হাদীসের মর্ম খোলাসা হয়ে যায়। এই দুটি হাদীস পরস্পর বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আসলে তাতে কোনো বিরোধ নেই।

এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

'যে ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় সততা ও আমানতদারি রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে তার হাশর হবে।'[১]

এই ব্যবসা – আমরা যাকে দুনিয়াবি কাজ মনে করি এবং ভাবি, এটি আমরা পেটের খাতিরে করছি এবং বাহ্যত এর সঙ্গে দ্বীনের কোনো সম্পর্ক নেই; কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, একজন ব্যবসায়ীর মাঝে যদি দুটি গুণ থাকে, তা হলে কিয়ামতের দিন তাকে নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে হাশর করানো হবে। সেই গুণদুটোর একটি হলো, তাকে 'সাদূক' হতে হবে। আরেকটি হলো, তাকে 'আমীন' হতে হবে। 'সাদূক' অর্থ সত্যবাদী আর 'আমীন' অর্থ আমানতদার। একজন ব্যবসায়ী যদি এই দুটি গুণ অর্জন করে ব্যবসা করে, তা হলে আল্লাহপাক কিয়ামতের দিন তাকে নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে হাশর করাবেন। মনে রাখবেন, গুণদুটো হলো সততা ও আমানতদারি।

ব্যবসায়ীর হাশর পাপীদের সঙ্গে

অপর হাদীসটি, যেটি বাহ্যত এই হাদীসের বিপরীত মনে হয়, তা হলো :

التُّجَّارُ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ

'ব্যবসায়ীদেরকে কিয়ামতের দিন পাপীদের সঙ্গে উঠানো হবে। কিন্তু সেই ব্যবসায়ী এর ব্যতিক্রম, যে তাক্ওয়া অবলম্বন করবে, নেক কাজ করবে এবং সততা বজায় রাখবে।'[২]

---

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীছ নং ১১৩০; সুনানে দারেমী, হাদীছ নং ২৪২৭

২. সুনানে তিরমিযী, হাদীছ নং ১১৩১; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীছ নং ২১৩৭; সুনানে দারেমী, হাদীছ নং ২৪২৬

এ হাদীসে ব্যবসায়ী বোঝাতে 'তুজ্জার' আর যাদের সঙ্গে তাদের হাশর করা হবে, তাদেরকে 'ফুজ্জার' নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'তুজ্জার' অর্থ ব্যবসায়ীবৃন্দ আর 'ফুজ্জার' ফাজির-এর বহুবচন। ফাজির একবচন আর ফুজ্জার তার বহুবচন। ফাজির অর্থ পাপাচারী, গুনাহগার; মানে যারা আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত।

ব্যবসায়ীদের দুটি শ্রেণী

পরিণতির দিক থেকে এই দুটি হাদীস পরস্পর-বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ব্যবসায়ীদের হাশর হবে নবীগণের সঙ্গে, সিদ্দীকগণের সঙ্গে, শহীদগণের সঙ্গে। আর দ্বিতীয় হাদীসে বলেছেন, ব্যবসায়ীদের হাশর হবে পাপীদের সঙ্গে। কিন্তু শাব্দিক তরজমা দ্বারা-ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, আসলে দুয়ের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। বরং দুটি হাদীসে ব্যবসায়ীদের দুটি শ্রেণী বর্ণনা করা হয়েছে। একটি শ্রেণী হলো তারা, যারা নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবে আর অপর শ্রেণী তারা, যারা পাপী লোকদের সঙ্গী হবে।

এই দুটি শ্রেণীর মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করার জন্য যে কটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো সততা, তাক্ওয়া ও আমানতদারি। একজন ব্যবসায়ী যদি তার ব্যবসায় সৎ হয়, পরহেযগার হয়, আমানতদার হয়, তা হলে সে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাকে নবীগণের সঙ্গে হাশর করানো হবে।

পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যবসায়ীর মাঝে এই গুণগুলো না থাকে; বরং অর্থ উপার্জনই তার একমাত্র ধান্দা হয়, ন্যায়-অন্যায় ও হালাল-হারামের কোনো বিবেচনা না থাকে, তা হলে সে দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবসায়ী। পাপিষ্ঠ লোকদের সঙ্গে তার হাশর হবে।

ব্যবসা জান্নাতেরও কারণ, জাহান্নামেরও কারণ

আমরা যদি এই দুটি হাদীসকে একত্রিত করে দেখি, তা হলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমরা যে ব্যবসা করছি, চাইলে তাকে আমরা জান্নাতেরও কারণ বানিয়ে নিতে পারি যে, নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে আমাদের হাশর হবে। আবার চাইলে জাহান্নামেরও কারণ বানিয়ে নিতে পারি যে, এর কারণে কিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠ লোকদের সঙ্গে আমাদের উত্থিত করা হবে।

আল্লাহপাক আমাদেরকে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে নিরাপদ রাখুন। আমীন।

প্রতিটি কাজেই দুটি দিক থাকে

আর এ বিষয়টি শুধু ব্যবসারই সঙ্গে বিশিষ্ট নয়; বরং জগতে যত কাজ আছে–চাই তা চাকুরি হোক কিংবা ব্যবসা হোক নতুবা কৃষিকর্ম হোক বা অন্যকিছু হোক–সবারই ক্ষেত্রে এই রীতি প্রযোজ্য যে, মানুষ যদি তাকে এক দিক থেকে দেখে, তা হলে সেটি দুনিয়া আবার আরেক দিক থেকে দেখলে তা দ্বীনও।

দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিন

এই দ্বীন মূলত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের নাম। ওই কাজটিই যদি আপনি আরেক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করেন, আরেক নিয়তে করেন, অন্য উদ্দেশ্যে করেন, অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে করেন, তা হলে সেই জিনিসটিই – যেটি নিরেট দুনিয়া ছিল – দ্বীন হয়ে যায়।

আহার করা ইবাদত

মানুষ আহার করে – খাবার খায়। বাহ্যত পেটের ক্ষুধা নিবারণের নিমিত্ত মানুষ এই কাজটি করে। কিন্তু খাওয়ার সময় যদি মানুষ এই নিয়ত করে যে, আমার উপর আমার নফ্সের কিছু হক আছে, আমার উপর আমার ব্যক্তিসত্তার, আমার অস্তিত্বের কিছু পাওনা আছে আর সেই পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে আমি আহার করছি। আমি এইজন্য খাচ্ছি যে, এসব খাদ্য-খাবার আল্লাহপাকের নেয়ামত আর তাঁর নেয়ামতের একটি হক হলো, আমি তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করব আর আল্লাহপাকের শোকর আদায় করে তাকে কাজে লাগাব।

তো যে খাবার বাহ্যত স্বাদ উপভোগ করার মাধ্যম ছিল, ক্ষুধার নিবারণের উপায় ছিল, সেই খাবার দ্বীনও ইবাদতে পরিণত হয়ে যাবে।

হযরত আইউব (আ.) ও সোনার ফড়িং

মানুষ মনে করে, দ্বীন হচ্ছে, দুনিয়া পরিত্যাগ করে ঘরের এক কোনায় গিয়ে বসে থাকো আর আল্লাহ-আল্লাহ করো। ব্যস, এটিই দ্বীন। আপনারা হযরত আইউব (আ.)-এর নাম শুনেছেন। একজন মুসলমানও এমন পাওয়া যাবে না, যে হযরত আইউব (আ.)-এর নাম শোনেনি। শীর্ষস্থানীয় একজন নবী ছিলেন। তাঁর জীবনটা অবর্ণনীয় এক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল।

হযরত আইউব (আ.)-এর একটি ঘটনা বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একদিন তিনি গোসল করছিলেন। গোসল করাকালে তাঁর উপর সোনার ফড়িং বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

হযরত আইউব (আ.) গোসল বাদ দিয়ে সেই ফড়িংগুলো ধরে-ধরে জমাতে শুরু করলেন। তখন আল্লাহপাক হযরত আইউব (আ.)কে জিজ্ঞেস করলেন, কী হে আইউব! আমি কি তোমাকে আগে থেকেই এত-এত নেয়ামত দিয়ে রাখিনি? তোমার প্রয়োজন পূরণের সব ব্যবস্থা-ই তো আমি করে রেখেছি। তারপরও তোমার এত লোভ যে, ফড়িংগুলো ধরতে শুরু করেছ! হযরত আইউব (আ.) কেমন চমৎকার উত্তর দিলেন!

তিনি বললেন :

لَا غِنَىٰ بِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ

'ওহে আমার আল্লাহ! আমি আপনার বরকত থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারি না।'[৩]

আপনি যখন আমার উপর নেয়ামত নাযিল করেছেন, তখন এই আচরণ আদবের খেলাফ হবে যে, আমি তার থেকে মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করব।

আপনি যখন নিজ অনুগ্রহে আমাকে এই নেয়ামতগুলো দান করেছেন, তখন আমি যদি বসে থাকি আর বলি, এই সম্পদগুলোর আমার দরকার নেই, তা হলে এটি আমার জন্য বে-আদবি হবে। আপনি যখন দিচ্ছেন, তখন আমার কর্তব্য হলো, আমি আগ্রহের সঙ্গে এগুলো গ্রহণ করে নেব, এগুলোর কদর করব এবং এর জন্য আল্লাহপাকের শোকর আদায় করব। সেজন্য এগিয়ে গিয়ে আমি এগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছি।

এটি ছিল একজন নবীর পরীক্ষা। অন্যথায় যদি সাধারণ কোনো শুষ্ক দ্বীনদার হতো, তা হলে বলত, আমার এগুলোর কোনো আবশ্যকতা নেই। আমি এই নেয়ামতগুলোকে প্রত্যাখ্যান করছি।

কিন্তু হযরত আইউব (আ.) যেহেতু বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং জানতেন যে, এই জিনিসগুলো যদি আমি এই দৃষ্টিকোণ থেকে সংগ্রহ করি যে, এগুলো আমার রব আমাকে দান করেছেন এবং এগুলো তাঁর নেয়ামত; আমি সংগ্রহ করে এই নেয়ামতে কদর করব, শোকর আদায় করব, তা হলে এটি দুনিয়া নয়; বরং এটি দ্বীন।

দৃষ্টি নেয়ামত দানকারীর প্রতি থাকবে

আমরা পাঁচ ভাই ছিলাম এবং সবাই কর্মজীবি ছিলাম। মাঝে-মধ্যে ঈদের সময় যখন আমরা একত্র হতাম, তখন অনেক সময় আব্বাজি আমাদেরকে ঈদ-উপহার দিতেন। কখনও ২০ টাকা, কখনও ২৫ টাকা, কখনও ৩০ টাকা।

---

৩. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ২৭০; সুনানে নাসায়ী, হাদীছ নং ৪০৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৭৮১২

আমার মনে আছে, আব্বাজি যখন আমাদেরকে ২৫ টাকা দিতেন, তখন আমরা বলতাম, না আব্বাজি, ৩০ টাকা দিন। আর যখন ৩০ টাকা দিতেন, তখন বলতাম, না, এবার আমরা ৩৫ টাকার কম নেব না। আর এই দৃশ্য প্রায় প্রতিটি পরিবারেই পরিলক্ষিত হয় যে, সন্তানরা – চাই তারা পরিণত বয়সের হোক, কর্মজীবি হোক – পিতার কাছ থেকে ঈদ-উপহার নিয়ে থাকে। পিতা যা দেন, তারা আরও দাবি করে বসে। অথচ পিতার কাছ থেকে তারা যা পায়, এই বয়সে ও এই পরিস্থিতিতে তার কোনোই মর্যাদা নেই। আমরা সব কজন ভাই মাসে হাজার-হাজার টাকা আয় করতাম। এই অবস্থায় ২৫/৩০ টাকা কিছুই ছিল না। কিন্তু তারপরও এই টাকা গ্রহণের আগ্রহ এবং আরও বেশির দাবি করা – এসব কেন ছিল?

ব্যাপার আসলে এই যে, আমাদের দৃষ্টি টাকার উপর ছিল না যে, আমরা ত্রিশটি করে টাকা পাচ্ছি। বরং আমাদের দৃষ্টি ছিল সেই হাতের প্রতি, যে-হাত থেকে আমরা এই উপহার গ্রহণ করছিলাম যে, এই ত্রিশটি টাকা আমরা কার হাত থেকে গ্রহণ করছি। এই টাকা আমরা একজন পিতার পক্ষ থেকে পাচ্ছি। আর এটি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। এটি মমতার বহিঃপ্রকাশ। এটি একটি নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ। কাজেই এর আদব হলো, একে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। এর মূল্য বুঝতে হবে। আব্বাজির কাছ থেকে প্রাপ্ত সেই টাকাগুলো আমরা খরচ করতাম না। বরং খামে ভরে রেখে দিতাম যে, এগুলো আমার আব্বাজির দেওয়া টাকা। এই ত্রিশ টাকা-ই যদি আমরা অন্য কারও কাছ থেকে পেতাম আর তাতে লোভ ও আগ্রহ প্রকাশ করতাম, তা হলে তা আমাদের ভদ্রতা ও মানবতার পরিপন্থী বলে বিবেচিত হতো।

এরই নাম তাক্ওয়া

দ্বীন মূলত দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর নাম। আর দৃষ্টিভঙ্গি যখন বদলে যায়, তখন কুরআনের পরিভাষায় তার নাম হয় তাক্ওয়া। অর্থাৎ– আমি দুনিয়াতে যা-কিছু করছি – পানাহার করছি, ঘুমোচ্ছি, উপার্জন করছি সবই আল্লাহর জন্য করছি, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছি, আল্লাহর মর্জিকে সামনে রেখে করছি। তারপর যদি আপনি এই তাক্ওয়ার সঙ্গে ব্যবসা করেন, তখন আপনার সেই ব্যবসা দুনিয়া নয় – দ্বীন এবং সে আপনাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবে এবং নবীদের সঙ্গে হাশর করাবে।

সাহচর্য দ্বারা তাক্ওয়া অর্জিত হয়

সাধারণত মনে একটি প্রশ্ন জাগে যে, তাক্ওয়া কীভাবে অর্জিত হবে? এই দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর কাজটি আমরা কীভাবে করব? তো এই প্রশ্নটিরই

উত্তরদানের জন্য আমি শুরুতে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেছিলাম। আল্লাহপাক বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।'[৪]

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করো – আল্লাহকে ভয় করো।

পবিত্র কুরআনের একটি রীতি হলো, যখন কুরআন কোনো কাজের আদেশ প্রদান করে, তখন তার উপর আমল করার পথও বাতলে দেয়। আর এমন পথের সন্ধান দেয়, যেটি আমাদের জন্য সহজ হয়। বলাবাহুল্য, এটি আল্লাহপাকে বিরাট এক অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে শুধু আদেশই করেন না, বরং তার সঙ্গে আমাদের প্রয়োজনাদি ও দুর্বলতাগুলোর প্রতিও লক্ষ্য রেখে আমাদের জন্য সহজ পথ বাতলে দেন। তো তাক্ওয়া অর্জনের জন্য আল্লাহপাক আমাদের জন্য সহজ পথটি এই বলে দিয়েছেন যে :

وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

'তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।'

তোমরা সত্য পথের পথিকদের সাহচর্য অবলম্বন করো।

যখন তোমাদের এই সাহচর্য অর্জিত হয়ে যাবে, তার ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, তোমাদের মাঝে তাক্ওয়া সৃষ্টি হয়ে যাবে। শুধু কিতাবে তাক্ওয়ার শর্তাবলি পড়ে তাক্ওয়া অবলম্বন করা খুব কঠিন বলে প্রতীয়মান হবে। কিন্তু কুরআন তার সহজ পন্থা বাতলে দিয়েছে যে, আল্লাহপাক যাদেরকে তাক্ওয়ার দৌলত দান করেছেন, তোমরা তার সাহচর্য অবলম্বন করো। অন্য শব্দে যার সত্যতার সম্পদ অর্জিত হয়েছে, তোমরা তার সঙ্গী হও। কারণ, সাহচর্যের ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, মানুষ যার সাহচর্য অবলম্বন করে, তার রং ধীরে-ধীরে সেই ব্যক্তির গায়ে চড়তে শুরু করে।

হেদায়াতের জন্য শুধু কিতাব যথেষ্ট ছিল না

দ্বীন অর্জন করার জন্য, দ্বীন বোঝার জন্যও এই একই পথ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্যই দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন। অন্যথায় সোজা কথাটি তো এই ছিল যে, আল্লাহপাক শুধু কুরআন নাযিল করে দিতেন। মক্কার মুশরিকদের দাবিও তো এটিই ছিল যে, আমাদের উপর কেন কুরআন নাযিল হয় না? আল্লাহর জন্য তো এটি কঠিন কোনো কাজ ছিল না যে, কুরআন

৪. সূরা তাওবা : ১১৯

তিনি এভাবে নাযিল করতেন যে, সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর মানুষ দেখতে পেত, সবার মাথার কাছে আকর্ষণীয় বাঁধাইয়ের একটি করে কুরআনের কপি পড়ে আছে আর আকাশ থেকে ঘোষণা আসত, এই কিতাবগুলো আমি তোমাদের জন্য প্রেরণ করেছি; তোমরা এর উপর আমল করো।

এমনটি করা আল্লাহপাকের জন্য কঠিন কোনো কাজ ছিল না। কিন্তু বাস্তবতা হলে কোনো আসমানি কিতাবই আল্লাহপাক নবী-রাসূল ব্যতীত নাযিল করেননি। প্রতিটি কিতাবের সঙ্গে একজন করে রাসূল প্রেরণ করেছেন। কিতাব ছাড়া রাসূল এসেছেন। কিন্তু রাসূল ব্যতীত কোনো কিতাব আসেনি। কেন? এইজন্য যে, মানুষের হেদায়াত ও পথনির্দেশনার জন্য, তাদের গায়ে বিশেষ কোনো রং চড়ানোর জন্য শুধু কিতাব যথেষ্ট হতো না।

শুধু বই পড়ে ডাক্তার হওয়ার পরিণতি

কেউ সিদ্ধান্ত নিল, আমি মেডিকেল সায়েন্সের বই পড়ে ডাক্তার হব। বাজার থেকে ক্রয় করে সে চিকিৎসা বিষয়ের কতগুলো বই পড়ল এবং বুঝলও। তারপর সে চেম্বার খুলে বসে চিকিৎসা শুরু করে দিল। বলুন, এই লোক কবরস্তান আবাদ করা ব্যতীত আর কোনো সেবা আঞ্জাম দিতে পারবে কি? যতক্ষণ-না সে অভিজ্ঞ কোনো ডাক্তারের সাহচর্য গ্রহণ করবে এবং কিছুকাল তার সঙ্গে অবস্থান করে কাজ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ডাক্তার হতে পারবে না। আমি আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলতে চাই যে, বাজারে রান্নার বই কিনতে পাওয়া যায়। তাতে রকমারি খাবার রান্না করার প্রণালি লেখা থাকে। পোলাও কীভাবে রান্না করতে হবে, কোরমা কীভাবে রান্না করতে হবে, বিরিয়ানি কীভাবে রান্না করতে হবে সব নিয়ম রান্নার বইয়ে লেখা থাকে। এখন কেউ যদি শুধু একটি বই ক্রয় করে তাকে সামনে রেখে রান্নার কাজ শুরু করে দেয় – বিরিয়ানি পাকাতে চায়, কোরমা পাকাতে চায়, তা হলে আল্লাহ জানেন, সে কোন হালুয়া তৈরি করে বসবে!

যতক্ষণ পর্যন্ত একজন অভিজ্ঞ বাবুর্চির সাহচর্যে অবস্থান করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ বিরিয়ানি প্রস্তুত করতে পারবে না।

তাক্ওয়া অর্জনের জন্য মুত্তাকীর সাহচর্য অবলম্বন করতে হবে

দ্বীনের বেলায়ও এই একই রীতি প্রযোজ্য। গায়ে দ্বীনিরং চড়ানোর জন্য, নিজেকে দ্বীনদার বানানোর জন্য শুধু কিতাব যথেষ্ট নয়। কিতাব অনুযায়ী জীবন গড়তে হলে আপনাকে অবশ্যই একজন শিক্ষক ও মুরুব্বীর সাহচর্য অবলম্বন

করতে হবে। আর সেজন্যই আল্লাহপাক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবীগণের পর সাহাবা কিরামের এই মর্যাদা অর্জিত হয়েছিল। 'সাহাবা' অর্থ কী? 'সাহাবা' সেই লোকগুলোকে বলা হয়, যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্যলাভে ধন্য হয়েছেন। তাঁরা দ্বীনের যা-কিছু অর্জন করেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহচর্যে অবস্থান করেই অর্জন করেছেন। তারপর অনুরূপ তাবেয়ীগণ সাহাবাগণের নিকট থেকে আবার তাবয়ে-তাবীয়গণ তাবেয়ীগণের সাহচর্য দ্বারা দ্বীন অর্জন করেছেন। দ্বীন এভাবেই আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছে।

আল্লাহপাকও আমাদেরকে তাক্ওয়া অর্জনের পন্থা এই বলে দিয়েছেন যে, তোমরা যদি তাক্ওয়া অর্জন করতে চাও, তা হলে তোমাদেরকে তাক্ওয়াওয়ালা মানুষদের সঙ্গ ধরতে হবে। তারপর সেই সাহচর্যের ফল হিসেবে আল্লাহপাক তোমাদের মাঝে তাক্ওয়া সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহপাক আমাদেরকে এর হাকীকত বুঝে সেই অনুসারে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র: ইসলাহী খুতুবাত- খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৩৬-২৪৫

ব্যবসার ফযীলত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۝

'তারপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর ফজল তালাশ করো ও আল্লাহকে বেশি-বেশি স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।'[৫]

পবিত্র কুরআনে বহুবার বলা হয়েছে, 'তোমরা আল্লাহর ফযল তালাশ করো'। কিন্তু কথাটির অর্থ কী? অধিকাংশ মুফাস্সির বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ব্যবসা। যেন আল্লাহপাক ব্যবসাকে 'আল্লাহর অনুগ্রহের অনুসন্ধান' বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'তোমরা আল্লাহর ফযল তালাশ করো' বলে আল্লাহপাক ব্যবসার ফযীলতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বোঝাতে চেয়েছেন, ব্যবসাকে তোমরা নিছক দুনিয়াবি কাজ মনে করো না; বরং এটি আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধানের সমার্থক।

পবিত্র কুরআনে ধন-সম্পদের উল্লেখ

আরেকটি বিষয় হলো, পবিত্র কুরআনে দুনিয়া ও ধন-সম্পদের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহপাক কোনো-কোনো স্থানে এমন-এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেগুলো এসবের নিন্দা ও মন্দত্বের প্রমাণ বহন করে।

যেমন– সূরা তাগাবুন-এর ১৫ নম্বর আয়াত :

اِنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

'তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা।'

---

৫. সূরা জুমু'আ : আয়াত ১০

সূরা হাদীদ-এর ২০ নম্বর আয়াত :

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

'দুনিয়াবি জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।'

আবার এসব বক্তব্যের ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়েছে।

যেমন–সূরা জুমু'আর ১০ নম্বর আয়াতে আল্লাহপাক বলেছেন :

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ

'তোমরা আল্লাহ অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো।'

এই আয়াতে ব্যবসার মুনাফাকে 'আল্লাহর অনুগ্রহ' আখ্যায়িত করা হয়েছে। আবার কোনো-কোনো জায়গায় সম্পদ বোঝাতে 'খায়র' (যার অর্থ কল্যাণ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

যেমন–সূরা 'আদিয়াত-এর ৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহপাক বলেছেন :

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

'বস্তুত মানুষ ধন-সম্পদের ঘোর আসক্ত।'

এই আয়াতে 'খায়ের' শব্দটি সম্পদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তো সাধারণ মানুষ অনেক সময় এই উভয় ধরনের আয়াতগুলোর মাঝে বিরোধ অনুভব করে থাকে যে, এইমাত্র বলা হলো, 'দুনিয়ার জীবনটা প্রতারণার উপকরণ'। আবার এখন বলা হচ্ছে, 'তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো'। মানে দুনিয়ার সম্পদ আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ।

কিন্তু আসলে দুয়ের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। বরং একথা বোঝানো উদ্দেশ্য, দুনিয়ার সহায়-সম্পদ মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য বা চূড়ান্ত কাম্য নয়। বরং আসল গন্তব্য আখেরাত আর সেখানে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি। এই জগতে বেঁচে থাকতে এসব বস্তু-সম্পদের প্রয়োজন। এগুলো ব্যতীত দুনিয়াতে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এগুলোকে চলার পথের পাথেয় আর দুনিয়াকে সফরের একটি মনযিল বলে ব্যবহার করবে এবং আসল গন্তব্য মনে না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো খায়ের বা কল্যাণ। আর যখনই মানুষ এগুলোকে আসল গন্তব্য বানিয়ে নেবে, যার অপরিহার্য ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, এগুলো অর্জন করার জন্য মানুষ বৈধাবৈধ ও হারাম-হালালের ভেদাভেদ ভুলে যাবে, তখন এগুলো ফেতনা ও প্রতারণার উপকরণে পরিণত হবে।

মোটকথা, দুনিয়ার সম্পদকে যদি শুধু উপকরণ মনে করে জায়েয ও হালাল সীমানার মধ্যে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা আল্লাহর অনুহ্গ্রহ ও কল্যাণ। আর যদি এগুলোকে না-জায়েয ও হারাম কাজে ব্যবহার করা হয়, তা হলে এগুলো ফেতনা, পরীক্ষা ও প্রতারণার উপকরণ।

দুনিয়াতে সম্পদ ও উপকরণের দৃষ্টান্ত

আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী রহ. চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, দেখো, দুনিয়ার ধন-সম্পদ যতই হোক-না কেন; এগুলো পানির মতো। আর হে মানুষ! তুমি হলে নৌকার মতো। নৌকা পানি ছাড়া চলতে পারে না। কিন্তু নৌকার জন্য পানি ততক্ষণ পর্যন্ত উপকারী, যতক্ষণ এই পানি নৌকার চার দিকে অবস্থান করবে – ডানে-বাঁয়ে থাকবে। কিন্তু পানি যদি নৌকার ভেতরে ঢুকে পড়ে, তা হলে এই পানি নৌকাটিকে ডুবিয়ে দেবে।

آب اندر زیر کشتی پشتی است
آب در کشتی ہلاک کشتی است

'পানি যতক্ষণ পর্যন্ত নৌকার তলে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নৌকাকে ভাসিয়ে রাখবে। কিন্তু যখনই পানি নৌকার ভেতরে ঢুকে যাবে, তখন সে নৌকার ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়।'

হাদীসে আছে :

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

'যে ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় সততা ও আমানতদারি রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে তার হাশর হবে।'[৬]

আরেক হাদীসে আছে :

التُّجَّارُ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ

'ব্যবসায়ীদেরকে কিয়ামতের দিন পাপীদের সঙ্গে উঠানো হবে। কিন্তু সেই ব্যবসায়ী এর ব্যতিক্রম, যে তাক্ওয়া অবলম্বন করবে, নেক কাজ করবে এবং সততা বজায় রাখবে।'[৭]

তো যে ব্যক্তি দুনিয়া ও দুনিয়ার সহায়-সম্পদকে ভ্রমণপথের একটি মনযিল মনে করবে এবং আল্লাহপাকের নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে তাকে ব্যবহার করবে, তা হলে এটি নেয়ামত ও আল্লাহর অনুগ্রহ বলে বিবেচিত হবে। আর যেখানে মানুষ তার মোহে জড়িয়ে পড়বে এবং তার কারণে হালাল ও হারামের সীমানরেখাকে দলিত করবে, সেখানে তা প্রতারণার উপকরণ বলে বিবেচিত হবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীস আমাদেরকে এই বাস্তবতাই বুঝিয়ে দিয়েছে।

---

৬. সুনানে তিরমিযী, হাদীছ নং ১১৩০; সুনানে দারেমী, হাদীছ নং ২৪২৭

৭. সুনানে তিরমিযী, হাদীছ নং ১১৩১; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীছ নং ২১৩৭; সুনানে দারেমী, হাদীছ নং ২৪২৬

মুসলমান ব্যবসায়ীর বৈশিষ্ট

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَ اذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

'যখন সালাত আদায় হয়ে যাবে, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর ফযল অনুসন্ধান করো আর আল্লাহকে বেশি-বেশি স্মরণ করো। তা হলেই তোমরা সফল হতে পারবে।'[৮]

আল্লাহর ফযল তালাশ করো আর আল্লাহকে বেশি-বেশি স্মরণ করো।

ব্যবসা করছ; আল্লাহর যিকির চালু থাকতে হবে। কারণ, তুমি ব্যবসা করতে গিয়ে যদি আল্লাহকে ভুলে যাও, তখন এই ব্যবসা তোমার অন্তরে ঢুকে তোমার নৌকাটিকে ডুবিয়ে দেবে। সেজন্য আল্লাহপাক 'আল্লাহর ফযল তালাশ করো' বলে আবার বলে দিয়েছেন, 'আর আল্লাহকে বেশি-বেশি স্মরণ করো' যে, ব্যবসার সঙ্গে আল্লাহর স্মরণও থাকতে হবে। এমন যেন না হয় :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ

'ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে।'[৯]

একজন মুসলমান ব্যবসায়ীর বৈশিষ্ট্য হলো, তার হাত ব্যবসা করবে আর তার অন্তর আল্লাহর স্মরণে ব্যাপৃত থাকবে। সূফিয়ায়ে কেরাম এর অনুশীলন করিয়ে থাকেন এবং এরই নাম তাসাওউফ যে, আমি ব্যবসাও করব আবার বেশি-বেশি আল্লাহর যিকিরও করব। এ-কাজটি আপনি কীভাবে করবেন? কীভাবে আপনি এর অভ্যাস গড়ে তুলবেন? তো সূফিয়ায়ে কেরাম মানুষকে এই বিদ্যাটি-ই শিক্ষা দিয়ে থাকেন যে, তোমরা ব্যবসাও করো আবার আল্লাহর যিকিরও চালু রাখো। আমার দাদা হযরত মাওলানা ইয়াসীন রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের সমবয়সী ছিলেন। মানে যে-বছর দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়, আমার দাদাজিও সে-বছরই জন্মলাভ করেন। সারাটা জীবন তিনি দারুল উলূমেই অতিবাহিত করেন। ওখানেই পড়েছেন এবং ওখানেই পড়িয়েছেন।

তিনি বলতেন :

> 'আমরা দারুল উলূম দেওবন্দে সেই আমলটি দেখেছি, যখন সেখানকার শায়খুল হাদীস থেকে শুরু করে দারোয়ান-চাপরাশি পর্যন্ত সবাই ছাহেবে নিসবত ওলী ছিলেন।'

---

৮. সূরা জুমু'আ : আয়াত ১০

৯. সূরা মুনাফিকূন : ৯

চৌকিদার চৌকিদারি করছে। গেটে বসে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু তার ছয় লতিফা চালু আছে।

দাদাজি রহ. হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর ছাত্র ছিলেন। শায়খুল হিন্দ রহ.-এরই নিকট দাওরা হাদীস পড়েছেন। তিনি বলতেন, আমি স্বয়ং দেখেছি, আমরা হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর কাছে মান্তেকের কিতাব 'মোল্লা হাসান' পড়তাম। আমরা দেখতাম, তিনি সবক পড়াচ্ছেন, তাকরীর করছেন; কিন্তু এই সময়টিতেও তাঁর অন্তর থেকে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকিরের আওয়াজ আসছে।

আমি একটু আগে আপনাদের সম্মুখে যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি, তার দাবি এটিই। আর সূফিয়ায়ে কেরাম এটিই শিক্ষা প্রদান করেন যে, তুমি কাজও করো আবার সেইসঙ্গে আল্লাহর যিকিরও চালু রাখো।

মানুষ মনে করে, এটি নতুন কোনো বিদ'আত বের করে নেওয়া হয়েছে। না, ভাই! এটি নতুন কিছু নয়। এটি বিদ'আত নয়। বরং এটি পবিত্র কুরআনেরই অনুসরণ। আল্লাহপাক বলছেন :

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ؕ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

'তোমরা আল্লাহকে বেশি-বেশি স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল হতে পার। তারা যখন কোনো ব্যবসা কিংবা তামাশা দেখতে পায়, তখন তারা আপনাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে যায়। আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা তামাশা থেকে ও ব্যবসা থেকে উত্তম। আর আল্লাহই উত্তম রিযিকদাতা।'[১০]

আয়াতের শানে নুযূল

বুখারী শরীফের কিতাবুল জুমু'আয় এই আয়াতটির শানে নুযূল বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন জুমু'আর নামাযের খুতবা দিচ্ছিলেন। এ সময় কিছু লোক উটে করে কিছু ব্যবসাপণ্য নিয়ে এল। তখন কিছু-কিছু মুসলমান তা দেখার জন্য উঠে যায়। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয় যে, তারা যখন কোনো ব্যবসা কিংবা তামাশা দেখতে পায়, তখন তারা সেদিকে ছুটে যায় আর নবীজিকে দাঁড়ানো অবস্থায় ফেলে যায়। তো এখানে ব্যবসাও আছে, আবার তামাশাও আছে।[১১]

---

১০. সূরা জুমু'আ : ১০, ১১

১১. তাফসীরে ইবনে কাছীর : ৪/৩৭০

لهو (লাহ্উন)-এর ব্যাখ্যা

কেউ-কেউ বলেছেন, এখানে لهو 'লাহ্উন' শব্দটি ব্যবসার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, ব্যবসা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে দেয়। আর সেজন্যই এটি 'লাহ্উন' বা তামাশায় পরিণত হয়ে যায়।

কেউ-কেউ বলেছেন, এখানে 'লাহ্উন' দ্বারা উদ্দেশ্য, যে লোকগুলো ব্যবসার পণ্য নিয়ে এসেছিল, তাদের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রও ছিল। তাই সেটি ব্যবসাও ছিল আবার তামাশাও ছিল। সেজন্য আল্লাহপাক দুটিরই কথা বলেছেন।[১২]

اليها এর সর্বনামটি একবচন হওয়ার কারণ

اليها এর মধ্যে সর্বনামটি 'তিজারাহ'-এর দিকে ফেরানো হয়েছে। অন্যথায় দ্বি-বচনে اليهما বলতে হতো। কিন্তু তা না করে এখানে সর্বনামটি একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। তাতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসার জন্য যাওয়া – তামাশা দেখার জন্য নয়। বরং 'লাহ্উন'-এর উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে।

তারপর আল্লাহপাক বললেন :

قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

'আপনি বলে দিন, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা তামাশা থেকে ও ব্যবসা থেকে অধিক উত্তম। আর আল্লাহই উত্তম রিযিকদাতা।'

একটু আগে বলেছেন :

مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

মানে ব্যবসা আল্লাহর ফযল বা অনুগ্রহ।

আর এখন বলছেন :

مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ

'আল্লাহর কাছে যা আছে, তা তামাশা থেকে ও ব্যবসা থেকে উত্তম।'

তা হলে অর্থ কী দাঁড়াল? সেই যে আমি বলেছিলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসা আপনাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করেনি, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসা আপনার জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল। আর যখনই কাজটি আপনাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে দিল, তখন সেই ব্যবসা আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার কারণে পরিণত হয়ে গেল। ব্যবসা করতে গিয়ে যদি আপনি মনে করেন, আমি যদি আল্লাহপাকের অমুক বিধানটি পালন করতে যাই, তা হলে আমার বিরাট

১২. উম্‌দাতুল কারী : ৫/১২২

ক্ষতি হয়ে যাবে, তা হলে বুঝতে হবে, এটি শয়তানের ধোঁকা। এই বুঝ অন্তর থেকে বের করে দিতে হবে।

কারণ, আল্লাহপাক বলছেন :

لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

'তোমরা একজন আরেকজনের সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না। তবে ব্যবসার সূত্রে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে খেতে পার।'[১৩]

এই আয়াতটিও ব্যবসার মূলনীতি বর্ণনা করছে যে, অন্যায় ও অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করা হারাম। হালাল হওয়ার পন্থা কেবল একটি যে, তোমরা ব্যবসা করবে আর পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে একজনের সম্পদ আরেকজন হস্তগত করবে।

ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য শুধু একজনের সম্মতি যথেষ্ট নয়

বোঝা গেল, একা এক পক্ষের সন্তুষ্টি ও সম্মতি ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। ক্রয়-বিক্রয় বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য উভয় পক্ষের সম্মতি জরুরি। আল্লাহপাক বলছেন :

اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

'পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যে ব্যবসা হবে, তার সূত্রে একজনের সম্পদ আরেকজনের ভোগ করা হালাল হবে।'

'যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসা না হবে...' কথাটার অর্থ হলো, সেই লেনদেন, যেটি আল্লাহর কাছে ব্যবসা বলে পরিগণিত। কাজেই সুদের লেনদেনে পারস্পরিক সম্মতি আছে বটে; কিন্তু এমন লেনদেন করতে আল্লাহপাক নিষেধ করে দিয়েছেন। কাজেই এটি ব্যবসা নয়। আবার ব্যবসা হলেও যদি তাতে পারস্পরিক সম্মতি না থাকে, তা হলেও তা হারাম। তার মানে একসঙ্গে দুটি শর্ত পাওয়া যেতে হবে। ব্যবসাও হতে হবে আবার পারস্পরিক সম্মতিও থাকতে হবে। আল্লাহপাক আমাদেরকে বুঝবার ও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَآ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : ইন'আমুল বারী– খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৭১-৭৫

---

১৩. সূরা নিসা : ২৯

উপায় অবলম্বন ও জীবিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

হযরত ফারুকে আ'জম (রাযি.) বলেছেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزِلُ نَفَقَةَ اَهْلِهِ سَنَةً

'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিবারের এক বছরের ভরণ-পোষণ আলাদা করে রাখতেন যে, এগুলো সারা বছর পরিবারের ভরণ-পোষণে ব্যয় করা হবে।'[১৪]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই রীতির কথা ব্যক্ত করেছেন হযরত ফারুকে আ'জম (রাযি.)। আল্লাহর রাসূল তাঁর সব কজন স্ত্রীর ঘরে পুরো এক বছরের বাজেট পৌছিয়ে দিতেন। তাঁর নিজের বাজেটটাও তার অন্তর্ভুক্ত থাকত। তবে এ সকল মহিলা যেহেতু নবীজিরই স্ত্রী ছিলেন; বছরের বাজেট তাঁদের ঘরে পৌছে যেত বটে; কিন্তু তাঁরা খুব দান-খয়রাত করতেন। সেজন্য এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে যে, নবীজির চুলায় লাগাতার তিন মাস পর্যন্ত আগুন জ্বলেনি।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আর্থিক অবস্থা

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, অনেক সময় এমনও হতো যে, আমরা লাগাতার তিনটি চাঁদ দেখতাম এবং এই পুরো সময়টিতে আমাদের ঘরে আগুন জ্বলত না।

আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযি.) যার কাছে এই তথ্যটি বর্ণনা করেছেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে আপনাদের জীবন চলত কীভাবে?

---

১৪. ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন : ১/২২৪

উত্তরে তিনি বলেছেন :

اَلْاَسْوَدَانِ اَلتَّمْرُ وَالْمَاءُ

'দুটি কালো বস্তুর উপর নির্ভর করে আমাদের জীবন অতিবাহিত হতো। একটি হলো খেজুর আর অপরটি পানি।'[১৫]

কিন্তু অনবরত তিন মাস ঘরের চুলায় আগুন জ্বলত না এমন ঘটনাও তাঁদের জীবনে ঘটেছে। বহুবার এমনও ঘটেছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধেছেন। এমন ঘটেছে যে, হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, কখনও দুবেলা পেট পুরে খাবার খাননি আর কখনও গমের আটার রুটি খাননি। তাঁর খাবার হতো জবের রুটি।[১৬]

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য কখনও খাবারের চৌকি বিছানো হয়নি। আর তাঁর জন্য কখনও চাপাতি তৈরি করা হয়নি।'[১৭]

রুচি ও ক্ষুধাবর্ধক আচার-চাটনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে একবারও খাননি। তার কারণ এই ছিল যে, বছরের খোরাকি আলাদা করে একধারে রাখা তো হয়েছিল; কিন্তু দান করে-করে সব আগেই শেষ করে ফেলতেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও অকাতরে দান করতেন এবং তাঁর স্ত্রীগণও খোলাহাতে দান করতেন। তার জন্যই এই পরিস্থিতি তৈরি হতো। এভাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি পরস্পর-বিরোধী বিষয়কে সুন্নতের রূপ দান করেছেন।

প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়

তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিকে নিজের আমল দ্বারা এই শিক্ষা প্রদান করেছেন যে, একসঙ্গে সারা বছরের ভরণ-পোষণ জমিয়ে রাখা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। এতে আল্লাহর উপর ভরসায় কোনো ঘাটতি আসে না। কারণ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আল্লাহর উপর পুরোপুরি তাওয়াক্কুল ছিল। এ ব্যাপারে কারও কোনো সন্দেহ

---

১৫. সহীহ বুখারী : হাদীস নং–২৩৭৯; সহীহ মুসলিম : হাদীস নং–৫২৮২; ইবনে মাজা : হাদীস নং-৪১৩৫; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং–২৩২৮৪।

১৬. সহীহ বুখারী : হাদীস নং–৪৯৯৬; সহীহ মুসলিম : হাদীস নং–৫২৭৪; সুনানে তিরমিযী : হাদীস নং–২২৮০; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং–২৩০২২।

১৭. সহীহ বুখারী : হাদীস নং–৪৯৬৭; সুনানে তিরমিযী : হাদীস নং–১৭১০; সুনানে ইবনে মাজা : হাদীস নং–৩২৮৩; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং–১১৮৪৮।

করার কোনোই অবকাশ নেই। কাজেই এ কাজটি যদি তাওয়াক্কুলের খেলাফ হতো, তা হলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কখনও করতেন না। তাঁর চেয়ে ভালো তাওয়াক্কুলকারী আর কে হতে পারে? কাজেই প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা এবং তা জমিয়ে রাখা না সাধারণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী, না পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী।

তাওয়াক্কুলের স্বরূপ

তাওয়াক্কুল হলো আল্লাহর উপর ভরসা রাখা। যদিও তাতে উপকরণ অবলম্বন করা হয়। কারণ, এই জগতকে আল্লাহপাক উপকরণের জগত বানিয়েছেন। সেজন্য আমরা উপকরণ অবলম্বন করছি। কিন্তু আল্লাহপাক উপকরণের মধ্যে কিছু রাখেননি। এই উপকরণ ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকরী হবে না, যতক্ষণ-না আল্লাহ তাতে ক্রিয়া সৃষ্টি করেন। আপনি এক বছরের খোরাকি তুলে রাখলেন। কিন্তু তারপরও ভরসা এই সম্পদের উপর থাকতে পারবে না। ভরসা থাকবে আল্লাহর উপর।

নিজের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা যা করার করেছেন। সারা বছরের বাজেট একত্রিত করে তুলে রেখেছেন। কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, এই সম্পদ আপনার কাছে বছরভর অক্ষত থাকবে – কোনো অবস্থাতেই এই সম্পদ আপনার হাতছাড়া কিংবা বিনষ্ট হবে না। আপনার এই সম্পদ পোকায় খেয়ে ফেলতে পারে। পঁচে যেতে পারে। চুরি-ডাকাতি হয়ে আপনার হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। হাজারো আশঙ্কা আছে। কাজেই নিজের পক্ষ থেকে আয়োজন সম্পন্ন করার পর এখন এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহই আমার রিযিকদাতা। তিনি-ই আমার অভিভাবক। আমি তাঁরই উপর ভরসা রাখছি এবং বিশ্বাস করছি, তিনি না খাওয়ালে আমি খেতে পারব না।

মানবীয় মেজাজ ও রুচির পার্থক্য

এখানে প্রথম বিষয়টি হলো, অনেক সময় এ বিষয়টিও দ্বীনের কাম্য হয় যে, মানুষের অন্তরে প্রশান্তি থাকবে এবং কোনো অস্থিরতা বা পেরেশানি থাকবে না। আবার মানুষের মেযাজ-স্বভাবও এক-একজনের এক-এক রকম হয়। কারও স্বভাব এমন হয় যে, তাদের কোনো কিছুতেই কোনো পরোয়া থাকে না। অন্তর সব সময় স্থির থাকে। সম্পদ আছে, তাও সই; নেই, তাও সই। তাতে দৈনন্দিন কাজে কোনোই হেরফের হয় না। আবার কিছু স্বভাব এমন হয় যে, উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা না হওয়া অবধি তাদের মনে স্বস্তি আসে না, কোনো কাজে মন বসে না।

এক বুযুর্গের একটি বিরল ঘটনা

আমি আমার আব্বাজি মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ.-এর কাছে শুনেছি যে, তিনি এক বুযুর্গের ঘটনা বলতেন। একদিন বুযুর্গ বসে-বসে দু'আ করছিলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে পুরো বছরের খরচা একসঙ্গে দিয়ে দিন।'

বুযুর্গ দু'আটি খুব আন্তরিকতার সঙ্গে মনের মাধুরি মিশিয়ে করছিলেন। ছিলেন কাশ্‌ফ ও কারামতওয়ালা। আল্লাহর পক্ষ থেকে তখনই এল্‌হাম এল, কেন, তোমার কি আমার উপর ভরসা নেই যে, সারা বছরের খরচ একসঙ্গে আগেই চাচ্ছ? আজ আজকেরটা চাও; কাল কী হবে, পরে দেখা যাবে।

বুযুর্গ উত্তরে বললেন, হে আল্লাহ, আপনার উপর নির্ভরতা আমার পুরোপুরিই আছে। কিন্তু হতভাগা শয়তান আমাকে সব সময় খোঁচায় যে, এই, কাল তুই কী খাবি? পরশু কী খাবি? ছেলেমেয়েদেরকে কী খাওয়াবি? এসব বলে-বলে শয়তান আমাকে বিরক্ত করে ফেলে। সেজন্য আমি চাচ্ছি, একবারেই এই অস্থিরতা দূর হয়ে যাক। আপনি আমাকে এক বছরের খোরাকি একসঙ্গে দিয়ে দিন; তা হলে সেদিকে দেখিয়ে আমি শয়তানকে বলতে পারব, ওই দেখ, রাখা আছে; আমার কোনো চিন্তা নেই। এজন্য আমি আপনার কাছে এক বছরের খোরাকি একসঙ্গে চাচ্ছি। অন্যথায় আপনার উপর ভরসার আমার কোনোই কমতি নেই।

আল্লাহপাক বুযুর্গের দু'আ কবুল করলেন। তাঁকে বছরের বাজেট একসঙ্গে দিয়ে দিলেন।

বুযুর্গের নিয়ত সঠিক ছিল যে, আমার অন্তর স্থির হয়ে যাক। মানুষের যখন অস্থিরতা দূর হয়ে যায়, তখন কাজ করতে আরাম পায়। কাজে-কর্মে শক্তি আসে। মন একাগ্র থাকে। আর মনের এই একাগ্রতা এই পথে বিরাট এক নেয়ামত। অন্তর প্রশান্ত থাকা, অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকা এই পথের অনেক বড় পাথেয়। কারণ, এ পথের সার হলো আল্লাহকে পেয়ে যাওয়া, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া এবং অন্তর সব সময় আল্লাহর প্রতি ঝুলে থাকা। অস্থিরতা আমাদের মতো দুর্বল ঈমানের লোকদের একাগ্রতাকে বিনষ্ট করে দেয়। তার ফলে ইবাদতে মন বসে না। যিকিরে মন বসে না।

হাদীসে আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'শয়তান মানুষের অন্তরে ওঁৎ পেতে থাকে।' কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহর যিকির করতে থাকে, আল্লাহর প্রতি ধ্যানমগ্ন হয়, তখন শয়তান পালিয়ে যায়। আর যখন মানুষ আল্লাহ থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে, তখন শয়তান আবার কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে।

মানবহৃদয়ের দুটি অবস্থা

এই হাদীস দ্বারা জানা যাচ্ছে, মানুষ দুই অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারে না। তার অন্তর হয় আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত থাকবে, নতুবা ব্যস্ত থাকবে শয়তানি কুমন্ত্রণার মাঝে। এর বাইরে তৃতীয় কোনো অবস্থা নেই। একজন মানুষ যদি আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত না থাকে, তা হলে শয়তান তার অন্তরে নানা ধরনের কুমন্ত্রণা ঢালতে থাকে। কাজেই শয়তানি কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার পথ হলো আল্লাহর স্মরণ। আর এই স্মরণ বা যিকির নানাভাবে হতে পারে। মুখে হতে পারে, অন্তরে হতে পারে। তাসবীহর আদলে হতে পারে, নামাযের আদলে হতে পারে, দান-সদকা ইত্যাদি নেক আমলের আদলে হতে পারে। মানুষ যা-কিছু ইবাদত বা নেক আমল করবে, তা-ই আল্লাহর যিকিরের অন্তর্ভুক্ত হবে।

যে কোনো আনুগত্য আল্লাহর যিকিরের সমার্থক

আল্লামা জাযরী রহ. হিস্নে হাসীনে লিখেছেন :

كُلُّ مُطِيْعٍ لِلّٰهِ فَهُوَ ذَاكِرٌ

'আল্লাহর আনুগত্যকারী মানেই যিকিরকারী।'

যে লোকই আল্লাহর আনুগত্যের কাজ করছে, সে-ই যাকের। এমনকি একজন মানুষ হালাল রুজি উপার্জনে ব্যস্ত। কিন্তু কাজটি করছে সে সঠিক নিয়তে যে, এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো নিজের হক আদায় করা। আবার তরীকাও তার সঠিক যে, হালাল পন্থায় উপার্জন করছে – হারামকে যত্নের সাথে পরিহার করছে। তো এই ব্যক্তিও যিকিরকারী বলে গণ্য হবে। এই লোকও যাকেরদের একজন।

মোটকথা, আল্লাহপাকের যত আনুগত্য আছে, তার সবই যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ হয়ত এই যিকিরের মাঝে লিপ্ত থাকবে কিংবা থাকবে না। যদি না থাকে, তা হলে সে শয়তানি কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে পড়বে।

এজন্যই আমরা বলে থাকি, অন্তরকে আল্লাহর জন্য অবসর রাখো।

অন্তরকে আল্লাহর জন্য অবসর করে নাও

আমার আব্বাজি মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ. একদিন কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। বললেন, একদিন আমি হযরত থানভী রহ.-এর সঙ্গে খানকাহ থেকে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। হযরত থানভী রহ. যখন খানকাহ থেকে বাড়ি যেতেন, তখন সাধারণ লোকদের জন্য নির্দেশনা ছিল, কেউ যেন তাঁর সঙ্গে না হাঁটে। তাঁর সঙ্গে হাঁটা নিষেধ ছিল। পীর ছাহেব কোথাও যাবেন আর ভক্ত-মুরীদদের একটি দল তাঁর ডানে-বাঁয়ে ও পেছনে হাঁটবে এই দৃশ্য হযরত থানভী

রহ. পছন্দ করতেন না। সেজন্য তাঁর নিয়ম ছিল, আমি যখন উঠে যাব, তখন আমার সঙ্গে কেউ হাঁটতে পারবে না। কথা যত আছে, আগেই সেরে নাও। আমি যখন বাড়ি যেতে রওনা হব, তখন আমার সঙ্গে ডানে-বাঁয়ে কেউ থাকতে পারবে না। আমাকে একাকি যাওয়ার সুযোগ দাও। আরও আদেশ ছিল, আমি যে মালপত্র নিয়ে যাব, সেগুলো কেউ ধরতে পারবে না। আমার বোঝা আমি নিজেই বহন করে নিয়ে যাব।

তার কারণ এই ছিল যে, হযরত রহ. বলতেন, ভাই, আমি তো একজন খাদেম। খেদমত গ্রহণের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী! সেজন্য চলার পথে ডানে-বাঁয়ে ও পেছনে মুরীদের বহর নিয়ে হাঁটা হযরত পছন্দ করতেন না। একজন সাধারণ মানুষ যেভাবে হাঁটতেন, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.ও ঠিক সেভাবেই চলতেন। তবে যদি কখনও এমন কোনো শিষ্য-মুরীদ, যে হযরতের মেজাজ বোঝে তাঁর সঙ্গে যাওয়ার আবদার করত, তা হলে তাতে তিনি বারণ করতেন না।

হযরতের সঙ্গে আমার আব্বাজির বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেছেন, একদিন আমি হযরতের সঙ্গে খানকাহ থেকে তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে হঠাৎ পকেট থেকে একটি কাগজ বের করলেন এবং তাতে কিছু লিখলেন। পরে আবার কাগজটি পকেটে রেখে দিলেন। তারপর বললেন, 'মৌলভী শফী'! তুমি তো দেখেছ, আমি কী করেছি।'

আব্বাজন বলেন, আমি বললাম, না হযরত! আমি বিষয়টি বুঝতে পারিনি। ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দিন।

হযরত থানভী রহ. বললেন :

'আমার একটি কাজের কথা মনে পড়ে গেল। সেটি আমার মনের উপর একটি বোঝা হয়ে ছিল। সেটি আমি কাগজে লিখে নিলাম। মনের বোঝাটি কাগজে স্থানান্তর করে দিলাম। এখন আলহামদুলিল্লাহ মনটা অবসর আছে। এই অন্তর তো আসলে একটি-ই কাজের জন্য। তা হলো আল্লাহপাকের যিকির। মনে যখনই কোনো অস্থিরতা বা পেরেশানির বোঝা চাপবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে, যাতে অন্তর সেই সত্তার জন্য অবসর হয়ে যায়, যার জন্য একে তৈরি করা হয়েছে।'

মানুষের অন্তর মহান আল্লাহর তাজাল্লির স্থান

এই অন্তর তো আল্লাহপাকের তাজাল্লির স্থান। কাজেই হওয়া দরকার ছিল এই যে, তাতে একমাত্র আল্লাহরই স্মরণ থাকবে। আর সেজন্য হযরত থানভী

রহ. মনের বোঝা কাগজে স্থানান্তর করে তাকে আল্লাহর জন্য অবসর করে নিলেন। তারপর বললেন, ব্যস, এই চেষ্টা করো যে, অন্তরে এদিক-ওদিককার যেসব অস্থিরতা ও পেরেশানি এসে ভিড় জমায়, সেগুলো যেন না থাকে। ব্যস, তাকে একটি-ই কাজে ব্যস্ত রাখো, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

এই হলো মনোযোগের সারকথা।

আমি আমার শায়খ আরেফ বিল্লাহ ডাক্তার আব্দুল হাই রহ.-এর কাছে শুনেছি। হযরত থানভী রহ. মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। চোখদুটো বন্ধ। চিকিৎসকগণ তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের আসা-যাওয়া আর হযরতকে বিরক্ত করা বন্ধ হলো না। একজন এল আর বলল, হযরত! আপনার ঔষধ সেবনের সময় হয়েছে; ঔষধটা খেয়ে নিন। আরেকজন এল। জিজ্ঞেস করল, হযরত! শরীরটা এখন কেমন আছে? এভাবে নানাজন আসছে আর নানা কথা বলে, নানা কথা জিজ্ঞেস করে বিরক্ত করতে থাকে। একদিন তিনি খানকার নাযেম মাওলানা শাব্বীর আলী সাহেবকে বললেন :

'মৌলভী শাব্বীর আলী! শুধু প্রয়োজনীয় কথাটা-ই এসে জিজ্ঞেস করে নিয়ো। এর অধিক কিছু জিজ্ঞেস করো না। তাতে কোনো লাভ হয় না। একজন ব্যস্ত মানুষকে পেরেশান করছ কেন!'

একথার অর্থ হলো, মন তো জায়গামতো আটকে আছে। এই অবস্থায় নানাজন এসে-এসে কথা বলছে। নানা ধরনের সমস্যার কথা তুলে ধরছে। তাতে মনোযোগ অন্য দিকে সরে যাচ্ছে। এভাবে একজন ব্যস্ত মানুষকে পেরেশান করা ঠিক নয়।

সারকথা হলো, অন্তর যেন আল্লাহর যিকিরে, আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত থাকে। অন্যথায় সে শয়তানের কুমন্ত্রণার আখড়া হয়ে যাবে। সেজন্য তরিকতে মনোসংযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর যে ব্যক্তির উপায় অবলম্বন ব্যতীত মনোসংযোগ অর্জিত হয় না, তার উপায় অবলম্বন করা উচিত, যাতে মন প্রশান্ত থাকে, কষ্ট দূর হয়ে যায় এবং একাগ্রতা তৈরি হয়। এই উপায়-উপকরণ অবলম্বন করাকে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী মনে করা একদম ভুল কথা। এটি তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। কারণ, উপকরণকে উপকরণের জায়গায়ই অবলম্বন করা হচ্ছে। আসল ভরসা তো আল্লাহর উপর যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি এসব উপকরণের মধ্যে ক্রিয়া সৃষ্টি না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে ক্রিয়া তৈরি হতে পারে না।

জীবিকা অর্জনের চিন্তা নিষিদ্ধ নয়

জীবিকা অর্জনের চিন্তা, হালাল রুজি উপার্জনের ভাবনা – চাই তা সঞ্চয়ের আদলেই হোক-না কেন – এটি কোনো নিষিদ্ধ কাজ নয়। মাকরূহও নয়।

নিন্দনীয়ও নয়। তাওয়াক্কুল-তাক্ওয়ার পরিপন্থীও নয়। বরং মনোসংযোগ তৈরির খাতিরে এমনটি করা অনেক ভালো।

কিন্তু যা মন্দ, তা হলো, মানুষ এর মাঝে এতটা নিমগ্ন হয়ে যাবে যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত দুনিয়ার ধান্দায় এমনভাবে জড়িয়ে থাকবে, যেন অর্থ উপার্জনই জীবনের একমাত্র কাজ – এছাড়া আর কোনোই কাজ নেই। কীভাবে অর্থ উপার্জন করব, কীভাবে সম্পদের পাহাড় গড়ব, কীভাবে আরও অধিক সম্পদের মালিক হব ব্যস, এ-ই একমাত্র ব্যস্ততা, একমাত্র ভাবনা। দুনিয়া উপার্জনের কাজে এমন নিমগ্নতা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। এই নিমগ্নতা নিন্দনীয়। নিয়ম হলো, আপনি আপনার প্রয়োজন অনুপাতে চেষ্টা চালাবেন।

জীবনধারণে আরামও প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আপনার প্রয়োজন এভাবেও পূরণ হতে পারে যে, সংসার চালাতে আপনার এক বছরে যা-যা দরকার হবে, আপনি তার ব্যবস্থা করে নিলেন। চাল. ডাল, নুন, তেল ইত্যাদি যা-কিছু দরকার আপনি তার ব্যবস্থা করে নিলেন। ব্যস, এতটুকু হয়ে গেলে আর উপার্জনের ব্যস্ততা রাখলেন না। এতটুকু প্রচেষ্টা তাওয়াক্কুলের খেলাফ নয়।

মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেবের একটি বাণী

আমাদের শায়খ মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব রহ. একদিন বললেন :

'দেখো ভাই! মানুষের প্রয়োজন, আরাম ও এক-একজনের এক-এক রকম হয়ে থাকে। এক বেচারা একা থাকে। তার জন্য সামান্য জিনিসই যথেষ্ট। অল্পতেই তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। সেজন্য বাস্তবতা ও শরীয়তের নির্দেশনার আলোকে ইসলামী চিন্তাবিদগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, মানুষের মৌলিক প্রয়োজন হলো, বছরে তিন জোড়া পোশাক আর সারা বছরের খোরাক। ব্যস, এতটুকু হলে আপনার আসল প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেল।

'কিন্তু একলোক এমন আছে যে, তার কাছে মেহমানের আগমন ঘটে। তার ঘরে মেহমান আসে। কাজেই এই ব্যক্তির প্রয়োজন প্রথমজনের তুলনায় কিছু বেশি হবে। এমতাবস্থায় এই লোক যদি তার চাহিদা ও প্রয়োজন অনুপাতে উপার্জনের চেষ্টা করে এবং তার প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তা হলে তা শরীয়তের খেলাফ হবে না।'

আমি আমার জীবনের কোনো এক পর্যায়ে হযরতের কাছে পত্র লিখলাম যে, বর্তমানে আমার মাসিক আয়ের পরিমাণ এত। এখন আমি চাচ্ছি, মাদরাসা থেকে বেতন নেওয়া বন্ধ করে দেব। কারণ, অন্য উৎস থেকে আয় যা আসছে, তাতেই আমার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাচ্ছে।

হযরত আমার উল্লেখিত অংকটির উপর দাগ টেনে লিখলেন, 'এই অংক আপনার প্রয়োজন পূরণকারী পরিমাণ নয়। কাজেই আপনি বেতন-ভাতা নিতে থাকুন। তবে খরচ করার পর যা উদ্বৃত্ত থাকবে, সেগুলো নিজের পক্ষ থেকে মাদরাসায় দিয়ে দিবেন।

জীবিকা অর্জনে বাড়াবাড়ি পরিত্যাজ্য

মোটকথা, নিজের প্রয়োজন অনুসারে সম্পদ উপার্জন ও সঞ্চয় করা শরীয়তে অপছন্দনীয় নয়, মাকরূহও নয়, তাসাওউফেরও পরিপন্থী নয়, তাক্ওয়া-তাওয়াক্কুলেরও বিরোধী নয়। বৈধ উপায়ে আবশ্যক পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা ইসলামে অনুমোদিত।

একথা সত্য যে, মানুষ সম্পদ উপার্জন করতে গিয়ে তাক্ওয়া ও শরীয়তের সীমানার বাইরে চলে যায়। অনেকেরই অবস্থা হলো, দিন-রাত ব্যস একই ধান্দা, একই কাজ, একই ভাবনা। আর কোনো কাজই যেন তার নেই। তাদের জীবনের সব চেয়ে বড় ভাবনাটি হলো, কীভাবে সম্পদ উপার্জন করব। কীভাবে সম্পদের পাহাড়টাকে আরও উঁচু করব। ফ্যাক্টরি একটি আছে; কীভাবে আরও একটি গড়ব। দুটি আছে; কীভাবে তিনটি হবে। ব্যাংক ব্যালেন্সকে কীভাবে আরও স্ফীত করব। বাড়ি একটা আছে; কীভাবে আরও বাড়ির মালিক হব। জীবনের ভোগ-বিলাসিতার মাত্রা কীভাবে আরও বাড়াব। ব্যস, রাত-দিন এই একই চিন্তা, একই ভাবনা।

এটি খারাপ ও নিন্দনীয়। এই চরিত্র থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, এর থেকে কীভাবে বাঁচব? কীভাবে এর থেকে রক্ষা পাব? সীমানাটা কীভাবে নির্ধারণ করব যে, প্রয়োজনের গাড়িটিকে কোথায় নিয়ে ব্রেক করব? আমি কীভাবে জানব, কোন জায়গায় গিয়ে প্রয়োজনের সীমানা শেষ হবে আর বিলাসিতার সীমানা শুরু হবে?

আমি আপনাদের সামনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একথাটি-ই উপস্থাপন করছি এবং বারবার বলছি যে, দুয়ে-দুয়ে চার করে এর ফর্মুলা ঠিক করে দেওয়া সম্ভব নয়। এই চরিত্র ও এই বুঝ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন, দ্বীনের মেজাজ ও চাহিদা জানা এবং আল্লাহর অলীদের সাহচর্য অবলম্বনের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। একজন আল্লাহর অলীর সাহচর্য অবলম্বন করলেই কেবল আপনি জানতে পারবেন, আর সামনে এগুবেন কি-না।

মনে রাখবেন, নিজেকে দিনরাত সারাক্ষণ দুনিয়া উপার্জনের ধান্দায় মাতিয়ে রাখা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করেছেন :

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا

'হে আল্লাহ! তুমি দুনিয়াকে আমার সবচেয়ে বড় ভাবনার বিষয়, আমার জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু, আমার কামনা-বাসনার চূড়ান্ত বানিয়ো না।'[১৮]

এ হলো খারাপ ও নিন্দনীয়। এর থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা

আপনি দেখুন, ইসলামের কেমন ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা যে, আমাদের প্রয়োজনকে কোথাও বাধা দেওয়া হয়নি। শুধু প্রয়োজনই নয় – সুখ-আরামকেও নিষিদ্ধ করা হয়নি। কিন্তু সঙ্গে একথাটি বলে দিচ্ছে যে, ওকে সামনে এগিয়ে দিয়ে নিজের উপর জয়ী করে দিয়ো না। চেষ্টা এজন্য করো, যাতে মস্তিষ্ক অবসর হয়ে যায়। মন স্থির থাকে এবং আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয় যে, আলহামুদলিল্লাহ! এক বছরের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হয়ে গেছে; এবার নিজের কাজে আত্মনিয়োগ করো।

এ হলো উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনে যে মনোসংযোগ দরকার, নিজের ভেতরে তা সৃষ্টি করতে যত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক, তার সবই করা যাবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি পদ্ধতি-ই বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। একদিকে তিনি সারা বছরের খোরাকি একত্রিত করে দিয়ে দিয়েছেন, যাতে উম্মত বুঝতে পারে, এই পদ্ধতি জায়েয আছে এবং এতে কোনো সমস্যা নেই। আরেক দিকে দান-খয়রাত এত বেশি করেছেন যে, একসঙ্গে তিনটি মাসও অতিবাহিত হয়েছে, যখন নবীজির বাড়ির চুলায় আগুন জ্বলেনি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুনিয়াবিমুখতা

ফেরেশতা আসছে। এসে বলছে, আপনি যদি চান, তা হলে এই অহুদ পাহাড়কে সোনার পাহাড়ে পরিণত করে দেব। আপনি বললে পাহাড়ের সমস্ত মাটি সোনা হয়ে যাবে। আল্লাহপাক পাহাড়টিকে সোনা বানিয়ে দেবেন। উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন :

'না, আমার তো বরং এটি-ই পছন্দ যে, একদিন খাব আর একদিন উপোস কাটাব।'[১৯]

---

১৮. রাওজাতুল মুহাদ্দিসীন : ৮/৪১, হাদীস নং-৩৩১১৬; আল-জামিউস-সাগীর : ১/২১৬, হাদীস নং-`১৪৮।

১৯. সুনানে তি[illegible] যুহদ :হাদীস নং-২২৭।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এই নীতিটি অবলম্বন না করতেন, তা হলে এই গরিব ও ভুখা-নাঙ্গা মানুষগুলো কোথায় যেত? এই গরিব মানুষগুলোর জন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আমল করে পেটে পাথর বেঁধে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করে তাদের জন্য সান্ত্বনার উপকরণ তৈরি করে দিয়েছেন যে, ওহে আমার গরিব উম্মতেরা, তোমরা যে-অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছ, তাতে তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ,আমি মুহাম্মাদের উপর দিয়েও এমন পরিস্থিতি গড়িয়েছে। এমন অভাবের জীবন আমি নবীও যাপন করেছি। তোমরা যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এই পরিস্থিতির শিকার হয়ে থাক, তো আমি ইচ্ছাকৃতভাবে হলেও এমন কষ্টের জীবন যাপন করে তোমাদের জন্য সান্ত্বনার ব্যবস্থা করেছি।

মানবতা ও দয়ার নবী আমাদের মতো দুর্বল লোকগুলোর জন্য সান্ত্বনার ব্যবস্থা এভাবে করেছেন যে, তিনি সারা বছরের ভরণ-পোষণ একত্রে সঞ্চিত করে আদর্শ বাতিয়ে দিয়েছেন যে, এটিও আমার সুন্নাত। আবার অভাবী লোকদের জন্য আদর্শ এই দেখিয়ে দিয়েছেন যে, দেখো, আমার সুন্নাত হলো, লাগাতার তিন মাস যাবত আমার ঘরে চুলা জ্বলত না।

নিজেকে কুরবান করে দিতে হয় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক-একটি আদর্শের জন্য। উম্মতের কোনো একটি শ্রেণীকে তিনি তাঁর আদর্শ থেকে বঞ্চিত রাখেননি। একবার তিনি একটি জুব্বা পরিধান করেছিলেন, সে সময়কার বাজারদাম অনুযায়ী যার মূল্য ছিল দশ হাজার দেরহাম। এত মূল্যবান পোশাকও তিনি পরিধান করেছেন। আবার সাধারণ অবস্থায় তিনি তালি-দেওয়া-পোশাক পরিধান করতেন। নিজহাতে কাপড় পরিষ্কার করেছেন। কাপড়ে তালি লাগিয়েছেন। ছেঁড়া জুতা সেলাই করেছেন।

মোটকথা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের প্রতিটি শ্রেণীর জন্য আদর্শ রেখে গেছেন, যাতে কারুরই নির্দেশা নিতে কোনো সমস্যা না হয়।

সারকথা

এই হাদীসের সারকথা হলো, মনের অস্থিরতা দূর করার জন্য এবং মনে প্রশান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে যদি কেউ সম্পদ সঞ্চিত করে, তা হলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু নিয়ত এমন যেন না হয় যে, তাতে মানুষ আমাকে মালদার

মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং-২১১৬৬।

জীবন দিয়ে দেবেন যে, না ভাই, আরও কম নিন—আরও কম নিন। আপনি বিক্রেতার কোনো কথাই শুনবেন না – দাম কমানোর জন্য কেবল নিজের কথাই বলে যাবেন। এই রীতি মুমিনের রীতি নয়।

আপনি এতটুকু করতে পারেন যে, বিক্রেতাকে এক-দুবার বলতে পারেন, ভাই পারলে এই দামে দিয়ে দিন। বিক্রেতা যদি আপনার আব্দার মেনে নেয়, তবে তো ভালো; অন্যথায় এই সওদা বাদ দিন। বলবেন, ঠিক আছে ভাই, আপনার মালটা আমি নিতে পারলাম না। নাছোড়বান্দার মতো লেগে পড়া আপনার প্রস্তাবিত মূল্যে বিক্রি করতে বিক্রেতাকে বাধ্য করার চেষ্টা করা ঠিক নয়।

দোকানদার থেকে জোরপূর্বক কম মূল্যে কোনো পণ্য ক্রয় করা

আজকাল নিয়ম হয়ে গেছে, মানুষ জোরপূর্বক মূল্য কমিয়ে পণ্য ক্রয় করার চেষ্টা করে থাকে। পণ্যটি আমাকে এই দামে দিতেই হবে। এমনভাবে চাপ তৈরি করল যে, শেষ পর্যন্ত বিক্রেতা ভাবতে বাধ্য হলো, লোকসান করে দিয়ে হলেও এই আপদটাকে সরাতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে বিক্রেতা যদি পণ্য দিয়েও দেয়, তবু আমি মনে করি, এই জিনিসটি তার জন্য হালাল হয়নি। কারণ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

'খুশিমনে দেওয়া ছাড়া কোনো মুসলমানের সম্পদ অপরের জন্য হালাল নয়।'[২১]

আপনার এই সওদা হালাল হয়নি। কাজেই মূল্য কম দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করা, বেশি নেওয়ার জন্য জিদ ধরে বসে থাকা মুমিনের জন্য শোভনীয় নয়।

এটিও দ্বীনের মূল লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত

আপনি কোনো যানবাহনের ভাড়া দিচেছন। তা হলে অন্যরা যা দেয়, আপনি তার চেয়ে কিছু বেশি দিন। এতে লাভ এই হবে যে, চালক আপনাকে ভদ্র বলে মূল্যায়ন করবে এবং তার অন্তরে আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হবে। সে আপনাকে মর্যাদা দেবে। আলেমদের জন্য এই চরিত্র অবলম্বন করা খুবই জরুরি। কারণ, এটি দ্বীনের মূল লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত যে, সাধারণ মানুষ আলেমদের শ্রদ্ধা করবে। আপনি যদি অন্যদের চেয়ে কম দেন, তা হলে এর

---

২১. মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং–১৯৭৭৪

ফল দাঁড়াবে, মানুষ হুজুরদের চেহারা দেখলে পালাতে চাইবে যে, ঐ তো মৌলভী ছাহেব এসেছেন। এখন আমার উপর আপদ নেমে আসবে। ইনি আমাকে পয়সা পুরোপুরি দেবেন না। তার চেয়ে অন্যরা বেশি দেবে। তো এই কৌশল অবলম্বন করলে মানুষের অন্তরে আপনার মর্যাদা তৈরি হবে।

এগুলো সবই দ্বীনের কথা। এগুলো নবীচরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। তাই আমাদেরকে এসব চরিত্র অবলম্বন করতে হবে। আমাদের অন্তরে সব সময় এই ভাবনা রাখতে হবে যে, দৈনন্দিন কার্যক্রমে প্রতিটি আচরণ ও লেনদেনে মানুষের সঙ্গে কোমল আচরণের পরিচয় দেব। পকেটে অর্থ আছে; কিন্তু জিনিসটি আপনার একান্ত প্রয়োজনীয় নয়। তা হলে ক্রয় করা থেকে বিরত থাকুন। কিন্তু চাপাচাপি করা, নাছোড়বান্দার মতো লেগে পড়া মুমিনের চরিত্র নয়।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর বলেছেন :

وَإِذَا اقْتَضٰى

'যখন পাওনা উসুলের জন্য তাগাদা দেবে, তখনও কোমলতার পরিচয় দেবে।'

কারও কাছে আপনার পাওনা আছে। আপনি সেই পাওনা উসুলের জন্য তাগাদা দিচ্ছেন। দেনাদারের যদি কোনো ওজর থাকে, তা হলে আপনি বিষয়টি আমলে নিন। এর জন্য একটি চমৎকার রীতি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, যখনই কারও সঙ্গে লেনদেন করবে, তখন অপর পক্ষকে নিজের জায়গায় বসাও আর নিজেকে তোমার জায়গায় বসাও। তারপর ভাবো, তার জায়গায় যদি আমি হতাম, তা হলে আমি কোনটা পছন্দ করতাম। তারপর নিজের জন্য যে রীতিটি পছন্দনীয় বলে প্রতীয়মান হবে, তুমি তার সঙ্গে সেই অনুপাতে আচরণ করো। নবীজি বলেছেন :

أَحِبَّ لِأَخِيْكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ

'তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ করছ, তোমার ভাইয়েরও জন্য তা-ই পছন্দ করো।'[২২]

এমন যেন না হয় যে, পাল্লা দুটি ঠিক করে নিলে। একটি নিজের জন্য, আরেকটি অপরের জন্য। বরং একই পাল্লা দিয়ে নিজেকেও মাপো, আবার সেই পাল্লা দিয়েই অপরকেও মাপো।

---

২২. সহীহ বুখারী : কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-১২; সুনানে তিরমিযী : কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাতি..., হাদীস নং-২৪৩৯; সুনানে নাসায়ী : কিতাবুল ঈমান..., হাদীস নং-৪৯৩০; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং-১২৬৭১।

এটি এমন একটি সোনালি মূলনীতি যে, মুসলমান যদি এই নীতির অনুসরণ শুরু করে, তা হলে না-জানি কত ঝগড়া, কত বিবাদ, কত অনাচার সমাজ থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। তো এই ক্ষেত্রে আপনি পরিমাপ করে দেখুন, আপনি যদি তার জায়গায় হতেন আর পাওনা উসুলের জন্য আপনি যে পীড়াপীড়ি-চাপাচাপি করছেন, এমন আচরণ যদি সে আপনার সঙ্গে করত, তা হলে আপনার কাছে কেমন লাগত। তার সেই আচরণ আপনার কাছে ভালো লাগত কি-না। যদি হিসাবে প্রতীয়মান হয়, এই আচরণ আপনার কাছে ভালো লাগত না, তা হলে আপনিও এরূপ আচরণ থেকে বিরত থাকুন। আলোচ্য হাদীসেরও এ-ই মর্ম যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرٰى وَإِذَا اقْتَضٰى

'যেলোক ক্রয়, বিক্রয় ও তাগাদার সময় কোমলতার পরিচয় দেয়, আল্লাহপাক তাঁর উপর রহমত নাযিল করেন।'

মুমিনের ব্যবসা, কায়কারবার, লেনদেন অমুসলিমদের থেকে ভিন্ন হতে হবে, যাতে আপনার আচরণ দ্বারা-ই বোঝা যায়, আপনি একজন ঈমানদার। আপনার নীতি এমন হতে হবে যে, একজন মানুষ আপনার সঙ্গে লেনদেন করলে বুঝতে পারে, সে একজন মুমিনের সঙ্গে লেনদেন করছে। আবার আপনি যদি আলেম হন, তা হলে তো কোনো কথা-ই নেই। আপনার মর্যাদা সাধারণ মুমিনদের চেয়ে অনেক বেশি। কাজ-কারবার ও লেনদেনে আপনাকে আরও বেশি সতর্ক হতে হবে। সাধারণ মুসলমানদের তুলনায় আপনার লেনদেন অধিক পরিচ্ছন্ন হতে হবে।

ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে দুনিয়াতে ইসলাম প্রচার

পৃথিবীর বহু অঞ্চলে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। কারণ, ইতিহাস পড়লে আমরা জানতে পারি, পৃথিবীর যত জায়গায় মুসলমান আছে, তার সব অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য নিয়মতান্ত্রিক কোনো তাবলীগি জামাত গমন করেনি যে, তাদের দাওয়াতে মানুষ মুসলমান হয়েছে। তা হলে তারা ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হলো কী করে? ইসলামের সন্ধান তারা পেল কীভাবে? পেয়েছে ব্যবসায়ী মুসলমানদের মাধ্যমে। তারা ব্যবসা করতে গিয়েছিল। মানুষ তাদের ব্যবসায়িক লেনদেন দেখেছে, প্রত্যক্ষ করেছে, এরা কত নীতিবান মানুষ! তাদের মনে কৌতূহল জেগেছে। অতঃপর ব্যবসায়ী মুসলমানদের নীতি-নৈতিকতা ও আচার-আচরণে মুগ্ধ হয়ে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে।

কিন্তু আজকালকার পরিস্থিতি তার বিপরীত। মুসলমান কোথাও ব্যবসা করতে গেলে মানুষ তাদেরকে ভয় করে যে, এদের সঙ্গে লেনদেন করব কি-না।

এদের সঙ্গে লেনদেন করলে আবার এরা ধোঁকা দিয়ে বসে কি-না। প্রতারণা করে কি-না। মিথ্যা বলে কি-না ইত্যাদি মুসলমান ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে অমুসলিমরা নানা সংশয়ে নিপতিত হয়। যে চরিত্র আমাদের ছিল, সেসব নিয়ে গেছে অমুসলিমরা। আর যে আচরণ তারা করার কথা ছিল, তা করছি আমরা। আর সেজন্যই আল্লাহপাক দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে উন্নতি দান করেছেন। আমেরিকায় আজও এই চরিত্র বিদ্যমান আছে যে, আপনি একটি দোকানে সওদা ক্রয় করতে গেলেন। সেখান থেকে এক জোড়া পোশাক ক্রয় করলেন। তার এক সপ্তাহ বা দু সপ্তাহ পর পোশাকটি নিয়ে আপনি আবার সেই দোকানে গেলেন। বললেন, ভাই, এই যে সেটটি আমি আপনার থেকে ক্রয় করেছিলাম, এটি আমার স্ত্রীর পছন্দ হয়নি; এখন এটি ফেরত নিন। তা হলে কী হবে? যদি পণ্যটিকে কোনো স্পট না পড়ে থাকে বা কোনো সমস্যা না হয়ে থাকে, তা হলে দোকানদার সেটি আপনার থেকে ফেরত নিয়ে নেবে। এই চরিত্রটি আমাদের ছিল। ইসলাম আমাদেরকে এই শিক্ষা প্রদান করেছিল। হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ اَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ اَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে-লোক কোনো অনুতপ্ত ব্যক্তির ক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহপাক তার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো প্রত্যাহার করে নেবেন।'[২৩]

কিন্তু আমাদের কাছে যদি এরকম কোনো মাল ফেরত আসে, তা হলে রীতিমতো বিবাদ শুরু হয়ে যাবে।

এসব রীতি-নীতির অনুসরণ এখন অমুসলিম ব্যবসায়ীদের মাঝে আছে

আমেরিকা থেকে কেউ পাকিস্তান ফোন করল। এক-দেড় মিনিট কথা বলল। পরে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ফোন করে জানাল, আমি অমুক নম্বরে কথা বলতে চেয়েছিলাম; কিন্তু কলটা রং নম্বরে ঢুকে গেছে। যে নম্বরটি চাচ্ছিলাম, সেটি পাইনি। তা হলে উত্তরে আপনাকে জানানো হবে, ঠিক আছে; আপনার বিল থেকে আমরা এই কলটি কেটে দেব।

এবার আমাদের পাকিস্তানি ভাইয়েরা আমেরিকা গেল। একজন কোনো এক দোকান থেকে একটি টাইপরাইটার ক্রয় করল। মাসভর ব্যবহার করল এবং নিজের কাজ সারল। এক মাস পর গিয়ে বলল, ভাই, এই মালটি আমার পছন্দ

---

২৩. জামুউল জাওয়ামি' ৪১৫৪। ই'লাউস-সুনান : ১৪/২২০; সহীহ ইবনে হিব্বান ১১/৩৮১, হাদীস নং–৫০২৭।

হয়নি; কাজেই এটি ফেরত নিন। দোকানদার প্রথম-প্রথম নানাজনের কাছ থেকে ফেরত নিত। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছে, এটি একটি কারবারে পরিণত হয়ে গেছে। ফলে ফেরত নেওয়ার এই সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত একটি ঘটনা আছে। আমি লন্ডন থেকে করাচি ফিরছিলাম। লন্ডনের হিথ্রো এয়ারপোর্টে অনেক বড় একটি বাজার আছে। ওখানে নানা ধরনের পণ্যের বহুসংখক স্টল আছে। একটি স্টল ছিল বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'এনসাইক্লুপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা'র। আমি এই স্টলে ঢুকে বই দেখতে লাগলাম। এক পর্যায়ে এমন একটি বই দেখতে পেলাম, যেটি দীর্ঘদিন যাবত আমি খুঁজছিলাম। বইটির নাম 'গ্রেট বুক্‌স'। ইংরেজি ভাষায় লেখা এই বইটি ৬৫ খণ্ডে সমাপ্ত। বইটিতে আরাসতু (এরিস্টটল) থেকে নিয়ে সাম্প্রতিককালের দার্শনিক ব্রাটারেন্ডাসল পর্যন্ত সকল দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও বড়-বড় চিন্তাবিদগণের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং সবগুলো বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ তাতে বিদ্যমান আছে।

আমি স্টলে দাঁড়িয়ে এই বইটি দেখতে শুরু করলাম। দোকানী আমাকে বলল, আপনি কি এই বইটি নিতে চান? আপনার সংগ্রহে 'এনসাইক্লুপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা' আছে কি?

আমি বললাম, হ্যাঁ, এই বইটি আমি নিতে চাই। আর 'এনসাইক্লুপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা' আগে থেকেই আমার কাছে আছে।

দোকানী বলল, 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা' যদি আগে থেকেই আপনার কাছে মজুদ থাকে, তা হলে এটি আপনাকে আমরা ৫০% কমিশনে দেব। অর্থাৎ– আসল মূল্যের অর্ধেক দামে আপনি এই বইটি ক্রয় করতে পারবেন।

আমি বললাম, আমার কাছে আছে বটে; কিন্তু কোনো প্রমাণ তো নেই।

দোকানদার বলল, প্রমাণ বাদ দিন। আপনি মুখে বলেছেন; ব্যস আপনি ৫০% কমিশনের হকদার হয়ে গেছেন।

আমি হিসাব কষলাম, ৫০% কমিশন বাদ দিলে মূল্য কত দাঁড়ায়। দেখলাম, পাকিস্তানি রুপিতে প্রায় ৪০ হাজার হয়। বইটি আমার দারুল উলূমের জন্য ক্রয় করা দরকার ছিল। আর দারুল উলূমে 'ব্রিটানিকা' আগে থেকেই মজুদ আছে। আমি বললাম, আমি এখন তো চলে যাচ্ছি। এই বই আমার কাছে কীভাবে আসবে? দোকানদার বলল, আপনি ফরম পূরণ করে দিয়ে যান। আমরা বই বিমানযোগে আপনার কাছে পৌঁছিয়ে দেব।

আমি ফরম পূরণ করে দিলাম। এবার দোকানদার বলল, আপনার ক্রেডিট কার্ডের নম্বরটা দিয়ে স্বাক্ষর করে দিন।

আমি খানিক ভাবনায় পড়ে গেলাম যে, স্বাক্ষর করব কি-না। কারণ, স্বাক্ষর করার অর্থ হলো, মূল্য পরিশোধ হয়ে গেছে; ইচ্ছা করলে এখনই সে টাকা তুলে আনতে পারবে। কিন্তু আমার আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হলো যে, লোকটি আমাকে আমার কথায় বিশ্বাস করল; এখন আমিও তাকে বিশ্বাস করব। তাই আমি স্বাক্ষর করে দিলাম।

এবার আমার মনে একটি চিন্তা জাগল। আমি তাকে বললাম, এখানে আপনারা বইটি ৫০% কমিশনে দিচ্ছেন। কিন্তু অনেক সময় এমনও হয় এবং একাধিকবার হয়েছেও যে, এখান থেকে অনেক কমিশনে ক্রয় করে পাকিস্তান গিয়ে আরও সস্তায় পেয়েছি। জানি না, তারা কীভাবে দেয়? কাজেই এ ক্ষেত্রেও এমন হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হতে পারে, পাকিস্তান গিয়ে আমি আরও কম মূল্যে পেয়ে যাব।

দোকানদার বলল, ঠিক আছে; কোনো সমস্যা নেই। আপনি গিয়ে পাকিস্তানে জেনে নিন, এর চেয়েও কম দামে পাচ্ছেন কি-না। যদি পান, তা হলে আমাদের এই অর্ডার বাতিল করে দেবেন। আর না পেলে আমরা পাঠিয়ে দেব।

আমি বললাম, আমি আপনাদের কীভাবে জানাব?

দোকানদার বলল, খোঁজ নিতে আপনার কদিন সময় লাগবে? চার-পাঁচদিন – মানে বুধবার নাগাদ খবর নিতে পারবেন?

আমি বললাম, তা পারব ইনশাআল্লাহ।

দোকানদার বলল, বুধবার দিনের বারোটার সময় আপনাকে ফোন দিয়ে আমি জেনে নেব।

আমি বললাম, ঠিক আছে।

আমি ফরমে দস্তখত করে রওনা হয়ে এলাম। কিন্তু সারা পথে আমার মনে খুটখুট করতে থাকল যে, স্বাক্ষর তো করে এলাম। লোকটি চাইলে তো এখনই আমার একাউন্ট থেকে চল্লিশ হাজার টাকা তুলে নিতে পারে।

ফলে করাচি পৌঁছে আমি দ্রুত দুটি কাজ করলাম। একটি কাজ এই করলাম যে, ক্রেডিট কার্ডের কোম্পানি 'আমেরিকান এক্সপ্রেস'কে পত্র লিখলাম যে, আমি এভাবে স্বাক্ষর করে এসেছি। কিন্তু আমি পুনর্বার না বলা পর্যন্ত আপনারা পেমেন্ট দেবেন না।

আরেকটি কাজ করলাম, এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিলাম, তুমি বাজারে গিয়ে দেখে আসো, এই বইটি পাও কি-না। পেলে নিয়ে আসো। বইটি আমি আগেও খুঁজেছি; কিন্তু পাইনি।

কিন্তু ঘটনাক্রমে করাচি সদরের এক দোকানে বইটি পাওয়া গেল এবং সস্তায়ই পাওয়া গেল – মাত্র ত্রিশ হাজারে। ওখানে ৫০% কমিশনে চল্লিশ হাজার আর এখানে ত্রিশ হাজার।

এবার আমার পেরেশানি আরও বেড়ে গেল। কথা তো ছিল, সে বুধবার ফোন করবে। কিন্তু আল্লাহ জানেন, করে কি-না। ফলে সাবধানতার খাতিরে আমি সেদিনই চিঠি লিখে দিলাম যে, বইটি আমি এখানে পেয়ে গেছি। তারপর বুধবার ঠিক দুপুর বারোটার সময় ওখান থেকে ফোন এল।

দোকানদার জিজ্ঞেস করল, বলুন, আপনি বইটি পেয়েছেন কি-না।

আমি বললাম, হ্যাঁ, পেয়েছি এবং অনেক কমে পেয়েছি।

দোকানদার বলল, তা হলে কি আমি আপনার অর্ডার বাতিল করে দেব?

আমি বললাম, হ্যাঁ, বাতিল করে দিন।

দোকানদার বলল, ঠিক আছে, আমি বাতিল করে দিচ্ছি আর আপনি যে ফরমটি পূরণ করে দিয়ে গেছেন, সেটি ছিঁড়ে ফেলছি। ভালোই হলো যে, আপনি সস্তায় পেয়ে গেছেন। আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চার-পাঁচদিন পর তার পত্র এল। লিখেছে, আমরা এইজন্য আনন্দিত যে, আপনি বইটি আমাদের চেয়েও কম মূল্যে পেয়ে গেছেন। কিন্তু আক্ষেপ হলো, আমরা আপনার সেবা করার সুযোগ পেলাম না। কিন্তু আপনি বইটি পেয়ে গেছেন এটিই বড় কথা। আপনার প্রয়োজন মিটে গেছে। আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি, আগামীতেও আমরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সক্ষম হব।

লোকটি লন্ডন থেকে করাচি আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলল। তাতে তার একটি পয়সারও উপকার হয়নি। তারপর আবার পত্রও লিখল।

এরা তারা, আমরা যাদেরকে গালাগাল করি। কিন্তু এরা সেই ইসলামী চরিত্র প্রদর্শন করছে, যেগুলো আমরা ছেড়ে দিয়েছি।

যাহোক, কুফরের কারণে আমাদেরকে তাদের ঘৃণা করতে হবে। কিন্তু পাশাপাশি এই বাস্তবতাকেও স্বীকার করতে হবে যে, তারা এমন কিছু চরিত্র অবলম্বন করে নিয়েছে, যেগুলো মূলত আমাদের চরিত্র ছিল। আর সেই চরিত্র অবলম্বনের ফলেই আল্লাহপাক তাদেরকে উন্নতি দান করেছেন।

সত্যের মাঝে মাথা নোওয়ানোর এবং মিথ্যার মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর যোগ্যতা নেই

আমার আব্বাজি মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ. স্মরণ রাখার মতো একটি মূল্যবান কথা বলতেন। তি[illegible]তেন, মিথ্যার মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর

যোগ্যতা নেই। তাঁর এই মূল্যায়নের পক্ষে তিনি পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন :

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

'মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই বিষয়।'[২৪]

কিন্তু যদি কখনও দেখ, মিথ্যার পুজারিরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে, উন্নতি করছে, তখন বুঝতে হবে, সত্যের কোনো চরিত্র তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে আর সেই চরিত্রই তাদেরকে উন্নতির শিখরে তুলে দিয়েছে। কারণ, মিথ্যার মাঝে উন্নতি ও মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর কোনোই যোগ্যতা নেই। তাদের মাঝে সত্যের কোনো চরিত্র ঢুকে পড়েছে আর সেই চরিত্র তাদেরকে উন্নত করে দিয়েছে। আর সত্যের মাঝে মাথা নোওয়ানোর, অধঃপতনের যোগ্যতা নেই।

আল্লাহপাক বলছেন :

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ

'আর বলুন, সত্য এসে পড়েছে আর মিথ্যার পতন ঘটেছে।'[২৫]

আর সেজন্যই যখনই সত্য ও মিথ্যার মাঝে সংঘাত শুরু হয়, তখন সত্যই জয়যুক্ত হয়। আদতেই তার মাঝে অধঃপতনের যোগ্যতা নেই। কাজেই যদি কখনও দেখ, সত্যপন্থীরা নিচের দিকে যাচ্ছে, অধঃপতনে যাচ্ছে, তা হলে বুঝে নিতে হবে, মিথ্যার কোনো চরিত্র তার সঙ্গে মিশে গেছে আর সেই বিষয়টি-ই তাকে অধঃপাতে নিয়ে যাচ্ছে। এ বড় কাজের কথা!

বাস্তবতা হলো, আজকাল আমরা যে সত্যের অনুসারী হওয়ার দাবি করছি, তার সঙ্গে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটে গেছে। আমরা সত্যের সঙ্গে মিথ্যাপন্থীদের চরিত্র অবলম্বন করে নিয়েছি। আর বিজাতিরা আমাদের সত্যের কিছু চরিত্রকে বরণ করে নিয়েছে। আর তারই ফলে আল্লাহপাক অন্তত দুনিয়াতে তাদেরকে তার পুরস্কার দিয়ে দিয়েছেন। দুনিয়ার জীবনে তারা উন্নতি লাভ করছে। নিজেদেরকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু আখেরাতে বিচারের মাপকাঠি হবে ভিন্ন। ওখানে ওখানকার অনুপাতে বিচার হবে।

তো সারকথা হলো, কাফেররা আমাদের চরিত্র অবলম্বন করে উন্নত হয়েছে আর আমরা তাদেরটা গ্রহণ করে অধঃপাতে নেমেছি।

দুনিয়াকে আল্লাহপাক উপকরণের জগত বানিয়েছেন আর এই জগতে উন্নতি লাভের জন্য তিনি কিছু চরিত্র দান করেছেন। কাফেররা সেই চরিত্র

---

২৪. বানী ইসরাঈল : ৮১

২৫. বানী ইসরাঈল : ৮১

অবলম্বন করেছে বিধায় আল্লাহপাক তাদের বাণিজ্যকে উন্নতি দান করেছেন। শিল্পকে উন্নতি দান করেছেন। রাজনীতিকে উন্নতি দান করেছেন। আর আমরা আমাদের সেই চরিত্রগুলোকে, অর্থাৎ– মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশকে পরিত্যাগ করার ফলে আল্লাহপাকের যখন ইচ্ছে হচ্ছে, আমাদেরকে পিটুনি দিচ্ছেন এবং রোজ-রোজই পেটাচ্ছেন।

আমাদের চরিত্রটা দেখুন। ব্রিটেন সরকার জনগণকে বেকার ভাতা দিয়ে থাকে। অর্থাৎ– দেশের কোনো নাগরিক যদি বেকার হয়ে পড়ে আর সরকার বিষয়টি জানতে পারে, তা হলে তার জন্য একটি ভাতা চালু করে দেয়, যাতে কাজের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাকে অনাহারে মরতে না হয়। লোকটি যদি অক্ষম না হয়, তা হলে কাজের সন্ধান নিতে থাকে। যখন কাজ পেয়ে যায় আর নিজের ভার নিজের বহনের ক্ষমতা ফিরে পায়, তখন ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। আর যদি লোকটি অক্ষম হয়, তা হলে ভাতা অব্যাহত থাকে।

আমাদের বিপুলসংখ্যক মুসলমান ভাই ওই দেশে অবস্থান করে। তাদের কিছু লোক নিজেদেরকে বেকার দাবি করে ভাতা চালু করে নিয়েছে। তাদের অনেকেরই বুঝ হলো, ঘরে বসেই যখন ভাতা পাচ্ছি, তা হলে এমতাবস্থায় আর কাজের সন্ধান করে লাভ কী। কষ্ট করতে যাব কেন। আবার অনেকে আছে, তাদের উপার্জনের ব্যবস্থা হয়ে গেছে; কিন্তু সরকারকে তা অবহিত না করে বেকার ভাতাও গ্রহণ করে যাচ্ছে। নিজে রোজগারও করছে আবার সরকার থেকে বেকার ভাতাও গ্রহণ করছে। অথচ কথা ছিল, রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে গেলে সরকারকে অবহিত করে ভাতা বন্ধ করিয়ে নেবে। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হলো, এই কাজ মসজিদের ইমামরাও করছেন! তারা দলিল বানিয়ে নিয়েছেন, এরা তো কাফের। এদের থেকে অর্থ খসানো সাওয়াবের কাজ। কাজেই আমরা এই ভাতা গ্রহণ করছি। ইমামতের বেতনও পাচ্ছে আবার বেকার ভাতাও গ্রহণ করছে।

এমন চরিত্রহীনতা ও অনৈতিকতার মধ্যে আমরা ডুবে আছি। এমতাবস্থায় আমাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবে কীভাবে? এই যখন আমাদের অবস্থা, তখন কী করে আল্লাহর করুণা ও সাহায্য আমাদের সঙ্গী হবে?

সমাজের সংশোধন ব্যক্তি থেকে শুরু হয়

সমাজের সংশোধন ব্যক্তি থেকে শুরু হয়। সবাই যখন করছে, তখন আমি একা না করে লাভ কী হবে? এই চিন্তা শয়তানের ধোঁকা। অন্যরা যা-কিছুই করুক-না কেন, আমি সেটি-ই করব, যা আমার করার কথা। মানুষ কে কী করছে, আমি তা দেখব না। আমি দেখব, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাকে কী

করতে বলছেন। সমাজের সকল মানুষ একদিকে থাকুক, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে আছি। এ হতে হবে একজন মুসলমানের বুঝ। তবেই সমাজের সংশোধন হবে।

আপনি যদি হেদায়েতের উপর থাকেন, তা হলে পথভ্রষ্টরা আপনার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলছেন :

لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ

'তোমরা যদি হেদায়েতের পথে থাক, তা হলে যারা গোমরাহ হয়েছে, তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'[২৬]

কাজেই প্রত্যেকে নিজেকে সংশোধনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিন। দেখুন, আপনি সঠিক পথে আছেন কি-না। অন্যদের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা করতে বলেছেন, আপনি করুন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা করতে নিষেধ করেছেন, তার থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহপাকের রীতি হলো একটি বাতি জ্বললে তার থেকে আরেকটি বাতি জ্বলে। এভাবে একদিন সব বাতি-ই জ্বলে ওঠে।

বাতি থেকে বাতি জ্বলে। ব্যক্তি দ্বারা সমাজ গড়ে।

আল্লাহপাক আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং দ্বীনের উপর চলে নিজেকে সংশোধন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : ইন'আমুল বারী– খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১২৫-১৩১

---

২৬. মায়েদা : ১০৫

পাপের পরিণতি : জীবিকা থেকে বঞ্চনা

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

أَمَّا بَعْدُ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম বলেছেন :

اَلْمُسْتَغْفِرُ مِنَ الذَّنْبِ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ

যে লোক কোনো গুনাহ থেকে ক্ষমাও চাইতে থাকে আবার গুনাহটি করার ক্ষেত্রে হঠকারিতাও করে। অর্থাৎ– গুনাহটি ত্যাগ করে না; বারবার করতে থাকে, যেন এই লোক আল্লাহর নিদর্শনাবলির সঙ্গে ঠাট্টা করছে।'[২৭]

ক্ষমা প্রার্থনার পাশাপাশি গুনাহ করতে থাকা ক্ষতিকর

এটি খুবই খারাপ কথা যে, একজন মানুষ গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাও চাইতে থাকবে আবার গুনাহ করতেও থাকবে। সেজন্যই আমি আগে বারবার বলেছি, তাওবা শুদ্ধ হওয়ার জন্য এটা জরুরি যে, মানুষের মনে অনুশোচনা থাকবে এবং পাপকর্মটি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করবে আর ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নেবে, আমি আর এই কাজটি করব না। তখনই কেবল তাওবা পরিপূর্ণ হবে। কাজেই যে ব্যক্তি গুনাহ করে যাচ্ছে, তার মধ্যে অনুশোচনা নেই আর পাশাপাশি 'আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ' বলছে, এই ব্যক্তি যেন আল্লাহর সাথে মশকারা করছে। এ কথাটিকেই মোল্লা জামী এভাবে বলেছেন :

'হাতে তাসবীহ, মুখে তাওবার বুলি; কিন্তু অন্তরটা পাপের স্পৃহায় ভরা এমন তাওবা দেখে আমাদের গুনাহরাও হাসে যে, কেমন মানুষ এ, তাওবা করছে বটে; কিন্তু পাপ ছাড়ছে না – মনে করছে, আমি একজন তাওবাকারী।'

এই হাদীসটি সনদের দিক থেকে যদিও দুর্বল, কিন্তু মর্মগতভাবে সহীহ পর্যায়ভুক্ত।

---

২৭. শু'আবুল ঈমান ৫/৪৩৬, হাদীস নং–৭১৭৮; আয-যাওয়াজির 'আন ইক্‌তিরাফিল কাবায়ির ৩/৩৪৮; তাফসীরে হাক্কী ১/৭২; ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন ৫/৩৫৯

অর্থাৎ– মানুষ তাওবা করবে আবার গুনাহও চালিয়ে যাবে, এমন চরিত্র আল্লাহর সঙ্গে মশকারা-ই বটে।

এক হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ

'যে লোক ক্ষমা প্রার্থনা করল, সে গুনাহের উপর হঠকারী বলে বিবেচিত হবে না।'[২৮]

এই হাদীসটি সনদের দিক থেকে বেশি শক্তিশালী।

আল্লাহর নেক বান্দাদের একটি গুণ

এই দুটি হাদীসের সম্পর্ক মূলত পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের সঙ্গে। তাতে আল্লাহপাক বলেছেন :

وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

'এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে-বুঝে তার পুনরাবৃত্তি করে না।'[২৯]

আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় বান্দাদের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, এরা সেই লোক, যারা প্রথমে চেষ্টা করে, আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকব। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি কখনও তাদের দ্বারা কোনো গুনাহ হয়ে যায় কিংবা যদি নিজেদের উপর কোনো অবিচার করে ফেলে, তখন সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। অর্থাৎ– তারা জানে, আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ ক্ষমাকারী নেই। সেজন্য আল্লাহরই কাছে শরণাপন্ন হয় এবং হঠাৎ যে অন্যায়টি করে ফেলেছে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর জেনে-বুঝে কৃত গুনাহটি পুনরায় করে না।

এই আয়াতে বলা হয়েছে, যেহেতু আল্লাহপাক মানুষকে তৈরিই করেছেন এমন যে, তার মাঝে গুনাহ করার প্রবণতা বিদ্যমান; ফলে কোনো-না-কোনো গুনাহ, কোনো-না-কোনো ভুল তাদের দ্বারা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহর কিছু বান্দা এমনও আছেন, যখনই তাদের দ্বারা কোনো ভুল-অন্যায় হয়ে যায়, সঙ্গে-সঙ্গে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে তাওবা-ইস্‌তেগ্‌ফার করে আর কৃত পাপটি পরিত্যাগ করে।

এ হলো পবিত্র কুরআনের ভাষ্য। এখানে আল্লাহপাক যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন, সেটি হলো 'ইস্‌রার'। 'ইসরার অর্থ পুনরাবৃত্তি বা কোনো কাজ করার জন্য জিদ ধরা যে, আমি একাজটি করবই।

---

২৮. সুনানে তিরমিযী : হাদীস নং–৩৪৮২; সুনানে আবুদাউদ : হাদীস নং–১২৯৩
২৯. আলে ইমরান : ১৩৫

আর হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ

'যে ক্ষমা চাইল, সে গুনাহের ব্যাপারে হঠকারী বলে বিবেচিত হবে না।'[৩০]

তাওবার শর্তাবলি

গুনাহ করা আর গুনাহ হয়ে যাওয়া এক নয়। মানুষ গুনাহ করে পরিকল্পিত ও ইচ্ছাকৃতভাবে। আর গুনাহ হয়ে যায় ইচ্ছার বিপরীত হঠাৎ নিজের অজান্তে। তো কারও দ্বারা যদি একাধিকবারও গুনাহ হয়ে যায় আর সে তাওবা-ইস্‌তেগফার করে, তা হলে তাকে 'বারবার পাপকারীদের' মধ্যে গণ্য করা হবে না। এ হলো এক হাদীসের মর্ম। আলোচনার শুরুতে আমি যে হাদীসটি উল্লেখ করেছি, তার মর্ম হলো, কোনো ব্যক্তি যদি এমন হয় যে, সে গুনাহ পরিত্যাগ করেনি, বরং গুনাহ করেই যাচ্ছে আবার তাওবা-ইসতেগফারও করছে, এই লোক যেন আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে তামাশা করছে।

উভয় হাদীসের সম্মিলিত মর্ম নিম্নরূপ :

উভয় হাদীসের সারমর্ম হলো, প্রকৃত অর্থে তাওবা-ইস্‌তেগফারের জন্য তিনটি বিষয় আবশ্যক।

১. যে গুনাহটি আগে হয়ে গেছে, তার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে এবং অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা জাগ্রত হতে হবে, তার কুফল সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

২. তাৎক্ষণিকভাবে কাজটি পরিত্যাগ করতে হবে।

৩. ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় প্রত্যয় নিতে হবে যে, এই আমল জীবনে আর কোনো দিন আমি করব না।

যখন এই তিনটি বিষয় পাওয়া যাবে, তখন তাওবা-ইস্‌তেগ্‌ফার পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আর এমন তাওবার জন্যই আল্লাহপাকের ওয়াদা আছে যে, যেলোক তাওবা করবে, সে এমন হয়ে যাবে, যেন সে কোনো গুনাহ করেইনি।

এ হলো আল্লাহপাকের ওয়াদা।

আর হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

'গুনাহ থেকে তাওবাকারী এমন, যেন তার কোনো গুনাহই নেই।'[৩১]

---

৩০. সুনানে তিরমিযী : হাদীস নং–৩৪৮২; সুনানে আবুদাউদ : হাদীস নং–১২৯৩

৩১. সুনানে ইবনে মাজা : হাদীস নং–৪২৪০

তার গুনাহগুলো আমলনামা থেকে মুছে ফেলা হবে। আসল তাওবা হলো এটি।

তাওবার আরও একটি প্রকার আছে। আমাদের মতো দুর্বলদের জন্য আল্লাহপাক সামান্য সুযোগও রেখেছেন। যেমন– এক ব্যক্তি কোনো একটি গুনাহে লিপ্ত। তার জন্য সে অনুতপ্ত ও লজ্জিত। গুনাহটি সে পরিত্যাগও করতে চায়। কিন্তু বিশেষ কোনো কারণে, কোনো অপারগতাবশত ছাড়তে পারছে না। যেমন– এক ব্যক্তি কোনো একটি অবৈধ চাকুরিতে ঢুকে পড়েছে, যেটি শরীয়তে জায়েয নয়। এর জন্য লোকটি মনে-মনে অনুতপ্ত ও লজ্জিত। সেইসঙ্গে ছাড়ার চেষ্টাও করছে। তাকে ছেড়ে উপার্জনের জন্য কোনো একটি হালাল উপায় অবলম্বনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তার আর্থিক অবস্থা এমন যে, বিকল্প ব্যবস্থা না করে হঠাৎ ছাড়তেও পারছে না। সংসার আছে, স্ত্রী-সন্তান আছে। তাদের নিয়ে খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে। হঠাৎ ছেড়ে দিলে না খেয়ে থাকতে হবে। আবার বিকল্প হালাল ব্যবস্থাটি হচ্ছেও না।

এমন ব্যক্তির জন্য আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে :

مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ

'যেলোক ক্ষমা চাইল, সে গুনাহের উপর হঠকারী বলে বিবেচিত হবে না।'

ইস্‌তেগ্‌ফারকে প্রিয় বস্তু বানিয়ে নিন

তো এমন পরিস্থিতিতে যদি সে ইস্‌তেগ্‌ফার করতে থাকে, আল্লাহর সমীপে এই নিবেদন জানাতে থাকে যে, আমি যে-চাকুরিটি করছি, আমি জানি, এটি একটি অন্যায় কাজ; এর জন্য আমি অনুতপ্তও, তোমার কাছে লজ্জিতও। একে আমি পরিত্যাগও করতে চাচ্ছি। কিন্তু অপারগতার কারণে ছাড়তে পারছি না। কাজেই হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনি আমাকে এই অপরাধের জন্য ক্ষমা করে দিন আর এর পরিবর্তে হালাল উপার্জনের একটি বন্দোবস্ত করে দিন।

তো এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নৈরাশ্যের পরিবর্তে এই সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, যেলোক এ ধরনের পরিস্থিতিতে এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, তো যদিও সে এখনও অপরাধটি পরিত্যাগ করেনি, তবুও আল্লাহপাক তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

আর অপর হাদীসে যে বলা হয়েছে, একদিকে ক্ষমা প্রার্থনা করা আর অপরদিকে গুনাহ করতে থাকা মানে আল্লাহর সঙ্গে মশকারা করা, তাতে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যার অবস্থাটা এমন নয়। বরং তার কোনো অপারগতা নেই। অবস্থা এমন যে, যেকোনো সময় চাইলেই সে গুনাহটি ছেড়ে

দিতে পারে। তার অন্তরে কোনো অনুতাপ-অনুশোচনা নেই, লজ্জা নেই। আর পাশাপাশি সে মুখে বলছে, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, এই লোক তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার নামে আল্লাহর সঙ্গে মশকারা করছে।

এটা তাওবা নয় – তামাশা। এটা ইস্‌তেগ্‌ফার নয় – মশকারা।

আপনি এক ব্যক্তিকে ধরে তাকে মারতে শুরু করুন। ইচ্ছাকৃতভাবে কারও গালে কষে একটা চড় বসিয়ে দিন। তারপর বলুন, সরি, ভুল হয়ে গেছে ভাই, আমাকে মাফ করে দিন। বলুন, এটা মশকারা হবে না তো কী হবে? এই ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা ক্ষমা পাওয়া যাবে কি? বরং এই ক্ষমা প্রার্থনাকে অবমাননাকর আচরণ মনে করে লোকটি আপনার উপর আরও বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে।

তো একজন মানুষের বেলায় যদি ব্যাপার এই হয়, এমতাবস্থায় বান্দা যদি আল্লাহর সঙ্গে এমন আচরণ করে, আল্লাহ তাকে ছেড়ে দেবেন কেন? আপনি আল্লাহর অবাধ্যতা করতে থাকবেন আবার বলবেন, আমি তাওবা করছি, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি; কিন্তু গুনাহ পরিত্যাগ করবেন না, এ তো হতে পারে না। এমন আচরণ আল্লাহর সঙ্গে তামাশা বৈ নয়। আর আল্লাহর সঙ্গে তামাশা করা মস্ত অপরাধ। আল্লাহপাক আমাদেরকে এই অপরাধ থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

সারকথা হলো এই– এক হাদীসের মর্ম হলো, গুনাহের জন্য অনুতপ্ত না হয়ে, কোনো অপারগতা না থাকা সত্ত্বেও গুনাহ পরিত্যাগ করে তাওবা-ইস্‌তেগ্‌ফারের দাবি করা বাতুলতা এবং এই আচরণ আল্লাহর সঙ্গে তামাশা বলে পরিগণিত। অপর হাদীসের মর্ম হলো, কেউ যদি কোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় এবং এর জন্য সে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়, কিন্তু যৌক্তিক কোনো অপারগতার কারণে সেটি পরিত্যাগ করতে না পারে, তা হলে এই ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত মনে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আর গুনাহ থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে থাকে, তা হলে আল্লাহপাক এই ব্যক্তির পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং তাকে 'তাওবাকারী' বলে গণ্য করে নেবেন।

পাপের কুফল : জীবিকা থেকে বঞ্চনা

হযরত সাওবান (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

'অনেক সময় বান্দা পাপের কারণে জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে।'[৩২]

---

৩২. ইবনে মাজা : হাদীস নং ৮৭; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং-২১৩৭৯, ২১৪০২

গুনাহের ফলাফল অনেক সময় দুনিয়াতেও প্রকাশ পায়। আর তা এই হয় যে, গুনাহকারীকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়। তবে এটা জরুরি নয় যে, সব সময়ই এমন হবে। আল্লাহপাক মাঝে-মধ্যে পাপের ফলস্বরূপ বান্দাকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে দেন। তার মানে হলো, গুনাহের আসল যে শাস্তি আছে, তার প্রকাশ ঘটবে আখেরাতে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন :

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

'কখনও-কখনও আমি বড় শাস্তির আগে তাদেরকে ছোট শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাই, যাতে তারা ফিরে আসে।'[৩৩]

অর্থাৎ- মানুষ দুনিয়াতে আমার যে নাফরমানি করে, তার আসল শাস্তির জন্য আখেরাতের জীবনকে নির্ধারণ করে রেখেছি। পুরোপুরি হিসাবটা ওখানে হবে। কিন্তু মাঝে-মধ্যে বান্দাকে সতর্ক করার জন্য, পাপ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য এটুকু করি যে, পাপের কিছু শাস্তি দুনিয়াতেই আস্বাদন করাই। আল্লাহপাক চান যে, বান্দা আমার নাফরমানি করে আখেরাতের শাস্তির উপযুক্ত না হোক, বান্দা আখেরাতে মুক্তি পেয়ে যাক। কারণ, মানুষকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহর কোনো লাভ নেই। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও মমতাময়।

পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে আল্লাহপাক বলেন :

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۝

'তোমরা যদি শোকর কর আর ঈমান আনয়ন কর, তা হলে তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কী করবেন?'[৩৪]

মানুষকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহর কোনো লাভ নেই। আর সেজন্যই বান্দা যখন জাহান্নামের পথে চলতে শুরু করে, তখন আল্লাহপাক মাঝে-মাঝে কিছু শাস্তি দিয়ে সতর্ক করে দেন, তুমি কিন্তু ভুল পথে চলছ; এই পথ কিন্তু জান্নাতের পথ নয়। এটা জাহান্নামের পথ। আর আমি চাই, তুমি জান্নাতের উপযোগী হও। কাজেই তুমি পাপের পথ থেকে ফিরে নেকীর পথে চলে আসো।

তো সেই শাস্তির একটি ধরন হলো জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া।

মানুষ যখন অর্থসংকটে পড়ে, জীবনে অভাব-অনটন দেখা দেয়, আল্লাহর অলীগণের পরামর্শ হলো, এই অবস্থায় বেশি-বেশি ইস্তেগ্ফার করো, আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করো এবং বলো, হে আল্লাহ! আমি এই যে অনটনের শিকার

৩৩. সূরা আস-সাজ্দাহ : ২১
৩৪. নিসা : ১৪৭

হয়ে পড়েছি, এটি আমার কোনো-না-কোনো নাফরমানির কুফল। অতএব, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

কাজেই আমরা যখনই কোনো সমস্যা বা বিপদে নিপতিত হব, সঙ্গে-সঙ্গে তাওবা ও ইস্‌তেগ্‌ফার করব।

'রিয্‌ক'-এর ব্যাপক অর্থ

কিন্তু এখানে আমাদেরকে একটি কথা মনে রাখতে হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষকে কখনও-কখনও পাপের কারণে 'রিয্‌ক' থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়। এখানে 'রিয্‌ক' শব্দটির অর্থ কী? সাধারণত আমরা খাদ্যদ্রব্য ও টাকা-পয়সাকে রিয্‌ক বা জীবিকা মনে করে থাকি। সেই হিসেবে হাদীসের বাহ্যিক মর্ম দাঁড়ায়, গুনাহের ফলে মানুষের টাকা-পয়সার আমদানি কমে যায়, আয়-উপার্জন কমে যায়। কিন্তু আরবি ভাষায় 'রিয্‌ক' শব্দটি শুধু খাদ্যদ্রব্য ও অর্থ-কড়ির সঙ্গে বিশিষ্ট নয়।

আরবী ভাষায় 'রিয্‌ক' বলা হয় দানকে। কেউ কাউকে কিছু দান করল। ব্যস, এটাই রিয্‌ক। এই রিয্‌ক শব্দটি যখন আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তখন তাতে আল্লাহপাকের সমস্ত দান-অনুদান অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় – শুধু খাদ্যদ্রব্য ও টাকা-পয়সা-ই নয়। বরং কারও কাছে যদি ইল্‌ম থাকে, তা হলে এটিও রিয্‌ক। কারও কাছে কোনো কারিগরি বিদ্যা আছে; এটিও রিয্‌ক। কারও কাছে সুস্বাস্থ্য আছে; এটিও রিয্‌ক। কারও কাছে স্বচ্ছলতা আছে; এটিও রিয্‌ক।

সমস্ত মানবীয় গুণাবলি ও যোগ্যতা রিয্‌ক-এর অন্তর্ভুক্ত

রিয্‌ক শুধু পানাহারদ্রব্য ও অর্থ-কড়ির সঙ্গে বিশিষ্ট নয়। মানুষের মাঝে যত গুণ ও যোগ্যতা পাওয়া যায়, সবই আল্লাহপাকের দান, তাঁর রিয্‌ক। একজন মানুষ খুব মেধাবী। তো তার এই মেধাও তার কাছে আল্লাহপাকের দান। কাজেই এটি আল্লাহর দেওয়া রিয্‌ক। মানুষের মাঝে বিবেক আছে। এই বিবেকও আল্লাহর দান। তাই বিবেক আল্লাহর দেওয়া রিয্‌ক। কাজেই যখন বলা হলো, অনেক সময় গুনাহের কারণে মানুষকে রিয্‌ক থেকে বঞ্চিত করা হয়, তো এখানে শুধু টাকা-পয়সা, খাদ্যদ্রব্যের কথাই বলা হয়নি। বরং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে সব ধরনের রিয্‌ক-এর কথাই বলেছেন।

কখনও-কখনও আল্লাহপাক এমনটি করে থাকেন যে, গুনাহের কারণে খাদ্যদ্রব্যে ঘাটতি করেন না। পাপী বান্দা খুব মৌজ করে খায়, পান করে। উপার্জন আগের চেয়ে বেশি হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহপাক তার থেকে তাঁর অন্য

কোনো অনুদান, অন্য কোনো নেয়ামত ছিনিয়ে নেন। সুস্থ্যতা ছিনিয়ে নেন। ফলে সে রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সময়ের বরকত ছিনিয়ে নেন। ফলে তার জীবনে অবসর বলতে কিছু থাকে না। স্বস্তি ছিনিয়ে নেন। ফলে টেনশন-পেরেশানি তার সঙ্গে লেগেই থাকে। আল্লাহপাক তাকে বিদ্যা দান করেছিলেন। তা তার থেকে ছিনিয়ে নেন। কারিগরি কোনো বিদ্যা দান করেছিলেন। তা তার থেকে ছিনিয়ে নেন। বুঝ-বিবেক দান করেছিলেন। তা তার থেকে ছিনিয়ে নেন।

তো সারকথা হলো, দুনিয়াতে পাপের যে শাস্তি প্রদান করা হয়, তা নানাভাবে ও নানা আকারে প্রকাশ পেয়ে থাকে। কিন্তু গুনাহের যে শাস্তি আখেরাতে প্রকাশ পাবে, তা মানুষের জন্য বিরাট এক ক্ষতি। দুনিয়ার শাস্তি হয় খণ্ডিত যে, আল্লাহপাক তার থেকে কোনো-না-কোনো একটি দৌলত ছিনিয়ে নেন। সুস্থতা ছিনিয়ে নিলেন; কিন্তু অর্থ-কড়ির অভাব রইল না। বাড়ি-গাড়ি ঠিক থাকল। মিল-ফ্যাক্টরি টিকে রইল। ব্যাংক-ব্যলেন্স থাকল। সব কিছুই রইল; কিন্তু নাফরমানির শাস্তিস্বরূপ তার থেকে সুস্থতা নামক রিয্‌কটি ছিনিয়ে নিলেন। আর এই সুস্থতার অভাবে তার সব কিছুই বেকার হয়ে গেল। তার বরকত নষ্ট হয়ে গেল। এ হলো পাপের দুনিয়াবি শাস্তির ক্ষতি।

বিদ্যা-যোগ্যতাও রিয্‌ক

অনেক সময় এমন হয় যে, আল্লাহ একজন মানুষকে কিছু বিদ্যা ও যোগ্যতা দান করেছিলেন। কিন্তু তার পাপের ফলস্বরূপ সেই বিদ্যা-যোগ্যতা চলে গেল। আবার অনেক সময় এমনও হয় যে, আল্লাহপাক গুনাহের ফলস্বরূপ বুঝ-বুদ্ধি উল্টিয়ে দেন। মানুষের বুঝ উল্টে যায়। আল্লাহপাক তার থেকে বিবেক ছিনিয়ে নেন যে, আমি তোমাকে বিবেক এইজন্য দান করেছিলাম, যাতে তুমি ভালো-মন্দ চিনে ভালোকে গ্রহণ আর মন্দকে বর্জন কর। কিন্তু তুমি তোমার সেই বিবেককে সঠিক খাতে ব্যয় করনি। তাকে তুমি মন্দ কাজে ব্যয় করেছ। কাজেই এর শাস্তিস্বরূপ তোমার থেকে আমি ভালো-মন্দ পার্থক্য করার সেই যোগ্যতাটি ছিনিয়ে নিলাম। তার ফল এই দাঁড়ায় যে, তার কাছে ভালো কাজগুলো খারাপ আর খারাপ কাজগুলো ভালো লাগতে শুরু করে। তার ফলে মানুষ অবলীলায় পাপ করতে থাকে। এ কথাটিই কুরআনে আল্লাহ এভাবে বলেছেন :

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۝

'তাদের কর্মের ফলস্বরূপ আল্লাহ তাদের অন্তরে জং ধরিয়ে দেন।'[৩৫]

---

৩৫. সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন : ১৪

পাপের ফলস্বরূপ আল্লাহপাক মানুষের অন্তরে জং ধরিয়ে দেন। ফলে অন্তরে ভালো কাজ করার চিন্তা আসেই না। মন্দ বলতে কোনো কাজ আছে, এই চেতনা তার অন্তর থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। বুঝ-বুদ্ধি উল্টা হয়ে যায়। যত মন্দ কাজ আছে, সব তার জীবনের ব্রত হয়ে যায়। আর ভালো ও নেক কাজগুলো তার কাছে তিক্ত হয়ে যায়। ভালো কাজ করতে ভালো লাগে না আর মন্দ কাজ না করলে মনে শান্তি আসে না।

পাপের কারণে অন্তরে জং ধরে যায়

এই প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার পথও এটি যে, মানুষ গুনাহ থেকে তাওবা করবে, ইস্তেগ্‌ফার করবে। মানুষ যখন তাওবা-ইস্তেগ্‌ফার করবে, তখন আল্লাহপাক তার বুঝ-বুদ্ধি ফিরিয়ে দেবেন। এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

'মানুষ যখন ঈমান আনয়ন করে কিংবা একজন মুমিন যখন সাবালক হয়, তখন তার অন্তর আয়নার মতো স্বচ্ছ থাকে। তখন তার মাঝে কোনো অপবিত্রতা, কোনো ময়লা থাকে না, কোনো আবর্জনা থাকে না। কিন্তু প্রথমবারের মতো যখন সে গুনাহ করে, তখনই তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। যদি সে গুনাহ থেকে তাওবা-ইস্তেগ্‌ফার করে নেয়, অনুশোচনা প্রকাশ করে, তা হলে সেই দাগটি মুছে যায়। কিন্তু যদি গুনাহ করার পর তাওবা না করে এবং আরও একটি গুনাহ করে, তা হলে আরও একটি দাগ পড়ে। আবারও গুনাহ করলে আরও একটি দাগ পড়ে যায়। যদি সে এভাবে গুনাহ করতে থাকে, তা হলে এভাবেই দাগ পড়তে-পড়তে একসময় গুনাহের দাগ তার পুরো হৃদয়টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তারপর সেগুলো জং-এর রূপ ধারণ করে। তারপর সেই ব্যক্তির কাছে ন্যায়-অন্যায়ের অনুভূতি-ই দূর হয়ে যায়।'[৩৬]

আমি আপনাদের কী বলব? আজকাল আমাদের এই মুসলিম সমাজেও এমন বহু মানুষ আছে, বহু মুসলমান আছে, যারা পাপের জন্য গর্ব করে বেড়ায় যে, আমি এই পাপ কর্মটিতে অভ্যস্ত। তারা মানুষের সম্মুখে গৌরব করে থাকে, আমি এই পাপটি করেছি। পবিত্র কুরআনে যে আল্লাহপাক বলেছেন 'রানা' – তার অর্থ হলো, গুনাহ করতে-করতে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, তার হৃদয়টা একদম কালো হয়ে গেছে এবং সেই কালিমা জং-এর রূপ ধারণ করেছে।

---

৩৬. সহীহ মুসলিম : হাদীস নং–২০৭; সুনানে তিরমিযী : হাদীস নং–৩২৫৭; সুনানে ইবনে মাজা : হাদীস নং–৪২৩৪; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং–৭৬১১

আমি সব সময়ই বলে থাকি, গুনাহ্‌র কার দ্বারা না হয়। কম-বেশি গুনাহ সবার দ্বারা-ই সংঘটিত হয়ে যায়। কাজেই আপনার দ্বারা যদি কখনও কোনো গুনাহ হয়ে যায়, কোনো ভুল-অন্যায় করে ফেলেন, তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহর কাছে তাওবা-ইস্‌তেগ্‌ফার করে নিন, আল্লার প্রতি মনোনিবেশ করুন, আল্লাহর শরণাপন্ন হোন।

তো আমি বলছিলাম, দুনিয়াতেও আল্লাহপাক গুনাহের কারণে মানুষকে রিয্‌ক থেকে বঞ্চিত করে দেন। আর তা বাহ্যিকও হতে পারে, আবার অভ্যন্তরীণও হতে পারে। আর আমি এই যে বললাম, এটি হলো অভ্যন্তরীণ রিয্‌ক।

নেক আমলের আগ্রহও রিয্‌ক

সূফিয়ায়ে কিরাম এর একটি অর্থ এই করেছেন যে, কারও অন্তরে যদি নেক আমলের আগ্রহ তৈরি হয়, মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে, আমি নেক আমল করব, তো এটিও আল্লাহপাকের দেওয়া দান, এটিও আল্লাহপাকের রিয্‌ক। অনেক সময় গুনাহে কারণে এই দান ছিনিয়ে নেওয়া হয় – নেক আমল করার আগ্রহ অবশিষ্ট থাকে না। এর ফলে যে নেক আমল আগে করত, তার থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়। এটিও গুনাহের একটি কুফল।

সূফিয়া কিরামের দুটি হালত : 'বস্‌ত' ও 'কব্‌জ'

সূফিয়া কিরাম বলে থাকেন, মানুষের দুটি অবস্থা হয়ে থাকে। একটিকে 'বস্‌ত' আর অপরটিকে 'কব্‌জ' বলা হয়। 'বস্‌ত' অর্থ মনের আগ্রহ, উদ্দীপনা, উৎসাহ ইত্যাদি। আর 'কব্‌জ' অর্থ সংকোচন, যার কারণে নেক আমল করতে মন চায় না, ইচ্ছা হয় না।

এই অবস্থগুলোও আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

কাব্‌জের অবস্থাটা আসে গুনাহের কারণে। কাজেই যখনই নেক আমলে অলসতা, উদাসীনতা ও অনাগ্রহ দেখা দেবে, তখন প্রথমে ইস্‌তেগ্‌ফার করবে

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوْبُ إِلَيْهِ

'হে আল্লাহ! আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। এই যে আমার মধ্যে অলসতা দেখা দিয়েছে, এটি নিশ্চয় আমার গুনাহের কারণে হয়েছে। কাজেই হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও; আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তুমি আমার অলসতা দূর করে নেক আমলে আমাকে উৎসাহ দান করো।'

তা হলে ইনশাআল্লাহ কব্‌জ-এর অবস্থা বস্‌ত-এর অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তাওবা-ইস্‌তেগ্‌ফারের ফলে মানুষের মধ্যে নেক আমলের আগ্রহ তৈরি

হয়। এজন্যই সূফিয়া কিরাম বলে থাকেন, কব্‌জ-এর অবস্থায় বেশি-বেশি তাওবা-ইসতেগফার করো। আল্লাহর কাছে অধিক পরিমাণে প্রার্থনা করো।

ইস্‌তেগ্‌ফার জীবিকার দ্বার খুলে দেয়

আমি একটি কিতাবে দেখেছি, উলামা, মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহা কিরাম যখন জটিল কোনো মাসআলার মুখোমুখী হন এবং তার কোনো সমাধান খুঁজে না পান – মস্তিষ্কে এক ধরনের স্থবিরতা তৈরি হয়ে যায়, কিছুই বুঝে না আসে, তা হলে তার সমাধান কী?

এমন পরিস্থিতিতে বুযর্গানে দ্বীন বলেন, প্রথমে একটি কাজ করো। ইস্‌তেগ্‌ফার করো।

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

'আমি প্রতিটি গুনাহ থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তার কাছে তাওবা করছি।'

কেন? তার কারণ হলো, বিষয়টি বুঝে না আসার অর্থ হলো, আল্লাহ্‌পাক তোমাকে যে বুঝশক্তি দান করেছিলেন, কোনো গুনাহের কারণে, কোনো বদ-আমলের কারণে তিনি তা তোমার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। কাজেই তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তা হলে আল্লাহপাক তোমার এই স্থবিরতা দূর করে দেবেন। তোমার মস্তিষ্ক খুলে দেবেন।

এ বিষয়টি শুধু ইল্‌মে দ্বীনেরই জন্য বিশিষ্ট নয় – অন্যান্য বিদ্যার বেলায়ও এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই বাস্তবতা স্বীকৃত।

যেমন– একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। তিনি রোগী দেখার জন্য চেম্বারে বসা আছেন। একজন রোগী এল। কিন্তু তার বুঝে আসছে না, এই রোগীকে তিনি কী ব্যবস্থা দেবেন। তো এই পরিস্থিতিতেও তিনি ইস্‌তেগ্‌ফার করবেন :

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কারণ, এই যে আমার মাথাটা স্থবির হয়ে গেল, এটি আমারই পাপের ফল। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছে তাওবা করছি।'

তাতে আশা করা যায়, আল্লাহপাক আপনার এই স্থবিরতা দূর করে দেবেন, মস্তিষ্ক খুলে দেবেন।

এভাবে দুনিয়ার যে-কোনো কাজে-কারবারে – যেখানেই এ রকম প্রতিবন্ধকতা তৈরি হবে – সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ব্যর্থ হবেন, মনে দ্বিধা তৈরি হবে, তখনই আল্লাহপাকের দরবারে ইস্‌তেগ্‌ফার করবেন :

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

'হে আল্লাহ! এই যে আমি স্থবিরতার শিকার হয়েছি, এই যে আমি সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হচ্ছি, এটি আমারই পাপের পরিণাম। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি আপনার কাছে তাওবা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।'

তা হলে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহপাক আপনার এই স্থবিরতা দূর করে দেবেন।

কথাটি আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। বড়দের কাছ থেকেও শুনেছি। আবার নিজেও পরীক্ষা করে দেখেছি। আমি যখনই এই নিয়মের উপর আমল করেছি, সুফল পেয়েছি। আল্লাহপাক আমার স্থবিরতা দূর করে দিয়েছেন।

পাপ ও স্বচ্ছলতার সমাবেশ ভয়ংকর

তো গুনাহের একটি কুফল হলো মস্তিষ্কের স্থবিরতা। আর এর প্রতিকার হলো বেশি-বেশি ইস্‌তেগ্‌ফার করা ও তাওবা করা। তা হলে ইনশাআল্লাহ স্থবিরতা দূর হয়ে যাবে এবং মস্তিষ্ক খুলে যাবে। আল্লাহপাক আমাদের প্রত্যেককে তাওফীক দান করুন।

হযরত উক্‌বা ইবনে আমের (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يُعْطِيْهِ اللهُ مَا يُحِبُّ وَهُوَ مُقِيْمٌ عَلٰى مَعْصِيَتِهٖ فَاعْلَمُوْا اَنَّ ذَالِكَ اِسْتِدْرَاجٌ

'যখন তোমরা কাউকে দেখবে, আল্লাহপাক তার সঙ্গে এমন আচরণ করছেন যে, লোকটি যখন যা চাচ্ছে, যা কামনা করছে, সবই পেয়ে যাচ্ছে; কিন্তু তার জীবন পাপের মাঝে ডুবে আছে – সে অনবরত পাপ করছে। এর জন্য তার মাঝে কোনো অনুশোচনা নেই, আক্ষেপ নেই, এসতেগফার নেই, তাওবা নেই। এককথায় লোকটি পাপজগতের বাসিন্দা। আল্লাহর আনুগত্য-ইবাদত বলতে তার মাঝে কিছু নেই। কিন্তু আল্লাহপাক তার সব কামনা-বাসনা ও সকল চাহিদা পূরণ করে দিচ্ছেন। জীবন তার স্বাচ্ছন্দে পরিপূর্ণ। সম্মান চাইলে পেয়ে যায়। অর্থ চাইলে পেয়ে যায়। ক্ষমতা চাইলে পেয়ে যায়। যা চায়, তা-ই পায়। তো কারও অবস্থা যদি এমন হয়, তা হলে বুঝে নিতে হবে, আল্লাহ তাকে ঢিল দিচ্ছেন। এর নাম 'ইস্‌তিদ্‌রাজ' বা 'ঢিল দেওয়া'। -ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ১৯/৬

'ইস্‌তিদ্‌রাজ' পবিত্র কুরআনের পরিভাষা। আল্লাহপাক বলেছেন :

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۗ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ۝

'আমি তাদেরকে এমনভাবে ঢিল দেব যে, তারা টেরও পাবে না, আমি তাদের ঢিল দিচ্ছি। আর আমি তাদেরকে সুযোগ দেব, যাতে তারা অপরাধ

করতে থাকে। তারপর একদিন হঠাৎ ধরে ফেলব। আমার কৌশল খুবই শক্ত ও মজবুত।'[৩৭]

এরই নাম 'ইস্তিদ্রাজ'।

'ইস্তিদ্রাজ'-এর তাৎপর্য

'ইস্তিদ্রাজ'-এর অর্থ হলো, একলোক আল্লাহপাকের অবাধ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে বাহ্যিক নেয়ামতরাশি দ্বারা ধন্য করছেন। তার জীবনে অর্থের বারিধারা বর্ষিত হচ্ছে। যথেষ্ট নাম-যশ-খ্যাতি তার আছে। দুনিয়ার জীবনে দিন-দিন তার উন্নতি হচ্ছে।

তো আল্লাহপাক বলছেন, আমি যদি আমার এমন কোনো অবাধ্য মানুষের সঙ্গে এরূপ আচরণ করি, তা হলে তোমাদের বুঝে নিতে হবে, দুনিয়াবি জীবনে আমি তাকে সামান্য ঢিল ও সুযোগ দিয়ে রেখেছি। তার চোখদুটো যখ বন্ধ হবে এবং আমার কাছে এসে পড়বে, তখন বুঝবে মজা কেমন। তখন তার সমস্ত আরাম-আয়েশ আর ভোগ-বিলাস শেষ হয়ে যাবে আর আজীবনের জন্য আমার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে নিপতিত হবে।

এটি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ইস্তিদ্রাজ' বা ঢিল দেওয়া। নাফরমানির কারণে আল্লাহ যার উপর চরমভাবে অসন্তুষ্ট হন, তার সঙ্গেই তিনি এরূপ আচরণ করেন এবং পাপময় জীবনকে ষোলকলায় পূর্ণ করার সুযোগ দেন। এই ইস্তিদ্রাজ যেমন কাফেরদের বেলায় হতে পারে, তেমনি নাফরমান মুসলমানের বেলায়ও হতে পারে। কোনো মুসলমানের বেলায় যদি এমন ঘটনা ঘটতে দেখা যায়, তা হলে বুঝতে হবে, লোকটির কপাল পুড়েছে। আল্লাহপাক তার উপর চরমভাবে রুষ্ট হয়েছেন। আল্লাহপাক তাকে পুরোপুরি জাহান্নামী হওয়ার জন্য ঢিল দিয়েছেন যে, নে, যা পারিস করে নে। আমার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোর অপেক্ষা করছে। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে হেফাযত করুন।

কালের কষাঘাত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন

মুসলমান যদি আল্লাহর নাফরমানিতে উঠে-পড়ে লাগে, পাপের মাঝে হাবুডুবু খায়, সিনাজুরি করে; কিন্তু কোনো অনুতাপ-অনুশোচনা না থাকে, তা হলে এমন মুসলমানকেও অনেক সময় আল্লাহপাক ঢিল দিয়ে থাকেন, সুযোগ দিতে থাকেন। আমি একটু আগে আপনাদের সম্মুখে একটি হাদীস পাঠ করেছি। তাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

৩৭. সূরা আল-কালাম : ৪৪, ৪৫

আল্লাহপাক অনেক সময় গুনাহের কারণে বান্দাকে জীবিকা কমিয়ে দেন। দুনিয়াতেই আল্লাহপাক পাপের শাস্তির কিছু নমুনা দেখিয়ে দেন। কিন্তু সেই হাদীসের ব্যাখ্যায় আমি ওখানে বলেছি, এমনটি আল্লাহপাক সব সময় করেন না। মাঝে-মধ্যে করেন।

আবার অপরদিকে আল্লাহপাক যখন কাউকে তাঁর নেয়ামত দ্বারা ধন্য করতে ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়াতেই তাকে বিপদে আপতিত করেন, যাতে সে সতর্কতা অবলম্বন করে, সে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে, আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। তাতে যদি তার চৈতন্য ফিরে আসে, তা হলে আল্লাহপাক তাকে অফুরন্ত কল্যাণে ধন্য করেন। কিন্তু বারংবারের এই কষাঘাতের পরেও যদি একজন মানুষ পাপের নর্দমা থেকে উঠে না আসে, আল্লাহর নাফরমানি পরিত্যাগ না করে, কোনো মূল্যেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন না করে, অনুতপ্ত না হয়, তা হলে অনেক সময় পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়ে যায় যে, আল্লাহপাক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তুমি যা কিছু চাইছ সবই আমি তোমাকে দেব। এই জগতে সব কিছুই আমি তোমাকে দেব। দৌলতও দেব, সম্পদও দেব। খ্যাতিও দেব, সম্মানও দেব। সব কিছুই দেব। কিন্তু যখন আখেরাতে ধরব, তখন এমন ধরা ধরব যে, জীবনেও ভুলবে না।

যাহোক, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দিয়েছেন, যদি কাউকে দেখ যে, সে বিপদে নিপতিত হয়েছে আর সে আল্লাহর নাফরমানি করে যাচ্ছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আল্লাহর নেয়ামতরাজি লাভ করছে। অনেকের মনে ধারণা জন্ম নিচ্ছে, ভাই, আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি, একলোক আল্লাহর নাফরমানি করছে, জুলুম করছে, অন্যায়-অপরাধ করছে, কোমর বেঁধে আল্লার অবাধ্যতা করছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মজা উড়াচ্ছে, বিলাসিতায় ডুবে আছে, তাকে ঠেকানোর মতো কেউ নেই; এমতাবস্থায় মনে প্রশ্ন জাগে, এ কী বিস্ময়কর! কবি বলেন–

رحمتیں ہیں تیری اغیار کا شانوں پر
برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر

'অন্য জাতির প্রাসাদে রহমত বর্ষিত হচ্ছে আর বেচারা মুসলমানদের উপর পড়ছে বরফ!'

মুসলমানদের উপর বিপদ আসছে। আপদ নিপতিত হচ্ছে।

তো এই যে মনে প্রশ্ন জাগছে, আল্লাহর রাসূল তার উত্তর দিচ্ছেন–

'যদি দেখ, কোনো নাফরমানের উপর এসব আপতিত হচ্ছে, তাহলে এটা কোনো ঈর্ষণীয় অবস্থান নয় – এটা ভয় পাওয়ার মতো ব্যাপার যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ঢিল দেওয়া হচ্ছে।

বিপদাপদ পাপের প্রায়শ্চিত্তও হয়ে থাকে

আল্লাহপাক অনেক সময় তাঁর প্রিয় ও মুমিন বান্দাকে কিছু সংকট ও বিপদাপদ দিয়ে থাকেন। তখন আমরা কী বুঝব? তখন বুঝতে হবে, এই বিপদ আমাদের গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত। মুমিন বান্দা যেসব গুনাহ করে থাকে, আমরা যেসব পাপ করে থাকি, এগুলো আল্লাহপাক আমাদেরকে তার কাফফারা হিসেবে দিয়ে থাকেন, যাতে আমরা হিসাব পরিষ্কার করে তাঁর কাছে উপস্থিত হতে পারি, যাতে আমাদেরকে আল্লাহপাকের কোনো শাস্তি দিতে না হয়।

এই দুনিয়া হলো আল্লাহপাকের কারখানা। তিনি বলেন, অনেক সময় আমি আমার বন্ধুদেরকে মেরে ফেলি আর শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখি। তিনি সামেরি জাদুকরকে হযরত জিবরীল (আ.)-এর দ্বারা লালন-পালন করিয়েছেন, যে কিনা বড় হয়ে মূর্তিপুজার প্রবর্তক হওয়ার ছিল। আল্লাহ তো জানতেন, এই লোকটি বেঁচে থেকে ও বড় হয়ে কী হবে। কিন্তু তাকে তিনি হযরত জিবরীল (আ.)-এর মাধ্যমে পাহাড়ে খাদ্য পৌঁছিয়েছেন ও লালন-পালন করেছেন। অপরদিকে নবী হযরত যাকারিয়া (আ.)কে করাত দ্বারা চিড়িয়ে খণ্ডিত করেছেন।

তো দুনিয়ার জীবনে আল্লাহপাক এমনটি করে থাকেন। এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রতি পরীক্ষা। প্রিয়ভাজনরা বিপদাপদের শিকার হয়ে কষ্টের জীবন যাপন করছে আর বিরাগভাজনরা সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবন কাটাচ্ছে। দুনিয়ার জন্য এটি আল্লাহপাকের একটি রীতি।

এর রহস্য কী?

এর রহস্য হলো, আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য আখেরাতের অফুরন্ত সুখ বরাদ্দ রেখেছেন। সেখানে তাদেরকে তিনি অনন্ত ও অফুরন্ত সুখ দান করবেন। তাই এই জগতে তাদেরকে কিছু দুঃখ, কিছু অশান্তি দান করে থাকেন। আর কাফের-বেঈমানদের জন্য আখেরাতে কোনো অংশ নেই। কাজেই তাদেরক যা দেওয়ার দুনিয়াতেই দিয়ে দেন।

তো আমার ভাইয়েরা!

আল্লাহপাকের ইস্তিদ্রাজ তথা ঢিল দেওয়াকে ভয় করতে হবে। এটি আশঙ্কার বিষয়। আপনি যদি এমন হন যে, আল্লাহপাকের নাফরমানিতে লিপ্ত আছেন; কিন্তু আপনার জীবনে সুখের অভাব নেই। জীবনে আপনার কোনো বিপদাপদ নেই, তা হলে আপনাকে আশঙ্কা করতে হবে যে, আল্লাহ আমাকে ঢিল দিচ্ছেন না তো! আমি একেবারে শেষ হয়ে গেলাম না তো!

আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে নিরাপদ রাখুন।

মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর একটি ঘটনা

আমার আব্বাজি মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ. তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। জানি না, আল্লাহপাক তাঁর বুকের মাঝে মানুষকে দ্বীনের পথে ডাকার কী আগুন ভরে দিয়েছিলেন! সেই আগুনেরই ফল মাশাআল্লাহ বিশ্বময় ছড়িয়ে রয়েছে।

তিনি অসুস্থ হয়ে রোগশয্যায় শায়িত হলেন। আমার আব্বাজি তাঁকে দেখার জন্য দিল্লি গেলেন। কিন্তু ওখানে গিয়ে জানতে পারলেন, ডাক্তারগণ তাঁকে একদম নিরিবিলি থাকতে বলেছেন এবং কাউকে সাক্ষাত দিতে বারণ করেছেন। আব্বাজি বলেন, শুনে আমি বললাম, ঠিক আছে; হযরতের অবস্থা জানার দরকার ছিল; তা জানা হয়ে গেছে; কাজেই আমি ফিরে যাচ্ছি। আমি হযরতের সুস্থতার দু'আ করে ফিরে আসতে উদ্যত হলাম।

কিন্তু হযরত কী করে যেন জানতে পারলেন, আমি তাঁকে দেখতে এসেছি এবং ফিরে যাচ্ছি। ফলে তিনি সঙ্গে-সঙ্গে একজন লোক পাঠিয়ে দিলেন যে, যাও; গিয়ে মাওলানাকে ফিরিয়ে আনো।

আব্বাজি বলেন, লোকটি এসে আমাকে সংবাদ জানালে আমি বললাম, চিকিৎসকগণ যখন নিষেধ করেছেন, তখন তো দেখা করা ঠিক হবে না। কিন্তু লোকটি বলল, না, আপনাকে যেতেই হবে। হযরত খুব তাকিদ করে বলেছেন। ডাক্তারগণের নিষেধাজ্ঞা অমান্য হলেও তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। আব্বাজি বলেন, আমি গেলাম এবং হযরতের সামনে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, আমি আপনাকে এজন্য ফিরিয়ে এনেছি যে, কিছু মানুষের সাক্ষাতে মনে শান্তি পাওয়া যায়। তারপর আমার ডান হাতটা নিজের ডান হাতে টেনে নিয়ে অঝোরে কাঁদতে শুরু করলেন।

আব্বাজি মনে করলেন, হয়ত রোগের কষ্টে কাঁদছেন। আমার সঙ্গে একটুখানি কথা বলার ফলে তাঁর কষ্ট বেড়ে গেছে। কিন্তু তিনি পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে শুরু করলেন :

'আপনাকে ডেকে পাঠানোর কারণ হলো, আমার অন্তরে একটি অস্থিরতা আছে। আপনার মাধ্যমে আমি মনের সেই অস্তিরতাকে দূর করতে চাই। তা হলো, এই জামাতের কাজ মাশাআল্লাহ দিন-দিন বিস্তার লাভ করছে এবং প্রতি কদমে আলহামদুলিল্লাহ তাতে সফলতা আসছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নুসরত আসছে। কিন্তু মাঝে-মধ্যে আমার মনে আশঙ্কা জাগছে, এই যে তাবলীগ জামাতের কাজ এতটা বিস্তৃতি লাভ করছে এবং এত সাফল্য অর্জন করছে, পাছে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ইস্‌তিদ্‌রাজ' (ঢিল দেওয়া) নয় তো ? আল্লাহ আমাকে ঢিল দেননি না তো?'

আপনি অনুমান করুন, যে লোকটির জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দ্বীনের জন্য নিবেদিত, যাঁর প্রতিটি ক্ষণ অতিবাহিত হচ্ছে দ্বীনও উম্মতের ফিকিরে, তাঁর অন্তরে কিনা আশঙ্কা জাগ্রত হচ্ছে, এই সফলতা আবার ইস্তিদ্রাজ কিনা! আর সেজন্যই তিনি এমন অঝোরে কাঁদছেন।

আমার আব্বাজি বলেন, সে সময় আল্লাহপাক আমার অন্তরে একটি কথা ঢেলে দিলেন। আমি বললাম, হযরত! আমি আপনাকে পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলছি, এটি ইস্তিদ্রাজ নয়।

হযরত ইলিয়াস রহ. বললেন, 'আপনি কী করে বুঝলেন যে, এটি ইস্তিদ্রাজ নয়? আপনার দলীল কী?'

আব্বাজি বললেন, 'আমার দলিল হলো, আল্লাহ যখন বান্দার সঙ্গে ইস্তিদ্রাজ করেন, তখন বান্দার অন্তরে এই ভাবনার উদয় হয় না যে, এটি আমার সঙ্গে ইস্তিদ্রাজ হচ্ছে কি-না। তার অন্তরে কখনও এই আশঙ্কা জাগে না, আমাকে ঢিল দেওয়া হচ্ছে কি-না। কারও অন্তরে যদি এমন কোনো প্রশ্ন, এমন কোনো আশঙ্কা জাগ্রত হয়, তা হলে এটিই দলিল যে, এটি ইস্তিদ্রাজ নয় – বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে নুসরত। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য হচ্ছে।

আব্বাজি বলেন, আমার এই মন্তব্য ও যুক্তির পর হযরত আশ্বস্ত হলেন এবং তাঁর অন্তরে প্রশান্তি ফিরে এল। তিনি বললেন, আমার মস্তিষ্ক কখনও এদিকে যায়নি।

তো একথাটি সত্য ও সঠিক যে, বুযর্গগণ বলেছেন, যখন ইস্তিদ্রাজ হয় – আল্লাহর পক্ষ থেকে ঢিল দেওয়া হয়, তখন অন্তরে কোনো ভাবনা, কোনো আশঙ্কা জাগে না। কিন্তু যদি কখনও মনে এমন কোনো প্রশ্ন, এমন কোনো আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকবে, তাঁর শরণাপন্ন হবে। তা হলে ইনশাআল্লাহ ইস্তিদ্রাজের আপদ থেকে নিরাপদ থাকা যাবে।

আল্লাহপাক আমাদেরকে সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলন : মুহাম্মদ ওয়ায়েস সরওয়ার
সংকলনের তারিখ : ৩১ মার্চ ২০০৯ ঈসায়ী

এ যুগে মুসলিম ব্যবসায়ীদের কর্তব্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ
اَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ؕ

উপস্থিত সুধীমণ্ডলি!

এটি আমার জন্য আনন্দ ও গৌরবের বিষয় যে, আজ আমি আপনাদের সম্মুখে একটি দ্বীনি বিষয়ের উপর আলোচনা করার সুযোগ পাচ্ছি। আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানটি – যাকে 'শিল্প ও বণিক সমিতি' বলা হয় – এখানে সাধারণত যাদেরকে বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানায়, এখানে এসে তারা হয় ব্যবসার উপর আলোচনা করেন কিংবা রাজনীতি বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। কিন্তু আমার ব্যাপার হলো, আমার রাজনীতির সঙ্গেও সক্রিয় কোনো সম্পর্ক নেই, ব্যবসার সঙ্গেও কার্যকরভাবে কোনো সম্পর্ক নেই।

আমি দ্বীনের একজন ছাত্র। ফলে যেখানেই কথা বলার সুযোগ পাই, আমার আলোচ্যবিষয় দ্বীন সম্পর্কিতই হয়ে থাকে। কাজেই আজকের এই সভায় আমি এই বিষয়েরই উপর কিছু আলোচনা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে চাই। আর ইসলাম এমনই একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান যে, জীবনের কোনো একটি কোণ, কোনো একটি বিভাগ এমন নেই, যার ব্যাপারে তাতে কোনো বক্তব্য নেই।

আল্লাহপাক যে দ্বীন আমাদেরকে দান করেছেন, তার পরিধি শুধু মসজিদ আর উপাসনালয়গুলোর সীমানা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। বরং জীবনের প্রতিটি বিভাগ ও প্রতিটি অঞ্চল তার আওতাভুক্ত। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন জীবনবিধান। আজকের এই সভায় আলোচনার জন্য আমাকে ফরমায়েশ করা হয়েছে, যেন আমি এই সভায় 'বর্তমান যুগে মুসলমান ব্যবসায়ীর কর্তব্য' বিষয়ে

আলোচনা উপস্থাপন করি। কাজেই আমি এখন আপনাদের সম্মুখে এ বিষয়টির উপর আলোচনা পেশ করার আশা রাখি। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি, যেন তিনি আমাকে ইখলাসের সঙ্গে সঠিক পদ্ধতিতে ও সঠিক নিয়তে কথা বলার তাওফীক দান করেন। আমীন।

ইসলাম শুধু মসজিদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়

আসল কথা হলো, যখন থেকে আমাদের এই জাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন শুরু হলো, তখন থেকে এই বিস্ময়কর বিরল পরিবেশটি তৈরি হয়ে গেল যে, দ্বীনকে আমরা অন্যান্য ধর্মের মতো শুধু কয়েকটি ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছি। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে কিংবা ঘরে কোনো ইবাদতের কাজে ব্যাপৃত থাকি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে কথা মনে থাকে। কিন্তু যখনই বাস্তব জীবনের ডামাডোলে ঢুকে পড়ি, বাজারে যাই কিংবা রাজনীতির অফিসে বসি কিংবা অন্য কোনো ব্যস্ততায় প্রবেশ করি, তখন আর আমাদের ধর্মের কথা, আল্লাহর আইনের কথা, ইসলামী শিক্ষার কথা মনে থাকে না।

কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সভা আরম্ভ করা

আমাদের সমাজে বেশ চমৎকার একটি রীতি চালু আছে যে, আমরা মুসলমানরা কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে যেকোনো সভার সূচনা করে থাকি। চাই তা অ্যাসেম্বলির বৈঠক হোক, রাষ্ট্রীয় কোনো অনুষ্ঠান হোক, বণিক সমিতির কোনো সভা হোক বা সাধারণ কোনো মাহফিল হোক। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যেকোনো অনুষ্ঠানের শুরুতে আল্লাহপাকের কালাম পাঠ করা হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই কালামে পাক পাঠ করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মর্যাদার কথা আমাদের মাথায় থাকে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, যেইমাত্র পবিত্র কালামের তিলাওয়াত শেষ হয়ে যায় এবং আমাদের বাস্তবজীবনে প্রবেশ করি, তখন আর কুরআনের কথা মনে থাকে না।

পবিত্র কুরআন আমাদের কাছে ফরিয়াদ করছে!

আমাদের এই যুগে একজন কবি অতীত হয়েছেন মরহুম জনাব মাহের আল-কাদেরী। তিনি 'কুরআনুল কারীমের ফরিয়াদ' শিরোনামে একটি কবিতা রচনা করেছেন। সেখানে তিনি পবিত্র কুরআনকে একজন ফরিয়াদী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন যে, কুরআন এভাবে ফরিয়াদ করছে :

طاقوں میں سجایا جاتا ہو
خوشبو میں بسایا جاتا ہو
جب قول و قسم لینے کے لئے
تکرار کی نوبت آتی ہے
پھر میری ضرورت پڑتی ہے
ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں

অর্থাৎ– আমাকে সব সময় তাকে সাজিয়ে রাখা হয়। আমাকে সুগন্ধি মাখিয়ে রাখা হয়। প্রতিটি সভা-সম্মেলনের শুরুতে আমাকে পাঠ করা হয়। আমার দ্বারা বরকত হাসিল করা হয়। যখন মানুষে-মানুষে বিবাদ হয়, তখন আমাকে হাতে নিয়ে শপথ করা হয়। মুখের কথায় আমার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু মানুষ যে-আইনে চলছে, যে জীবনধারা মানুষ অবলম্বন করেছে, তা চিৎকার করে-করে বলছে, হে কুরআন! (আল্লাহপাক রক্ষা করুন) তোমার হেদায়েতের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।'

ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো

কারী ছাহেব একটু আগে যে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেছেন, সেগুলো আজকের এই সভার জন্য বেশ উপযুক্ত আয়াত। ক্ষেত্র অনুপাতে তিনি খুবই যুৎসই কটি আয়াত পাঠ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে একটি আয়াত হলো, আল্লাহপাক বলেছেন :

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো।'[৩৮]

এমন যেন না হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি মুসলমান আর যখন বাজারে থাকবে, তখন আর মুসলমান নও। ক্ষমতার মসনদে তুমি মুসলমান নও। বরং তোমাকে সবখানেই মুসলমান হতে হবে।

যাহোক, আজকের এই সভায় আমার জন্য আলোচ্যবিষয় নির্ধারণ করা হয়েছিল 'বর্তমান যুগে মুসলমান ব্যবসায়ীর দায়িত্ব ও কর্তব্য'। এ বিষয়টিকে সামনে রেখেই আমি আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। এখন আমি সেই আয়াতটির খানিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন

৩৮. বাকারা : ২০৮

করতে চাই। কিন্তু তার আগে আমি বর্তমান যুগের একটি পর্যালোচনামূলক ভূমিকা আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই। তা হলে আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যা বুঝতে আপনাদের সহজ হবে।

দুটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

আমরা বর্তমানে এমন একটি যুগে জীবন যাপন করছি, যে-যুগে বলা ও বোঝানো হচ্ছে যে, মানুষের জীবনের সব চেয়ে বুনিয়াদি সমস্যা হলো অর্থনৈতিক সমস্যা। আর তারই উপর ভিত্তি করে বর্তমান যুগে দুটি অর্থব্যবস্থার মাঝে প্রথমে চিন্তাগত ও পরে কর্মগত বিরোধ আত্মপ্রকাশ করেছে। একটি হলো পুঁজিবাদী অর্থনীতি আর অপরটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। এই দুটি অর্থনীতির মাঝে বিগত অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল যাবত প্রবল সংঘাত চলে আসছে এবং চিন্তা ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রে উভয় নীতি-ই সক্রিয় রয়েছে। উভয়েরই পেছনে একটি দর্শন ও একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। কিন্তু ৪৭ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা এই চর্মচোখে দেখলাম, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পরাজয় স্বীকার করে হাল ছেড়ে বসে পড়ল আর জগত তার প্রতারণামূলক দৃষ্টিভঙ্গির আসল চেহারাটিকে অভিজ্ঞতা দ্বারা বাস্তব জীবনে চাক্ষুষ চিনে ফেলল।

একটি বিপ্লবী জীবনব্যস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্র অকৃতকার্য হয়ে গেল।

সমাজতন্ত্র কেন অস্তিত্ব লাভ করেছিল?

কিন্তু ভাবনার বিষয় হলো, সমাজতন্ত্র কেন অস্তিত্ব লাভ করেছিল? তার পেছনে কী-কী কারণ ছিল এবং কোন-কোন বিষয় কার্যকর ছিল। যারা পৃথিবীর বিভিন্ন অর্থব্যবস্থা অধ্যয়ন করেছেন, তারা জানেন, সমাজতন্ত্র মূলত একটি পাল্টা ব্যবস্থা। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ধনী ও নির্ধনের মাঝে মস্ত যে-প্রাচীরগুলো প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করিয়ে রেখেছে এবং তার মাঝে অসম, অবিচার ও বৈষম্যমূলক যে আচরণ বিদ্যমান, তার জবাব ও বিকল্প হিসেবেই সমাজতন্ত্র অস্তিত্বে এসেছে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিকে এত পরিমাণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে যে, যে যেভাবে খুশি উপার্জন করতে পারে। তার উপর কোনো বিধিনিষেধ বা বাধ্যবাধকতা নেই। স্বাধীন জীবনযাপন ও স্বাধীন বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে তাকে পুরোপুরি ছুটি দেওয়া হয়েছে। এই ছুটির ফলস্বরূপ অর্থবণ্টন ব্যবস্থা অসম হয়ে গেছে, ধনী আর নির্ধনের মাঝে কতগুলো প্রাচীর দাঁড়িয়ে গেছে এবং গরিবের অধিকার ভূ-লুণ্ঠিত হয়েছে। আর তারই প্রতিকার হিসেবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অস্তিত্বে এসেছে। আর সে এই স্লোগান নিয়ে এসেছে যে, 'ব্যক্তির কোনো স্বাধীনতা থাকতে পারবে না এবং অর্থনীতিকে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অধীনে কাজ করতে হবে।'

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অনেকগুলো সমস্যা আছে

একথাটি সঠিক যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যে-ক্রটিগুলোর কারণে সমাজতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করেছিল, সেগুলো কি দূর হয়েছে? যে অবিচারগুলো পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় বিদ্যমান ছিল, সেগুলোর সন্তোষজনক কোনো সমাধান বেরিয়ে এসেছে কি? এই প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় যে ক্রটিগুলো ছিল, সেগুলো আজও আপন জায়গায় বহাল আছে।

সব চেয়ে বেশি উপার্জনকারী শ্রেণী

এখানে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হলো, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে খান-খান হওয়ার পর আমেরিকান ম্যাগাজিন 'টাইম্‌স'-এর যে সংখ্যাটিতে এই সংবাদ ও তার উপর বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছিল, ঠিক সেই সংখ্যাটিতেই আমেরিকান জীবনব্যবস্থা সম্পর্কেও একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল। তাতে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, বর্তমানে আমেরিকান জীবনব্যবস্থায় সেবার বিনিময়ে সব চেয়ে বেশি উপার্জনকারী শ্রেণী কোনটি।

উক্ত নিবন্ধে বলা হয়েছিল, আমাদের সমাজে সব চেয়ে বেশি উপার্জনকারী শ্রেণী হলো মডেল গার্লস, যেসব নারী মডেলিং করে অর্থ উপার্জন করে। নিবন্ধে বলা হয়েছে, কোনো-কোনো মডেল এমনও আছে, তারা এক দিনের সেবার বিনিময়ে ২৫ মিলিয়ন ডলার আয় করে থাকে। কাজেই এই শ্রেণীর চেয়ে বেশি উপার্জনকারী শ্রেণী দ্বিতীয়টি নেই।

এখন প্রশ্ন হলো, এই ২৫ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করে কে? কার পকেট থেকে এই অর্থ মডেলদের পকেটে যাচ্ছে? বলা বাহুল্য যে, এই অর্থগুলো সাধারণ জনগণই পরিশোধ করে থাকে। আমরা ভোক্তারা-ই এই অর্থ পরিশোধ করি।

টাইম্‌স-এর একই সংখ্যায় এই দুটি তথ্য পড়ে আমি শিক্ষা গ্রহণ করছিলাম যে, একদিকে তো এই জোরালো দাবির মাধ্যমে বগল বাজানো হচ্ছে, আমরা সমাজতন্ত্রের মূর্তিটিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছি; কিন্তু যে জিনিসটি সমাজতন্ত্রকে জন্ম দিয়েছিল, তার প্রতি কারও দৃষ্টি বা সেটা দূর করার কোনো চিন্তা নেই। আজ আপনি সমাজতন্ত্রের একটি মূর্তিকে গুড়িয়ে দিলেন বটে; কিন্তু তার আসল কারণ ও উস্কানিদাতাকে যদি নির্মূল না করেন, তা হলে কাল আরেক সমাজতন্ত্র সামনে এসে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর প্রথম সমাজতন্ত্র বিশ্বমানবতাকে যতটুকু কষ্ট দিয়েছিল, এই সমাজতন্ত্র আরও বেশি যন্ত্রণার কারণ হবে।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার আসল দোষ

সঠিক বিষয়টি হলো, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার আসল সমস্যা এটা ছিল না যে, তাতে ব্যক্তিকে মুনাফা উপার্জনের পুরোপুরি স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। এও নয় যে, তাতে ব্যক্তিমালিকানাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বরং এই অর্থব্যবস্থার আসল দোষ হলো, তাতে হারাম-হালাল ও জায়েয-না-জায়েযের কোনো ভেদাভেদ রাখা হয়নি। অথচ আল্লাহপাক তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে যে জীবনবিধান ও অর্থব্যবস্থা আমাদেরকে দান করেছেন, তার ভিত্তি রাখা হয়েছে এ বিষয়টির উপর যে, মানুষ যদিও আপন-আপন জীবিকা ও উপার্জনে স্বাধীন; কিন্তু তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের জারিকৃত আইনের কাছেও দায়বদ্ধ। এখানে তারা স্বাধীন নয়। তারা তাদের ব্যবসা, শিল্প ও জীবনযাত্রায় হালাল-হারামের নিগড়ে আবদ্ধ। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ হালাল-হারামের এই মূলনীতিগুলোকে সামনে রেখে ব্যবসা ও শিল্পের রাজপথে পরিচালিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ জাতীয় ভারসাম্যহীনতা ও ব্যর্থতার পথ উন্মুক্তই থাকবে।

এক আমেরিকান অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ

পাকিস্তানে যখন সুদ বিষয়ে 'ফেডারেল শরীয়ত কোর্ট'-এর সিদ্ধান্ত জনসম্মুখে আত্মপ্রকাশ করল, তখন পাকিস্তানে মার্কিন দূতাবাসের অর্থনীতি বিষয়ক ইনচার্জ আমার কাছে এল এবং এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমার ব্যাখ্যা জানতে চাইল। তখন সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার কাহিনী একদম তরতাজা।

আলোচনার শেষে তাকে বললাম, আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। তা হলো, বর্তমানে বিশ্বময় আমেরিকার ডংকা বাজছে। আর নিঃসন্দেহে আপনারা সমগ্র বিশ্বের উপর এত বিশাল সাফল্য অর্জন করেছেন যে, আজ বলা হচ্ছে, আপনারাই পৃথিবীতে একমাত্র পরাশক্তি। আপনারা ব্যতীত আর কোনো শক্তি বর্তমানে পৃথিবীতে নেই।

কিন্তু আমি আপনার কাছে জানতে চাই, সমাজতন্ত্রের এই ব্যার্থতার পর আপনি কি কখনও চিন্তা করেছেন, যে কারণগুলোর অনিবার্য ফলস্বরূপ সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল, সেগুলো কি নির্মূল হয়েছে? সেই কারণগুলো নিয়ে পুনর্বার বিবেচনা করার আবশ্যকতা ফুরিয়ে গেছে কি? আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, কেউ যদি আপন জায়গায় দাঁড়িয়ে বলে, সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা ও পতন আপন জায়গায় যথার্থ বটে; কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ত্রুটিগুলোর একটি সমাধান আমাদের কাছে আছে। আর সেটি হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনীত হালাল-হারামের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সুষম অর্থব্যবস্থা, তখন

আপনাদের পক্ষ থেকে তাকে 'মৌলবাদে'র তীর নিক্ষেপ করা হয়। তাকে 'মৌলবাদী' আখ্যায়িত করা হয়। তার বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা চালানো হয় আর বলা হয়, এরা সময়ের দাবি বোঝে না। বলুন, আপনার দৃষ্টিতে তৃতীয় কোনো ফর্মুলা নিয়ে চিন্তা করা কি অন্যায়? তৃতীয় একটি ফর্মুলা কি জনসম্মুখে আসতে পারে না? আপনারা চিন্তা করতে প্রস্তুত নন কেন?

আমি তার সামনে এই প্রশ্নটি উপস্থাপন করলাম। তিনি বেশ মনোযোগ সহকারে আমার কথাগুলো শুনলেন। পরে বললেন, আসলে ব্যাপার হলো, আমাদের প্রচারমাধ্যমগুলো ইসলামী আইন ও ইসলামী শিক্ষাকে খুব বেশি বিকৃতরূপে উপস্থাপন করতে শুরু করেছে। এ বিষয়টি আমি স্বীকার করছি। আর সুদ সম্পর্কে আপনি আজ যেরূপ বিশ্লেষণের সঙ্গে আলোচনা করলেন, এমন আলোচনা আমি এই আজই প্রথম শুনলাম। এখন আমি বুঝতে পারছি, এ বিষয়টিতে আরও ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, আমাদের প্রচারমাধ্যমগুলো অপপ্রচারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সেজন্য যখনই এ জাতীয় কোনো আলোচনা সামনে আসে, তারা তার বিরুদ্ধে প্রচারণায় মেতে ওঠে। তাদের এই কর্মনীতি ভালো নয়।

একমাত্র ইসলামের অর্থব্যবস্থা-ই ভারসাম্যপূর্ণ

আমি বলছিলাম, অন্যরা যদি ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী আইনের ব্যাপারে এসব কথা বলে, তা হলে তাকে অপারগ মনে করা যায়। কারণ, তারা ইসলাম বোঝেইনি। তারা ইসলাম পড়েইনি। ইসলামে তাদের বিশ্বাসই নেই। ইসলাম তাদের কী শিক্ষা দেয়, সে ব্যাপারে তাদের কোনোই ধারণা নেই। কিন্তু আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করছি, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলল্লাহ'র উপর ঈমান রাখি এবং যেকোনো সভা-সমাবেশের শুরুতে পবিত্র কুরআন পাঠ করি ও শুনি, আমাদের জন্য এটা বৈধ নয় যে, আমরা ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি সম্পর্কে নিজেদেরকে উদাসীন ও অজ্ঞ রাখব। এমনটি মেনে নেওয়া যায় না যে, আমাদের ধর্ম ইসলাম অর্থনীতির অঙ্গনে আমাদেরকে কী শিক্ষা প্রদান করেছে, আমরা তা জানবার চেষ্টা করব না। সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। পুঁজিবাদের দোষক্রটিগুলো যেমন ছিল, তেমনই আছে। এমন একটি সমাজে কোনো ব্যবস্থা যদি মানবতাকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সুষম পথ দেখাবার যোগ্যতা রাখে, সে হলো একমাত্র এবং একমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনীত জীবনবিধান ইসলাম। এই বোধ ও বিশ্বাসকে সামনে রেখে যদি আলোচ্য আয়াতটির উপর গবেষণা করা হয়, তা হলে দেখতে পাবেন, তাতে আমাদের জন্য পথনির্দেশনার অনেক বড় উপাদান রয়েছে।

কারূন ও তার বিত্ত-বৈভব

এটি সূরা কাসাস-এর একটি আয়াত। এই আয়াতে কারূনকে উদ্দেশ করা হয়েছে। এই কারূন লোকটি হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে বিপুল সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি ছিল। তার ধনভাণ্ডারের অনেক খ্যাতি আছে। সম্পদ তার এত বিপুল ছিল যে, পবিত্র কুরআন তার পরিমাণ বোঝাতে গিয়ে বলেছে :

اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ

'তার ধনভাণ্ডারের চাবিই এত পরিমাণ ছিল যে, সেগুলোকে বহন করতে একদল শক্তিশালী মানুষের প্রয়োজন হতো।'[৩৯]

সে যুগের চাবিও খুব ভারী হতো। তদুপরি কারূনের সম্পদও ছিল প্রচুর। হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহপাক তাকে যেকটি নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলো আল্লাহপাক এই আয়াতটিতে ব্যক্ত করেছেন, যেটি এইমাত্র আমি আপনাদের সম্মুখে তিলাওয়াত করেছি। এ আয়াতে উদ্দেশ যদিও কারূনকে করা হয়েছে, কিন্তু মূলত এসব নির্দেশনা সেই সকল লোকদের জন্য প্রযোজ্য, আল্লাহপাক যাদেরকে সম্পদ দান করেছেন।

কারূনকে আল্লাহপাকের চারটি নির্দেশনা

আল্লাহপাক বলেছেন :

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ

'আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তার মাঝে তুমি আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান করো। তবে তোমার দুনিয়ার অংশের কথা ভুলো না। আর তুমি মানুষের উপকার করো, যেমন আল্লাহ তোমাকে অনুগ্রহ করেছেন। আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না।'[৪০]

এই আয়াতে মোট চারটি বাক্য আছে। প্রথম বাক্যে বলেছেন, আল্লাহ তোমাকে যে-সম্পদ দান করেছেন, তার মাঝে তুমি আখেরাতের কল্যাণ ও সাফল্য অনুসন্ধান করো। দ্বিতীয় বাক্যে বলেছেন, আবার এমন যেন না হয় যে, আখেরাত তালাশ করতে গিয়ে, সম্পদ দ্বারা পরকাল ক্রয় করতে গিয়ে সমস্ত সম্পদ এই খাতেই ব্যয় করে ফেলবে আর দুনিয়ার জন্য কিছুই রাখবে না। না, তা করো না। বরং দুনিয়ার প্রয়োজন অনুপাতে কিছু সম্পদ এখানকার জন্যও ব্যয় করো এবং নিজের হক আদায় করো।

---

৩৯. কাসাস : ৭৬

৪০. কাসাস : ৭৭

তৃতীয় বাক্যে বলেছেন, আল্লাহ যেমন তোমার উপর অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তুমিও মানুষের সঙ্গে অনুগ্রহসুলভ আচরণ করো। আল্লাহ যেমন সম্পদ দান করে তোমার উপকার করেছেন, তেমনি এই সম্পদ দ্বারা তুমিও মানুষের উপকার করো।

চতুর্থ বাক্যে বলেছেন, এই সম্পদের কারণে দিশা হারিয়ে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না। সম্পদের অহমিকায় বুঁদ হয়ে যেয়ো না। ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করো না।

এই চারটি নির্দেশনা আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক কারূনকে প্রদান করেছেন। কিন্তু আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি, তা হলে বুঝতে পারব, এই নির্দেশনাগুলো মূলত একজন ব্যবসায়ীর জন্য, একজন শিল্পপতির জন্য এবং এমন একজন মুসলমানের জন্য, আল্লাহপাক যাকে এই দুনিয়াতে কিছু হলেও সম্পদ দান করেছেন।

এখানে আল্লাহপাক একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মনীতি উপস্থাপন করেছেন।

প্রথম নির্দেশনা : পরকালীন কল্যাণের চিন্তা

সর্বপ্রথম নির্দেশনা এই প্রদান করা হয়েছে যে, তোমাদের ও অমুসলিমদের মাঝে পার্থক্য আছে। মুসলমান ও অমুসলিমের জীবনধারা এক হতে পারে না। তা হলো, একজন অমুসলিম, তথা যে আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে না, তার দৃষ্টিভঙ্গি হলো, আমার যা-কিছু অর্জিত হয়েছে, এর সবই আমি আমার বাহুর বলে অর্জন করেছি। এটি একান্তই আমার আপন শক্তির ক্যারিশমা। আমি আমার প্রচেষ্টায়, আমার শ্রমে, আমার যোগ্যতায় এগুলো অর্জন করেছি। কাজেই এই সম্পদের আমি একচ্ছত্র মালিক। এখানে আর কারও মালিকানা বা হস্তক্ষেপের কোনোই অধিকার নেই। এই সম্পদ আমার। আমি আমার বাহুবলে এগুলো অর্জন করেছি। আর সেজন্য উপার্জনের পদ্ধতিতেও আমি স্বাধীন, ব্যয় করার বেলায়ও আমি স্বাধীন। এখানেও আমার উপর কারও হাত দেওয়ার সুযোগ নেই।

শু'আইব (আ.)-এর জাতি ও পুঁজিবাদী চিন্তাধারা

হযরত শু'আইব (আ.)-এর সম্প্রদায় তাঁকে বলেছিল :

أَصَلٰوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ أَوْ أَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ أَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا

'হে শু'আইব! তোমার নামায কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা যার উপাসনা করত, আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে এবং ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি, তাও করতে পারব না।'[৪১]

---

৪১. হূদ : ৮৭

অর্থাৎ– আপনি এই যে আমাদেরকে বারণ করছেন, তোমরা মাপে কম দিয়ো না, কাজে-কর্মে সুবিচার বজায় রাখো, হালাল-হারামের চিন্তা করে চলো, তো আপনি আমাদের এসব সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াষয়ে কী কারণে হস্তক্ষেপ শুরু করেছেন? এগুলো করতে ও বলতে কে আদেশ করছে? আপনার যদি নামায পড়তে হয়, তা হলে ঘরে গিয়ে নামায পড়ুন। নাকি আপনার নামাযই আপনাকে এসব করতে আদেশ করছে যে, আমরা আমাদের উপাস্যগুলোকে পরিত্যাগ করব, আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের উপাসনা করতেন। কিংবা আমাদের যে সম্পদ আছে, সেগুলোকে আমরা আমাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করব? এসব ক্ষেত্রে আপনি আমাদের বারণ করতে আপনাকে কে বলে?

এটিই মূলত পুঁজিবাদী চিন্তাধারা যে, এই সম্পদ আমার। এই বিত্ত আমার। কাজেই কর্তৃত্বও একমাত্র আমারই চলবে। আমি যেভাবে খুশি উপার্জন করব। যেভাবে মন চায় ব্যয় করব। হযরত শু'আইব (আ.)-এর সম্প্রদায়ও এই একই মানসিকতা লালন করত। তার জবাবে বলা হয়েছে, তোমাদের কাছে যে সম্পদ আছে, তাতে তোমার মালিকানা একচ্ছত্র নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলছেন :

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

'আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তার মালিকানা আল্লাহর।'[৪২]

অবশ্য আল্লাহ এগুলো তোমাদেরকে দান করেছেন। আর সেজন্যই বলছেন :

وَابْتَغِ فِيمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ

'আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তার মাধ্যমে তুমি পরকালীন আবাস খুঁজে নাও।'

একথা বলেননি যে, তুমি তোমার সম্পদ দ্বারা আখেরাত অনুসন্ধান করো।

ধন-সম্পদ আল্লাহপাকের দান

কাজেই আগে একথাটি বুঝে নিন, আপনার কাছে যে সম্পদ আছে – চাই তা নগদ অর্থ হোক, চাই ব্যাংক ব্যালেন্স হোক, চাই শিল্প কারখানা হোক, চাই ব্যবসা হোক – এগুলো সব আল্লাহপাকের দান। একথা সত্য যে, এগুলো অর্জন করতে আপনাকে চেষ্টা-সাধনা করতে হয়েছে। আপনি কষ্ট করেই এগুলো উপার্জন করেছেন। কিন্তু আপনার এই প্রচেষ্টা সম্পদ অর্জনে প্রকৃত কারণের মর্যাদা রাখে না। কারণ, চেষ্টা করলেই সম্পদ মানুষের হস্তগত হয়ে যায় না।

---

৪২. নিসা : ১৩২

আল্লাহপাক দিলেই তবে মানুষ সম্পদের অধিকারী হয়। এই সম্পদ আল্লাহপাকের দান। কাজেই মাথা থেকে এই চিন্তা বের করে দিন যে, এই সম্পদের মালিক আপনি নিজে। বরং সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। আর তিনি দয়া করে আপনাকে এই সম্পদ দান করেছেন।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একটি নির্দেশনা এই প্রদান করা হয়েছে।

মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে পার্থক্য

মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে তিনটি পার্থক্য আছে।

১. একটি পার্থক্য হলো, মুসলমান তার সম্পদকে আল্লাহর দান মনে করে। পক্ষান্তরে অমুসলিম তার সম্পদকে আল্লাহর দান মনে করে না। বরং সম্পদকে সে আপন বাহুবলের কৃতিত্ব মনে করে।

২. আরেকটি পার্থক্য হলো, একজন মুসলমানের কাজ হলো, এই সম্পদকে সে আখেরাতের কল্যাণ অর্জনের মাধ্যম বানাবে এবং এই সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় করার ক্ষেত্রে এমন কর্মনীতি অবলম্বন করবে যে, কোনো কাজই আল্লাহপাকের মর্জি ও তাঁর বিধানের খেলাফ হবে না, যাতে এই দুনিয়া তার জন্য দ্বীনের উপায় হয়ে যায় এবং আখেরাতের কল্যাণ ও সাফল্যের কারণ হয়। মানুষ যদি দুনিয়া অর্জনে নিয়ত ঠিক করে নেয়, আল্লাহপাকের আরোপিত হালাল-হারামের বিধানগুলোকে অনুসরণ করে, তখন দুনিয়া দ্বীন হয়ে যায়। তখন এই দুনিয়া আখেরাতের নাজাতের মাধ্যম হয়ে যায়।

৩. তৃতীয় পার্থক্য হলো, একজন মুসলমানও খাবার খায়, টাকা-পয়সা কামায়, একজন অমুসলিমও খায়-কামায়। কিন্তু অমুসলিমের অন্তরে না আল্লাহর কোনো কল্পনা থাকে, না তাঁর বিধিবিধানের পাবন্দির খেয়াল থাকে। কিন্তু মুসলমানের অন্তরে এই বিষয়গুলো বিদ্যমান থাকে। আর এজন্যই আল্লাহপাক আমাদের জন্য দুনিয়াকে দ্বীন বানিয়ে দিয়েছেন।

একজন ব্যবসায়ী যদি এই নিয়তে ব্যবসা করে যে, আল্লাহপাক আমার উপর কিছু দায়িত্ব আরোপ করেছেন। আমার দায়িত্বে আমার নিজের কিছু হক আছে, আমার সন্তানদের কিছু হক আছে, আমার স্ত্রীর কিছু হক আছে। এ কর্তব্য পালনের জন্য আমি এই ব্যবসা করছি। তা ছাড়া আমি এই জন্য ব্যবসা করছি যে, আমার এই ব্যবসার কারণে মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পেয়ে যাবে এবং তাদের সমস্যার সমাধান হবে।

ব্যবসা করার সময় যদি অন্তরে এই দুটি নিয়ত বিদ্যমান থাকে এবং সেই সঙ্গে হালাল পন্থা অবলম্বন করে আর হারামকে বর্জন করে চলে, তা হলে এই ব্যবসা ইবাদত।

ব্যবসায়ীদের দুটি প্রকার

এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

'যে ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় সততা ও আমানতদারি রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে তার হাশর হবে।'

কিন্তু ব্যবসার মধ্যে নিয়ত যদি সঠিক না থাকে, হালাল-হারামের চিন্তা না থাকে, তা হলে এমন ব্যবসায়ীর ব্যাপারে প্রথম হাদীসটির উল্টো আরেকটি হাদীসও আছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَلتُّجَّارُ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ

'ব্যবসায়ীদেরকে কিয়ামতের দিন পাপীদের সঙ্গে উঠানো হবে। কিন্তু সেই ব্যবসায়ী এর ব্যতিক্রম, যে তাক্ওয়া অবলম্বন করবে, নেক কাজ করবে এবং সততা বজায় রাখবে।'

হাদীসে ব্যবসায়ী বোঝাতে 'তুজ্জার' আর তাদেরকে যাদের সঙ্গে উঠানো হবে, তাদেরকে 'ফুজ্জার' নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'তুজ্জার' অর্থ ব্যবসায়ীবৃন্দ আর 'ফুজ্জার' ফাজির-এর বহুবচন। ফাজির একবচন আর ফুজ্জার বহুবচন। ফাজির অর্থ পাপাচারী বা গুনাহগার। অর্থাৎ– যারা আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত।

প্রথম হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ব্যবসায়ীদের হাশর হবে নবীগণের সঙ্গে, সিদ্দীকগণের সঙ্গে, শহীদগণের সঙ্গে। আর দ্বিতীয় হাদীসে বলেছেন, ব্যবসায়ীদের হাশর হবে পাপীদের সঙ্গে। কিন্তু শাব্দিক তরজমা দ্বারা-ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, আসলে দুয়ের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। বরং দুটি হাদীসে ব্যবসায়ীদের দুটি শ্রেণী বর্ণনা করা হয়েছে। একটি শ্রেণী হলো তারা, যারা নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবে আর অপর শ্রেণী তারা, যারা পাপী লোকদের সঙ্গী হবে।

এই দুটি শ্রেণীর মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করার জন্য যেকটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো সততা, তাক্ওয়া ও আমানতদারি। একজন ব্যবসায়ী যদি তার ব্যবসায় সৎ হয়, পরহেযগার হয় এবং আমানতদার হয়, তা হলে সে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাকে নবীগণের সঙ্গে হাশর করা হবে। পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যবসায়ীর মাঝে এই গুণগুলো না থাকে; বরং অর্থ উপার্জনই তার একমাত্র ধান্দা হয়, ন্যায়-অন্যায় ও হালাল-হারামের কোনো বিবেচনা না থাকে, তা হলে সে দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবসায়ী। পাপিষ্ঠ লোকদের সঙ্গে তার হাশর হবে।

মোটকথা, প্রথম ধাপ হলো, নিয়ত ঠিক করে নিতে হবে। দ্বিতীয় ধাপ হলো, কাজের মধ্যে হালাল-হারামের ভেদাভেদ রাখতে হবে। এমন যেন না হয় যে, মসজিদের সীমানা পর্যন্ত তো মুসলমান; কিন্তু মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর এর কোনো পরোয়া থাকল না যে, আমার কাজ-কারবার আল্লাহর বিধান অনুসারে হলো কি-না। কিন্তু আজ-কালকার বাস্তবতা হলো, এই দ্বিতীয় ধাপে এসে মুসলিম আর অমুসলিমের মাঝ কোনো ভেদাভেদ থাকছে না। একজন অমুসলিমও নির্দ্বিধায় সুদের কারবার করে আবার একজন মুসলিমও সুদের কারবার করে। একজন অমুসলিমও জুয়া খেলে আবার একজন মুসলমানও জুয়া খেলে। একজন মুসলিম ব্যবসায়ীর চরিত্র যদি এমন হয়, তা হলে সে সেই ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের হাশর পাপিষ্ঠ লোকদের সঙ্গে হবে।

অন্যথায় একজন মুসলিম ব্যবসায়ী প্রথম হাদীসে বর্ণিত সুসংবাদের উপযুক্ত বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় নির্দেশনা : নিজের জাগতিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে

এখন কারও মনে এই ভাবনা জাগতে পারে যে, ইসলাম আমাদের ব্যবসার পথও বন্ধ করে দিয়েছে আবার এই আদেশ প্রদান করেছে যে, ব্যস, আখেরাতের ভাবনা-ই ভাবো – দুনিয়ার চিন্তা করো না, দুনিয়ার প্রয়োজনের প্রতি কোনো লক্ষ্য রেখো না। এ জাতীয় ভাবনার অপনোদনে পবিত্র কুরআন সঙ্গে-সঙ্গেই বলে দিয়েছে :

وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

'কিন্তু তুমি তোমার দুনিয়ার অংশের কথা ভুলে যেয়ো না।'

মানে আল্লাহপাক বলছেন, আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তোমরা দুনিয়াকে একেবারে ছেড়ে দাও। বরং দুনিয়ার জন্য তোমার যতটুকু প্রয়োজন, তার কথাও স্মরণ রাখো। দুনিয়ার প্রয়োজনের কথা ভুলে যেয়ো না। হালাল ও জায়েয পন্থায় উপার্জন করো এবং প্রয়োজনীয় বৈধ খাতে তোমার চাহিদা ও প্রয়োজন অনুপাতে ব্যয় করো।

এই দুনিয়া-ই সব কিছু নয়

কিন্তু পবিত্র কুরআনের বলার ধরন দেখুন। এক কথার ফাঁকে কুরআন আরও একটি কথা বুঝিয়ে দিয়েছে যে, পার্থিব জীবনের 'অর্থনৈতিক সমস্যা' তোমাদের মৌলিক সমস্যা নয়। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের আর্থিক সমস্যাকে একটি সমস্যা হিসেবে মেনে নিয়েছেন বটে; কিন্তু এই অর্থনৈতিক সমস্যা মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যা নয়।

একজন কাফের আর একজন মুমিনের মাঝে একটি পার্থক্য হলো, কাফের তার গোটা জীবনের মৌলিক সমস্যা বলতে মনে করে, আমার জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত খাওয়া আর উপার্জনের কী ব্যবস্থা আছে? তার ভাবনার গতি এর সামনে আর অগ্রসর হয় না। কিন্তু কুরআন ও হাদীস একজন মুসলমানকে এই শিক্ষা প্রদান করে যে, তুমি অর্থনৈতিক তৎপরতায় জড়িত হবে এই অনুমতি তোমার জন্য আছে। কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে, এটি তোমার জীবনের মূল লক্ষ্য নয়। কারণ, তোমার এই জীবন আল্লাহই জানেন, কত দিন টিকবে। আজও শেষ হয়ে যেতে পারে, কালও শেষ হতে পারে। প্রতিটি মুহূর্তে এই পার্থিব জীবনের অবসান ঘটার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। আজ পর্যন্ত এমন একজন মানুষও জন্মলাভ করেনি, যে মৃত্যুকে অস্বীকার করতে পেরেছে। আজ হোক আর কাল হোক এই জগত ছেড়ে যেতেই হবে। কাজেই তুমি যদি মুসলমান হয়ে থাক, তা হলে নিশ্চয় এই বিশ্বাস থাকবে যে, মৃত্যুর পর আরও একটি জীবন আছে। আর সেই জীবন কখনও শেষ হবে না। সেটি হলো অনন্ত জীবন।

মানুষ কি একটি অর্থনৈতিক জীব?

সামান্য একটু বিবেক আছে এমন মানুষেরও ভাবা দরকার যে, আমি আমার চেষ্টা-সাধনা ও কর্মতৎপরতাকে কোন কাজে ব্যয় করব। জীবনের মূল লক্ষ্য আমি কাকে সাব্যস্ত করব। এই ক্ষণিকের ক্ষণস্থায়ী জীবনকে, নাকি মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন আসবে, তাকে। একজন মুসলমানের – যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধিবিধানের উপর ঈমান রাখে – জীবনের লক্ষ্য শুধু খেয়ে-পরে পূরণ হয়ে যেতে পারে না। কেবল বিপুল অর্থ উপার্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হতে পারে না। কারণ, যদি এমনই হয়, তা হলে মানুষ আর জীব-জন্তুর মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না।

মানুষ কাকে বলে? 'মানুষ একটি অর্থনৈতিক জীব' (Economic Animal) এই সংজ্ঞা সঠিক নয়। কারণ, মানুষ যদি অর্থনৈতিক জীব হয়, তা হলে মানুষ আর গরু-গাধা-কুকুরের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না। কারণ, এই জন্তুগুলো শুধু পানাহারের জন্য জন্মলাভ করেছে। এমতাবস্থায় মানুষও যদি শুধু পানাহারের জন্য জন্মে, তা হলে মানুষ আর জীব-জন্তুর মাঝে কোনো পার্থক্য থাকবে না। আল্লাহপাক সমস্ত জন্তুর জন্য জীবিকার দরজা খুলে দিয়েছেন।

তারাও খায়, পান করে। কিন্তু মানুষকে জন্তুদের থেকে যে-স্বাতন্ত্র দান করেছেন, তার রূপরেখা হলো, আল্লাহপাক মানুষকে বিবেক দান করেছেন। এই বিবেকের মাধ্যমে সে ভাববে, আমার সামনে যে-জীবন আসছে, সেটি একটি অনন্ত জীবন এবং বর্তমান জীবনের তুলনায় সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মোটকথা, এই দ্বিতীয় বাক্যে আল্লাহপাক একথা বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের দুনিয়ার অংশের কথা ভুলো না। কিন্তু একটি কথা মনে রেখো, জীবনের আসল উদ্দেশ্য হলো আখেরাত। আর এই যে যত অর্থনৈতিক তৎপরতা আছে, এগুলো পথের মনযিল। এগুলো শেষ গন্তব্য নয়।

তৃতীয় নির্দেশনা : সম্পদকে কল্যাণকর কাজে ব্যয় করো

তারপর তৃতীয় বাক্যে এই নির্দেশনাটি প্রদান করেছেন :

أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ

'আল্লাহ তোমার প্রতি যেমন অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও মানুষের প্রতি সেরূপ অনুগ্রহ করো।'

অর্থাৎ– সম্পদ দান করে আল্লাহ যেমন তোমার উপর অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তুমিও অন্যদের উপর – মানুষের উপর অনুগ্রহ করো।

এই আয়াতে একদিকে তো বলা হয়েছে, তোমরা হালাল-হারামের পার্থক্য বিবেচনা করে চলো। হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করো না। আবার অপর দিকে একথাও বলে দিয়েছেন যে, হালাল পন্থায় যা অর্জন করবে, তার ব্যাপারে এমন মনে করো না, তুমি এর একচ্ছত্র মালিক। বরং এর মাধ্যমে তুমি অন্যদের উপর অনুগ্রহ করো। আর এই অনুগ্রহ করার জন্য আল্লাহপাক যাকাত ও সাধারণ দানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

চতুর্থ নির্দেশনা : পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না

চতুর্থ বাক্যে আল্লাহপাক এই নির্দেশনা প্রদান করেছেন :

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ

'পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না।'

অর্থাৎ–সম্পদের অহমিকায় পড়ে অন্যদের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ শুরু করে দিয়ো না। অন্যদের অধিকার কেড়ে নিয়ো না।

তুমি যদি এই চারটি নির্দেশনা মান্য করে চল, তা হলে তোমার এই সম্পদ, তোমার এই বিত্ত, তোমার এই অর্থনৈতিক তৎপরতা তোমার জন্য বরকতের কারণ হবে। তোমার জীবনে কল্যাণ বয়ে আনবে আর তুমি কিয়ামতের দিন

নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে উত্থিত হবে। অন্যথায় তোমার সব তৎপরতা বেকার হয়ে যাবে এবং আখেরাতে তার ফলাফল শাস্তিরূপে সামনে এসে হাজির হবে।

জগতের সামনে নমুনা উপস্থাপন করুন

মোটকথা, আমাদের মুসলমান ব্যবসায়ীদের সব চেয়ে বড় কর্তব্যটি হলো, তারা পবিত্র কুরআনের এই চারটি নির্দেশনাকে সামনে রেখে জগতের সামনে নমুনা উপস্থাপন করতে হবে। জগত পুঁজিবাদী অর্থনীতির দ্বারাও ছোবল খেয়েছে আবার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি দ্বারাও ছোবল খেয়েছে। আপনারা এমন একটি নমুনা পেশ করুন, যাতে বিশ্ববাসী উত্তম বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়। যিনি এ-কাজটি করবেন, তিনি এ যুগের সব চেয়ে বড় প্রয়োজনটি পূরণ করবেন।

একা একজন মানুষ সমাজে পরিবর্তন আনতে পারে কি?

আজকাল এই অজুহাত পেশ করা হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবস্থা না বদলাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সবাই না বদলাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত একা একজন কী করে বদলাতে পারে? একা একজন মানুষ কী করে এই চারটি নির্দেশনার উপর আমল করতে পারে? মনে রাখবেন, সমাজ কতগুলো ব্যক্তির সমষ্টির নাম। প্রতিজন মানুষই যদি আপন-আপন জায়গায় ভাবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজ না বদলাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বদলাব না, তা হলে সমাজে কোনো দিনও পরিবর্তন আসবে না। পরিবর্তন সব সময় এভাবে সাধিত হয় যে, আল্লাহর কোনো বান্দা ব্যক্তি হিসেবেই নিজের জীবনে পরিবর্তন সাধন করে। তারপর এই বাতিটিকে দেখে আরেকটি বাতি জ্বলে ওঠে। এভাবে তৃতীয় আরও একটি বাতি আলো লাভ করে। এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি তৈরির মাধ্যমে সমাজ তৈরি হয়। ব্যক্তি দ্বারা জাতি গঠিত হয়। কাজেই 'আমি একা কিছু করতে পাবর না' এই অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহর রাসূল কীভাবে পরিবর্তন সাধন করেছেন

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দুনিয়াতে আগমন করলেন, তখন সমাজের অনাচার ও অপরাধ চূড়ান্তে উপনীত হয়ে গিয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে যদি তিনি এই চিন্তা করতেন যে, এত বড় একটি সমাজ – যে কিনা উল্টো দিকে যাচ্ছে – আমি একা তার কী করতে পারব। এই ভাবনা ভেবে যদি তিনি সাহস হারিয়ে বসে পড়তেন, তা হলে আজ আমি ও আপনারা

এখানে মুসলমান হিসেবে বসতে পারতাম না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জগতের বিরোধিতার সয়লাবের মোকাবেলা করে একটি পথ তৈরি করেছেন। নতুন একটি রাস্তা বের করেছেন। তারপর তিনি নিজে সেই পথে চলতে শুরু করেছেন।

তবে একথা সঠিক যে, সেই পথে তাঁকে অনেক কুরবানিও দিতে হয়েছে। নানা পেরেশানির তিনি সম্মুখীন হয়েছেন। অনেক সংকটের মোকাবেলা তাকে করতে হয়েছে। কিন্তু সেসবকে তিনি কোনোই পরোয়া করেননি। সকল বাধা-বিপত্তিকে পায়ে দলে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন। তার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, আজ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ তাঁর সমর্থক ও অনুসারী। কিন্তু তিনি যদি এই চিন্তা করে বসে পড়তেন, সমাজ না বদলানো পর্যন্ত আমি একা কী করব? তা হলে আজ এই দৃশ্য আমরা দেখতে পেতাম না।

প্রত্যেকের নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে

আল্লাহপাক প্রতিজন মানুষের দায়-দায়িত্ব যার-যার উপর ন্যস্ত করেছেন। কাজেই মানুষ কে কী করছে, তা না দেখে প্রতিজন মানুষের কর্তব্য হলো নিজেকে ঠিক করে নেওয়া। কাজেই আজকের এই আলোচনার পর আমাদের প্রত্যেককে অন্তরে এই ভাবনা জাগাতে হবে যে, অর্থনৈতিক জীবনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাকে কী নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এই জীবনে আমার ধর্ম আমাকে কী বিধান দিয়েছে। এখানে আমাকে কোন আইন পালন করতে হবে। অন্য কেউ ভাবুক আর না ভাবুক, আমি এই ভাবনা ভাবব এবং ইসলামী বিধিবিধান মেনে এবং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশনা পালন করে ব্যবসা করব।

আপনারা যারা এখানে উপস্থিত থেকে আমার বক্তব্য শুনেছেন, তাদের একজন লোকেরও মনে যদি এই বুঝ তৈরি হয় এবং এই ভাবনা জাগ্রত হয়, তা হলে আমার এই আলোচনা, আপনাদের এই আয়োজন সার্থক হয়েছে মনে করব। অন্যথায় এই সভা 'বসলাম, শুনলাম আর উঠে চলে গেলাম' ধরনের সভায় পরিণত হবে।

আল্লাহপাক আমাদেরকে বুঝবার ও আমল করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত- খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৫০-৭১

আধুনিক অর্থনীতি ও ইসলাম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

وقَالَ تَعَالٰى : اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ

লেনদেন : দ্বীনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ

ইসলামের একটি বিভাগ আছে লেনদেন। এই বিভাগের সূচনা হয় 'ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়' দ্বারা। এখানে আমি এই অধ্যায়টির কয়েকটি মূলনীতি বর্ণনা করছি।

প্রথম কথাটি হলো, লেনদেন ইসলামের একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আল্লাহপাক যেমন আমাদেরকে ইবাদতের মুকাল্লাফ বানিয়েছেন, তেমনি লেনদেন সংক্রান্ত কিছু বিধিবিধানেরও মুকাল্লাফ (আদিষ্ট) বানিয়েছেন। আবার যেমন আল্লাহ আমাদেরকে ইবাদতের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন, তেমনি লেনদেনের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে তিনি পথপ্রদর্শন করেছেন যে, লেনদেন করার সময় কোন-কোন বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, কোন জিনিস হারাম, কোন জিনিস হালাল ইত্যাদি।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, দীর্ঘদিন যাবত মুসলমানদের মাঝে এর কোনো চর্চা নেই। লেনদেন সংক্রান্ত ইসলামের বিধিবিধানগুলো মুসলমানদের জীবন থেকে মুছে গেছে। মুসলমান এখন দ্বীন বলতে শুধু বিশ্বাস আর ইবাদতকেই বোঝে। লেনদেনে পরিচ্ছন্নতা, জায়েয-না-জায়েযের ভাবনা, হালাল-হারামের অনুভূতি মুসলমানদের জীবন থেকে ধীরে-ধীরে মুছে গেছে। তাই এদিক থেকেও এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এ বিষয়টিতে মানুষের উদাসীনতা বেড়ে গেছে। ফলে এখন এ-ক্ষেত্রে মুসলমানদের সজাগ করে তোলা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

লেনদেনে মুসলমানদের দ্বীন থেকে সরে যাওয়ার কারণ

কিন্তু প্রশ্ন হলো, দ্বীনের এই বিভাগটি থেকে মুসলমানরা দূরে সরে গেল কেন? এর একটি কারণ হলো, কয়েকশো বছর যাবত আমরা মুসলমানরা বিজাতীয় ও অমুসলিমদের শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছি। আমাদের মাথার উপর ইসলামের শত্রুদের শাসন চেপে ছিল। আর এই সময়টিতে মুসলমানদের জন্য আপন বোধ-বিশ্বাস, ইবাদত ও ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের অনুসরণের অনুমতি বহাল থাকলেও ব্যবসা ও অর্থনীতিতে মুসলমানদরকে মানবরচিত আইন মান্য করতে বাধ্য করা হয়েছে। ইসলামের অর্থনীতিকে মুসলমাদের জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, এখন মসজিদ-মাদরাসায় দ্বীনের আলোচনা-অনুসরণ আছে বটে; কিন্তু বাজারে, রাজনীতিতে, আদালতে দ্বীনের কোনো আলোচনা নেই। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এই ক্ষেত্রগুলোতেও যে ইসলাম আছে, তার কোনো অনুভূতি মুসলমানদের মাঝে নেই।

এই ধারা তখন শুরু হয়েছিল, যখন মুসলমানদের রাজনৈতিক শক্তির পতন ঘটেছিল আর অমুসলিমরা শাসনক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল। তার ফলে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ইসলামের যে বিধান আছে, তার চর্চা ও অনুসরণ বন্ধ হয়ে গেল এবং এর বাস্তব প্রয়োগ পৃথিবী থেকে উঠে গেল। সে কারণে মুসলমানদের অন্তরে তার গুরুত্ব কমে গেল, এর আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণার জগতও সীমিত হয়ে গেল।

মানুষের স্বভাবই এমন যে, আল্লাহপাক মানুষের প্রয়োজন অনুপাতে উপকরণের ব্যবস্থা করে দেন। প্রয়োজন তৈরি হতে থাকে আর উপকরণের ব্যবস্থা হতে থাকে। লেনদেনের বিভাগটিও মানবজীবনের এমনই একটি বিভাগ যে, যতদিন পর্যন্ত তার অনুসরণ ও বাস্তবায়ন ছিল, ততদিন নতুন-নতুন সমস্যা, নতুন-নতুন পরিস্থিতি সামনে আসত। তাতে হালাল-হারামের গবেষণা হতো। ইসলামী আইনবিদগণ তাতে গবেষণা করতেন এবং সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতেন এবং সে ব্যাপারে ইসলামের বিধান মানুষদের অবহিত করতেন।

কিন্তু যখন পৃথিবীতে ইসলামের এই বিভাগটির প্রচলন কমে গেল, এমনকি রাষ্ট্রীয়ভাবে এর ব্যবহার একদম বন্ধ হয়ে গেল, তখন এর চর্চাও কমে গেল। ফকীহদেরকে এসব ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার মতো মানুষ কমে গেল। ফলে এ নিয়ে গবেষণার যে ধারাটি চলে আসছিল তা-ও স্তিমিত হয়ে গেল।

কিন্তু তারপরও প্রতিটি যুগে আল্লাহর কিছু বান্দা এমন ছিলেন এবং আছেন, যারা তাদের ব্যক্তিজীবন থেকে ইসলামের এই বিভাগটিকে হারিয়ে যেতে দেননি। তারা তাদের ব্যবসা ও অর্থনীতিতে হালাল-হারামের ভাবনা ও বিবেচনাকে বহাল রেখেছেন। তারা মাঝে-মধ্যে আলেমদের শরণাপন্ন হয়ে

থাকেন এবং এসব ব্যাপারে ইসলামের বিধান জিজ্ঞেস করেন। আর আলেমগণ তার উত্তর প্রদান করেন। সেই উত্তরগুলো আমাদের কাছে ফাতওয়ার কিতাবসমূহে বিদ্যমান আছে।

কিন্তু যেহেতু গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থাপনা অনৈসলামিক ছিল, তাই গবেষণা ও উদ্ভাবনে বিস্তৃতি, গভীরতা ও জোর অবশিষ্ট থাকল না এবং তার পরিধি সীমিত হয়ে গেল। তার ফলে লেনদেন ও ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে ফিক্হ-এর যে একটি স্বাভাবিক উর্দ্ধগতি ছিল, তা থিতিয়ে গেল। আর তার একটি ফল এইও দাঁড়াল যে, আমরা যখন মাদরাসাগুলোতে ফিক্হ ও হাদীস ইত্যাদি পড়ি ও পড়াই, তখন সবটুকু জোর ইবাদতের মধ্যেই ব্যয় করে ফেলি। পরে যখন লেনদেন ও অর্থনীতির অধ্যায়টি আসে, তখন যেহেতু আমাদের চিন্তা-চেতনায় এ বিষয়টির গুরুত্ব কমে গেছে এবং বাজারে এর প্রচলন মন্দা হয়ে গেছে, তাই এর উপর জোর দেওয়ার এবং এ বিষয়টিতে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার গরজ বোধ করি না। তাই সাধারণত লেনদেন অধ্যায়টি দৌড়ের উপরই সমাপ্ত করে ফেলা হয়। আর সেজন্য ইসলামের ব্যবসা ও অর্থনীতি জানার মতো আলেমের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। তার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, বাজারে একদিকে নিত্যনতুন সমস্যা ও ব্যবসার পদ্ধতি আবিষ্কার হচ্ছে আর অপরদিকে এ বিষয়গুলোকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝবার ও এসব ক্ষেত্রে সমাধান বের করার লোকের সংখ্যা কমে গেছে।

এখন অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, একজন ব্যবসায়ী ব্যবসা করছে। তাতে তাকে রোজ নিত্যনতুন সমস্যা ও পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হচ্ছে। সে কোনো একজন আলেমের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে, এই পরিস্থিতিতে আমার জন্য ইসলামের বিধান কী? তখন অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, মাওলানা ছাহেব না সমস্যা বোঝেন, না সমাধান দিতে সক্ষম হন। ব্যবসায়ী আলেমের কথা বোঝে না–আলেম ব্যবসায়ীর কথা বোঝেন না। কারণ, দুজনের মাঝে দূরত্ব এত বেড়ে গেছে যে, ব্যবসার অনেক পরিভাষা, অনেক প্রচলন সম্পর্কে মাওলানা ছাহেব অনবহিত। ব্যবসায়ী যখন মাসআলা জিজ্ঞেস করবে, তখন সে তার নিজস্ব ভাষা-পরিভাষায়ই জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু তিনি তার ভাষা-পরিভাষা না শুনেছেন, না পড়েছেন। কাজেই তিনি তার কথার মর্ম বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন না। এখন মাওলানা ছাহেব যদি নিজের ভাষা-পরিভাষায় উত্তর প্রদান করেন – যার থেকে ব্যবসায়ী লোকটি বঞ্চিত – তার ফল এই দাঁড়ায় যে, সে ধরে নেয়, আমরা যখন হুজুরদের কাছে গিয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করি, তখন পুরোপুরি উত্তর পাই না। তার চূড়ান্ত কুফল এই দাঁড়ায় যে, পরবর্তী সময়ে তারা আলেমদের কাছে আসা-ই ছেড়ে দেয়।

এ কারণে আলেম, ব্যবসায়ী ও কায়-কারবারের মাঝে বিরাট এক দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। তার ফলাফল দিন-দিন মন্দ-থেকে-মন্দতরের দিকেই যাচ্ছে। এখন প্রয়োজন হলো, আমাদেরকে এই ইসলামী লেনদেন, কায়কারবার ও অর্থনীতির বিষয়টিকে ভালোভাবে পড়াতে ও পড়তে হবে। ভালোভাবে বুঝতে ও বোঝাতে হবে।

লেনদেন সংশোধনের সূচনা

কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে সারা বিশ্বে একটি অনুভূতি জাগ্রত হচ্ছে। আর সেটি হলো, যেভাবে আমরা আমাদের ইবাদতগুলোকে শরীয়ত অনুসারে আঞ্জাম দিতে চাই, তেমনি লেনদেনগুলোকেও শরীয়তের ছাঁচে ঢেলে সাজাতে হবে। এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অনুভূতি, যা সমগ্র পৃথিবীতে ধীরে-ধীরে জাগ্রত হতে শুরু হয়েছে। আর তার ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে, এমন কিছু লোক তৈরি হয়ে গেছে, যাদের বেশভুষা দেখে ঘুণাক্ষরেও কারও ধারণা হবে না যে, এই লোকগুলো দ্বীনদার হতে পারে; কিন্তু আল্লাহপাক তাদের অন্তরে হারামের প্রতি প্রচণ্ড অনীহা আর হালালের প্রতি প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এখন তারা ভাবছে, আমাদের লেনদেন তথা অর্থনীতি কীভাবে শরীয়তসম্মত হবে।

একাজে তারা একজন দিশারীর অনুসন্ধান করছে। কিন্তু এই ময়দানে দিকনির্দেশনা দেওয়ার মতো লোক খুবই কমে গেছে। মেজাজ ও রুচি উপলব্ধি করে তাদের লেনদেন ও পরিভাষাগুলোকে বুঝে উত্তর দেওয়ার মতো লোকের অভাব হয়ে গেছে। বর্তমানে প্রয়োজন তো অনেক; কিন্তু সেই প্রয়োজন পূরণ করার মতো মানুষ খুবই কম।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা

সেজন্য আমরা দীর্ঘদিন যাবত ভাবছি, 'ফিক্‌হুল মু'আমালাত'কে কী করে দ্বীনি মাদরাসাগুলোর সিলেবাসে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এ-লক্ষ্যে আমরা বেশকিছু পদক্ষেপও হাতে নিয়েছি। আল্লাহপাক এই মিশনে আমাদেরকে কামিয়াব করুন। আমীন।

মোটকথা, এটি দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সেজন্য 'কিতাবুল বুয়ূ' (ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়) সংশ্লিষ্ট মাসআলাগুলোকে যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক, যাতে এ বিষয়টিতে ছাত্রদের ন্যূনতম অভিজ্ঞতা তৈরি হয়ে যায়।

প্রচলিত অর্থনীতি

এ বিষয়ের প্রথম আলোচনা হলো, আপনারা অর্থনীতি বিষয়ে দুটি নাম বারবার শুনে থাকবেন। একটি হলো 'পুঁজিবাদী অর্থনীতি' (Capitalism) আর অপরটি 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি' (Socalism)। বর্তমান পৃথিবীতে এই দুটি ব্যবস্থা-ই চালু আছে এবং সমগ্র পৃথিবী এই দুইভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে সমাজতন্ত্রের যদিও পতন ঘটেছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এখন আর তার সেই রাজনৈতিক শক্তি অবশিষ্ট নেই, যা আগে ছিল। কিন্তু একটি দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে সেটি এখনও বেঁচে আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের যে রাজ্যগুলো স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, সেগুলোতে মার্কিন প্রভাব বিস্তার লাভ করার সুবাদে পুঁজিবাদী অর্থনীতির নানা কুফলও ছড়িয়ে পড়েছে। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় এখন মানুষের মাঝে পুনর্বার সমাজতন্ত্রের প্রতি আগ্রহ তৈরি হচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটেছে বেশিদিন হয়নি। কিন্তু যেহেতু পুঁজিবাদী অর্থনীতির কুফল সামনে আসা শুরু হয়ে গেছে, সেজন্য মানুষ আবারও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুনর্জীবিত করার চিন্তা শুরু করে দিয়েছে।

আর এ কারণেই রাশিয়ার কোনো-কোনো স্বাধীন রাজ্যের নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে। কাজেই যদিও সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে; কিন্তু একটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে একথা বলা যায় না যে, সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে। বরং সমাজতন্ত্র এখনও জীবিত আছে।

তো বর্তমান পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ পরস্পর বিরোধী এই দুটি ব্যবস্থা চালু আছে এবং বিশ্বরাজনীতি এই দুই ব্যবস্থার মধ্যখানেই ঘুরপাক খাচ্ছে। চিন্তার জগতেও এই দুই মতাদর্শের মাঝে তর্ক-বিতর্কের বাজার সরগরম রয়েছে এবং একে অপরের সমালোচনায়ও মুখর রয়েছে। এ বিষয়ে বহু গ্রন্থও রচিত হয়েছে। তো একটি হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আর অপরটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

আজকাল মানুষ পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ বিষয়ে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা করছে। অর্থাৎ– এই দুটি ব্যবস্থা খুবই আলোচিত বিষয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, পুঁজিবাদ কী? সমাজবাদ কী? এগুলোর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো কী? এগুলোর ভুল কোথায় এবং এগুলোর মোকাবেলায় ইসলামী অর্থনীতি ভালো কীভাবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দুয়ে-দুয়ে চারের মতো স্পষ্টরূপে আমাদের মাথায় নেই। সাধারণত যা বলা হয়, মোটের উপর অস্পষ্ট কিছু কথা বলা হয়।

অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা

সেজন্য আমি সংক্ষেপে হলেও বিষয়টি আলোকপাত করতে চাই। বিষয়টিকে আপনারা এভাবে বুঝুন যে, বর্তমানে অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র বিষয় ও স্বতন্ত্র বিদ্যায় পরিণত হয়ে গেছে। যেকোনো অর্থব্যবস্থা যে কটি সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তার সমাধান খুঁজে বেড়ায়, মৌলিকভবে তা হলো চারটি।

১. অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ (Determination Of Priorites) : অর্থনীতি সর্বপ্রথম যে সমস্যাটির সম্মুখীন হয়, অর্থনৈতিক পরিভাষায় তাকে 'অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ' বা Determination Of Priorites বলা হয়। এর অর্থ হলো, একথাটি সর্বজনস্বীকৃত ও স্পষ্ট যে, মানুষের চাহিদা অনেক। (প্রয়োজন নয়-চাহিদা) আর সেই চাহিদাগুলোকে পূরণ করার উপকরণ সেই তুলনায় কম।

প্রতিজন মানুষের অন্তরে অসংখ্য চাহিদা থাকে যে, আমার এত পরিমাণ অর্থ দরকার। আমার ভালো একটি গাড়ি দরকার। উন্নতমানের একটি বাড়ি দরকার। খাওয়ার জন্য এই দরকার, সেই দরকার ইত্যাদি। নানা চাহিদার মাঝে ঘুরপাক খায় মানুষ। তো মানুষের চাহিদা অনেক। কিন্তু সেই চাহিদাগুলো পূরণ করার উপকরণ অপ্রতুল।

একটি চুটকি শুনুন। এক গ্রাম্যলোক একদিন বলতে শুরু করল, 'আমার মন চায়, আমি যদি বেশ কিছু দুধ পেতাম, তা হলে তার মধ্যে কতগুলো গুড় ঢালতাম আর আঙুল চুবিয়ে-চুবিয়ে খেতাম।' তার এই বাসনার কথা শুনে এক ব্যক্তি বলল, মন তো চায় বুঝলাম; কিন্তু তোমার কাছে আছে কিছু? বলল, শুধু আঙুল আছে; আর কিছু তো নেই।

তো মানুষের চাহিদা অনেক। কিন্তু সেই চাহিদা পূরণ করার উপকরণ কম ও সীমিত। এ ব্যাপারে একজন ব্যক্তির যে অবস্থা, একটি সমাজেরও একই অবস্থা, একটি রাষ্ট্রেরও সেই একই অবস্থা।

একজন ব্যক্তিরও চাহিদা অনেক; কিন্তু তার উপকরণ সীমিত ও অল্প।

একটি সমাজেরও চাহিদা অনেক; কিন্তু সেই চাহিদা পূরণের উপকরণ কম।

একটি রাষ্ট্রেরও চাহিদা অনেক; কিন্তু সেই চাহিদা পূরণের উপকরণ অপ্রতুল।

ফলে মানুষ যে কাজটি করতে বাধ্য হয়, তা হলো, চাহিদাগুলো পূরণ করার ক্ষেত্রে তাকে আগ-পরের বিন্যাস তৈরি করতে হয়। একটি চাহিদাকে আগে পূরণ করতে হয় আর আরেকটিকে পিছিয়ে দিতে হয়। এরই নাম 'অগ্রগণ্যতা'। মানুষ একটি চাহিদাকে আরেকটি চাহিদার উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে যে, আমি কোনটিকে আগে পূরণ করব আর কোনটিকে পরে পূরণ করব।

যেমন– ধরুন, আমাদের একটি চাহিদা হলো, করাচি থেকে নিয়ে পেশোয়ার পর্যন্ত মোটরওয়ে তৈরি হয়ে যাক। আরও একটি চাহিদা আছে - আমরা পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয়ে যাই। কিন্তু দুটি চাহিদা একসঙ্গে পূরণ করার সামর্থ আমাদের নেই। এমতাবস্থায় আমরা কী করব? আমরা 'ডিটারমিনেশন অফ প্রায়রিটি' তথা 'অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ' পদ্ধতি অবলম্বন করব। আমরা হিসাব কষতে বসে যাব যে, এই দুটি চাহিদার কোনটি অগ্রগণ্য। যেটি অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হবে, তাকে তালিকার আগে নিয়ে আসব আর অপরটি পরে রাখব। এরই নাম 'ডিটারমিনেশন অফ প্রায়রিটি' বা 'অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ'।

যেকোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একে প্রথম বিষয় বলে বিবেচনা করা হয় যে, কোন চাহিদাটিকে আগে পূরণ করব আর কোনটিকে পরে করব।

২. উপকরণ বিভাজন (Allocation Of Resources) : এর অর্থ হলো, কিছু উপকরণ আমাদের কাছে আছে। জমি আছে, অর্থ আছে। কারখানা আছে। এসব উপকরণ আমাদের কাছে আছে। এর কতটুকু উপকরণ কোন কাজে ব্যয় করব। যেমন– আপনি অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ করে নিলেন যে, আমার গম উৎপন্ন করা দরকার। এটিও আমার প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আমাকে চাল উৎপন্ন করতে হবে। এটিও আমার প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। কাপড় তৈরি করতে হবে। এটিও আমার প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কী পরিমাণ জমিতে গম উৎপন্ন করব, কী পরিমাণ জমিতে চাল উৎপন্ন করব, কী পরিমাণ জমিতে তুলা উৎপন্ন করব, কী পরিমাণ জমিতে চা উৎপন্ন করব, কী পরিমাণ জমিতে তামাক উৎপন্ন করব। অনুরূপভাবে কাপড় তৈরির জন্য কটি কারখানা স্থাপন করব, জুতার জন্য কটি কারখানা স্থাপন করব, অস্ত্র তৈরির জন্য কটি কারখানা স্থাপন করব। অর্থনীতির পরিভাষায় একে 'উপকরণের বিভাজন' বা (এ্যালকেশন অফ রিসোর্স) বলা হয়।

৩. আয় বণ্টন (Distribution Of Income) : তৃতীয় সমস্যাটি হলো আয় বণ্টনের সমস্যা। আমি অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ করে নিলাম। উপকরণের বিভাজনও করলাম। এখন জমিগুলো কাজ করে যাচ্ছে। তাতে চাল উৎপাদন হচ্ছে, গম উৎপাদন হচ্ছে ইত্যাদি। কারখানাগুলো কাজ করছে। কোনোটিতে কাপড় তৈরি হচ্ছে। কোনোটিতে জুতা তৈরি হচ্ছে। এক কথায় আমার প্রয়োজনের সব কিছুই তৈরি হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমার এই সবগুলো কাজ যখন উৎপাদন ও আমদানির আদলে আমার সামনে এসে উপস্থিত হবে, তখন এগুলোকে আমি কীভাবে বণ্টন করব। অর্থনীতির পরিভাষায় এর নাম 'আয় বণ্টন' বা 'ডিস্টিবিউশন অফ ইনকাম'।

৪. উন্নয়ন (Development) : চতুর্থ বিষয়টি হলো উন্নয়ন। অর্থাৎ- আমাকে পর্যায়ক্রমে উন্নতিও করতে হবে। যেমন- মানুষের একটি স্বভাবজাত চাহিদা হলো, সে এক অবস্থার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে চায় না; বরং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায় – পর্যায়ক্রমে উন্নতি করতে চায়। এই চাহিদারই ফল হলো, একসময় মানুষ গাধার পিঠে চড়ে ভ্রমণ করত। তারপর ঘোড়ার পিঠে চড়ে ভ্রমণ করতে শুরু করেছে। তারপর এসেছে উট। তারপর মানুষ বাইসাইকেল তৈরি করে নিয়েছে। তারপর মোটর সাইকেল। তারপর কার। তারপর উড়োজাহাজ। এখন মানুষ উড়োজাহাড়ে চড়ে ভ্রমণ করছে।

তো উন্নতি মানবীয় স্বভাবের একটি চাহিদা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা উন্নতি কীভাবে করব? কী করে আমরা আমাদের অর্থনীতিতে উন্নতি সাধন করতে পারব? এর জন্য আমাদেরকে কোন ধরনের পথ অবলম্বন করা উচিত, যার ফলে আমাদেরকে জীবনভর একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না; বরং আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারব?

এ হলো সেই চারটি মৌলিক বিষয়, যেকোনো অর্থব্যবস্থাকে যেগুলোর মুখোমুখী হতে হয়। একনজরে বিষয়গুলো হলো :

১. অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ (Determination Of Priorites)

২. উপকরণ বিভাজন (location Of Resources)

৩. আয় বণ্টন (Distribution Of Income)

৪. উন্নতি (Development)

আমরা যখনই কোনো অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে কথা বলব, তখনই সবার আগে আমাদেরকে দেখতে হবে, সেই ব্যবস্থাটি এই চারটি সমস্যাকে কীভাবে সমাধান করেছে এবং তার কোনটিতে সে কোন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

তো এই সমস্যাগুলোর সমাধানে পুঁজিবাদী অর্থনীতি (ক্যাপিটালিজম) একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। আবার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি (স্যোসালিজম) আরেকটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। তাই আসুন, আমরা পর্যালোচনা করে দেখি, পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সমাজবাদী অর্থনীতি এই চার মৌলিক সমস্যার সমাধানে কে কী পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতি (Capitalism)

পুঁজিবাদী অর্থনীতির দর্শন হলো, এই চারটি সমস্যার সমাধান করার একটি-ই পদ্ধতি। আর তা হলো, প্রতিজন মানুষকে বেশি-বেশি মুনাফা অর্জনের সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে হবে। অর্থাৎ- প্রতিজন মানুষের এই অধিকার থাকবে

যে, সে যত বেশি ইচ্ছা অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করতে পারবে। যুক্তিসঙ্গত সীমানার মধ্যে অবস্থান করে যত খুশি সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা প্রত্যেক মানুষের থাকতে হবে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির দর্শন হলো, বেশি-বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য যখন প্রতিজন মানুষকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হবে, তখন প্রকৃতির পক্ষ থেকে এমন দুটি শক্তি নিয়োজিত আছে যে, মুনাফা অর্জনে সেগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগালে অর্থনীতির এই চারটি সমস্যা আপনা-আপনি সমাধান হয়ে যাবে। সেই শক্তিদুটো কী?

তাদের ভাষায় তার একটি হলো 'সরবরাহ' বা 'সাপ্লাই'। আরেকটি 'চাহিদা' বা 'ডিমান্ড'। বাজারের চাহিদার নাম 'ডিমান্ড' আর যেসব পণ্য মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য বাজারে আনা হয়, তার নাম 'সরবরাহ' বা 'সাপ্লাই'।

প্রকৃতির বিধান

প্রকৃতির বিধান হলো, যখন কোনো পণ্যের সাপ্লাই বেড়ে যায় আর ডিমান্ড কমে যায়, তখন তার দাম কমে যায়। আর যখন কোনো পণ্যের সাপ্লাই কমে যায় আর ডিমান্ড বেড়ে যায়, তখন তার মূল্য বেড়ে যায়। আমরা সবাই জানি ও দেখি যে, গরমের দিনে বরফের খুব প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু বাজারে প্রয়োজন অনুপাতে বরফ সরবরাহ হয় না। ফলে দাম বেড়ে যায়। তার বিপরীতে শীতকালে বরফের সরবরাহ বেশি হয় বিধায় দাম কম থাকে।

তো সরবরাহ ও চাহিদা এই দুটি বিষয় হলো প্রকৃতির একটি বিধান। ওরা এর নাম রেখেছে 'মার্কেট ফোর্সেস' বা 'বাজারশক্তি'। এগুলো হলো প্রাকৃতিক শক্তি, যেগুলো বাজারে কার্যকর থাকে।

তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, একদিকে প্রাকৃতিক শক্তিগুলো বাজারে কাজ করছে, আবার অন্যদিকে মানুষের পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয়েছে, যে যেভাবে পার, বেশি-বেশি মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করো।

এমতাবস্থায় একজন ব্যবসায়ী যখন পণ্য নিয়ে বাজারে আসবে, তখন সে অবশ্যই সেই পণ্যটি আনবে, যার চাহিদা বেশি, সরবরাহ কম। কারণ, তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, তুমি বেশি-বেশি মুনাফা অর্জন করো। এজন্য সে চিন্তা করবে, বাজারে কোন জিনিসটির চাহিদা বেশি, সরবরাহ কম। কারণ, সেই জিনিসটি বিক্রি করেই অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হবে। তা না করে যদি সে সেই জিনিসটি বাজারে আনে, যার সরবরাহ বেশি, চাহিদা কম, তা হলে তার মুনাফা কম হবে এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যেহেতু সব মানুষকে এই স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে যে, তুমি বেশি-বেশি মুনাফা অর্জন করো, তখন সবাই বাজারে সেই একই পণ্য সরবরাহ করবে, যার চাহিদার তুলনায় সরবরাহ

কম। এবং তারা এই ধারা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত রাখবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সরবরাহ চাহিদার সমান না হবে। যখন চাহিদা আর সরবরাহ সমান-সমান হয়ে যাবে, তখন যদি আরও আনা হয়, তা হলে তার ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, পণ্যটির মূল্য পড়ে যাবে এবং তার লোকসান হয়ে যাবে।

একলোক কাপড়ের ব্যবসা করে। সে দেখবে, বাজারে কতগুলো কাপড় আছে। যদি অনুভব করে, চাহিদা বেশি আর বাজারে যে-পরিমাণ কাপড় উৎপাদন হচ্ছে, চাহিদার তুলনায় তার পরিমাণ কম এবং মূল্য বেড়ে যাচ্ছে, তা হলে সে কাপড়ের একটি কারখানা স্থাপন করবে। কিন্তু যখন সরবরাহ আর চাহিদা সমান-সমান হয়ে যাবে – যাকে অর্থনীতির পরিভাষায় 'ভারসাম্য রেখা' বলা হয় – তখন সে বাজারে কাপড় সরবরাহ করা বন্ধ করে দেবে। কারণ, তখন তার লোকসান হবে।

তো পুঁজিবাদী অর্থনীতির দর্শন একথা বলছে যে, এভাবে আপনা-আপনিই 'অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ' হয়ে যাবে। প্রতিজন মানুষই চিন্তা করবে, এখন বাজারে কোন জিনিসটির প্রয়োজন আছে। কাপড়ের প্রয়োজন থাকলে কাপড় তৈরি করবে। অন্য কোনো জিনিসের প্রয়োজন থাকলে সেটি সরবরাহ করবে। যখন মানুষকে অধিক মুনাফা অর্জনের স্বাধীনতা প্রদান করা হবে, তখন তারা-ই বাজারশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে, কোনটি উৎপাদন করতে হবে আর কোনটির উৎপাদনের আবশ্যকতা নেই।

একব্যক্তি জমির মালিক। তিনি তার জমিতে ধানও ফলাতে পারেন, গমও ফলাতে পারেন, আবার তুলাও ফলাতে পারেন, তামাকও ফলাতে পারেন, আবার চায়ের চাষও করতে পারেন। কিন্তু চাষ করার আগে তিনি ভাববেন, কোন জিনিসটি উৎপাদন করলে আমি অধিক লাভবান হতে পারব। মুনাফা কোনটিতে বেশি হবে। বাজারে যার চাহিদা ও প্রয়োজনীতা বেশি থাকবে, তিনি সেটিরই চাষ করবেন। যদি এমন হয় যে, মানুষ আটা পাচ্ছে না; বাজারে আটার খুব চাহিদা। কিন্তু জমির মালিক চাষ করলেন আফিম, তা হলে মানুষ তাকে বোকা ঠাওরাবে। উৎপাদনের পর বাজারে গিয়ে তিনি আফিমের কোনো ক্রেতা খুঁজে পাবেন না। ফলে তিনি আফিমের চাষ না করে গমেরই চাষ করবেন।

এভাবে অগ্রগণ্যতাও নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে, আবার উপকরণের বিভাজনও হয়ে যাচ্ছে।

আয় বণ্টন (Distribution Of Income)

পুঁজিবাদী অর্থনীতির বক্তব্য হলো, উৎপাদনের পেছনে চারটি কার্যকরী শক্তি থাকে। অর্থাৎ– যেকোনো পণ্য উৎপাদন করতে হলে চারটি জিনিসের প্রয়োজন

হয়। সেই চার জিনিস মিলে কাজ করে পণ্যটি উৎপাদন করে। তাদের পরিভষায় এর নাম 'ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন'। যেমন– একটি কাপড় তৈরির কারখানা। এখানে চারটি কার্যকরী শক্তি কাজ করছে।

১. জমি (Land)। এমন একটি স্থান, যেখানে কাজ করা হবে। এটি একটি 'উৎপাদন কার্যকরী শক্তি' বা 'ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন'।

২. পুঁজি (Capital)। পুঁজি দ্বারা উদ্দেশ্য অর্থ। মানুষের কাছে অর্থ থাকবে। সেই অর্থ দ্বারা ফ্যাক্টরির ভবন নির্মাণ করবে, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করবে ।

৩. শ্রম (Labour)। জমিও আছে। পুঁজিও আছে। কিন্তু শ্রম বা লেবার নেই। তা হলে কাজ চলবে না। কাজেই শ্রম খাটার জন্য শ্রমিক জোগান দিতে হবে।

৪. এমন একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, যে বা যারা এই তিনটি শক্তিকে একত্রিত করে কারখানাটি দাঁড় করাবেন এবং পরিচালনা করবেন। পরিভাষায় একে Entrepreneur (জোগানদাতা) বলা হয়। তিনি একটি পরিকল্পনা দাঁড় করাবেন। তারপর সেই পরিকল্পনা অনুপাতে মাথায় ঝুঁকি বরণ করে নেবেন যে, এ কাজটি আমাকে করতে হবে। তারপর তিনি প্রথমোক্ত শক্তিগুলোকে সমবেত করবেন। জমি নেবেন। পুঁজির ব্যবস্থা করবেন। শ্রমিক নিয়োগ দেবেন। তারপর উৎপাদন শুরু হবে। এবার তাকে আরও একটি ঝুঁকি মাথায় তুলে নিতে হবে যে, তার কারখানায় যে পণ্যটি উৎপাদিত হবে, সেটি বাজারে বিকাবে কি-না। তার জানা থাকবে না, এই পণ্য বিক্রি হবে কি হবে না। আশঙ্কা থাকবে, এই পণ্য মানুষ ক্রয় নাও করতে পারে।

তো এই চারটি জিনিস হলো উৎপাদনের কার্যকরী শক্তি (Factors Of Production – ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন)। জমি, পুঁজি, শ্রম ও পরিচালক বা সংগঠন।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দর্শন হলো, এই চারটি শক্তি মিলে পণ্যটি উৎপাদন করল। কাজেই এরা সবাই আয়ের অংশীদার। জমির অংশ হলো ভাড়া। অর্থাৎ– যে ব্যক্তি কারবারটি করার জন্য জমি দিল, তার অধিকার হলো, তাকে জমির ভাড়া দিতে হবে।

পুঁজির অংশ হলো সুদ। অর্থাৎ– যে ব্যক্তি পুঁজি বিনিয়োগ করল, তার এই অধিকার আছে, এর বিপরীতে সে সুদ দাবি করতে পারে যে, আমি আপনাকে এত টাকা প্রদান করেছি; কাজেই আমাকে এত শতাংশহারে সুদ প্রদান করুন। শ্রমিকের এই অধিকার আছে, সে তার মালিকের কাছ থেকে তার পারিশ্রমিক উসুল করে নেবে।

তো জমির ভাড়া (Rent), পুঁজির সুদ (Interent) ও শ্রমিকের বেতন (Wages) এই তিন খাতে ব্যয় করার পর যা উদ্বৃত্ত থাকবে, তা হলো মালিকের মুনাফা (Profit)। কারণ, তিনিই এত কিছুর আয়োজন করেছিলেন এবং ঝুঁকি বরণ করে নিয়েছিলেন। কাজেই যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে, তার সবটুকুই তার মুনাফা বলে বিবেচিত হবে।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, আপনি তো বলেছেন, জমির মালিক ভাড়া পাবে, পুঁজির মালিক সুদ পাবে, শ্রমিক বেতন পাবে। কিন্তু জমির ভাড়া কত, পুঁজির সুদের পরিমাণ কত, শ্রমিকের বেতন কত এসব নির্ধারণ করবে কে? এর নির্ধারণ কীভাবে হবে?

এই প্রশ্নের উত্তর হলো, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বক্তব্য হলো, সেই সরবরাহ ও চাহিদা-ই এসব নির্ধারণ করে দেবে। জমির ভাড়া, শ্রমিকের বেতন, পুঁজির সুদ এসব বাজারশক্তি, তথা চাহিদা ও সরবরাহই বলে দেবে, কার পাওনা কত।

যেমন– যায়েদ একটি কারখানা স্থাপন করতে চায়। এর জন্য তার জমি দরকার। এখন দেখার বিষয় হলো, জমির সরবরাহ ও চাহিদা কেমন। জমিটি ভাড়া নেওয়ার মতো মানুষ কি শুধু যায়েদই, নাকি এমন আরও লোক আছে, তারাও এই জমিটি ভাড়া নিতে চায়। যদি জমি ভাড়া নেওয়ার মতো লোক যায়েদ একা-ই হয়, তা হলে তার অর্থ হলো, জমির চাহিদা কম আর সরবরাহ বেশি। কাজেই জমির ভাড়া কম হবে। আর যদি জমি ভাড়া নেওয়ার মতো আরও লোক থাকে; কিন্তু জমির পরিমাণ সীমিত, তা হলে এর অর্থ হলো, জমির সরবরাহ কম; কিন্তু চাহিদা বেশি। কাজেই জমির ভাড়াও বেশি হবে।

সারকথা দাঁড়াল, সরবরাহ ও চাহিদা নামক বাজারশক্তির উপর নির্ভর করে জমির ভাড়া নির্ধারিত হবে। মনে করুন, যায়েদের জমি দরকার। কিন্তু তিনি এক হাজার টাকার বেশি ভাড়া দিতে সক্ষম নন। ফলে তিনি মাসে এক হাজার টাকা ভাড়ার জমির অনুসন্ধানে বের হয়েছেন। বাজারে গিয়ে দেখলেন, ওখানে আরও বহু মানুষ জমির অনুসন্ধানে ঘুরছে। কেউ পাঁচ হাজার দিতে প্রস্তুত, কেউ সাত হাজার প্রস্তাব করছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় জমি কম। তার ফল এই দাঁড়াবে যে, যায়েদ এক হাজারে জমি পাবে না। কাজেই বাধ্য হয়ে তাকে বাজারমূল্য অনুপাতে অন্তত পাঁচ হাজারে রাজি হতে হবে।

অনুরূপভাবে জমিওয়ালা এই সিদ্ধান্ত নিল যে, আমি আমার জমি মাসিক দশ হাজার টাকার কমে ভাড়া দেব না। কিন্তু দেখা গেল, পাঁচ হাজার দিতেও কেউ রাজি নয়। কারণ, জমির সরবরাহ বেশি আর চাহিদা কম। এমতাবস্থায় বাধ্য হয়ে তাকে কম মূল্যে জমি ভাড়া দিতে হবে।

তো পাঁচ হাজারের রেখা এমন যে, তার উপর এসে চাহিদা ও সরবরাহ একত্র হয়ে যাবে এবং ভাড়া নির্ধারিত হয়ে যাবে। তার অর্থ হলো, জমির ভাড়া নির্ধারণ করার পদ্ধতি হলো, চাহিদা আর সরবরাহের শক্তি একে নির্ধারণ করে দেবে। এ হলো পুঁজিবাদী অর্থনীতির দর্শন।

সুদের বেলায়ও এই একই রীতি যে, ব্যবসা করার জন্য একজন মানুষের টাকা দরকার। সে ব্যাংকের কাছে যায় যে, আমি ব্যবসা করতে চাই; আপনারা আমাকে পুঁজি দিন। ব্যাংক তাকে বলল, দেব; তবে তুমি আমাদেরকে এত টাকা করে সুদ দিতে হবে। এখন যদি ব্যাংকের অর্থ কম হয় আর ব্যবসায়ীর চাহিদা বেশি হয়, তা হলে সুদের হার বেড়ে যাবে। কিন্তু অবস্থা যদি এর বিপরীত হয় – মানে সরবরাহ বেশি হয় আর চাহিদা কম হয়, তা হলে সুদের হার কমে যাবে। তো এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরবরাহ আর চাহিদা দুয়ে মিলে সুদের হার নির্ধারণ করে দিচ্ছে।

শ্রমিকেরও ব্যাপার একই রকম। বাজারে যদি শ্রমিকের সরবরাহ বেশি হয় – মানুষ কাজের সন্ধানে জুতা ক্ষয় করে ফিরছে; কিন্তু কারখানা কম, তা হলে বেতন কম হবে। আর যদি ব্যাপার এর উল্টো হয়, তা হলে শ্রমিকের বেতন বেড়ে যাবে।

শ্রমিকরা কারখানার দ্বারে-দ্বারে গিয়ে ধরনা দিচ্ছে, আমাকে কাজ দিন। মালিক বলে, না তোমাকে রাখব না; আমার লোকের প্রয়োজন নেই। শ্রমিক বলে, রাখুন, আমাকে রোজ এক টাকা দিলেই চলবে; তারপরও রাখুন। এবার কারখানার মালিক ভাবে, অন্যরা রোজ দুই টাকায় কাজ করে। একে তো আরও সস্তায় পাচ্ছি। কাজেই দুই টাকার একজনকে ছাটাই করে একে রেখে দিলেই তো ভালো হয়। তাই বলল, ঠিক আছে; তোমার চাকুরি হয়ে গেছে; কাজে লেগে যাও।

কিন্তু অবস্থা যদি এর বিপরীত হয় যে, কাজ করার লোকের খুব অভাব। শ্রমিকের সরবরাহ কম; কিন্তু চাহিদা বেশি। এমতাবস্থায় শ্রমিকের পারিশ্রমিক বেড়ে যাবে।

আমাদের দেশে যেহেতু বেকার মানুষের সংখ্যা বেশি, সেজন্য বেতন কম। ইংল্যান্ড গিয়ে দেখুন, ওখানে শ্রমিকের বেতন-ভাতা আকাশছোঁয়া। আমরা বিলাসিতার সঙ্গে জীবন যাপন করছি। ঘরে কাজ করার জন্য লোক রাখা আছে। কিন্তু ওই দেশে যদি কেউ লোক রেখে ঘরের কাজকর্ম করাতে যায়, তা হলে তাকে দেউলিয়া না হয়ে উপায় থাকবে না। কারণ, ওই দেশে শ্রমের মূল্য খুব বেশি। বেতন-ভাতা অনেক বেশি। তার কারণ হলো, ওখানে শ্রমিকের সরবরাহ কম, চাহিদা বেশি।

তো জানা গেল, শ্রমিকের পাওনাও সরবরাহ ও চাহিদার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

চতুর্থ বিষয়টি হলো উন্নতি (Development)

তো আপনি যখন প্রতিজন মানুষকে মুনাফা অর্জনের জন্য স্বাধীন ছেড়ে দিলেন, তখন তারা বাজারে এমন পণ্যগুলো আনার চেষ্টা করবে, যেগুলো বেশি চিত্তাকর্ষক, মানুষের জন্য বেশি উপকারী ও অধিক লাভজনক হবে।

এক ব্যক্তি গাড়ি তৈরি করছে এবং বছরের-পর-পর ধরে একই ধরনের গাড়ি তৈরি করছে। তা হলে মানুষ তার কারখানার প্রতি অনীহ ও বিরক্ত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সে চাইবে, আমি গাড়িটিকে এমন তৈরি করব, যার ফলে মানুষের কাছে অধিক মূল্য হাঁকাতে পারি। ফলে সে তার মধ্যে কোনো-না-কোনো নতুনত্ব আনার চেষ্টা করবে। আল্লাহপাক মানুষকে আবিষ্কারের যে যোগ্যতা দান করেছেন, তাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ নতুন-নতুন জিনিস তৈরি করছে। ফলে উন্নতি আপনা-আপনিই হয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি মানুষকে অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হয়, তা হলে মানুষ নিত্যই নতুন-নতুন জিনিস তৈরি করবে। আপনি বাজারে চোখ বুলিয়ে দেখুন, এটি-ই হচ্ছে। প্রতি দিনই নতুন-নতুন জিনিস বাজারে আসছে। তা এ কারণে যে, ভোক্তারা চাচ্ছে, নিত্য বাজারে নতুন-নতুন পণ্য আসুক। এভাবে দিন-দিন উন্নতি হচ্ছে।

সারকথা এই দাঁড়াল যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দর্শনে অর্থনীতির সবগুলো সমস্যার সমাধানের জন্য একটি-ই জাদুর কাঠি। আর তা হলো, সরবরাহ ও চাহিদা নামক বাজারশক্তি, যার আরেক নাম Market Mechnism।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূলকথা

পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূলকথা তিনটি।

১. ব্যক্তিমালিকানার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। মানে প্রতিজন মানুষের মালিকানা স্বীকার করে নেওয়া।

২. মুনাফা অর্জনের জন্য মানুষকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া এবং

৩. রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না করা। অর্থাৎ- রাষ্ট্র ব্যবসায়ীদের উপর কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করবে না; বরং তাদেরকে পুরোপুরি স্বাধীন ছেড়ে দেবে যে, তোমরা যেভাবে পার কামাও।

জমির ভাড়া, শ্রমিকের বেতন, পুঁজির সুদ এসব নির্ধারণ করবে বাজারশক্তি, তথা চাহিদা ও সরবরাহ। এই তিন খাতের ব্যয়ের পর যা উদ্বৃত্ত থাকবে, তার নাম মুনাফা। এই মুনাফার অধিকারী হবে মালিক। এই পরিমাণও পরোক্ষভাবে বাজারশক্তি নির্ধারণ করে দেবে।

আরও একটি বিষয় বোঝা দরকার। তা হলো, আপনি যখন আপনার উৎপাদিত পণ্য নিয়ে বাজারে যাবেন, তখন ওখানে আপনি যা মূল্য পাবেন, সরবরাহ ও চাহিদার উপর ভিত্তি করেই পাবেন। তারপর উল্লিখিত তিন খাতে ব্যয় করার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তাও মূলত চাহিদা-সরবরাহেরই ক্যারিশমা।

এ হলো পুঁজিবাদী অর্থনীতির দর্শনের খোলাসা।

এবার আসুন, সমাজবাদী ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (Socalism)

সমাজতন্ত্র মাঠে এল। সে বলল, জনাব, আপনি অর্থনীতির এমন গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়টিকে চাহিদা ও সরবরাহের অন্ধ ও বধির শক্তিগুলোর হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি বলেছেন, প্রতিটি কাজ এরই মাধ্যমে সমাধা হবে। এটি খুবই মারাত্মক চিন্তা।

সমাজতন্ত্র এর বিরুদ্ধে দুটি মৌলিক সমালোচনা করেছে।

পুঁজিবাদের উপর সমাজবাদের আপত্তি ও সমালোচনা

সমাজবাদ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এই আপত্তি উত্থাপন করেছে যে, আপনি বলছেন, প্রতিজন মানুষ বাজারে সেই জিনিসগুলোই আমদানি করবে, বাজারে যার চাহিদা বেশি। আর চাহিদা যখন সরবরাহের সমান হয়ে যাবে, তখন পণ্য উৎপাদন করা ছেড়ে দেবে। কারণ, এই অবস্থায় পণ্য উৎপাদন করলে তোমার মুনাফা কম হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই রেখা কোনটি, যেখানে পৌঁছে চাহিদা ও সরবরাহ সমান-সমান হবে? প্রতিজন মানুষের কাছে স্বয়ংক্রিয় কোনো মিটার আছে নাকি, যার দ্বারা সে বুঝতে পারবে, এখন চাহিদা আর সরবরাহ সমান-সমান হয়ে গেছে; কাজেই এখন আর পণ্য উৎপাদন করার দরকার নেই। নাকি অদৃশ্য থেকে কোনো ফেরেশতা এসে বলে যাবে, এই তোমরা শোনো, তোমাদের চাহিদা আর সরবরাহ সমান-সমান হয়ে গেছে; আর পণ্য তৈরি করো না।

তো না কোনো মিটার আছে, না এমন কোনো অদৃশ্য শক্তি আছে, যে এসে ব্যবসায়ীকে বলে দেবে, আর পণ্য উৎপাদনের আবশ্যকতা নেই। তার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, ব্যবসায়ী তার পণ্য উৎপাদন করতে থাকে। তার খবরও নেই যে, চাহিদা আর সরবরাহ সমান-সমান হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হলো, চাহিদা আর সরবরাহ সমান-সমান হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যবসায়ী এ ব্যাপারে পুরোপুরি অন্ধকারে আছে – এ ব্যাপারে তার কোনোই খবর নেই। ফলে

হাজার-হাজার টন পণ্য তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত তৈরি করে ফেলেছেন। তারপর তার হুঁশ এল, আরে, মাল তো বেশি বানিয়ে ফেলেছি! বাজারে দাম পড়ে যেতে শুরু করেছে! বাজার মন্দা হয়ে গেছে। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। দাম এত কমে গেছে যে, উৎপাদনব্যয়টুকুও উঠে আসছে না। তিনি বললেন, কারখানা বন্ধ করে দাও।

কারখানা বন্ধ হয়ে গেল।

আর কারখানা বন্ধ হওয়া মানে হাজার-হাজার শ্রমিক বেকার হওয়া। ফল এই দাঁড়াল যে, সমাজে বেকারত্ব বেড়ে গেছে। অর্থনীতির পরিভাষায় এর নাম মন্দা। এটি এমন এক মারাত্মক এবং এত বড় আপদ যে, অর্থনৈতিক ব্যধিগুলোর মধ্যে সম্ভবত এর চেয়ে বড় ও এত মারাত্মক আপদ দ্বিতীয়টি নেই।

আজকাল মানুষ মনে করে, মূল্যস্ফীতি সব চেয়ে বড় আপদ। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বাজার মন্দা হয়ে যাওয়া এর চেয়েও বড় আপদ। এর ফলে একটি দেশ অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। মিল-ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যায়। হাজার-হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে যায়।

তো বাজার মন্দা হয়ে গেল। মানুষ সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করল, কারখানা খোলা যাবে না। কারণ, এখানে লোকসান হয়। পণ্য যা ছিল, সস্তায় বিক্রি হয়ে গেল। এমনকি বাজারে সরবরাহ কমে গেল। কারণ, নতুন উৎপাদন বন্ধ। কেউ নতুন করে পণ্য উৎপাদন করতে সাহস পাচ্ছে না। ফলে সময়ের ব্যবধানে বাজারে পণ্যের ক্রাইসিস দেখা দিল আর চাহিদা বেড়ে গেল। ব্যবসায়ী বলছে, না, আমি কাপড়ের কারখানা দেব না। কারণ, তাতে লস খেয়ে আমি সর্বশান্ত হয়ে গেছি। ভোক্তারা বাজারে কাপড় খুঁজছে; কিন্তু পাচ্ছে না।

তারপর কিছুলোক এল। তারা ভাবল, এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন বাজারে চাহিদা বেড়ে গেছে। চলো, আমরা কারখানা করি। কিন্তু যেহেতু মধ্যখানের সময়টি কাটে চরম ভারসাম্যহীনতার মধ্য দিয়ে। যেখানে অন্তত দশ-বিশটি বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। তাতে দেশ অর্থনৈতিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। বাজারে মন্দা চলে আসে। আল্লাহ জানেন, আরও কত কী হয়।

আর এই যে, আপনি বললেন, চাহিদা ও সরবরাহশক্তি-ই নির্ধারণ করে দেবে, কোন পণ্যটি উৎপাদন করবে আর কোনটি উৎপাদন করবে না, আমার প্রশ্ন হলো, এই নির্ধারণের অর্থ কী? দীর্ঘ একটি সময় এমনভাবে কেটে যায়, যে সময়টিতে বাজারে এই চাহিদা ও সরবরাহের মাঝে সীমাহীন অসমতা বিরাজ করে থাকে। ফলে পরবর্তী সময়ে যখন মানুষ পুনরায় পণ্য উৎপাদন করতে শুরু করে, তখনও আগের মতো বেশি বানাতে শুরু করে। কাজেই বাজারের চাহিদা সরবরাহশক্তিকে নিয়ন্ত্রক মনে করার আপনাদের এই দর্শন ভুল প্রমাণিত হলো।

আরেকটি কথা হলো, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষকে একটি পণ্য ও ভেড়া-বকরির মতো মনে করা হয়েছে। তা এভাবে যে, আপনি বলছেন, একজন শ্রমিকের পারিশ্রমিকও বাজার ঠিক করে দেবে। তার অর্থ হলো, বাজারে যদি শ্রমিক বেশি হয়, তা হলে শ্রমের দাম কম হবে। কিন্তু আপনি একথাটি বলছেন না, শ্রমিক যদি এক টাকা রোজে কাজ করতে রাজি হয়ে যায়, তা হলে এই এক টাকা দিয়ে সে নিজেই বা কী খাবে আর পরিজনকেই বা কী খাওয়াবে। কোথায়ই বা বাস করবে। অথচ আপনি বলছেন, চাহিদা আর সরবরাহ এই দুয়ে মিলে শ্রমিকের পাওনা ঠিক করে দিল তো ব্যস, আর কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু শ্রমিক বেচারা সারাটা দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আপনার কাজ করছে আর সন্ধ্যায় পায় এক টাকা। আপনি বলছেন, এটা একদম সঠিক। এটি একটি অমানবিক দর্শন যে, আপনি মানুষকে ভেড়া-বকরির মতো সরবরাহ ও চাহিদার অনুগামী বানিয়ে দিয়েছেন।

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজবাদীদের তৃতীয় অভিযোগটি হলো, আপনি 'ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন' তথা 'উৎপাদনে কার্যকরী শক্তি' চারটি নির্ধারণ করেছেন। জমি, পুঁজি, শ্রম ও ঝুঁকি মাথায় নিয়ে পণ্যটি উৎপাদনকারী ব্যক্তি। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে 'ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন' মাত্র দুটি। জমি আর শ্রম।

জমি কোনো মানুষের মালিকানা নয়। এটি প্রকৃতির দান। মানুষ যখন দুনিয়াতে আগমন করেছে, তখনই প্রকৃতি সমস্ত মানুষের জন্য জমি দান করেছে। কাজেই সমস্ত জমির মালিকানা যৌথ। কাজেই কোনো মানুষের এই অধিকার নেই যে, সে বলবে, এটি আমার জমি; আমি এর এত টাকা ভাড়া নেব। জমি হলো প্রকৃতির দান আর মানুষ তাতে শ্রম খাটায়, যার ফলে ফসল অস্তিত্ব লাভ করে।

আর এই পুঁজি কোথা থেকে এল? প্রথম মানুষটি যখন পৃথিবীতে অবতরণ করেছিল, তখন তার কাছে কিছুই ছিল না। শুধু জমি ছিল। সে জমিতে শ্রম খাটিয়ে গম উৎপন্ন করেছে। তো এই গম জমি আর শ্রমের দ্বারা অস্তিত্বে এসেছে। না কোনো পুঁজি ছিল, না কোনো মহাজন ছিল। আর সেজন্যই আমাদের দৃষ্টিতে উৎপাদনের কার্যকরী শক্তি দুটি। জমি আর শ্রম। জমির ভাড়ার কোনো হকদার এজন্য নেই যে, এটি প্রকৃতির দান। এখানে কারও কোনো মালিকানা নেই। তবে শ্রমিক পারিশ্রমিকের হকদার। কাজেই এই যে আপনি আর অতিরিক্ত দুটি কার্যকরী শক্তি বানিয়ে রেখেছেন, এটি সঠিক হয়নি। আপনার জমির ভাড়া, পুঁজির সুদ আর মহাজনের মুনাফা বৈধ নয়।

বৈধ হলো শ্রমিকের মজুরি। আর এই ব্যক্তি মূলত আয়ের পাওনাদার। কিন্তু আপনি তাকে সরবরাহ ও চাহিদার অনুগামী বানিয়ে দিয়েছেন আর তার

প্রাপ্য যতই কম হোক-না কেন, তাতে আপনার কিছু যায় আসে না। অথচ আসল পাওনাদার সে-ই ছিল। কাজেই আপনার এই দর্শন নির্বোধের দর্শন। এর কোনোই গ্রহণযোগ্যতা নেই। এটি চরম অবিচারমূলক থিওরি।

তা হলে সঠিক কোনটি?

সমাজবাদীদের দাবি হলো, সঠিক দর্শন হলো, কোনো জমি, কোনো উপকরণ, কোনো উৎপাদন কোনো ব্যক্তির মালিকানায় থাকবে না। না জমির কোনো ব্যক্তিমালিকানা থাকবে, না কারখানার কোনো ব্যক্তিমালিকানা থাকবে। হওয়া দরকার এই– দেশের সমস্ত জমির মালিক থাকবে সরকার। কারখানাও সরকারের মালিকানায় থাকবে। তারপর অর্থনীতির চার মৌলিক সমস্যার সমাধানও সরকার দেবে। অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ (Determination Of Priorities), উপকরণ বিভাজন (Alocation Of Resources), আয় বণ্টন (Distribution Of Income) ও উন্নতি (Development) এর সবকটি বিষয়ই পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকার ঠিক করে দেবে। অর্থাৎ– সরকার পরিকল্পনা ঠিক করবে, আমাদের দেশে জনসংখ্যা কত, মাথাপিছু কী পরিমাণ গম দরকার, কী পরিমাণ চাল দরকার, জনপ্রতি কত গজ কাপড় দরকার, কী পরিমাণ চা দরকার ইত্যাদি। তারপর সরকার দেখবে আমাদের কাছে কী পরিমাণ জমি আছে। এবার পরিকল্পনার মাধ্যমে ঠিক করবে, কী পরিমাণ জমিতে গম চাষ করতে হবে, কী পরিমাণ জমিতে ধান চাষ করতে হবে, কোন পণ্য উৎপাদনের জন্য কতটি কারখানা স্থাপন করতে হবে। তারপর যা আয় হবে, সবটুকু শ্রমিকদের মাছে বণ্টন করে দাও। না সুদ, না ভাড়া, না মুনাফা।

তো সমাজতন্ত্রের দর্শন হলো, দেশের সমস্ত জমি ও সমস্ত মিল-ফ্যাক্টরি সরকার তার মালিকানায় নিয়ে নেবে। তারপর পরিকল্পনার মাধ্যমে 'অগ্রগণ্যতা' নির্ধারণ করবে, উপকরণ বিভাজন করবে ও আয় বণ্টন করবে। আবার উন্নয়ন-উন্নতির বিষয়টিও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাধা হবে।

এ হলো সমাজতন্ত্রের দর্শন। এ কারণেই সমাজতন্ত্রের আরেক নাম Planned Economy বা 'পরিকল্পিত অর্থনীতি'। আর পুঁজিবাদের অপর নাম Market Economy বা 'বাজার অর্থনীতি'। কারণ, এখানে বাজারের কল্পনা আছে; কিন্তু সমাজতন্ত্রে বাজারের কল্পনা নেই। সেটি নিছক নামের বাজার। কারণ, ওখানে কারখানাগুলো সরকারের। উৎপাদিত পণ্যগুলোর দাম সরকার নির্ধারণ করে দিয়েছে। যে লোকটি সেগুলো বিক্রি করতে বাজারে গিয়ে বসেছে, সে তার মালিক নয় – সরকারের কর্মচারী। মূল্য নির্ধারিত। দাম-দর করার প্রশ্ন নেই। বরং সরকার যে মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেই মূল্যেই ক্রয় করতে

হবে। নিলে নাও, না নিলে যাও। কাজেই এখানে সেই বাজারের কোনো কল্পনা নেই, যার সঙ্গে আমরা পরিচিত যে, দর-দাম হচ্ছে, যাচাই-বাছাই হচ্ছে, প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এমনটি নয়। সেজন্য এই অর্থনীতিকে Planned Economy বা 'পরিকল্পিত অর্থনীতি' বলা হয়।

এ কারণেরই যেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালু থাকে, সেখানে প্রতিজন মানুষ নিজ-নিজ উৎপাদিত পণ্যকে বাজার খাওয়ানোর জন্য নানা রকম পন্থা অবলম্বন করে থাকে। প্রচারণা চালায়, বিজ্ঞাপন ছাপে, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে, জায়গায়-জায়গায় বিলবোর্ড স্থাপন করে। কিন্তু যে দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত, সেখানে আপনি এসবের কিছুই দেখতে পাবেন না। না ওখানে বোর্ড আছে, না ওখানে বিজ্ঞাপন আছে। কারণ, এসবের কারও প্রয়োজন হয় না। কেননা, কোনো জিনিসে কারও ব্যক্তিমালিকানা নেই। বাজারে যা-কিছু বিক্রি হচ্ছে, আপনি বাজারে গেলেই তা দেখতে পাবেন। কাজেই গিয়ে দেখুন, কোনটা আপনার পছন্দ হয়। মূল্য গায়ে লেখা আছে। দেখে নিন। পছন্দ হলে নিন, না হলে নিবেন না। এজন্য ওখানে বাজারের কোনো কল্পনা নেই। আর সেজন্যই এই ব্যবস্থার নাম Planned Economy। আর পুঁজিবাদেরটার নাম Market Economy।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা

সমাজতন্ত্র যে দর্শন উপস্থাপন করেছে, তাতে মৌলিক ভুলটি হলো, তারা মনে করে, অর্থনীতির যত সমস্যা আছে, তার সবগুলোর সমাধান হলো, উৎপাদনের যত উপকরণ আছে, সবগুলোকে রাষ্ট্রের মালিকানায় নিয়ে সরকার পরিকল্পনা ঠিক করে দেবে। বলা বাহুল্য, এটি একটি কৃত্রিম, কাল্পনিক ও পশ্চাদপদ পদ্ধতি। অর্থনীতি মানবজীবনের অসংখ্য সমস্যার মধ্য থেকে একটি সমস্যা। আর আল্লাহপাক এই দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাকে এমন বানিয়েছেন যে, এখানে পছন্দ-অপছন্দের সিদ্ধান্ত পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে হতে পারে না।

যেমন– বিবাহ। এখানে পুরুষের পছন্দনীয়া একজন নারী দরকার। আবার নারীরও তার পছন্দ অনুসারে একজন পুরুষ আবশ্যক। তো এখানে যা ঘটে, তা হলো, মানুষ একজন অপরজনের অনুসন্ধান চালাতে থাকে। পরে একটি পর্যায়ে গিয়ে কথাবার্তার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। কিন্তু অনেক সময় এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে ভুলও হয়ে যায় এবং সম্বন্ধ সঠিক হয় না। ফলে পরস্পর অমিল হয়ে যায় এবং সংসার অশান্তিময় হয়ে ওঠে।

এখন যদি কেউ বলে, নিজেরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বলে এই অশান্তি ও অমিলের ঘটনা ঘটছে; কাজেই এই পদ্ধতি বাদ দিয়ে পরিকল্পনা ঠিক করে নাও, দেশে

কতজন পুরুষ আছে আর কতজন নারী আছে। তারপর পরিকল্পনা অনুসারে তাদের বিবাহ দাও। বলা বাহুল্য যে, এই রীতি সমাজে চলতে পারে না। অর্থনীতির বিষয়টিও ঠিক এ রকম। অর্থনীতির ব্যাপারটিও একই রকম। এ ক্ষেত্রেও এক-একজন মানুষের স্বভাব ও রুচি এক-এক রকম হয়ে থাকে। আর প্রত্যেককে আপন-আপন স্বভাব ও রুচিকে কাজে লাগিয়ে জীবনযাত্রা পরিচালনা করতে হয়।

এমতাবস্থায় যদি পরিকল্পনা ঠিক করে দেওয়া হয় যে, তুমি অমুক কারখানায় কাজ করবে কিংবা জমিতে কাজ করবে আর সেই কাজটি যদি তার স্বভাব ও রুচি অনুপাতে না হয়, তা হলে এই প্রক্রিয়ায় তার প্রতিভা ও যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। তার যোগ্যতা দ্বারা সঠিকভাবে কাজ আদায় করা যাবে না। মেজাজ-রুচি একরকম আর তাকে কাজে লাগানো হলো আরেক রকম। কঠোর বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকে এই ব্যবস্থা চলতেও পারে না।

যেমন– এক ব্যক্তিকে তুলার কারখানায় কাজে নিযুক্ত করা হলো যে, যাও ওখানে গিয়ে কাজ করো। কিন্তু তার মন ওখানে কাজ করতে রাজি নয়। ওখান থেকে সে পালাতে চায়। এমতাবস্থায় তাকে ধরে রাখতে প্রবল চাপ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। ওখানে তাকে হাত-পা বেঁধেই তবে ধরে রাখতে হবে। কাজেই প্রমাণিত হলো, প্রবল চাপ আর চরম বাধ্যবাধকতা ছাড়া এই ব্যবস্থা চলতে পারে না। এই চাপ তৈরি করে কাজ আদায় করার মতো বহু মতবাদ দুনিয়াতে এসেছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের মতো এত চাপের মতবাদ আর একটাও আসেনি।

সারকথা হলো, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতা পুরোপুরি রহিত হয়ে যায়। আর তার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, যখন একজন মানুষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া হয় আর তাকে বাধ্য করা হয়, তখন আর সে আগ্রহের সঙ্গে কাজ করতে পারে না। এটি একটি স্বভাবজাত বিষয় যে, যখন কোনো বিষয়ের সঙ্গে মানুষের স্বার্থের সম্পর্ক তৈরি হয়, তখন তার প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়ে যায়। আর যদি তার সঙ্গে লোকটির কোনো স্বার্থের সম্পর্ক না থাকে, তা হলে তাতে আর কোনো আগ্রহ থাকে না। তো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেহেতু কোনো সম্পদে নাগরিকের ব্যক্তিমালিকানা নেই, সেজন্য তার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, যত মানুষ কাজ করে, সবাই সর্বাবস্থায় বেতন পায়। শিল্পের উন্নতি হোক আর না হোক। কাজেই এই অবস্থায় মানুষ কেন বাড়তি পরিশ্রম করবে? কেন মানুষ বাড়তি সময় ব্যয় করবে? ফল এই দাঁড়ায় যে, মানুষের আগ্রহ অবশিষ্ট থাকে না। তারা যন্ত্রের মতো সময় মেপে ডিউটি করে যায় শুধু।

সেজন্যই আপনারা আপনাদের দেশ পাকিস্তানেই দেখুন, ভুট্টো সাহেবের শুরু আমলে তিনি অনেকগুলো মিল-কারখানা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে

নিয়েছিলেন। কিন্তু যতগুলো কারখানা তিনি রাষ্ট্রের মালিকানায় এনেছিলেন, সবগুলোই ডুবেছে। সব কটি প্রতিষ্ঠানই লোকসানে পড়েছে। ভুট্টো ছাহেব লোকসান গণনা করেছেন। আর এখন সেগুলোকে নিলাম করে ব্যক্তিমালিকানায় দিয়ে দিতে সরকার বাধ্য হচ্ছে।

বর্তমানে আমাদের দেশে ইউনাইটেড ব্যাংকের বেশ দুর্দিন চলছে (যেটি কিনা হাবীব ব্যাংকের পর দ্বিতীয় স্তরের ব্যাংক ছিল)। এখন তার অবস্থা হলো, ব্যাংকটি দেউলিয়া হতে চলেছে এবং তাকে ব্যক্তিমালিকানায় দিয়ে দেওয়ার চিন্তা চলছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে আমরা এই চিত্রই প্রত্যক্ষ করছি। কারণ, দোকানদারের এই ভাবনা নেই যে, বিক্রি বেশি হচ্ছে, না কম হচ্ছে। উভয় অবস্থায়ই তার বেতন সমান – যা নির্ধারিত আছে, তা। কাজেই সেল বেশি হলেই তার কী আর কম হলেই তার কী। হলেও যা, না হলেও তা। সেজন্য ক্রেতা আকর্ষণে তার কোনোই ভাবনা থাকে না।

আলজেরিয়ার একটি চাক্ষুষ ঘটনা

ঘটনাটি আমার নিজের। ঘটেছে আলজেরিয়ায়। আল্লামা তাহির ইবনে আশুর-এর একটি তাফসীর গ্রন্থ আছে التنوير و التحرير (আত তানবীর ওয়াত তাহরীর)। আমার এই কিতাবটি ক্রয় করার প্রয়োজন ছিল। বিকাল পাঁচটার দিকে আমি এক দোকানে গেলাম। বললাম, ভাই! আমি এই কিতাবটি ক্রয় করতে চাই। কিন্তু আমার কাছে আলজেরিয়ার মুদ্রা নেই – আছে ইউএস ডলার। আপনি দয়া করে দোকানটা আর কিছু সময় খোলা রাখুন; আমি ডলারগুলো ভাঙিয়ে আনি। কিন্তু সে উত্তর দিল, ঠিক পাঁচটার সময় দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর আর আমি অপেক্ষা করতে পারব না। আমি বললাম, আমাকে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দিন; আমি যাব আর আসব। বলেই আমি চলে গেলাম। যখন ফিরলাম, তখন পাঁচটা বেজে এক-দু-মিনিট হয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। সেই আলজেরীয় নোটগুলো এখনও আমার কাছে পড়ে আছে। কিতাবটি আর কেনা হয়নি। এখন আর এগুলোর আমার কাছে কোনো মূল্য নেই। যদি আবার কখনও আলজেরিয়া যাওয়া হয়, তখন ব্যবহার করতে পারব।

এটি একটি ঘটনা, যেটি আমি আপনাদের সম্মুখে ব্যক্ত করেছি। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর এটিই বাস্তব চিত্র যে, দোকানদারদের ক্রেতা আকর্ষণে কোনোই ভাবনা নেই। কারণ, মাল বেশি বিক্রি হলো, না কম হলো, এর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা চাকুরি করে আর বেতন নেয়। তার ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে, যে কটি রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রকে বরণ করে নিয়েছিল, চুয়াত্তর

বছরের মাথায় তারা সবাই হাতে-নাতে এর কুফল পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্র ছাড়তে তারা বাধ্য হয়েছে। অপর দিকে বলা হয়েছিল, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মানুষ উৎপাদন-উপকরণের উপর কব্জা প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। তারা জমির উপর, মিল-কারখানার উপর, মানুষের উপর অবিচার করছে। কিন্তু আমরা যদি একটু গভীরভাবে তাকাই, তা হলে দেখতে পাব, আগে জুলুমকারীর সংখ্যা ছিল হাজারে-হাজারে। কিন্তু সমস্ত সম্পদ যখন গুটিয়ে সরকারের হাতে চলে এল, তখন তার অর্থ এই দাঁড়াল যে, দেশের সমুদয় সম্পদ এখন গুটিকতক অফিসারের মুঠোয়।

তো এই লোকগুলো যখন বিপুল পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হলো, তখন তাদের অন্যায়-অপরাধ ও দুর্নীতি বাড়তে শুরু করল। কারণ, আগে একজন মানুষ একটি কারখানার মালিক হয়ে কিছু মানুষের উপর জুলুম করত আর এখন ছোট-ছোট মালিকের পরিবর্তে একটি দল গোটা দেশের জনগণের উপর জুলুমের স্টীমরোলার চালাচ্ছে। তো এই নীতির বাস্তবায়নের ফলে ছোট-ছোট পুঁজিপতির পতন ঘটবে বটে; কিন্তু তাদের সব কজনের জায়গায় এমন কিছু লোক জেঁকে বসবে, যারা সম্পদের এই বিশাল ভাণ্ডারটিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করবে। যেহেতু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের স্বভাব-রুচিকে বিবেচনায় রাখা হয়নি, তাই এই ব্যবস্থা চুয়াত্তর বছরের মাথায় মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এই অর্থব্যবস্থাটির পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই হয়ে গেছে। প্রমাণিত হয়ে গেছে, এই মতবাদটি একটি ভুল থিওরি ছিল।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার পর্যালোচনা

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ভুলগুলো বুঝতে হলে খানিক সূক্ষ্মদৃষ্টি আবশ্যক। কারণ, পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং এর ভিত রচিত হয়েছে বাজারশক্তির উপর – চাহিদা ও সরবরাহশক্তির উপর। এই দর্শন মৌলিকভাবে ভুল নয় এবং কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা এই নীতির সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন– পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন :

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

'আমি পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দিয়েছি এবং আমিই তাদের একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, যাতে তাদের একে অন্যের দ্বারা কাজ নিতে পারে।'[৪৩]

---

৪৩. সূরা যুখরুফ : ৩২

আমি মানুষের মাঝে তাদের জীবিকাকে বণ্টন করে দিয়েছি। আর তাদের একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, যাতে তারা একজন আরেকজনের দ্বারা কাজ নিতে পারে। এর সারমর্ম হলো, আমি এমন একটি ব্যবস্থাপনা ঠিক করে দিয়েছি যে, বাজারে গিয়ে নানা মানুষ স্বভাব ও রুচি অনুপাতে নানাজনের চাহিদা পূরণ করে দেয়। এই বক্তব্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে, বাজারে সরবরাহ ও চাহিদার ব্যবস্থাপনা আমি ঠিক করে দিয়েছি।

এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

'শহরের কোনো লোক যেন গ্রামের কোনো ব্যক্তির পণ্য বিক্রি না করে।'[৪৪]

এক হাদীসের ভাষ্য হলো, নবীজি বলেছেন :

دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ

'তোমরা লোকদেরকে ছেড়ে দাও। আল্লাহপাক তাদের একজন দ্বারা আরেকজনকে জীবিকা দান করে থাকেন।'[৪৫]

মধ্যখানে হস্তক্ষেপ করো না। এসব বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইসলাম বাজারশক্তিকেও মেনে নিয়েছে। ব্যক্তিমালিকানাও মেনে নিয়েছে। মুনাফার সঞ্চালককেও মেনে নিয়েছে যে, মানুষ নিজের মুনাফার জন্য কাজ করবে।

তো বাহ্যত পুঁজিবাদের এই মৌলদর্শন ভুল নয়। কিন্তু সমস্যাটি হলো এখানে যে, সে বলে দিয়েছে, ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের জন্য মানুষকে স্বাধীন ছেড়ে দাও, যাতে সে যেভাবে খুশি উপার্জন করতে পারে। একাজে তার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। তার ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে, একজন মানুষ যখন মুনাফা অর্জন করতে ইচ্ছা করে, তখন যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। ইচ্ছে হলে তুমি সুদের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করো। মন চাইলে জুয়ার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করো। ইচ্ছে হলে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করো। এখানে হালাল-হারামের কোনো ভেদাভেদ নেই। যার যেভাবে খুশি অর্থ উপার্জন করতে পারে।

---

৪৪. সহীহ বুখারী কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং-২০১৩; সহীহ মুসলিম কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং-২৭৯০; সুনানে তিরমিযী কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং-১১৪৩; সুনানে নাসায়ী কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং-৪৪১৯; সুনানে আবুদাউদ কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং-২৯৮৩; সুনানে ইবনে মাজা কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং-২১৬৬; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং-৭০১১

৪৫. সহীহ মুসলিম কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং-২৭৯৯; সুনানে তিরমিযী কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং-১১৪৩; সুনানে নাসায়ী কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং-৪৪১৯; সুনানে ইবনে মাজা কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং-২১৬৭; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং-১০২৩৭

কোনো চারিত্রিক বিধিবিধানও এখানে নেই। কাজেই নগ্ন ফিল্ম তৈরি করো। তাতে অনেক মুনাফা পাওয়া যাবে। এরই ফলে নগ্ন পত্রিকা আর নগ্ন ফিল্মে পুরো পশ্চিমা জগত ছেয়ে আছে।

মডেলগার্লদের কার্যকলাপ

কিছুদিন আগে আমেরিকান পত্রিকা টাইম্স-এ তথ্য বেরিয়েছিল, আমেরিকায় সেবার জগতে সব চেয়ে বেশি উপার্জনকারী শ্রেণীটি হলো মডেলগার্ল। এক-একজন মডেলগার্ল রোজ কয়েক মিলিয়ন ডলার উপার্জন করে। তো উপার্জনের সবগুলো পদ্ধতি-ই যখন বৈধ হয়ে গেল, তখন আর হালাল-হারামের কোনো ভেদাভেদ থাকল না। বৈধ-অবৈধ, উচিত-অনুচিত, নৈতিকতা-অনৈতিকতার মাঝে কোনো পার্থক্য থাকল না।

সম্ভ্রম বিক্রির সাংবিধানিক স্বীকৃতি

সম্ভ্রম বিক্রির ফলাফল এই দাঁড়াল যে, পাশ্চাত্যের অনেক দেশে এই ব্যবসার সাংবিধানিক স্বীকৃতি আছে। সম্প্রতি লসএনজেলস-এ সম্ভ্রমব্যবসায়ী নারীদের একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সেই কনফারেন্সে দাবি উত্থাপন করা হয়েছে, যেসব রাষ্ট্র এখনও এই পেশার লাইসেন্স প্রদান করেনি, তারা যেন আর কালক্ষেপন না করে এর লাইসেন্স দিয়ে দেয়।

তো প্রতিজন মানুষ যখন মুনাফা অর্জনের বেলায় স্বাধীন এবং এই উপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই, তখন মানুষ যার যে পদ্ধতি খুশি সে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করবে এটাই স্বাভাবিক।

টাইম্স পত্রিকা এক আন্তর্জাতিক মডেলগার্ল সম্পর্কে লিখেছে, এই নারী অন্যান্য দেশের বিভিন্ন কোম্পানীর সঙ্গেও মডেলিং করে। তার এই মডেলিং-এর ফি আলাদা। অন্য দেশে যাওয়া-আসার প্রথম শ্রেণীর টিকিট খরচ পায় আলাদা। ফাইভ স্টার হোটেলে থাকার খরচ আলাদা। চুক্তিটি এভাবে হয় যে, তিন বছর পর্যন্ত সেই কোম্পানী যত পণ্য উৎপাদন করবে, তার থেকে উক্ত মডেলকন্যা যা চাইবে, তা-ই তাকে বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। এ জাতীয় শর্তে চুক্তি সম্পাদিত হয়। তার ফলে কোম্পানীর উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বেশি পড়ে যায় আর সেই মূল্য পরিশোধ করে সাধারণ মানুষ।

এভাবে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের পকেট খালি করার সব ধরনের ব্যবস্থায়ই রাখা হয়েছে। গরিবের পকেটের অর্থ ধনীদের পকেটে চলে যাচ্ছে আর গরিব দিন-দিন নিঃস্ব-থেকে-নিঃস্বতর হচ্ছে। গরিবরা ধনীদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে। একদিকে ব্যবসার স্বাধীনতার নামে গণমানুষের

চরিত্র ধ্বংস করা হচ্ছে, অপর দিকে এই অশ্লীলতার বিষবাষ্প ছড়ানোর ব্যয়টাও গরিবদেরই পকেট থেকে খসিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বেচারা গরিব জনতা যখন সেই পণ্যটি ক্রয় করতে যায়, তখন তার থেকে উক্ত পণ্যটি উৎপাদনের সমুদয় অর্থ নিয়ে নেওয়া হয়। এর মধ্যে এই মডেলিংয়ের যাবতীয় ব্যয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। গরিব বেচারা বাধ্য হয়ে এসব পরিশোধ করে থাকে। এর মাধ্যমে কী পরিমাণ ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়, তার বলে বোঝানো সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে জুয়ার নানা পদ্ধতি সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। স্টক এক্সচেঞ্জে প্রতারণার বাজার গরম, যার ফলে সমগ্র পৃথিবীতে একটি ঝড় প্রবাহিত হচ্ছে। শেয়ার ব্যবসায় প্রতারণার শিকার হয়ে লাখ-লাখ মানুষ সর্বশান্ত হচ্ছে। তো যখন মানুষকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হলো, তখন সুদ, জুয়া ও প্রতারণার মাধ্যমে তারা নিজেদের একচেটিয়া অধিকার (Monopolies) প্রতিষ্ঠিত করে নিল। একচেটিয়া অধিকার মানে কোনো ব্যক্তি বিশেষ কোনো শিল্পে এমনভাবে নিজের দখল প্রতিষ্ঠিত করে নিল যে, মানুষ যখনই প্রয়োজন হয়, সেই পণ্যটি তারই থেকে ক্রয় করতে বাধ্য হয়ে পড়েছে। চাহিদা ও সরবরাহশক্তি সেখানে কাজ করে, যেখানে বাজারে স্বাধীন প্রতিযোগিতা (Free Competition) থাকে। একটি পণ্য দশ ব্যক্তির কাছে পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় যদি একজন মূল্য বেশি হাঁকায়, তা হলে ক্রেতারা তার কাছে না গিয়ে অন্যদের কাছে যাবে। কিন্তু যেখানে মানুষ বাধ্য হয়ে একই ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রয় করবে, সেখানে চাহিদা ও সরবরাহের শক্তিগুলো অকেজো হয়ে যায়। এই শক্তি সেখানে কাজ করে না। তখনই ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

সারকথা, মুনাফা অর্জনের জন্য যখন মানুষকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হলো, তারা বাজারে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে নিল। আর এর ফলে 'বাজারশক্তি' অকেজো হয়ে গেল আর কিছুলোক গোটা ব্যবসাকে দখল করে নিল। ধনী আরও ধনী হলো। গরিব আরও গরিব হতে চলল।

পৃথিবীর সর্বাধিক মাঙ্গা (দুর্মূল্যের) বাজার

আমেরিকার লস্এনজেলস-এ একটা বাজার আছে। এটি পৃথিবীর সর্বাধিক মাঙ্গা বাজার বলে খ্যাত। এক সঙ্গী আমাকে সেখানে নিয়ে গেল এবং একটা দোকান দেখিয়ে বলল, এটা পৃথিবীর সর্বাধিক মাঙ্গা দোকানগুলোর একটা। তাতে দেখলাম, মোজা আছে। জিজ্ঞেস করলাম, এর দাম কত? উত্তর পেলাম, এক জোড়া মোজার দাম দুশো ডলার। দুশো ডলার মানে প্রায় বারো হাজার পাকিস্তানি রুপী। সামনে একটা স্যুট ঝোলানো ছিল। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, কোনোটার দাম দশ হাজার ডলার, কোনোটার পনেরো হাজার।

অবশেষে সঙ্গী জানাল, আপনি দোকানের নিচ তলাটি ঘুরে-ফিরে দেখতে পারেন। কিন্তু উপর তলায় ততক্ষণ পর্যন্ত যেতে পারবেন না, যতক্ষণ-না দোকানের মালিক আপনাকে সঙ্গ দেবে। তার কারণ হলো, মালিক সঙ্গে গিয়ে আপনাকে পরামর্শ দেবে, আপনার স্বাস্থ্য, দৈহিক উচ্চতা ও রং-রূপ অনুপাতে কোন স্যুটটি আপনার জন্য মানানসই হবে। আর এই পরামর্শের জন্য আপনার থেকে দশ হাজার ডলার ফি নেবে। স্যুটের মূল্য এর বাইরে। শুধু পরামর্শ ফি দশ হাজার ডলার! শুধু এতটুকুই নয় – এর জন্য আপনাকে আগে তার থেকে সময় (Appointment) নিতে হবে। আর আবেদন জানানোর পর সিরিয়াল পেতে আপনাকে সাধারণত ছয় মাস অপেক্ষা করতে হবে।

ব্রিটেনের প্রিন্স চার্লস আমেরিকা সফরের প্রোগ্রাম করল। এই দোকান থেকে তার স্যুট ক্রয়ের সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু এ্যাপয়ন্টমেন্ট চেয়ে সিরিয়াল পেতে তাকে এক মাস অপেক্ষা করতে হয়েছে। ফলে সে এক মাস পর আমেরিকা এসেছে। এ হলো এই দোকানটির অবস্থা।

সর্বাধিক ধনী দেশগুলোতে সম্পদের প্রাচুর্য ও দরিদ্রতার সংমিশ্রণ

সেখান থেকে মাত্র এক মাইল দূরত্বে গিয়ে দেখলাম এর বিপরীত এক দৃশ্য। কিছু মানুষ কতগুলো ট্রলি নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। ট্রলিগুলো কোকাকোলা, সেভেন আপ, পেপসিকোলা ইত্যাদির খালি বোতলে ভরা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জানতে পারলাম, এই মানুষগুলো টোকাই। শহরের ডাস্টবিনগুলো থেকে বড়লোকদের ফেলে দেওয়া পাত্র, বোতল ইত্যাদি কুড়িয়ে নিয়ে ভাঙাড়ির দোকানে বিক্রি করে। তাতে যা অর্থ পায়, তা দ্বারা জীবন নির্বাহ করে। এদের কোনো বাড়ি-ঘর নেই। ঠিকানা নেই। রাতে রাস্তার ধারে ট্রলিগুলোকে দাঁড় করিয়ে তার তলে ঘুমিয়ে থাকে। শীতের মওসুমে এদের মাথা গোঁজার কোনো জায়গা থাকে না। সেজন্য পাতালরেলের স্টেশনগুলোতে এরা রাত কাটায়।

তো এক মাইল দূরে বিত্তের এই অপরিসীম প্রাচুর্য। আর এখানে দারিদ্রের এমন নিষ্ঠুর কষাঘাত। এই চিত্র ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসেরও। ফ্রান্স এখন ব্যবসা, শিল্প ও প্রযুক্তিতে আমেরিকার চোখে চোখ রেখে কথা বলার ক্ষমতাসম্পন্ন দেশ। কিন্তু এই দেশটিতেও হাজার-হাজার মানুষ এমন আছে, যাদের মাথা গোজার ঠাঁই নেই।

এটি মূলত পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতারই কুফল। এর মাধ্যমে ধনী ও গরিবের মাঝে বিশাল এক প্রাচীর দাঁড়িয়ে গেছে। অর্থবণ্টন

ব্যবস্থা অসম হয়ে গেছে। দর্শন তো সঠিকই ছিল যে, ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য মানুষ কাজ করবে। কিন্তু এভাবে অবাধ স্বাধীন ছেড়ে দেওয়ার ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে, মানুষ একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলামী বিধিবিধান

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, তোমাদের বাজারশক্তিও ঠিক আছে, ব্যক্তিমালিকানাও ঠিক আছে, ব্যক্তিমুনাফার সঞ্চালকও ঠিক আছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এসবকে হারাম-হালালের শিকলে বাঁধা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজে স্থিতিশীলতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ইসলামের আসল বৈশিষ্ট্যই হলো, সে হারাম-হালালে প্রভেদ তৈরি করে দিয়েছে যে, অর্থ উপার্জনের এই পন্থাটি হালাল আর এই পন্থাটি হারাম।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা দু-ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। একটি হলো খোদায়ী বিধিনিষেধ আর অপরটি রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ।

খোদায়ী বিধিনিষেধ

ইসলাম যে দুটি বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, আমি তার প্রথমটির নাম দিচ্ছি 'খোদায়ী বিধিনিষেধ'। মানে এই বিধিনিষেধ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত হারাম-হালালের বিধিনিষেধ। যেমন– ইসলামে সুদ হারাম। জুয়া হারাম। প্রতারণা হারাম। মাল ক্রয়ের পর হস্তগত করার আগে বিক্রি করা হারাম। এছাড়া আরও অনেক বিষয়কে হারাম ঘোষণা করার মাধ্যমে বাধ্য-বাধকতা আরোপ করেছে। আমরা যদি এই পাবন্দিগুলোতে চিন্তা করি, তা হলে জানতে পারব, আল্লাহপাক তাঁর সুগভীর প্রজ্ঞার আলোকেই এই নিষেধাজ্ঞাগুলো আরোপ করেছেন এবং এমন-এমন চোরা দরজাগুলোতে পাহারা বসিয়ে দিয়েছেন, যেখান থেকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অভিশাপগুলো শুরু হয়। ইসলাম এর দ্বারা অনাচারের দরজাগুলো সব বন্ধ করে দিয়েছে।

এগুলো হলো খোদায়ী বিধিনিষেধ।

সরকারি বিধিনিষেধ

দ্বিতীয় প্রকারের বিধিনিষেধ হলো, আল্লাহপাক যে বিধিনিষেধগুলো আরোপ করেছেন, অনেক মানুষ এমন থাকবে, যারা সেগুলোর কোনো পরোয়া করবে না এবং তার পরিপন্থী কাজ করবে কিংবা সমাজে কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি করবে, যার ফলে এসব বিধিনিষেধ যথেষ্ট নাও হতে পারে। তখন সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ইসলামী সরকারকে এই অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, সে কিছু বৈধ কাজের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে।

এগুলো হলো সরকারি বিধিনিষেধ।

'উসূলে ফিক্‌হ (ফিক্‌হ-এর মূলনীতি)-এর একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে, যার নাম سد ذرائع (প্রতিরোধ ব্যবস্থা)। এর অর্থ হলো, একটি কাজ মূলত বৈধ; কিন্তু তার আধিক্য কোনো পাপাচার কিংবা কোনো অনাচারের পথ উন্মুক্ত করছে। তা হলে সরকারের জন্য এটা বৈধ হবে যে, এই জায়েয কর্মটিকেও সাময়িক স্বার্থের অনুগামী বানিয়ে সাময়িকের জন্য নিষিদ্ধ করে দেবে।[৪৬]

ইসলামী সরকারের প্রণীত এ জাতীয় আইন মান্য করা অপরিহার্য হওয়ার পক্ষে পবিত্র কুরআনে প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

আল্লাহপাক বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা শাসক, তাদের আনুগত্য করো।'[৪৭]

যেমন– সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থায় বাজারে পণ্যমূল্য নির্ধারণের জন্য চাহিদা ও সরবরাহের শক্তিগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু যেখানে কোনো কারণে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, সেখানে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণেরও অধিকার আছে। এখানে এসে সরকার হস্তক্ষেপ করে মূল্য নির্ধারণ করে দেবে এবং ঘোষণা প্রদান করবে যে, অমুক পণ্যের মূল্য এত – এর কমও নয় – বেশিও নয়।

এই মূলনীতির আওতায় সরকার সমস্ত অর্থনৈতিক তৎপরতার প্রতি নজর রাখতে পারে এবং যেসব তৎপরতার কারণে অর্থনীতিতে অসমতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে, সেগুলোর উপর যৌক্তিক বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে।

কানযুল উম্মাল কিতাবে রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, হযরত উমর ফারূক (রাযি.) একদিন বাজারে গিয়ে দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি একটি পণ্য প্রচলিত দামের চেয়ে অনেক কমে বিক্রি করছে। ফলে তিনি বললেন :

إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا

'হয় দাম বাড়িয়ে দাও; অন্যথায় আমাদের বাজার থেকে উঠে যাও।'[৪৮]

বর্ণনায় একথা বলা হয়নি যে, হযরত উমর (রাযি.) কী কারণে লোকটির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। হতে পারে, তার কারণ এই ছিল যে, সে

---

৪৬. আ'লামুল মূকি'য়ীন ২/১৬০

৪৭. সূরা নিসা : ৫৯

৪৮. কানযুল উম্মাল ৪/৬৫; জামিউল উসূল ১/৪৩৭ : হাদীস নং–৪৩৪; আস-সুনানুস সুগরা লিল-বায়হাকী ২/১০৫ : হাদীস নং–২১০৮; মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার ৯/৪৭৬ : হাদীস নং–৩৬৬৮; মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক ৮/২০৭ : হাদীস নং–৪৯০৫

তার পণ্যটির মূল্য স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে অনেক কম হাঁকিয়ে অন্যদের জন্য বৈধ মুনাফার পথ বন্ধ করে দিচ্ছিল। আবার এও হতে পারে যে, এই নিষেধাজ্ঞার কারণ ছিল, কম দামে পাওয়ার কারণে মানুষ এই পণ্যটি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করছিল, যার ফলে অপচয়ের দরজা খুলে যাচ্ছিল কিংবা মানুষের মধ্যে বেশি ক্রয় করে পণ্য আটকে রাখার সুযোগ তৈরি হচ্ছিল। কারণ যা-ই হোক, এখানে বুঝবার বিষয়টি হলো, ইসলামের বিধান হচ্ছে, একজন মানুষ তার পণ্য যেকোনো দামে ইচ্ছা বিক্রি করতে পারে। ফলে উক্ত লোকটির তার পণ্যটি কম দামে বিক্রি করা মূলত বৈধ ছিল। কিন্তু কোনো এক বিশেষ কারণে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। কাজেই প্রয়োজন বোধ করলে সরকার এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে।

এই দুই বিধিনিষেধের আওতায় অবস্থান করে বাজারে যে প্রতিযোগিতা হবে, সেটি হবে Free Competition বা 'স্বাধীন প্রতিযোগিতা'। আর প্রতিযোগিতা যখন স্বাধীন হবে, তখনই কেবল সত্যিকার অর্থে চাহিদা ও সরবরাহশক্তি কাজ করবে এবং তার ফলে সিদ্ধান্তও সঠিক বের হবে।

মোটকথা, পুঁজিবাদী অর্থনীতির মৌলিক দর্শন যদিও ভুল ছিল না; কিন্তু তাকে বাস্তবায়নের জন্য যে দুটি মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো বাস্তবসম্মত নয়। আর তা হলো, মুনাফা অর্জনে মানুষকে অবাধ স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া আর সরকারের তাতে হস্তক্ষেপ করতে না পারা। পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনুসারী অধিকাংশ দেশে যদিও শেষোক্ত নীতিটির অনুসরণ হয় না – প্রতিটি রাষ্ট্রই কোনো-কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করে রেখেছে; কিন্তু সেই বিধিনিষেধগুলো তাদের মনগড়া বিধায় খোদায়ী বিধিনিষেধের ফলে যে সুফল পাওয়া যায়, এখানে তার কোনো প্রতিফলন ঘটে না। এটিই সেই মৌলিক পার্থক্য, যা ইসলামকে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা থেকে স্বাতন্ত্র দান করে।

এ হলো তিনটি ব্যবস্থার মাঝে তারতম্যের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ। এই কথাগুলো মনে রাখতে পারলে অন্তত অর্থনীতির মৌলিক বিষয়গুলো মস্তিষ্কে জাগরূক থাকবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

অনেকে বলে, চুয়াত্তর বছরের মাথায় সমাজতন্ত্রের পতনের কারণ এই নয় যে, উক্ত ব্যবস্থা স্বত্তাগতভাবেই ভুল ছিল কিংবা খারাপ ছিল। বরং তার কারণ ছিল, সমাজতন্ত্র বলতে প্রকৃত যে ব্যবস্থা ছিল, তার অনুসরণে ত্রুটি করা হয়েছে, যার ফলে ব্যবস্থাটির পতন ঘটেছে। এর উপমা দিতে গিয়ে অনেকে বলে থাকে, ইসলাম আর মুসলমানগণও তো দীর্ঘ একটি সময় পর্যন্ত পৃথিবী শাসন করেছে। কিন্তু পরে তার পতন ঘটেছে।

এর উত্তর হলো, এই যুক্তির অবতারণা করে তারা বোঝাতে চায়, ইসলাম ব্যর্থ হয়েছে। তাদের এই মূল্যায়ন ভুল। কারণ, প্রকৃত বিষয় হলো, ইসলাম ব্যর্থ হয়নি। বরং ইসলামের অনুসারীগণ ইসলামের শিক্ষাকে পরিত্যাগ করার কারণে তাদের জীবনে পতন এসেছে। সমাজতন্ত্রীরাও বলে, তাদের আসল যে মতবাদ ছিল, সত্তাগতভাবে সেটি ভুল ছিল না। তাকে পরিত্যাগ করার কারণে পতন এসেছে। কিন্তু আমরা বলব, আসুন, পর্যালোচনা করে দেখি, আসল মতবাদটিকে পরিত্যাগ করার কারণে পতন এসেছে, নাকি তাকে গ্রহণ করার কারণে পতন এসেছে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন কিছু নয়।

সমাজতন্ত্র একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। প্রশ্ন হলো, সমাজতন্ত্রের যে কটি মূলনীতি ছিল, সেগুলোকে কোন পর্যায়ে এবং কোথায় পরিত্যাগ করা হয়েছিল? সমাজন্ত্রের মূল থিওরি দুটি। রাষ্ট্রীয় মালিকানা আর পরিকল্পনা। এগুলো তো কোনো কালে এবং কোন যুগেই পরিত্যাগ করা হয়নি! লেলিনের যুগ বলুন, স্টালিনের যুগ বলুন আর গর্বাচেভের যুগ বলুন, সকলের আমলেই এই মূলনীতিদ্বয় যথাস্থানে বহাল ছিল যে, দেশের সমস্ত উৎপাদন রাষ্ট্রের মালিকানায় ছিল এবং অর্থনীতি রাষ্ট্রের পরিকল্পার ভিত্তিতে পরিচালিত হতো।

এই অবস্থায় যে পতন এসেছে, তার কারণ তো এই ছিল যে, এই নীতি বাস্তবায়নের ফলে রাষ্ট্রের উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিল আর তার ফলে মানুষের মধ্যে বেকারত্ব ছড়িয়ে পড়ল এবং জনগণ মারাত্মক সমস্যার মধ্যে পড়ে গেল।

গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি পুনর্গঠনের নামে একটি আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। তিনি তার সেই চিন্তাধারার উপর একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, জাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। জাতিকে সেই ধ্বংস থেকে বাঁচাতে তিনি একটুখানি নড়চড় করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই প্রচেষ্টার মূল প্রতিপাদ্য ছিল, জনগণকে ব্যবসামুখী করা, যাতে অর্থনৈতিক তৎপরতায় পুনরায় প্রাণ ফিরে আসে। কিন্তু নিজের সেই চিন্তাধারাকে বাস্তবায়নের সুযোগ তিনি পাননি। যদি মূলনীতি থেকে সরে আসার কারণে এই পতন হয়ে থাকে, তা হলে তা হতো প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভের যুগে। কারণ, সমাজন্ত্রের মূলনীতি থেকে সরে এসে বাজার অর্থনীতি চালু করার চিন্তা তিনি করেছিলেন। কিন্তু তার সেই চিন্তার বাস্তবায়নের আগেই তিনি গণ-অভ্যুত্থানের শিকার হন এবং ক্ষমতাচ্যুত হন। এমনকি ঘটনার এখানেই ইতি ঘটে যায়।

কাজেই মূলনীতি বর্জনের কারণে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে, এই যুক্তি সঠিক নয়। সমাজতন্ত্রের যে কটি মূলনীতি ছিল, শেষ পর্যন্ত তার প্রয়োগ ও

বাস্তবায়ন ছিল। আর তারই কারণে আমরা সেই দৃশ্যটি দেখতে পেয়েছি, যা আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে।

তারা হয়ত বলতে পারে, সমাজতন্ত্র একটা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা ছিল। তাই আমরা গণতন্ত্র আনার চেষ্টা করেছি। এর উত্তরে আমি বলব, এমনটি কখনও হয়নি। বরং সমাজন্ত্রও গণতন্ত্রের তাঁবেদার ছিল। সে নিজেই গণতন্ত্র চাইত। কিন্তু সে বলত, গণতন্ত্র, মানে শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র লেনিনের যুগেও ছিল, স্টালিনের যুগেও ছিল, গর্বাচেভের যুগেও ছিল। কারও যুগেই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোনোই পরিবর্তন সাধিত হয়নি। লেনিনের যুগেও দেশে এক দলীয় রাজনীতি ছিল, যা শেষ পর্যন্ত বহাল ছিল।

কাজেই 'মূলনীতি থেকে সরে আসার কারণে আমরা পতনের শিকার হয়েছি' একথাটি সর্বৈব ভুল ও অবাস্তব। কারণ, ইতিহাস বলছে, তোমরা সব সময় মূলনীতি অনুসরণ করেই সমাজতন্ত্র চর্চা করেছ।

মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Mixed Economy)

কোনো-কোনো দেশে নতুন আরেকটি অর্থব্যবস্থার ধারণা জন্ম নিয়েছে, যার নাম Mixed Economy বা 'মিশ্র অর্থনীতি'। এখানে একদিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বাজারশক্তিগুলোকে বহাল রাখা হয়েছে, আবার অন্যদিকে কিছু রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকে যুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। যেমন– কিছু জিনিস এমন আছে, যেগুলোর মালিকানা রাষ্ট্রের, আবার কিছু এমন আছে, যেগুলোর মালিকানা জনগণের। রাষ্ট্রীয় মালিকানার নাম Public Sector (পাবলিক সেক্টর)। যেমন– পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, এয়ারলাইনস ইত্যাদি। আমাদের দেশেও এই জিনিসগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আছে। আবার কিছু আছে ব্যক্তিমালিকানা, যার নাম Private Secto (প্রাইভেট সেক্টর)। তো অনেক দেশে এই মিশ্র অর্থনীতি চালু আছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির যে মূলনীতিটি ছিল, যেমন– সরকারের হস্তক্ষেপ না করা, সম্ভবত কোনো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই এই নীতির অনুসরণ নেই। সবাই কিছু-না-কিছু হস্তক্ষেপ করেছে। কেউ কম, কেউ বেশি। একেই Mixed Economy (মিক্সেড ইকোনমি) বলা হয়। আবার সেই হস্তক্ষেপও হয়েছে নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুপাতে।

সেই হস্তক্ষেপটি কী? তা হলো সংসদ যে বিধিনিষেধ আরোপ করবে, তা-ই মান্য করতে হবে। অর্থাৎ– সংসদের অধিকাংশ সদস্য যে মতের পক্ষে রায় প্রদান করবে, সেটিই জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। কাজেই তারা

বিধিনিষেধ আরোপ করে বটে; কিন্তু তা হয় গোঁড়ামিমূলক – তাতে নিরপেক্ষতা থাকে না। তার ফলে অর্থনীতির উপর যে কুপ্রভাব পড়ে, যে অসমতা তৈরি হয়, তার ফলাফল খুবই নেতিবাচক ও ক্ষতিকর। কোনো দেশই খোদায়ী বিধিনিষেধকে বরণ করে নেয়নি, যার মর্যাদা ছিল মানুষের চিন্তা ও বিবেকের ঊর্ধ্বে। তার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, যেহেতু মানুষের বিবেক ও জ্ঞান সীমিত, তাই তারা যা করেছে, তার দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি।

য়তক্ষণ পর্যন্ত খোদায়ী বিধিনিষেধকে মেনে নেওয়া না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রিরাজমান সমস্যা ও ভারসাম্যহীনতার অবসান ঘটবে না। এ ছাড়া সমস্যার সমাধানে আর কোনো পথ নেই। ইসলামী অর্থব্যবস্থা-ই মানবতার অর্থনৈতিক মুক্তির একমাত্র পথ। এর কোনোই বিকল্প নেই।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমি তিনটি অর্থব্যবস্থার মধ্যকার তারতম্য তুলে ধরলাম। আজকাল অর্থনীতি বিষয়ক বই-পুস্তকগুলো খুব দীর্ঘ হয়। ফলে সেগুলো পড়ে সারমর্ম বের করা কঠিন হয়ে পড়ে। আপনি কয়েক হাজার পৃষ্ঠা পড়ে যে সারাংশে উপনীত হতে পারবেন, আমি আপনাদের সম্মুখে তা-ই তুলে ধরলাম। এতে আশা করি, আপনারা তিনটি অর্থব্যবস্থার মৌলিক বিষয়গুলো হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছেন। আল্লাহপাক আমাদেরকে বুঝবার ও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : ইন'আমুল বারী– খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪১-৬৭

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার অপকারিতা ও তার বিকল্প

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

আজকের এই সেমিনারের জন্য যে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে, তা হলো 'রিবা', যাকে উর্দুতে (এবং বাংলায়ও) 'সুদ' আর ইংরেজিতে Usury (ইউঝারি) বা Intrerst (ইন্টারেস্ট) বলা হয়। আর খুবসম্ভব এই বিষয়বস্তুটিকে নির্বাচন করার উদ্দেশ্য হলো, এমনিতেই তো বর্তমানে সারা বিশ্বে সুদি অর্থব্যবস্থা চালু আছে। তদুপরি পশ্চিমা বিশ্বে – আপনারা যেখানে বাস করছেন – অধিকাংশ আর্থিক তৎপরতা সুদের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হচ্ছে। এজন্য মুসলমানদের পায়ে-পায়ে এই প্রশ্নটি এসে উপস্থিত হচ্ছে যে, আমরা কীভাবে লেনদেন করব এবং সুদ থেকে কীভাবে মুক্তি অর্জন করব। তা ছাড়া বর্তমানে মানুষের মাঝে নানা ধরনের ভুল বোঝাবুঝি ছড়ানো হচ্ছে যে, এ-যুগে আর্থিক ক্ষেত্রে যে Intrerst চালু আছে, প্রকৃতপক্ষে তা হারাম নয়। কারণ, পবিত্র কুরআন যে 'রিবা'কে হারাম ঘোষণা করেছে, এই Intrerst তার অন্তর্ভুক্ত নয়। এ সবগুলো বিষয়কে মাথায় রেখেই আমার জন্য এ বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে যে, Intrerst বিষয়ের উপর যেসব মৌলিক তথ্য আছে, আমি পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও বিদ্যমান অবস্থার আলোকে আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করব।

সুদি কারবারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা

সবার আগে বুঝবার বিষয়টি হলো, 'সুদ'কে পবিত্র কুরআন যত বড় অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, সম্ভবত অন্য কোনো গুনাহকে এত বড় অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়নি। যেমন– মদ পান করা, শূকর খাওয়া, ব্যভিচার করা ইত্যাদি

অপরাধের জন্য পবিত্র কুরআনে সেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়নি, যেগুলো সুদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

যেমন- সূরা বাকারায় আল্লাহপাক বলেন :

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۞ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে, তা ছেড়ে দাও; যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। যদি তোমরা তা না কর (সুদের বকেয়া না ছাড় এবং সুদের কারবার অব্যাহত রাখ), তা হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।'[৪৯]

অর্থাৎ- সুদি মহাজনদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই যুদ্ধঘোষণা অন্য কোনো অপরাধের জন্য করা হয়নি। যেমন- যারা মদ পান করে, তাদের সম্পর্কে একথা বলা হয়নি যে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। যারা শূকর খায়, তাদের সম্পর্কে একথা বলা হয়নি যে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে।

যারা ব্যভিচার করে, তাদের সম্পর্কে একথা বলা হয়নি যে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। কিন্তু 'সুদ' সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা সুদের কারবার বর্জন না করবে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। এত শক্ত ও কঠিন হুঁশিয়ারি সুদের ব্যাপারে উচ্চারিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, এর জন্য এত কঠিন, এত শক্ত হুঁশিয়ারি কেন? এর বিস্তারিত জবাব ইনশাআল্লাহ সামনে জানা যাবে।

'সুদ' কাকে বলে?

কিন্তু তার আগে আমাদের জানতে হবে, 'সুদ' কাকে বলে, 'সুদ' জিনিসটা কী, 'সুদে'র সংজ্ঞা কী। পবিত্র কুরআন যে সময়ে 'সুদ'কে হারাম ঘোষণা করেছে, তখন আরবদের মাঝে সুদের লেনদের একটি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ বিষয় ছিল। সে সময়ে সুদ বলতে যা বোঝানো হতো, তা হলো, প্রদত্ত ঋণের উপর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কোনো প্রকারের অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা। যেমন- আজ আমি কাউকে ঋণ হিসেবে একশো টাকা প্রদান করলাম এই শর্তে যে, এক মাস পর সে আমাকে একশো দুই টাকা পরিশোধ করবে। এরই নাম 'সুদ'।

---

৪৯. সূরা বাকারা : ২৭৮, ২৭৯

চুক্তি ব্যতিরেকে বেশি দেওয়া 'সুদ' নয়

আগেই স্থির করে নেওয়ার শর্ত এজন্য আরোপ করা হয়েছে যে, যদি ঋণ দেওয়ার সময় অতিরিক্ত পরিশোধের কথা স্থির করে না নেওয়া হয়, তা হলে প্রদত্ত অর্থের বাড়তি দেওয়া সুদ হবে না। যেমন– আমি কাউকে একশো টাকা ঋণ প্রদান করলাম। আমি তার থেকে এই দাবি করলাম না যে, তুমি আমাকে একশো দুই টাকা ফেরত দেবে। কিন্তু পরিশোধের সময় ঋণগ্রহীতা নিজের খুশিতে আমাকে একশো দুই টাকা ফেরত দিল। তো এটা সুদ নয়। এটা হারাম নয়; বরং জায়েয।

ঋণ পরিশোধের উত্তম পন্থা

স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে প্রমাণিত আছে, তিনি যখন কারও নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন, তখন পরিশোধ করার সময় কিছু বেশি দিতেন, যাতে ঋণদাতা খুশি হয়। কিন্তু বাড়তি আদান-প্রদানের কথা যেহেতু পূর্ব থেকে স্থির করা থাকত না, তাই এটা 'সুদ' হতো না। হাদীসের পরিভাষায় একে 'হুস্নুল কাজা' বা 'উত্তম পরিশোধ' বলা হয়। অর্থাৎ– উত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করা, পরিশোধের সময় ভালো আচরণ করা এবং কিছু বেশি দেওয়া সুদ নয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন পর্যন্ত বলেছেন যে :

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

'তোমাদের মধ্যে ঋণপরিশোধের পন্থা যার যত সুন্দর, সে তত ভালো মানুষ।'[৫০]

কিন্তু যদি ঋণ দেওয়ার সময় সিদ্ধান্ত করে নেওয়া হয়, ফেরত দেওয়ার সময় অতিরিক্ত এত টাকাসহ দিতে হবে, একে 'সুদ' বলা হয়।

পবিত্র কুরআন একেই কঠোর ও শক্ত ভাষায় হারাম সাব্যস্ত করেছে। সূরা বাকারার প্রায় পৌনে দুই রুকু এই সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

পবিত্র কুরআন কোন 'সুদ'কে হারাম সাব্যস্ত করেছে?

অনেকে বলে থাকেন, পবিত্র কুরআন যে-সুদকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, তার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন রকম। সে-যুগে যারা ঋণ গ্রহণ করত, তারা গরিব মানুষ ছিল। তাদের কাছে রুটি-রুজির জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। অসুখ হলে

---

৫০. বুখারী কিতাবুল ইসতিকরাজ... : হাদীস নং-২২১৮; সুনানে নাসাঈ কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং–৪৫৩৯ ; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং–৮৭৪৩

তাদের কাছে চিকিৎসার অর্থ থাকত না। কেউ মারা গেলে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা থাকত না। ফলে গরিব মানুষগুলো কারও নিকট থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হতো। কিন্তু ঋনদাতারা বলত, আমরা তোমাদের ঋণ দেব বটে; কিন্তু শতকরা এত টাকা বেশি দিতে হবে। কিন্তু যেহেতু বিষয়টি মানবতাবিরোধী ছিল যে, একজনের ব্যক্তিগত একটি প্রয়োজন – তার পেটে খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই; এমতাবস্থায় তাকে সুদ ছাড়া ঋণ না দেওয়া অবিচার ও বাড়াবাড়ি ছিল বিধায় আল্লাহপাক 'সুদ'কে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু আমাদের এযুগে এবং বিশেষভাবে ব্যাংকগুলোতে সুদভিত্তিক যে লেনদেন হয়, সেগুলোতে ঋণগ্রহীতারা গরিব বা অভাবী হয় না। বরং অধিকাংশ সময় তারা বড় বিত্তশালী ও পুঁজিপতি হয়ে থাকে। তারা এজন্য ঋণ গ্রহণ করে না যে, তাদের ঘরে খাবার নেই বা পরনে কাপড় নেই কিংবা চিকিৎসা করাবার অর্থ নেই আর তার জন্য এরা ঋণ গ্রহণ করছে। বরং তারা এজন্য ঋণ গ্রহণ করছে যে, এই অর্থ ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে এবং তার দ্বারা মুনাফা অর্জন করবে। এমতাস্থায় ঋণদাতা যদি একথা বলে, তুমি আমার অর্থ তোমার ব্যবসায় বিনিয়োগ করে লাভবান হও আর লাভের ১০ ভাগ আমাকে দিয়ো, তা হলে এতে দোষের কী আছে? এ সেই 'সুদ' নয়, পবিত্র কুরআন যাকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে আজ এই যুক্তি উপস্থাপন করা হচ্ছে।

বাণিজ্যিক ঋণ (Commercial Loan) সেযুগেও ছিল

তো বলা হচ্ছে, এই বাণিজ্যিক সুদ (কমার্শিয়াল ইন্টারেস্ট) ও এই বাণিজ্যিক ঋণ (কমার্শিয়াল লোন) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ছিল না। বরং সেযুগে ব্যক্তিগত ব্যয় ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ঋণ নেওয়া হতো। কাজেই পবিত্র কুরআন সেই সুদকে কী করে হারাম ঘোষণা করতে পারে, সেযুগে যার অস্তিত্বই ছিল না। এই যুক্তির উপর নির্ভর করে কেউ-কেউ বলে থাকেন, পবিত্র কুরআন যে সুদকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, সেটি গরিব-অসহায় জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত সুদ ছিল। আমাদের এই কারবারি সুদ হারাম নয়।

আকৃতির পরিবর্তনে প্রকৃতি বদলায় না

এই যুক্তির জবাবে আমাদের প্রথম কথা হলো, কোনো বস্তুর হারাম হওয়ার জন্য জরুরি নয় যে, বস্তুটি হুবহু ওই আকৃতিতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে বিদ্যমান থাকতে হবে। পবিত্র কুরআন

যখন কোনো বস্তুকে হারাম ঘোষণা করে, তখন সেই বস্তুটির একটি প্রকৃতি তার সামনে থাকে। কুরআন সেই প্রকৃতিকে হারাম সাব্যস্ত করে। চাই তার বিশেষ কোনো আকার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক।

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথাটি বুঝুন। পবিত্র কুরআন মদকে হারাম ঘোষণা করেছে। মদের প্রকৃতি হলো, এটি এমন একটি পানীয়, যার মধ্যে নেশা থাকে। এখন যদি কেউ একথা বলতে শুরু করে যে, জনাব, এ যুগের হুইস্কি, বিয়ার ও ব্রান্ডি নবীজির যুগে ছিল না; কাজেই এগুলো হারাম নয়, তা হলে তার এই দাবি সঠিক বলে বিবেচিত হবে না। কারণ, এই পানীয়গুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ঠিক এই আকারে ছিল না বটে; কিন্তু প্রকৃতি, তথা 'বস্তুটি নেশাকর হওয়া' বিদ্যমান ছিল। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেশাকর বস্তুকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কাজেই যেকোনো নেশাকর বস্তু চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে গেছে। চাই তার নাম ও আকার যা-ই হোক। নাম হুইস্কি হোক কিংবা বিয়ার। ব্রান্ডি হোক কিংবা কোকেন। নেশাকর বস্তু মাত্রই হারাম।

মজার একটি গল্প শুনুন

একটি মজার গল্প মনে পড়ল। হিন্দুস্তানে এক গায়ক ছিল। একবার সে হজে গেল। হজ সমাপনের পর মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। পথে এক মনযিলে যাত্রাবিরতি করল। সেযুগে চলার পথে বিভিন্ন মনযিল থাকত। মানুষ সেসব মনযিলে রাতযাপন করত এবং পরদিন সকালে সম্মুখপানে রওনা করত। নিয়ম অনুযায়ী হিন্দুস্তানি গায়ক রাতযাপনের জন্য এক মনযিলে অবস্থান গ্রহণ করল। উক্ত মনযিলে এক আরব গায়কও গিয়ে উপস্থিত হলো এবং ওখানে বসে আরবিতে গান গাইতে শুরু করল। আরব গায়কের কণ্ঠ ছিল খানিক কর্কশ ও কাঠখোট্টা। হিন্দুস্তানি গায়কের কাছে তার গান খুব বিশ্রী ও বিরক্তিকর ঠেকল। তাই সে বলে উঠল, আজ আমার বুঝে এসেছে, আমাদের নবীজি গান-বাজনাকে কেন হারাম সাব্যস্ত করেছিলেন। তার কারণ হলো, তিনি বেদুঈনদের বেসুরো ও কর্কশ গান শুনেছিলেন। তাই তিনি গানকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। তিনি যদি আমার গান শুনতেন, তা হলে গান-বাজনাকে তিনি হারাম ঘোষণা করতেন না।

আজকালকার মেজাজ

আজকাল মেজাজ তৈরি হয়ে গেছে, যেকোনো বিষয়ের ব্যাপারে মানুষ হুট করে বলে ফেলে, জনাব, নবীজির আমলে তো এই আমলটি এভাবে হতো আর

সেজন্য তিনি তাকে হারাম সাব্যস্ত করেছিলেন। বর্তমানে যেহেতু আমলটি সেভাবে হয় না, তাই সেটি হারাম নয়। যারা এ ধরনের যুক্তির অবতারণা করে, তারা এমনও বলে থাকে যে, শূকরকে এজন্য হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, সেযুগে এই জন্তুটি নোংরা পরিবেশে পড়ে থাকত, আবর্জনা খেত এবং নোংরা পরিবেশে প্রতিপালিত হতো। কিন্তু শূকর এখন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত হচ্ছে এবং তাদের জন্য উন্নতমানের ফার্ম প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এখন শূকর হারাম হওয়ার কোনোই কারণ নেই।

শরীয়তের একটি মূলনীতি

মনে রাখবেন, পবিত্র কুরআন যখন কোনো বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করে, তখন তার একটি প্রকৃতি থাকে। তার আকৃতি যতই পরিবর্তিত হোক, তার প্রস্তুতপ্রণালী যতই বদলাতে থাকুক, প্রকৃতি তার আপন স্থানে বহাল থাকে এবং সেই প্রকৃতিটি-ই হারাম সাবস্ত হয়। এ হলো শরীয়তের মূলনীতি।

নবুয়ওতযুগ সম্পর্কে একটি ভুল বোঝাবুঝি

তা ছাড়া একথাটিও যথাযথ নয় যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে বাণিজ্যিক ঋণের প্রচলন ছিল না এবং সকল ঋণ কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে করা হতো। এ বিষয়বস্তুটির উপর আমার আব্বাজান মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ. 'মাসআলায়ে সূদ' (সুদের বিধান) নামে একটি পুস্তক লিখেছেন। তার দ্বিতীয় খণ্ডটি আমি লিখেছি। তাতে আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলেও বাণিজ্যিক ঋণের লেনদেন হতো।

যখন একথাটি বলা হয়, আরবরা মরুবাসী ছিল, তখন সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্কে একটি কল্পনা এসে উপস্থিত হয় যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে যুগে আগমন করেছিলেন, সেটি এমন একটি সরল ও সাধারণ সমাজ হয়ে থাকবে, যেখানে ব্যবসা বলতে কিছু ছিল না। ছিলও যদি, ছিল শুধু গম ও যব ইত্যাদির। আর তাও দশ-বিশ টাকার বেশির হতো না। এ ছাড়া বড় কোনো বাণিজ্য সেই সমাজে ছিল না।

সাধারণভাবে মানুষের মস্তিষ্কে এই ধারণাটি-ই বদ্ধমূল হয়ে আছে।

প্রতিটি গোত্র এক-একটি 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানী' ছিল

কিন্তু মনে রাখবেন, একথাটি সঠিক নয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমাজে আগমন করেছিলেন, সেই সমাজেও আজকের

আধুনিক ব্যবসার প্রায় সব কটি ভিত্তি বিদ্যমান ছিল। যেমন– আজকাল 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানী' আছে। এ ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, এটি চতুর্দশ শতাব্দীর আবিষ্কার। এর আগে 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানী'র কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু আমরা যখন আরবের ইতিহাস পাঠ করি, তখন দেখতে পাই, আরবের প্রতিটি গোত্র এক-একটি স্বতন্ত্র 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানী' ছিল। কারণ, প্রতিটি গোত্রে ব্যবসার পদ্ধতি এই ছিল যে, গোত্রের প্রতিজন মানুষ এক টাকা-দুটাকা করে একস্থানে সঞ্চয় করত এবং সেই অর্থ শাম প্রেরণ করে সেখান থেকে ব্যবসাপণ্য আমদানি করত।

আপনারা অনেক বাণিজ্য কাফেলার (Commercial Caravan)-এর নাম শুনে থাকবেন। এসকল কাজ এটিই হতো যে, গোত্রের সব মানুষ এক-একটি টাকা একত্রিত করে অন্যত্র পাঠাত আর সেখান থেকে পণ্য ক্রয় করে নিজ অঞ্চলে এনে বিক্রি করত।

যেমন– পবিত্র কুরআনের সূরা কুরাইশে আল্লাহপাক সে যুগের 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানী'গুলোর বাণিজ্যিক তৎপরতারই প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

আল্লাহপাক বলেন :

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍۙ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِۚ

'যেহেতু কুরাইশের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মের সফরের।'[৫১]

এই ব্যবসারই মিশন নিয়ে আরবের লোকেরা শীতকালে ইয়েমেন আর গ্রীষ্মকালে শাম সফর করত। তাদের শীত-গ্রীষ্মের এই সফর শুধু ব্যবসার উদ্দেশ্যে হতো। এখান থেকে পণ্য নিয়ে ওখানে বিক্রি করত আর ওখান থেকে পণ্য এনে এখানে বিক্রি করত। কোনো-কোনো সময় এক-একজন মানুষ আপন গোত্র থেকে দশ লাখ দিনার ঋণ গ্রহণ করত। এখন প্রশ্ন হলো, তারা কি এজন্য ঋণ গ্রহণ করত যে, তাদের ঘরে খাওয়ার কিছু ছিল না? তাদের কাছে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করবার মতো কাপড় ছিল না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এত বড় ঋণ তারা কোনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করত।

সর্বপ্রথম পরিত্যাগ করা সুদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে যখন সুদ হারাম হওয়ার ঘোষণা প্রদান করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন :

---

৫১. সূরা কুরাইশ : ১, ২

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ

'জাহেলিয়াতের সুদ রহিত করা হলো। সবার আগে আমি আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ রহিত করলাম। তার সম্পূর্ণ সুদ রহিত করা হলো।'[৫২]

হযরত আব্বাস (রাযি.) সুদের উপর ঋণ দিতেন। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিলেন, আমি আমার চাচা আব্বাস-এর সম্পূর্ণ সুদ রহিত করে দিলাম। যার-যার কাছে তিনি সুদ পাওনা আছেন, সেগুলো আর পরিশোধ করতে হবে না।

বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস (রাযি.)-এর যে সুদ রহিত ঘোষণা করেছিলেন, তার পরিমাণ ছিল দশ হাজার মিছকাল সোনা। প্রায় চার মাশায় এক মিছকাল হয়। আর এই দশ হাজার মিছকাল মূলধন ছিল না। বরং এই পরিমাণটি ছিল সুদ, যা তিনি মানুষের কাছে পাওনা ছিলেন।

আপনারাই বলুন, যে বিনিয়োগের বিপরীতে দশ হাজার মিছকাল সোনা সুদ আসে, সেই ঋণ কি শুধু খাওয়া-পরার প্রয়োজনে গ্রহণ করা হয়েছিল? বলা অনাবশ্যক যে, উক্ত ঋণ ব্যবসার জন্যই গ্রহণ করা হয়েছিল।

সাহাবাযুগে ব্যাংকিং-এর একটি দৃষ্টান্ত

হযরত যুবায়র ইবনে আওয়াম (রাযি.) জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন ছিলেন। তিনি নিজের কাছে হুবহু এ যুগের ব্যাংকিং সিস্টেমের মতো একটি সিস্টেম দাঁড় করিয়েছিলেন। মানুষ যখন তাঁর কাছে আমানত রাখত, তখন তিনি বলে নিতেন, আমানতের এই অর্থ আমি ঋণ হিসেবে গ্রহণ করছি। তোমার এই অর্থ আমার দায়িত্বে ঋণ হিসেবে থাকল। তারপর এই অর্থকে তিনি ব্যবসায় বিনিয়োগ করতেন। এই ধারাবাহিকতায় মৃত্যুর সময় তাঁর দায়িত্বে যে-ঋণ ছিল, সে সম্পর্কে তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাযি.) বলেন:

فَحَسِبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدتُّهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِأَتَيْ أَلْفٍ

'আমি তাঁর ঋণগুলো হিসাব করে দেখলাম যে, তার পরিমাণ বাইশ লাখ দিনার।'[৫৩]

---

৫২. সহীহ মুসলিম কিতাবুল হাজ্জ : হাদীস নং ১২৩৭; সুনানে আবু দাউদ কিতাবুল মানাসিক : হাদীস নং ১৬২৮; সুনানে হাদীস নং ১৭৭৪

৫৩. সহীহ বুখারী কিতাবু ফার্‌জিল খুমুসি : হাদীস নং ২৮৯৭; শারহু ইব্‌নি বাত্তাল ৯/৩৬৩ : হাদীস নং–৩১২৯; হিল্‌য়াতুল আওলিয়া ১/৯১; আস-সুনানুল কুব্‌রা লিল-বায়হাকী ৬/২৮৬; আত-তাবাকাতু লিইব্‌নি সা'দ ৩/১৯

কাজেই সেযুগে বাণিজ্যিক ঋণ ছিল না একথাটি একেবারেই অবাস্তব ও ঐতিহাসিক ভুল। বাস্তবতা হলো, সেযুগে বাণিজ্যিক ঋণও হতো এবং তার উপর সুদের লেনদেনও হতো। পবিত্র কুরআন যেকোনো ঋণের উপর অতিরিক্ত আদায় করাকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। কাজেই এই অভিমত ব্যক্ত করা সঠিক নয় যে, কমার্শিয়াল লোনের উপর ইন্টারেস্ট গ্রহণ করা জায়েয আর ব্যক্তিগত লোনের উপর ইন্টারেস্ট গ্রহণ করা না-জায়েয ।

'চক্রবৃদ্ধি সুদ' ও 'সরল সুদ' দু-ই হারাম

এ ছাড়া আরও একটি বিভ্রান্তি এই ছড়ানো হচ্ছে যে, এক হলো 'সরল সুদ' (Simple Intererst)। আরেক হলো 'চক্রবৃদ্ধি সুদ' (Compound Intererst)। 'চক্রবৃদ্ধি' মানে সুদের উপর সুদ আরোপ করা। কেউ-কেউ বলে থাকেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে 'চক্রবৃদ্ধি সুদ' হতো। আর পবিত্র কুরআন এই সুদকেই হারাম সাব্যস্ত করেছে। কাজেই 'চক্রবৃদ্ধি সুদ' হারাম হলেও 'সরল সুদ' জায়েয। কারণ, 'সরল সুদ' সেযুগে ছিল না। আর না কুরআন তাকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু এই একটু আগে আমি আপনাদের সম্মুখে কুরআনের যে আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি, তাতে আল্লাহ বলেছেন :

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا ۝

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর সুদের যা বকেয়া আছে, সেগুলো ছেড়ে দাও।'[৫৪]

এই আয়াতে আল্লাহপাক বকেয়া সুদের দাবি পরিত্যাগ করতে আদেশ করেছেন। 'সরল' আর 'চক্র'র কোনো উল্লেখ নেই। তারপর বলেছেন :

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ

'যদি তোমরা (সুদ থেকে) তাওবা করে নাও, তা হলে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে।'[৫৫]

পবিত্র কুরআন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে, তোমাদের মূলধন ঠিক থাকবে। এটি তোমাদের অধিকার। কিন্তু এর বাইরে সামান্যতম বাড়তিও হারাম। কাজেই একথা বলা সম্পূর্ণ ভুল যে, 'চক্রবৃদ্ধি সুদ' হারাম – 'সরল সুদ' হারাম নয়। বরং সুদ কম হোক কিংবা বেশি, সবই হারাম। ঋণগ্রহীতা যদি গরিব হয়, তবুও হারাম; যদি বিত্তশালী হয়, তবুও হারাম। যদি কেউ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করে, তবুও সুদ হারাম; যদি ব্যবসার জন্য করে, তবুও হারাম। সব ধরনের সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

---

৫৪. বাকারা : ২৭৮
৫৫. বাকারা : ২৭৯

বর্তমান ব্যাংকিং ইন্টারেস্ট সর্বসম্মতিক্রমে হারাম

এখানে আমি আরও একটি কথা বলতে চাই। তা হলো, বিগত ৫০-৬০ বছর যাবত মুসলিম বিশ্বে Banking Intererst সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে আসছে। আর যেমনটি বলেছি, কিছু লোক বলছে, Compound Intrerst হারাম আর Simple Intererst হালাল কিংবা বাণিজ্যিক লোন হারাম নয় ইত্যাদি। এসব প্রশ্ন ও অভিযোগ মুসলিম বিশ্বে প্রায় ৫০-৬০ বছর যাবত আলোচিত হয়ে আসছে। কিন্তু এই আলোচনার এখন সমাপ্তি ঘটেছে। বর্তমানে সারা বিশ্বের শুধু আলেমগণই নন – অর্থনীতিবিদ ও মুসলিম ব্যাংকারগণও এই সিদ্ধান্তে একমত যে, সাধারণ ঋণের উপর সুদ যেমন হারাম, ব্যাংকিং ইনটারেস্টও তেমনই হারাম। এই সিদ্ধান্তের উপর এখন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যক্তিত্বের এতে কোনোই ভিন্নমত নেই। এ বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে আজ থেকে প্রায় চার বছর আগে জিদ্দায় 'আল-মাজ্‌মাউল ফিক্‌হিল ইসলামী'তে। তাতে প্রায় ৪৫টি মুসলিম দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের সমাবেশ ঘটেছিল। আমিও তাতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর প্রায় ২০০ আলেম সর্বসম্মতিক্রমে এই ফতোয়া প্রদান করেছিলেন যে, ব্যাংকিং ইন্টারেস্ট সম্পূর্ণ হারাম এবং তার জায়েয হওয়ার কোনোই পথ নেই। কাজেই এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া এখন বাতুলতা বই কিছু নয়।

কমার্শিয়াল লোনের উপর ইন্টারেস্ট গ্রহণে সমস্যাটা কী?

আরও একটি কথা বুঝে নেওয়া দরকার। তা হলো, আলোচনার শুরুতে যেমনটি বলেছিলাম যে, মানুষ বলছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করা হতো। এখন যদি কোনো লোক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ নেয় আর ঋণদাতা সুদ দাবি করে, তা হলে এটি অমানবিক আচরণ ও অবিচার বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু কেউ আমার অর্থ তার ব্যবসায় বিনিয়োগ করে মুনাফা করল আর আমি সেই মুনাফা থেকে একটি অংশ গ্রহণ করলাম, তাতে দোষের কী আছে?

আপনাকে লোকসানের ঝুঁকিও নিতে হবে

এর উত্তরে আমার প্রথম কথা হলো, একজন মুসলমানের জন্য আল্লাহর কোনো বিধানে প্রশ্ন উত্থাপন করার সুযোগ থাকা উচিত নয়। আল্লাহ যদি কোনো বস্তু বা বিষয়কে হারাম করে দিয়ে থাকেন, তা হলে তা হারাম হয়ে গেল। ইসলামের বিধান হলো, আপনি যদি কাউকে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে

থাকেন, তা হলে দেওয়ার আগে দুটি বিষয়ের যেকোনো একটি ঠিক করে নিন। আপনি কি তাকে সহযোগিতা করতে চাচ্ছেন, নাকি তার কারবারে অংশীদার হতে চাচ্ছেন? আপনি যদি ঋণের মাধ্যমে তাকে সহযোগিতা করতে চান, তা হলে শুধু সহযোগিতা-ই করবেন। এমতাবস্থায় উক্ত ঋণের উপর অতিরিক্ত দাবি করার কোনো অধিকার থাকবে না। পক্ষান্তরে যদি আপনি তার কারবারে অংশীদার হতে চান, তা হলে যেভাবে আপনি তার লাভের অংশীদার হবেন, তেমনি আপনাকে তার ব্যবসায় লোকসানেরও অংশীদার হতে হবে। এমনটি হতে পারবে না যে, কারবারে লোকসানের ঝুঁকি সবটুকু তিনি বহন করবেন আর আপনি মুনাফা গণনা করবেন। এই পদ্ধতিতে আপনি তাকে ঋণ প্রদান থেকে বিরত থাকুন। আপনি বরং তার সঙ্গে একটি Joint Enterprise (জয়েন্ট এন্টারপ্রাইজ) গড়ে তুলুন। অর্থাৎ– আপনি তার সঙ্গে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হোন যে, তুমি যে ব্যবসার জন্য ঋণ চাচ্ছ, আমাকে তার অংশীদার বানিয়ে নাও। ব্যবসা যদি লাভজনক হয়, তা হলে আমাকে এত শতাংশ দিয়ো। আর যদি লোকসান হয়, তা হলেও মুনাফার হারে আমি সেই ক্ষতি বহন করব। কিন্তু এটা বৈধ নয় যে, আপনি তাকে বলবেন, এই ঋণের উপর আমি তোমার নিকট থেকে এত পার্সেন্ট মুনাফা নেব। কারবারে তোমার লাভ হলো, না লোকসান হলো, আমি তা দেখব না। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ হারাম ও সুদ।

প্রচলিত সুদি ব্যবস্থার অপকারিতা

বর্তমানে Intererst (সুদ)-এর যে সিস্টেমটি চালু আছে, তার সারাংশ হলো, অনেক সময় ঋণগ্রহীতার লোকসান হয়ে যায়। তখন ঋণদাতা লাভে থাকে আর ঋণগ্রহীতা লোকসানে থাকে। অনেক সময় এমন হয় যে, ঋণগ্রহীতা বিপুলহারে মুনাফা অর্জন করল আর ঋণদাতাকে সে সামান্য লাভ দিল। এবার ঋণদাতা ক্ষতির মধ্যে থাকল। বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝুন।

ডিপোজিটাররা সব সময়ই লোকসানের মধ্যে থাকে

যেমন– এক ব্যক্তি এক কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করল। এই এক কোটি টাকা তার কাছে কোথা থেকে এলো? এই টাকাগুলো কার? বলা বাহুল্য যে, এই টাকাগুলো সে ব্যাংক থেকে নিয়েছে। আর ব্যাংকের এই টাকাগুলো ডিপোজিটারদের। বলা যায়, এই এক কোটি টাকা গোটা জাতির। এখন লোকটি জাতির এই এক কোটি দ্বারা ব্যবসা শুরু করল এবং এই ব্যবসায় সে একশো ভাগ মুনাফা অর্জন করল। এখন তার সম্পদ দাঁড়িয়েছে দুই কোটি

টাকায়। এখান থেকে সে ১৫ পার্সেন্ট, তথা ১৫ লাখ টাকা ব্যাংককে দিয়ে দিল। ব্যাংক সেখান থেকে তার কমিশন ও যাবতীয় ব্যয় বের করে অবশিষ্ট ৭ কিংবা ১০ ভাগ ডিপোজিটারকে দিল। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, যাদের অর্থ এই ব্যবসায় বিনিয়োগ হয়েছিল, যার মাধ্যমে এই মুনাফা অর্জিত হয়েছিল, তারা পেল শতকরা মাত্র ১০ টাকা। আর এই বেচারা ডিপোজিটার খুবই আনন্দিত যে, আমার একশো টাকা এখন একশো দশ টাকা হয়ে গেছে। অথচ তার এই তথ্য জানা নেই যে, তার টাকা দ্বারা যে অংকের মুনাফা অর্জন করা হয়েছে, তাতে তার একশো টাকা দুশো টাকায় পরিণত হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু তারপরও আরও যা হচ্ছে, তা হলো, ঋণগ্রহীতা তার মুনাফার এই ১০ টাকা পুনরায় তার থেকে উসুল করে নিয়ে নিচ্ছে।

কীভাবে নিচ্ছে?

সুদের অর্থ উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়

এভাবে নিচ্ছে যে, ঋণগ্রহীতা এই ১০ টাকাকে তার পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত করে নেয়। যেমন– সে ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা ঋণ নিয়ে কারখানা খুলল কিংবা কোনো পণ্য উৎপাদন করল। তো এই উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে সুদের সেই ১৫ পার্সেন্টকেও যোগ করে নিল, যা সে ব্যাংককে পরিশোধ করেছিল। ফলে তার উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ১৫ শতাংশ বেড়ে গেল। যেমন– সে কাপড় প্রস্তুত করেছিল। তো সুদের টাকা যুক্ত হওয়ার কারণে কাপড়টির উৎপাদনব্যয় ১৫ ভাগ বেড়ে গেছে। এমতাবস্থায় ডিপোজিটার ব্যাংকে একশো টাকা জিপোজিট রেখে যে একশো দশ টাকা পেয়েছিল, তিনি যখন বাজার থেকে কাপড়টি ক্রয় করবেন, তখন তাকে এই কাপড়টির মূল্য ১৫ শতাংশ বেশি পরিশোধ করতে হবে।

তা হলে ফলাফল এই বের হলো যে, ডিপোজিটার যে ১০ পার্সেন্ট মুনাফা করেছিল, ঋণগ্রহীতা তার চেয়েও বেশি ১৫ পার্সেন্ট আদায় করে নিয়ে গেছে। অথচ জিপোজিটার খুবই আনন্দিত, আমি ১০০ টাকা ডিপোজিট করে ১১০ টাকা পেয়েছি! কিন্তু প্রকৃত হিসাবে সে ১০০ টাকার পরিবর্তে পেয়েছে ৯০ টাকা। কারণ, সেই ১৫ শতাংশ চলে গেছে কাপড়ের উৎপাদনব্যয়ে আর ৮৫ শতাংশ মুনাফা ঢুকে গেছে ঋণগ্রহীতার পকেটে।

ব্যবসায় অংশিদারিত্বের উপকারিতা

এই ব্যবসায়িক চুক্তিটি যদি অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে হতো, তা হলে বিনিয়োগকারীরা ১৫ শতাংশের পরিবর্তে ৫০ শতাংশ মুনাফা পেত এবং এই

পদ্ধতিতে বিনিয়োগকারীদের মুনাফার এই ৫০ শতাংশ পণ্যের উৎপাদনব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হতো না।

কারণ, তখন উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় হওয়ার পর মুনাফা সামনে আসত এবং তার পরে বন্টিত হতো। যেমন- চুক্তিটি এভাবে হতে পারত যে, মুনাফার ৫০ ভাগ বিনিয়োগকারীর আর ৫০ ভাগ যিনি শ্রম দিয়ে ব্যবসা করবেন, তার। এভাবে হলে বিনিয়োগকারীরা সুদি বিনিয়োগের মতো ক্ষতিগ্রস্ত হতো না।

লাভ একজনের, লোকসান আরেকজনের!

আবার দেখুন, কেউ ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা লোন নিয়ে ব্যবসা শুরু করল। কিন্তু সেই ব্যবসায় তার লোকসান হয়ে গেল। এই লোকসানের ফলে ব্যাংকটি দেউলিয়া হয়ে গেল। এখন ব্যাংকটির দেউলিয়াত্বের কারণে কার টাকা গেল? জানা কথা যে, যা গেল, জনগণের গেল। তো এই পদ্ধতির বিনিয়োগে লোকসান পুরোটাই পাবলিকের ঘাড়ে চাপে। পক্ষান্তরে যদি মুনাফা হয়, তা হলে পুরোটাই ঢোকে ঋণগ্রহীতার পকেটে।

বীমা কোম্পানী দ্বারা কে লাভবান হচ্ছে?

ঋণগ্রহীতার যদি লোকসান হয়ে যায়, তা হলে তার প্রতিকারের জন্য সে ভিন্ন একটি পথ খুঁজে নিয়েছে। তা হলো ইন্সুরেন্স। যেমন- ধরুন, তুলার গুদামে আগুন লাগল। এমতাবস্থায় এই ক্ষয়ক্ষতির প্রতিকারের দায়িত্ব ইন্সুরেন্স কোম্পানীর উপর অর্পিত হয়।

প্রশ্ন হলো, ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে টাকাগুলো কার? ইন্সুরেন্স কোম্পানী কার অর্থ দ্বারা এই ক্ষতিপূরণ দেবে? এগুলো গরিব জনগণের টাকা। সেই জনগণের, যারা ততক্ষণ পর্যন্ত গাড়ি রাস্তায় নামাতে পারে না, যতক্ষণ-না গাড়িটিকে ইন্সুরেন্স করিয়ে নেবে। আর গরিব জনগণের গাড়ি একসিডেন্ট করে না, তাতে আগুনও লাগে না। কিন্তু বীমার কিস্তি যথারীতি আদায় করতে তারা বাধ্য। এই গরিব জনসাধারণের বীমার কিস্তির টাকা দ্বারা কোম্পানীর নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং তাদের ডিপোজিটের মাধ্যমে ব্যবসায়ীর ক্ষতিপূরণ করছে। এসব গোলকধাঁধা এজন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে, যাতে যদি মুনাফা হয়, তা যেন পুঁজিপতি ব্যবসায়ীর বাটে থাকে। আর যদি লোকসান হয়, তা যেন গরিব জনসাধারণের ঘাড়ে চাপে।

ব্যাংকে গোটা জাতির যে অর্থ আছে, তাকে যদি সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হতো, তা হলে তার সমুদয় মুনাফা জনসাধারণের হাতে আসত। কিন্তু

বর্তমান ব্যবস্থাপনায় সম্পদ বন্টনের যে পদ্ধতি চালু আছে, তার ফলে সম্পদ নিচের দিকে যাওয়ার পরিবর্তে উপর দিকে যাচ্ছে।

এসব অপকারিতার কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সুদ খাওয়া এমন, যেন নিজের মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করা। এটি এত মারাত্মক এইজন্য যে, এর মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়।

সুদের বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলা

আজকের আগে আমরা সুদকে শুধু এজন্য হারাম বলে বিশ্বাস করতাম যে, পবিত্র কুরআন একে হারাম সাব্যস্ত করেছে। এর পক্ষে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন পড়ত না এবং এ নিয়ে তেমন আলোচনা-পর্যালোচনাও হতো না। আল্লাহ যখন হারাম সাব্যস্ত করে দিয়েছেন, ব্যস, হারাম। কিন্তু আজকের অবস্থা আপনারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছেন। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে Intererst (সুদি) ব্যবস্থা চালু আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদের এই দেশটি (আমেরিকা) এখন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি। একটি প্রতিদ্বন্দ্বী যা-ও ছিল, তারও পতন ঘটেছে। এখন এর সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মতো কোনো শক্তি দুনিয়াতে অবশিষ্ট নেই। কিন্তু তারপরও দেশটি অর্থনৈতিক মন্দার শিকার। এর মূলেও Intererst।

কাজেই আমি বাস্তবতার আলোকেও বলতে পারি, 'রাসূলের যুগে গরিব শ্রেণীর মানুষ সুদের উপর লোন নিত। তাদের থেকে সুদ নেওয়া হারাম ছিল। কিন্তু এ-যুগের কমার্শিয়াল লোন সে যুগে ছিল না বিধায় একে হারাম বলা যাবে না।' যুক্তি ও অর্থনীতির বিচারে এই বক্তব্য সঠিক নয়। কেউ যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক কালের এই সুদভিত্তিক অর্থনীতি অধ্যয়ন করে, তা হলে তার কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে যে, এই অর্থব্যবস্থা পৃথিবীটাকে ধ্বংসের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। আর আল্লাহ চাহেন তো এমন একটি সময় আসবে, তখন মানুষের সম্মুখে এর বাস্তবতা খুলে যাবে এবং তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, পবিত্র কুরআন সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কেন ঘোষণা করেছে।

এ হলো সুদ হারাম হওয়ার একটি দিক, আমি যা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছি।

সুদি ব্যবস্থার বিকল্প

আরও একটি প্রশ্ন আছে, যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা আজকাল মানুষের মনে জাগ্রত হচ্ছে। প্রশ্নটি হলো, আমরা একথা স্বীকার করি যে, 'ইন্টারেস্ট' হারাম।

কিন্তু যদি 'ইন্টারেস্ট'কে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়, তা হলে এর বিকল্প পদ্ধতিটা কী হবে, যার মাধ্যমে অর্থনীতিকে পরিচালনা করা হবে? কারণ, বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে অর্থনীতির প্রাণ 'ইন্টারেস্টে'র উপর প্রতিষ্ঠিত। এর প্রাণটিকে যদি বের করে দেওয়া হয়, তা হলে তো একে পরিচালনা করার মতো দ্বিতীয় কোনো পদ্ধতি চোখে পড়ছে না। এজন্য মানুষ বলছে, 'ইন্টারেস্ট' ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যবস্থার অস্তিত্বই নেই। থাকেও যদি, তা হলে তা বাস্তবায়নযোগ্য নয়। তদুপরি কারও কাছে যদি বাস্তবায়নযোগ্য কোনো ব্যবস্থা থাকে, তা হলে তিনি সেটি উপস্থাপন করুন। তিনি বলুন সেটি কী?

এই প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ। এক বৈঠকে আলোচনা করে বিষয়টি পুরোপুরি বোঝানো সম্ভব নয়। এর উত্তর খানিক টেকনিক্যালও। একে সহজবোধ্য ও সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত করা সহজও নয়। তবে আমি বিষয়টিকে সহজবোধ্য উপায়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি, যাতে আপনারা বুঝতে সক্ষম হন।

ইসলাম অপরিহার্য বিষয়াবলিকে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করেনি

সবার আগে একথাটি বুঝে নিন যে, আল্লাহ যখন কোনো বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন, তখন সেটি হারামই। এমতাবস্থায় এটা সম্ভবই নয় যে, সেই বস্তুটি মানুষের জন্য অপরিহার্য হবে এবং মানুষ সেই বস্তুটি ব্যতীত চলতে পারবে না। কারণ, সেই বস্তুটি যদি অপররিহার্য হতো, তা হলে আল্লাহ তাকে হারাম সাব্যস্ত করতেনই না। কারণ, পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন :

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

'আল্লাহ কোনো মানুষকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য চাপান না।'[৫৬]

অর্থাৎ– আল্লাহ মানুষকে এমন কোনো আদেশ করেন না, যেটি পালন করা তার সাধ্যের অতীত। কাজেই একজন মুমিনের জন্য এতটুকু কথা-ই যথেষ্ট যে, একটি বিষয়কে আল্লাহপাক যখন হারাম সাব্যস্ত করেছেন, তা হলে আল্লার এই হারাম করা-ই প্রমাণ করে, এটি মানুষের জন্য অপরিহার্য নয়। এটি ছাড়াও মানুষের পক্ষে চলা সম্ভব। এর মাঝে কোনো অসুবিধা আছে অবশ্যই। একথা বলা যাবে না যে, এটি ছাড়া কাজ চলবে না এবং এটি অপরিহার্য বিষয়।

'সুদি ঋণে'র বিকল্প শুধু 'করজে হাসানা'-ই নয়

দ্বিতীয় কথাটি হলো, কিছু লোক মনে করে, 'ইন্টারেস্ট' (সুদ) – যাকে পবিত্র কুরআন হারাম সাব্যস্ত করেছে – তার অর্থ হলো, আগামীতে যখন

---

৫৬. সূরা বাকারা : ২৮৬

কাউকে ঋণ প্রদান করা হবে, তখন তাকে সুদবিহীন ঋণ দেবে এবং তার জন্য কোনো মুনাফা দাবি করবে না। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যখন 'ইন্টারেস্ট' বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তখন আমরা সুদবিহীন ঋণ পাব আর সেই ঋণের টাকা দ্বারা আমরা বাড়ি নির্মাণ করব, মিল-কারখানা স্থাপন করব এবং আমাদের নিকট থেকে কেউ 'ইন্টারেস্ট' দাবি করবে না। আর এই চিন্তার উপরই ভিত্তি করে মানুষ বলছে, এই পন্থাটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এই ঋণ কেউ দেবে না।

সুদি ঋণের বিকল্প 'অংশীদারিত্ব'

মনে রাখবেন, Intererst-এর বিকল্প (Alternative) 'করজে হাসানা' নয় যে, আপনি কাউকে এমনিতেই ঋণ দিয়ে দেবেন। বরং তার বিকল্প হলো, 'অংশীদারিত্ব'। অর্থাৎ– কেউ যদি ব্যবসার জন্য ঋণ গ্রহণ করে, তা হলে ঋণদাতা একথা বলতে পারে, আমি তোমার ব্যবসায় অংশীদার হতে চাই। ব্যবসায় যদি তোমার লাভ হয়, তা হলে তার একটি অংশ আমাকে দিতে হবে। আর যদি লোকসান হয়, তা হলে আমি তাতেও তোমার অংশীদার হব। এভাবে ঋণদাতা এই ব্যবসার লাভ-লোকসানে অংশীদার হয়ে যাবে এবং ব্যবসাটি অংশীদারত্বের ব্যবসায় পরিণত হবে। এই হলো Intererst-এর বিকল্প পদ্ধতি (Alternative System)।

এই অংশীদারিত্বের তাত্ত্বিক দিকটি আমি আপনাদের সম্মুখে আগেও উপস্থাপন করেছি যে, Intererst পদ্ধতিতে সম্পদের অতি সামান্য অংশ ডিপোজিটারদের হাতে যায়। কিন্তু যদি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কারবার পরিচালনা করা হয় এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পুঁজিবিনিয়োগ (Financing) করা হয়, তা হলে এই পদ্ধতিতে ব্যবসায় যা মুনাফা হবে, তার একটি যৌক্তিক অংশ বিনিয়োগকারীদের হাতে যাবে। আর এই পদ্ধতিতে সম্পদের বণ্টন (Distribution Of Wealth) উপরের দিকে যাওয়ার পরিবর্তে নিচের দিকে আসবে। কাজেই ইসলাম যে বিকল্প ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছে, সেটি হলো, 'অংশিদারিত্বের ব্যবস্থা'।

অংশীদারিত্বের শুভ ফলাফল

কিন্তু এই অংশীদারিত্বের ব্যবস্থা যেহেতু বর্তমান পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত কোথাও চালু হয়নি এবং তার অনুসরণ শুরু হয়নি, তাই তার বরকতও মানুষের সম্মুখে আসছে না। সাম্প্রতিককালে এই ২০-২৫ বছর হলো, মুসলমানদের বিভিন্ন অঞ্চলে এই পদ্ধতিটি চালু করার চেষ্টা চালানো হয়েছে যে, এমন কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত করা হবে, যেটি 'ইন্টারেস্ট' পদ্ধতির

পরিবর্তে ইসলামী আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। আপনাদের জানা থাকার কথা যে, বর্তমানে সারা পৃথিবীতে অন্ততপক্ষে ৮০ থেকে ১০০টি ব্যাংক ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলোর দাবি হলো, আমরা ইসলামী নিয়ম-নীতি অনুসারে কারবার পরিচালনা করছি এবং সুদমুক্ত ব্যবসা করছি।

আমি একথা বলছি না যে, তাদের এই দাবি শতভাগ সঠিক। বরং হতে পারে, তাতে কিছু ভুল-ত্রুটিও আছে। কিন্তু একথাটি সত্য যে, বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় একশোটি প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক সুদবিহীন ব্যবস্থার উপর কাজ করছে। উক্ত ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানগুলো অংশীদারি পদ্ধতির বাস্তবায়ন শুরু করে দিয়েছে। আর যেখানেই অংশীদারি পদ্ধতিটিকে গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানেই তার ভালো সুফল পাওয়া গেছে। আমরা পাকিস্তানে একটি ব্যাংকে এই পদ্ধতিটি পরীক্ষা করেছি। আমি নিজে উক্ত ব্যাংকের 'মাযহাবী নেগরান কমিটি'র (ধর্মীয় তত্ত্বাবধান পরিষদ) একজন সদস্য হওয়ার সুবাদে ব্যাংকটির কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত আছি। এই ব্যাংক 'অংশীদারিত্ব' নীতির ভিত্তিতে ডিপোজিটারদের সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ পর্যন্ত মুনাফা প্রদান করেছে। কাজেই এই 'অংশীদারিত্ব' পদ্ধতিটিকে ব্যাপকভাবে চালু করা যায়, তা হলে এর ফলাফল আরও ভালো হতে পারে।

অংশীদারিত্বের বাস্তবায়নগত জটিলতা

কিন্তু এই পদ্ধতিতে বাস্তবায়নগত একটি জটিলতাও আছে। তা হলো, যেমন– এক ব্যক্তি অংশিদারি ভিত্তিতে ব্যাংক থেকে অর্থ নিল। আর অংশীদারি মানে লাভে ও লোকসানে অংশগ্রহণ। অথাৎ– যদি ব্যবসায় লাভ হয়, তাতেও অংশীদার হবে এবং যদি লোকসান হয়, তাতেও অংশীদার হবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, খোদ আমাদের মুসলিম বিশ্বে অসততা ও অবিশ্বস্ততা এত বেশি ও এত ব্যাপক যে, কোনো ব্যক্তি যদি এই ভিত্তির উপর ব্যাংক থেকে অর্থ নিতে পারে যে, লাভ হলে লাভ এনে দেব আর লোকসান হলে ব্যাংকও তার অংশীদার হবে, তা হলে বিনিয়োগ গ্রহীতা বিনিয়োগ গ্রহণ করে ব্যাংক থেকে বিদায় নেওয়ার পর আর ফিরে আসবে না। সে ব্যাংককে শুধু লোকসানই দেখাবে এবং মুনাফা দেওয়ার পরিবর্তে উল্টো ব্যাংকের কাছে লোকসানের ভর্তুকি দাবি করবে।

অংশীদারিত্ব পদ্ধতির বাস্তবায়নগত দিকের এটি একটি গুরুতর সমস্যা। কিন্তু এই সমস্যার সম্পর্ক অংশীদারিত্ব সিস্টেমের সঙ্গে নয়। বরং এর সম্পর্ক সেই মানুষের ত্রুটির সঙ্গে, যারা এই ব্যবস্থার অনুসরণ করছে। তাদের মাঝে উত্তম চরিত্র, সততা ও আমানত নেই। আর এ-কারণেই 'অংশীদারিত্ব' পদ্ধতির

মাঝে এই ঝুঁকি বিরাজমান যে, মানুষ ব্যাংক থেকে 'অংশীদারিত্বে'র চুক্তিকে ঋণ নেবে আর পরে ব্যবসায় লোকসান দেখিয়ে ব্যাংকের মাধ্যমে ডিপোজিটারদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

এই জটিলতার সমাধান

কিন্তু এটি সমাধান-অযোগ্য কোনো সমস্যা নয়। এটি এমন কোনো সমস্যা নয় যে, এর কোনো সমাধান খুঁজে বের করা যাবে না। কোনো রাষ্ট্র যদি 'অংশীদারিত্ব' ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নেয়, তা হলে সেই দেশ অনায়াসেই এই সমস্যার সমাধান বের করে নিতে সক্ষম হবে। যার সম্পর্কে প্রমাণিত হবে, বিনিয়োগের জন্য অর্থ গ্রহণের পর সে অসততার পরিচয় দিয়েছে এবং তার একাউন্টস্ প্রদর্শনে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তা হলে সরকার তাকে দীর্ঘ একটি সময়ের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করে দেবে এবং ভবিষ্যতে কোনো ব্যাংক তাকে ফাইন্যান্সিং-এর কোনো সুবিধা প্রদান করবে না। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মানুষ অসততা প্রদর্শন ও দুর্নীতির আশ্রয় নিতে ভয় পাবে। বর্তমানেও বিভিন্ন 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানী' কাজ করছে এবং তারা তাদের ব্যালেন্সসীট প্রকাশ করছে। সেই সীটে দুর্নীতিও হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাতে মুনাফা দেখাচ্ছে।

কাজেই 'অংশীদারিত্ব' ব্যবস্থাকে যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করে নেওয়া হয়, তা হলে এই সমাধানটিকেও অবলম্বন করা যেতে পারে।

কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গ্রহণ করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বেসরকারি পর্যায়ে এই ব্যবস্থার বাস্তবায়ন খুবই কঠিন কাজ। তবে কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সিলেক্টেড ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বচ্ছ কথাবার্তার মাধ্যমে 'অংশীদারিত্ব' করতে পারে।

দ্বিতীয় বিকল্প পদ্ধতি 'ইজারা'

তা ছাড়া আল্লাহপাক ইসলামের আদলে আমাদেরকে এমন একটি দ্বীন দান করেছেন, যার মধ্যে 'মুশারাকা' বাদেও ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সিং-এর আরও বহু পদ্ধতি আছে। যেমন– একটি পদ্ধতি আছে 'ইজারা' (Leasing)। পদ্ধতিটি হলো, এক ব্যক্তি বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকে আবেদন জানাল। ব্যাংক তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার কোন কাজে টাকা দরকার? তিনি বললেন, কারখানার জন্য আমার বিদেশ থেকে একটি মেশিন আমদানি করতে হবে। ব্যাংক তাকে টাকা দিল না। বরং নিজেরা মেশিন কিনে ভাড়ার চুক্তিতে তাকে দিয়ে দিল।

পরিভাষায় এই কাজটিকে 'ইজারা' বা Leasing বলা হয়। কিন্তু আজকাল ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকগুলোতে 'ফাইন্যান্সিং লিজিং'-এর যে-পদ্ধতিটি চালু আছে, তা শরীয়তসম্মত নয়। এর এগ্রিমেন্টে অনেকগুলো ধারা (Clauses) শরীয়তপরীপন্থী। তবে একে খুব সহজেই শরীয়তসম্মত বানিয়ে নেওয়া যায়। পাকিস্তানে একাধিক ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান এমন আছে, যেগুলোর লিজিং এগ্রিমেন্ট শরীয়তসম্মত।

তৃতীয় বিকল্প পদ্ধতি 'মুরাবাহা'

অনুরূপ আরও একটি পদ্ধতি আছে, আপনারা যার নাম শুনে থাকবেন। সেটি হলো, 'মুরাবাহা ফাইন্যান্সিং'। এটিও অপরের সঙ্গে লেনদেন করার একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে লাভের ভিত্তিতে পণ্যটি বিক্রি করে দেওয়া হয়। মনে করুন, এক ব্যক্তি কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণের আবেদন জানাল। কিন্তু ব্যাংক তাকে টাকা না দিয়ে সেই মালটি ক্রয় করে লাভের ভিত্তিতে তার কাছে বিক্রি করল। ইসলামে এই পদ্ধতিও জায়েয। অনেকে মনে করে, এই পদ্ধতি তো হাত ঘুরিয়ে কান ধরার মতো হয়ে গেল। কারণ, এখানে ব্যাংক এক পদ্ধতির পরিবর্তে আরেক পদ্ধতিতে মুনাফা আদায় করে নিল। কিন্তু তাদের এই বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ, পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন :

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর রিবাকে করেছেন হারাম।'[৫৭]

ক্রয়-বিক্রয় হালাল আর রিবা (সুদ) হারাম এটি আল্লাহপাকের সিদ্ধান্ত। কাজেই এখানে মানুষের প্রশ্ন তুলবার কোনোই সুযোগ নেই। তা ছাড়া মক্কার মুশরিকরাও এই যুক্তির অবতারণা করত। তারা বলত, ক্রয়-বিক্রয় তো রিবারই মতো। ক্রয়-বিক্রয়েও মানুষ মুনাফা অর্জন করে, রিবায়ও মুনাফা অর্জন করে। কাজেই দুয়ের মাঝে পার্থক্যটা কী? পবিত্র কুরআন তাদেরকে একটিই উত্তর দিয়েছিল যে, এটি আমার বিধান যে, রিবা হারাম আর ক্রয়-বিক্রয় হালাল। এর অর্থ হলো, অর্থের উপর অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া যায় না এবং অর্থের উপর অতিরিক্ত মুনাফা নেওয়া যায় না। কিন্তু মধ্যখানে যদি কোনো বস্তু কিংবা ব্যবসাপণ্য এসে পড়ে এবং সেই পণ্য বিক্রি করে মুনাফা করে, তা হলে আমি তাকে হালাল ঘোষণা করলাম। আর মুরাবাহা পদ্ধতিতে মধ্যখানে পণ্য আসছে। এজন্য ইসলামের আইনে এই ক্রয়-বিক্রয় বৈধ।

---

৫৭. সূরা বাকারা : ২৭৫

পছন্দনীয় বিকল্প কোনটি?

কিন্তু এই 'মুরাবাহা' ও 'লিজিং' কাঙ্খিত ও পছন্দনীয় বিকল্প নয় এবং এর দ্বারা সম্পদ বণ্টনের উপর মৌলিক কোনো প্রভাব পড়ে না। পছন্দনীয় বিকল্প হলো 'মুশারাকা'। কিন্তু আগামীতে যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হবে, তাদের জন্য পরীক্ষামূলক মেয়াদে মুরাবাহা ও লিজিং পদ্ধতির উপর কাজ করার সুযোগ আছে। বর্তমানেও কিছু ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এসব ভিত্তির উপর কাজ করছে।

এ হলো, সুদ ও এতদ্‌সম্পর্কিত বিষয়ে সাধারণ কথা, যা আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করলাম। সুদসম্পর্কিত আরও একটি মাসআলা আছে, যার প্রতিধ্বনি বারবার কানে আসছে। তা হলো, অনেকে বলছে, দারুল হার্‌বে – যেখানে অমুসলিমদের শাসন চলছে – সুদি লেনদেনে কোনো সমস্যা নেই। সেসব দেশে অমুসলিম সরকার থেকে সুদ নেওয়া যায়। এ মাসআলাটির উপর সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, চাই দারুল হার্‌ব হোক, চাই দারুল ইসলাম, সুদ সবখানেই হারাম। সুদ দারুল ইসলামে যেমন হারাম, তেমনি দারুল হার্‌বেও হারাম।

তবে অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমানরা যেন অবশ্যই ব্যাংকে কারেন্ট একাউন্ট ব্যবহার করে, যেখানে আমানতের উপর কোনো সুদ আসে না। যদি কেউ ভুলবশত সেভিংস একাউন্ট ব্যবহার করে ফেলে, তা হলে তাতে যে সুদ আসে, পাকিস্তানে তো আমরা মানুষদের বলে দেই যে, সুদের অর্থ ব্যাংকেই রেখে দিন। কিন্তু যেসব দেশে এমন অর্থ ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যয় হয়, সেসব দেশে মুসলমানদের উচিত, সুদের অর্থ ব্যাংক থেকে তুলে ছাওয়াবের নিয়ত ব্যতীত যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে দান করে দেওয়া এবং সেই অর্থ নিজের কাজে না লাগানো।

আধুনিক যুগে ইসলামী অর্থনীতির প্রতিষ্ঠান

আমি আরও একটি কাজের কথা বলতে চাই। কাজটি তুলনামূলকভাবে খানিক কঠিন মনে হচ্ছে। কিন্তু তথাপি সাধ্যপরিমাণ চেষ্টা করা দরকার। কাজটি হলো, আমরা নিজেরা এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাব, যেটি ইসলামী ভিত্তির উপর কাজ করবে। আর যেমনটি আমি এইমাত্র বলেছি যে, 'মুশারাকা', 'মুরাবাহা' ও 'লিজিং' পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত আছে এবং সেসব ভিত্তির উপর মুসলমানগণ নিজস্ব প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাতে পারে। এখানকার মুসলমানগণ মাশাআল্লাহ এই বিষয়টি বোঝে এবং এর মাঝে স্বয়ং তাদের জন্য সমস্যাবলির

সমাধানও আছে। তাদের উচিত, এখানে বসে 'ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত করা। আমেরিকায় আমার জানামতে কমপক্ষে হাউজিং-এর সীমা পর্যন্ত দুটি প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান আছে এবং তারা সঠিক ইসলামী ভিত্তির উপর কাজ করছে। তার একটি টরেন্টোতে, অপরটি লস্এন্জেল্স-এ। এখন এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ানো দরকার এবং মুসলমানদেরকে নিজেদের মতো করে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো আবশ্যক। কিন্তু তার জন্য বুনিয়াদি শর্ত হলো, কাজটি করতে হবে বিজ্ঞ ফকীহ ও মুফতীদের পরামর্শ অনুপাতে। আপনারা যদি এ কাজে আমার থেকেও সহযোগিতা নিতে চান, আমি আপনাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত আছি। যেমনটি আমি বলেছি, বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় একশোটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে এবং প্রায় পাঁচ বছর যাবত আমি সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে খেদমতে নিয়োজিত আছি। মহান আল্লাহ আপনাদেরকেও এই কাজের তাওফীক দান করুন এবং মুসলমানদের জন্য ভালো একটি পথ বের করে দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত– খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৭-৭০

প্রচলিত সুদ ও বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهٗ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদী মহাজন, সুদের খাতক, সুদী লেনদেনের স্বাক্ষী ও তার কেরানী সব কজনকে অভিশম্পাত করেছেন।[৫৮]

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, সুদের কারবার যেমন হারাম, তেমনি সুদের দালালি করা কিংবা সুদের হিসাব লেখাও না-জায়েয। এই হাদীসেরই ভিত্তিতে ফাতাওয়া প্রদান করা হচ্ছে, আজকালকার ব্যংকগুলোতে চাকুরি করা জায়েয নয়। কেননা, এই প্রক্রিয়ায় মানুষ কোনো-না-কোনোভাবে সুদী কারবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদের চুক্তি লিপিবদ্ধকারী

এই বিষয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হাফেয ইবনে হাজ্র আসকালানী রহ. লিখেছেন, হাদীসে উল্লেখিত 'কাতিবে রিবা' দ্বারা উদ্দেশ্য সেই ব্যক্তি, যে সুদী লেনদেনের চুক্তির সময় সুদ ইত্যাদির হিসাব লিখে উভয় পক্ষের এই চুক্তিতে সহযোগিতা করে। এমন ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি সুদী লেনদেনের চুক্তির সময় এসব হিসাব লিখে না; তবে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরে বিগত সময়ের সমস্ত হিসাবের অডিট করে, রিপোর্ট ইত্যাদি প্রস্তুত করে, এমন ব্যক্তি এই হুঁশিয়ারির অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ, সে সুদী কারবারের চুক্তিতে সহযোগিতা করেনি। এই

---

৫৮. সুনানে তিরমিযী কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং ১১২৭; সুনানে আবুদাউদ কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং ২৮৯৫; সুনানে ইবনে মাজা কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং ২২৬৮

বিশ্লেষণ অনুপাতে একাউন্টস ও অডিটের কাজে যারা নিয়োজিত, যাদেরকে বিভিন্ন ফার্ম, প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানীতে পুরো বছরের হিসাব লিপিবদ্ধ করতে হয়, সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয় আবার প্রতিষ্ঠানগুলোর কৃত সুদ ইত্যাদির হিসাবও লিখতে হয়। কিন্তু তাদের এই লেখা একটি বাৎসরিক রিপোর্টের মর্যাদা রাখে – কোম্পানীর সুদী লেনদেনে কোনো সহযোগিতা করে না। এমন ব্যক্তিবর্গ আলোচ্য হুমকির অন্তর্ভুক্ত হবে না। আল্লাহ ভালো জানেন।

ব্যাংকে চাকুরি করা হারাম কেন?

প্রশ্ন আসে, ব্যাংকে চাকুরি করা হারাম কেন? যুক্তি দেখানো হয়, আজকাল তো সব জায়গা থেকে অর্থ ব্যাংকেরই মাধ্যমে আসে। কোনো বস্তুই সুদ থেকে মুক্ত নয়। এমতাবস্থায় আমাদের চাকুরিটা হারাম হবে কেন?

এর উত্তর হলো, শরীয়ত প্রতিটি জিনিসের একটি সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, এই সীমানা পর্যন্ত জায়েয এবং এই বাইরে গেলে না-জায়েয। ব্যাংকের চাকুরি না-জায়েয হওয়ার কারণ হলো, ব্যাংকের মাধ্যমে সুদী লেনদেন হয়। আর যারা সুদী ব্যাংকে চাকুরি করেন, তারা কোনো-না-কোনো পর্যায়ে সুদী লেনদেনে সহযোগিতা করছেন। আর যে কোনো গুনাহের কাজে সহযোগিতা করা পবিত্র কুরআনের ভাষ্যমতে হারাম। আল্লাহপাক বলেন :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

'তোমরা অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনের কাজে কেউ কাউকে সহায়তা করো না।'[৫৯]

এ কারণে ব্যাংকের চাকুরি হারাম।

আর এই যে যুক্তি দেখানো হচ্ছে, সকল অর্থ ব্যাংকেরই মাধ্যমে আমাদের কাছে আসে, তাই ব্যাংকের চাকুরি হারাম হলে সকল পেশা-ই হারাম হওয়া দরকার। শুধু ব্যাংকের চাকুরি হারাম হবে কেন?

এর উত্তর হলো, ব্যাংকের মাধ্যমে মানুষের হাতে যেসব অর্থ আসছে, সেই অর্থ যদি হালাল উপায়ে অর্জিত হয়ে থাকে, তা হলে এই অর্থের ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি হারাম উপায়ে অর্জিত হয়, তা হলে এই অর্থের ব্যবহারও হারাম হবে।

কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত 'রিবা'

'রিবা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বাড়তি বা অতিরিক্ত। শরীয়তের পরিভাষায় এই শব্দটি পাঁচ ধরনের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ব্যবহার দুটি অর্থে হয়ে থাকে। এক. 'রিবান নাসীআহ', দুই. রিবাল ফায্ল'।

---

৫৯. সূরা মায়েদা : ২

'রিবান নাসীআহ'-এর সজ্ঞা হলো :

هُوَ الْقَرْضُ الْمَشْرُوْطُ فِيْهِ الْاَجَلُ وَزِيَادَةُ مَالٍ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ

'সেই ঋণ, যেখানে ঋণগ্রহীতার জন্য নির্ধারিত সময় ও অতিরিক্ত পরিশোধের শর্ত থাকে।'

এর আরেক নাম 'রিবাল কুরআন'

'রিবাল ফায্ল'-এর সজ্ঞা হলো, 'এক জাতীয় দুটি বস্তুর মাঝে বিনিময়ের সময় কম-বেশি করা। এর আরেক নাম 'রিবাল হাদীস'।

প্রথমটিকে হারাম করেছে কুরআন; তাই এর নাম 'রিবাল কুরআন'।। আর দ্বিতীয়টিকে হারাম করেছে হাদীস; তাই এর নাম 'রিবাল হাদীস'।

'সরল সুদ' ও 'চক্রবৃদ্ধি সুদ' উভয়ই হারাম

অনেকে প্রশ্ন করেন, পবিত্র কুরআন তো শুধু 'চক্রবৃদ্ধি সুদ'কে হারাম করেছে। কুরআন 'সরল সুদ'কে হারাম করেনি। তারা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি দ্বারা দলিল দিয়ে থাকে। আল্লাহপাক বলেছেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰۤوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না।'[৬০]

এই আয়াতে 'রিবা'র সঙ্গে 'চক্রবৃদ্ধি'র শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। কাজেই কেবল সেই সুদ হারাম হবে, যাতে সুদের হার মূল অর্থের অন্তত দ্বিগুণ হবে।

কিন্তু তাদের এই দলিল প্রদান সঠিক নয়। কারণ, সব যুগের সকল আলেম একমত যে, এই আয়াতে 'চক্রবৃদ্ধি'র শর্ত আরোপ করে একথা বোঝানো হয়নি যে, সকল ক্ষেত্রে সুদ হারাম হওয়ার জন্য চক্রবৃদ্ধি শর্ত। চক্রবৃদ্ধি হলেই কেবল সুদ হারাম হবে; অন্যথায় হারাম হবে না। বরং এখানে বলা হয়েছে, চক্রবৃদ্ধিহারে যে সুদ নেওয়া হয়, সেটি হারাম। আর আল্লাহপাক এই নিষেধাজ্ঞা একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জারি করেছেন, যেখানে চক্রবৃদ্ধির বিষয়টি ছিল। এই শর্তারোপের বিষয়টি এমন, যেমন– এক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا

'তোমরা আল্লাহর আয়াতগুলোকে অল্প দামে বিক্রি করো না।'[৬১]

এই আয়াতে আল্লাহপাক কুরআনকে অল্প দামে বিক্রি করতে বারণ করেছেন। অর্থাৎ– বিক্রয়ের সঙ্গে 'অল্প দাম'-এর শর্ত আরোপ করেছেন। কিন্তু

---

৬০. আলে ইমরান : ১৩০

৬১. সূরা বাকারা : ৪১

কোনো বিবেকবান মানুষই আয়াতটির এই মর্ম বুঝবে না যে, পবিত্র কুরআনের আয়াতকে অল্প দামে বিক্রি করা হারাম বলা হয়েছে বটে; কিন্তু বেশি দামে বিক্রি করতে কোনো দোষ নেই। কাজেই এই আয়াতের শর্ত আর উল্লিখিত আয়াতের শর্ত একই পর্যায়ভুক্ত।

এ জাতীয় আরও কয়েকটি আয়াত দেখুন :

১. আল্লাহপাক বলছেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে, তা ছেড়ে দাও; যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।'[৬২]

এই আয়াতে مَا শব্দটি ব্যাপক, যা রিবার প্রত্যেক অল্প ও অধিক পরিমাণকে অন্তর্ভুক্ত করে।

২. বিদায় হজের ভাষণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছিলেন :

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ

'আজ জাহেলিয়াতের সুদ পরিত্যাজ্য ঘোষণা করা হলো। আমি সর্বপ্রথম আমাদের সুদ, মানে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব-এর সুদকে রহিত ঘোষণা করছি। তার সুদ পুরোপুরি পরিত্যাজ্য।'[৬৩]

এই হাদীসে كله (সমস্ত) শব্দটি রিবার যেকোনো পরিমাণকে সুস্পষ্টরূপে হারাম সাব্যস্ত করছে।

৩. হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا -

'যে ঋণ মুনাফা টানে, সেটিই রিবা।'

এই হাদীসের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম نَفْعًا শব্দটি একথা প্রমাণ করে যে, মুনাফার যেকোনো পরিমাণ হারাম।

এই বিশ্লেষণ দ্বারা জানা গেল, আয়াতে اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً (চক্রবৃদ্ধিহারে)-এর এই শর্তটি প্রাসঙ্গিক–মৌলিক নয়।

---

৬২. সূরা বাকারা : ২৭৮

৬৩. সহীহ মুসলিম কিতাবুল হাজ্জ : হাদীস নং ১২৩৭; সুনানে আবুদাউদ কিতাবুল মানাসিক : হাদীস নং ১৬২৮; সুনানে ইবনে মাজা : হাদীস নং-৩০৪৬; সুনানে দারেমী কিতাবুল মানাসিক : হাদীস নং ১৭৭৪

সুদখোরের বিরুদ্ধে আল্লাহপাকের যুদ্ধ ঘোষণা

সুদ হারাম হওয়ার আয়াতগুলো অকাট্য এবং যারা সুদ খায়, সুদের কারবার করে, পবিত্র কুরআনে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি ঘোষণা করা হয়েছে। এত শক্ত হুঁশিয়ারি যে, সম্ভবত এমন কঠোর হুঁশিয়ারি অন্যকোনো অপরাধের বেলায় ঘোষণা করা হয়নি। যেমন– এক আয়াতে আল্লাহপাক বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে, তা ছেড়ে দাও; যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। যদি তোমরা তা না কর (সুদের বকেয়া না ছাড় এবং সুদের কারবার অব্যাহত রাখ), তা হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।'[৬৪]

এই আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি সুদের লেনদেন, সুদের কারবার পরিত্যাগ না কর, তা হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।

বর্তমান ব্যাংকগুলোর সুদ হারাম নয় কি?

আজ গোটা বিশ্ব সুদের জালে আটকে আছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তি-ই তো সুদের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। সকল ব্যবসা সুদের ভিত্তিতে চলছে। বড়-বড় পুঁজিপতিরা, বড়-বড় কোম্পানীগুলো ব্যাংক থেকে সুদের উপর ঋণ নিচ্ছে এবং সেই অর্থ দ্বারা কারবার পরিচালনা করছে।

এহেন পরিস্থিতিতে ইসলামী বিশ্বে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটেছে যে, তারা দাবি করে বসেছেন, বর্তমান ব্যাংকগুলোর সুদ সেই সুদ নয়, যাকে পবিত্র কুরআন হারাম করেছে। তারা প্রমাণ উপস্থাপন করছে, সে যুগে মানুষ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ নিত। যেমন– একজন মানুষের ঘরে খাওয়ার কিছু নেই এবং তার কাছে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করার মতো কোনো অর্থ নেই। এমতাবস্থায় সে কোনো একজন সামর্থ্যবান ব্যক্তির কাছে গিয়ে বলল, আমি পরিবার-পরিজন নিয়ে না খেয়ে আছি; আমাকে কিছু টাকা ঋণ দিন, যাতে তা দ্বারা কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেয়ে বাঁচতে পারি। উত্তরে লোকটি বলল, আমি তোমাকে ঋণ দিতে পারি; কিন্তু তাতে আমাকে সুদ দিতে হবে। আমি তোমাকে

---

৬৪. সূরা বাকারা : ২৭৮, ২৭৯

সুদের উপর ঋণ দিতে পারি। কাজেই তুমি ওয়াদা করো, এই ঋণের সঙ্গে এত টাকা সুদ পরিশোধ করবে।

তো বলা বাহুল্য, এটি চরম এক অবিচার যে, একজন মানুষ না খেয়ে জীবন যাপন করছে আর সেই ক্ষুধা নিবারণের জন্য আপনার কাছে ঋণ চাচ্ছে; কিন্তু আপনি তার কাছে সুদ দাবি করছেন! অথচ আপনার নৈতিক কর্তব্য ছিল, নিজের পক্ষ থেকে তার ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করা।

কিন্তু সেই জায়গায় ঋণ দিয়ে আপনি তার থেকে সুদ দাবি করছেন। এমন সুদ সম্পর্কেই পবিত্র কুরআন বলেছে, তোমরা যদি এই সুদ পরিত্যাগ না কর, তা হলে তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। কিংবা যেমন– এক ব্যক্তির ঘরে কেউ মারা গেল। তার কাফন-দাফনের জন্য অর্থের ব্যবস্থা নেই।

ফলে বাধ্য হয়ে সে আপনার কাছে কিছু টাকা ঋণ চাইল। কিন্তু আপনি বললেন, আমি তোমাকে ঋণ দেব; কিন্তু আমাকে এর জন্য সুদ দিতে হবে। আমি সুদ ছাড়া ঋণ দেব না। তো বলা বাহুল্য যে, এমন ক্ষেত্রেও সুদ দাবি করা মানবতার পরিপন্থী। তাই এ জাতীয় সুদকে পবিত্র কুরআন হারাম সাব্যস্ত করেছে।

বাণিজ্যিক ঋণের উপর সুদের স্বরূপ

কিন্তু বর্তমান যুগের ব্যাংকগুলো থেকে ঋণগ্রহীতা ব্যক্তিরা এমন কোনো গরিব-অসহায় মানুষ নয়, যাদের পেটে খাবার নেই, গায়ে কাপড় নেই, লাশ দাফনের ব্যবস্থা নেই। ব্যাংক এমন নিঃস্ব লোকদেরকে ঋণ দেয়ই না। আপনি-আমি যদি ব্যাংকে লোনের জন্য যাই, তা হলে ব্যাংকওয়ালারা আমাদেরকে পিটিয়ে ব্যাংক থেকে বেরই করে দেবে। বরং ব্যাংক থেকে যারা লোন নেয়, তারা বড়-বড় পুঁজিপতি ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ। আর তারা পেটের দায়ে লোন নেয় না। বরং তাদের লোন নেওয়ার উদ্দেশ্য থাকে, এই অর্থকে ব্যবসায় বিনিয়োগ করে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা, মুনাফা করা। যেমন– ব্যাংক থেকে এক লাখ টাকা ঋণ নিয়ে একে দুলাখ টাকায় পরিণত করা।

তা ছাড়া তারা ব্যাংক থেকে যে অর্থ লোন নেয়, সেগুলো জনগণেরই অর্থ। যারা তাদের উপার্জন থেকে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে ব্যাংকে আমানত রেখেছে। এমতাবস্থায় এই অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যাংক যদি সুদের নামে কিছু মুনাফা গ্রহণ করে, তা হলে এতে দোষের কী আছে! এখানে অবিচারের কী আছে! কাজেই সেযুগে যে সুদের প্রচলন ছিল, তাতে ঋণগ্রহীতার উপর অবিচার হতো। আর সেজন্যই পবিত্র কুরআন সেই সুদকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। কাজেই বর্তমান যুগের ব্যাংকের সুদ হারাম নয়।

কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, এক ধরনের ঋণ আছে, যাকে মানুষ নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য গ্রহণ করে থাকে। এমন ঋণকে 'সারফী' বলা হয়। আরেক ধরনের ঋণ আছে, যাকে মানুষ বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে থাকে। এমন ঋণকে 'বাণিজ্যিক ঋণ' বা 'উৎপাদনি ঋণ' বলা হয়। সুদের বৈধতার প্রবক্তাদের দাবি হলো, পবিত্র কুরআন 'সারফি ঋণ'-এর উপর সুদকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। 'বাণিজ্যিক ঋণের সুদ' হারাম নয়।

সুদ জায়েয হওয়ার ভ্রান্ত দলিল

যারা সুদকে জায়েয ও বৈধ লেনদেন বলে দাবি করছে, তারা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি দ্বারা দলিল উপস্থাপন করে থাকে। আল্লাহপাক বলেছেন :

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন।'[৬৫]

এই আয়াতটি উপস্থাপন করে তারা বলছে, এখানে সুদ বোঝাতে আল্লাহপাক 'আর-রিবা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শুরুতে আলিফ লাম যুক্ত করে শব্দটিকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

কাজেই এখানে 'রিবা' বলতে সেই রিবাকে বোঝানো হয়েছে, জাহেলি যুগে ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুরু যুগে যার প্রচলন ছিল। আর সে যুগে সুদ বলতে শুধু 'সারফি ঋণের সুদে'রই প্রচলন ছিল। 'বাণিজ্যিক ঋণের সুদ'-এর প্রচলন সেযুগে ছিল না। কাজেই একথাটি বলে বোঝানোর আবশ্যকতা নেই যে, একটি যুগে যার প্রচলন থাকে না, তাকে হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করার কোনো মানে হয় না। কাজেই পবিত্র কুরআন যে সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে, সেটি সেই সুদ, যার প্রচলন সেযুগে ছিল। আর তা হলো, একান্ত ব্যক্তি পর্যায়ের ঋণের সুদ। অর্থাৎ– 'সারফি ঋণে'র উপর সুদ। 'বাণিজ্যিক ঋণে'র উপর সুদ হারাম হবে না।

এরা কারা?

যারা সুদের বৈধতার পক্ষে এই দলিল ও যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন, তারা সাধারণ কোনো মানুষ নন। তারা পড়ালেখাকরা ভালো-ভালো মানুষ। এমনকি মিসরের বর্তমান গ্রান্ড মুফতী পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর সুদকে হালাল বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন। তার সেই ফতোয়ায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এক রকম হইচই পড়ে গেছে এবং বিষয়টি আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

---

৬৫. 'সূরা বাকারা : ২৭৫

মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলেই এই মতের পক্ষে কিছু-না-কিছু লোক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে স্যার সায়্যেদ আহমাদ খান এবং আরবে মুফতী আব্দাহ ও রশীদ রেজাও এই মতের ধারক ছিলেন।

পাকিস্তানে ডক্টর ফযলুর রহমান সাহেবও এই মতের সমর্থক ছিলেন। জাস্টিস কাদীরুদ্দীন খান এর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে একখানা পুস্তিকাও রচনা করে ফেলেছিলেন। একজন মানুষ যদি গভীরভাবে না দেখে, তা হলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুদের বৈধতার প্রবক্তাদের দলিল ও যুক্তি-তর্ক হৃদয়ে এই আবেদন জাগায় যে, একজন পুঁজিপতি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মুনাফা অর্জন করছে। এমতাবস্থায় যদি তার থেকে সুদ দাবি করা হয়, তা হলে তাতে অবিচারের কী থাকতে পারে? এখানে অন্যায়ের তো কিছু নেই। ফলে সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণী এই মতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এর সমর্থক হয়ে যাচ্ছে।

বিধান প্রকৃতির উপর আরোপিত হয় – আকৃতির উপর নয়

বাস্তবতা হলো, সুদের বৈধতার প্রবক্তাদের উক্ত দলিল প্রদান মারাত্মক ভুল বুঝ ও বিভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দলিল উপস্থাপনের ভূমিকা ও ফলাফল দু-ই ভুল। তাদের দলিলের ভূমিকা হলো, নবীযুগে বাণিজ্যিক সুদের প্রচলন ছিল না। আর ফলাফল হলো, নবীর যুগে যে কাজের প্রচলন থাকবে না, তার উপর হারামের সিদ্ধান্ত আরোপিত হবে না। তাদের এই ভূমিকা ও ফলাফল দুটোই ভুল। কাজেই তাদের এই দলিল সঠিক নয়।

আগে বুঝুন, এই ভূমিকা ভুল কেন। দেখুন, মূলনীতি হলো, পবিত্র কুরআন ও হাদীস যখন কোনো বিষয়ের উপর হালাল কিংবা হারামের বিধান আরোপিত করে, তখন বিধানটি সেই বস্তুটির বিশেষ কোনো আকার বা আকৃতির উপর আরোপ করে না। বরং তার প্রকৃতির উপর আরোপ করে। কাজেই যেখানে উক্ত প্রকৃতি পাওয়া যাবে, সেখানেই এই বিধানটি প্রযোজ্য হবে।

যেমন– মদের বিষয়টি ধরুন। যে যুগে মদ হারাম হয়েছে, সেযুগে তখনকার মানুষ ঘরে বসে হাত দ্বারা নিংড়ে আঙুরের রস বের করে তাকে পঁচিয়ে মদ তৈরি করত। কাজেই এযুগের কোনো ব্যক্তি যদি বলে, যেহেতু সেযুগে মানুষ হাতে মদ তৈরি করত এবং তাতে স্বাস্থ্য সুরক্ষার কোনো নীতিমালার অনুসরণ করা হতো না, সেজন্য সেযুগে মদকে হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে যেহেতু উন্নতমানের মেশিনের সাহায্যে স্বাস্থ্যের সমস্ত নিয়ম-নীতির অনুসরণ করে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশে মদ তৈরি করা হয়, তাই আমাদের এ যুগের মদের উপর হারামের সিদ্ধান্ত আরোপিত হবে না।

তো বলা অনাবশ্যক যে, এই দলিল উপস্থাপন নিতান্তই বোকামিসুলভ বলে বিবেচিত হবে। কারণ, শরীয়ত মদের বিশেষ কোনো আকার বা আকৃতিকে হারাম করেনি। বরং শরীয়ত হারাম করেছে মদের প্রকৃতিকে। কাজেই যে প্রকৃতির কারণে মদকে হারাম করা হয়েছে, কোনো বস্তুর মধ্যে যদি সেই প্রকৃতিটি পাওয়া যায়, তা হলেই তার উপর হারামের বিধান আরোপিত হবে। চাই তার সেই বিশেষ আকৃতিটি রাসূলের যুগে থাকুক বা না থাকুক।

কাজেই আজ যদি কেউ বলে, রাসূলের যুগে হুইস্কি, বিয়ার, ব্রান্ডি এসব ছিল না; তাই এগুলো হারাম নয়, তো বলা বাহুল্য যে, তার এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, রাসূলের যুগে যদিও এই নামে, এই আকারে জিনিসগুলো বিদ্যমান ছিল না; কিন্তু তার প্রকৃতি বিদ্যমান ছিল না। মদের প্রকৃতি হলো, এমন একটি পানীয়, যা নেশাকর।

আর নবীজির যুগে মদের এই প্রকৃতিকে হারাম করা হয়েছে। এই প্রকৃতি চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে গেছে। চাই তা যে কালেই হোক এবং তার নাম যা-ই হোক।

মজার একটি কৌতুক

হিন্দুস্তানে এক গায়ক ছিল। একবার সে হজে গেল। হজ সমাপনের পর মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। পথে এক মনযিলে যাত্রাবিরতি দিল। সেযুগে চলার পথে বিভিন্ন মনযিল থাকত। মানুষ সেসব মনযিলে রাতযাপন করত এবং পরদিন সকালে সম্মুখপানে রওনা হতো। নিয়ম অনুযায়ী হিন্দুস্তানি গায়ক রাতযাপনের জন্য এক মনযিলে অবস্থান গ্রহণ করল। উক্ত মনযিলে এক আরব গায়কও গিয়ে উপস্থিত হলো এবং ওখানে বসে আরবিতে গান গাইতে শুরু করল। আরব গায়কের কণ্ঠ ছিল খানিক কর্কশ ও কাঠখোট্টা। হিন্দুস্তানি গায়কের কাছে তার গান খুব বিশ্রী ও বিরক্তিকর ঠেকল। তাই সে বলে উঠল, আজ আমার বুঝে এসেছে, আমাদের নবীজি গান-বাজনাকে কেন হারাম সাব্যস্ত করেছিলেন।

তার কারণ হলো, তিনি বেদুঈনদের বেসুরো ও কর্কশ গান শুনেছিলেন। তাই তিনি গানকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। তিনি যদি আমার গান শুনতেন, তা হলে গান-বাজনাকে তিনি হারাম ঘোষণা করতেন না।

তা হলে তো শূকরও হালাল হওয়া দরকার!

আজকাল মেজাজ তৈরি হয়ে গেছে, যেকোনো বিষয়ে মানুষ হুট করে বলে ফেলে, জনাব, নবীজির আমলে তো এই আমলটি এভাবে হতো আর সেজন্য

তিনি তাকে হারাম সাব্যস্ত করেছিলেন। বর্তমানে যেহেতু আমলটি সেভাবে হয় না, তাই সেটি হারাম নয়। যারা এ ধরনের যুক্তির অবতারণা করে, তারা এমনও বলে থাকে যে, শূকরকে এজন্য হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, সেযুগে এই জন্তুটি নোংরা পরিবেশে পড়ে থাকত, আবর্জনা খেত এবং নোংরা পরিবেশে প্রতিপালিত হতো। কিন্তু শূকর এখন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত হচ্ছে এবং তাদের জন্য উন্নতমানের ফার্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কাজেই এখন শূকর হারাম হওয়ার কোনোই কারণ নেই। ঠিক অনুরূপ সুদের ব্যাপারেও একথাটি-ই বলা হচ্ছে যে, এই বাণিজ্যিক সুদ ও এই বাণিজ্যিক ঋণ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ছিল না। বরং সেযুগে ব্যক্তিগত ব্যয় ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ঋণ নেওয়া হতো। কাজেই পবিত্র কুরআন সেই সুদকে কী করে হারাম ঘোষণা করতে পারে, সেযুগে যার অস্তিত্বই ছিল না। এই যুক্তির উপর নির্ভর করে কেউ-কেউ বলে থাকেন, পবিত্র কুরআন যে সুদকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, সেটি গরিব-অসহায় জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত সুদ ছিল। আমাদের এই কারবারি সুদ হারাম নয়।

'সুদ'-এর স্বরূপ

কিন্তু তার আগে আমাদের জানতে হবে, 'সুদ'-এর প্রকৃতি কী এবং 'সুদ' কাকে বলে। 'সুদ' জিনিসটা কী। 'সুদে'র সংজ্ঞা কী, শরীয়ত যাকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। তারপর দেখতে হবে, বর্তমান এ যুগের 'বাণিজ্যিক সুদে সেই প্রকৃতি পাওয়া যায় কি-না।

তো সুদের প্রকৃতি হলো, কোনো ব্যক্তিকে প্রদত্ত ঋণের উপর যেকোনো পরিমাণ ও যেকোনো ধরনের বাড়তি দাবি করা। যেমন– আজ আমি কাউকে ঋণ হিসেবে একশো টাকা প্রদান করলাম এই শর্তে যে, এক মাস পর সে আমাকে একশো দুই টাকা পরিশোধ করবে। এরই নাম 'সুদ'।

যদি পূর্ব সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে ঋণ পরিশোধের সময় ঋণগ্রহীতা বাড়তি কিছু প্রদান করে, তা হলে তার পরিমাণ যা-ই হোক-না কেন, তা সুদ হবে না।

পবিত্র কুরআন যে সময়ে 'সুদ'কে হারাম ঘোষণা করেছে, তখন আরবদের মাঝে সুদের লেনদের একটি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ বিষয় ছিল। সে সময়ে সুদ বলতে যা বোঝানো হতো, তা হলো, প্রদত্ত ঋণের উপর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কোনো প্রকারের অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা।

ঋণ পরিশোধের উত্তম পন্থা

স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে প্রমাণিত আছে, তিনি যখন কারও নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন, তখন পরিশোধ করার সময় কিছু

বেশি দিতেন, যাতে ঋণদাতা খুশি হয়। কিন্তু বাড়তি আদান-প্রদানের কথা যেহেতু পূর্ব থেকে স্থির করা থাকত না, তাই এটা 'সুদ' হতো না।

হাদীসের পরিভাষায় একে 'হুস্‌নুল কাজা' বা 'উত্তম পরিশোধ' বলা হয়। অর্থাৎ- উত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করা, পরিশোধের সময় ভালো আচরণ করা এবং কিছু বেশি দেওয়া সুদ নয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন পর্যন্ত বলেছেন :

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

তোমাদের মধ্যে ঋণপরিশোধের পন্থা যার যত সুন্দর, সে তত ভালো মানুষ।[৬৬]

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, চুক্তি ও শর্ত আরোপ করে অতিরিক্ত আদায় করা সুদ। ঋণগ্রহীতা যদি কোনো প্রকার চুক্তি ব্যাতিরেকে পরিশোধের সময় কিছু বেশি প্রদান করে, তা হলে তা সুদ হবে না। বরং সেটি 'হুস্‌নুল কাজা'।

সারকথা হলো, সুদের এই প্রকৃতি বর্তমান যুগের ব্যাংকগুলোর বাণিজ্যিক ঋণে পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই এই বাণিজ্যিক ঋণ হারাম বলে বিবেচিত হবে। আর তাতে বাণিজ্যিক সুদ হারাম না হওয়ার পক্ষে তার প্রবক্তাগণ যে দলিল প্রদান করেন, তার ভূমিকা ও ফলাফল ভুল প্রমাণিত হলো।

নবীজির যুগে বাণিজ্যের বিস্তার

তাদের দলিলের ভূমিকা এই ছিল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে বাণিজ্যিক সুদ ছিল না। তাদের এই দাবিটিও ভুল। কারণ, আরবের যে সমাজে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছিলেন, সেখানেও আজকের এই যুগের আধুনিক বাণিজ্যের প্রায় সবগুলো ভিত্তি বিদ্যমান ছিল।

যেমন- আজকাল ব্যবসার জন্য মানুষ যৌথ কোম্পানী দাঁড় করায়, যাকে 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানী' বলা হয়। এই পদ্ধতির ব্যাপারে ধারণা হলো, এটি চতুর্দশ শতাব্দির আবিষ্কার। তার আগে ব্যবসার এই পদ্ধতির অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু আমরা যখন আরবের ইতিহাসের পাতা উল্টাই, তখন দেখতে পাই, আরবের প্রতিটি গোত্র এক-একটি স্বতন্ত্র 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানী' ছিল। তার কারণ ছিল, প্রতিটি গোত্রের ব্যবসার এই পদ্ধতি ছিল, গোত্রের প্রতিজন সদস্য তাদের একটি-একটি মুদ্রা এনে একস্থানে জমা করত। তারপর সেই অর্থ নিয়ে শাম

---

৬৬. বুখারী কিতাবুল ইসতিকরাজ... : হাদীস নং-২২১৮; সুনানে নাসাঈ কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং-৪৫৩৯; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং-৮৭৪৩

দেশে গিয়ে ব্যবসার পণ্য ক্রয় করত। আপনারা সে-কালের আরবদের যে-বাণিজ্যিক কাফেলার নাম শুনে থাকবেন, সেগুলো এ কাজটি-ই করত।

যেমন- পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন :

لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ ۝ إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ۝

'যেহেতু কুরাইশের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মের সফরের।'[৬৭]

এই আয়াতে গরম ও শীতকালের যে সফরের কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা এই বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোই উদ্দেশ্য, যারা শীতকালে ইয়েমেনের দিকে আর গরম কালে শামের দিকে সফর করত। তারা মক্কা থেকে পণ্য ক্রয় করে ওখানে নিয়ে বিক্রি করত আর ওখান থেকে ব্যবসাপণ্য ক্রয় করে মক্কায় এনে বিক্রি করত। এই কাফেলার এক-একজন লোক অনেক সময় নিজগোত্র থেকে দশ লাখ দিনারও ঋণ গ্রহণ করত।

আর বলাবাহুল্য যে, এই ঋণ তারা খাওয়ার জন্য কিংবা মৃত মানুষের কাফন-দাফনের প্রয়োজনে গ্রহণ করত না। বরং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করত।

হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.)-এর বাণিজ্যিক কাফেলা

হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.) যে বাণিজ্যিক কাফেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মক্কা থেকে আসছিলেন, যাদের উপর মুসলমানগণ আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেই কাফেলাটি সম্পর্কে হাদীসবিশারদ ও সীরাতবিদগণ লিখেছেন :

لَمْ يَبْقَ قُرَشِيٌّ وَلَا قُرَشِيَّةٌ عِنْدَهُ دِرْهَمٌ إِلَّا وَبَعَثَ بِهِ فِي الْعِيرِ

'কুরাইশের যে নারী ও পুরুষের কাছে একটিও দেরহাম ছিল, তারা তাদের সেই অর্থ উক্ত বাণিজ্যিক কাফেলায় প্রদান করে।'

এই তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হলো, এই গোত্রটি অনুরূপ যৌথ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করত।

বর্ণনায় এসেছে, বনু মুগীরা ও বনু ছাকীফ এই দুই গোত্রের মাঝে পরস্পর গোত্রীয় পর্যায়ে সুদের লেনদেন হতো। এক গোত্র আরেক গোত্র থেকে সুদের উপর ঋণ নিত। এক গোত্র ঋণ দিত আর অপর গোত্র ঋণ গ্রহণ করত। এক গোত্র সুদ দাবি করত আর অপর গোত্র সুদ পরিশোধ করত। আর এসব ঋণ হতো সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যিক।

---

৬৭. সূরা কুরাইশ : ১, ২

সর্বপ্রথম পরিত্যাগ করা সুদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে যখন সুদ হারাম হওয়ার ঘোষণা প্রদান করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন :

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ

'জাহেলিয়াতের সুদ রহিত করা হলো। সবার আগে আমি আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ রহিত করলাম। তার সম্পূর্ণ সুদ রহিত করা হলো।'[৬৮]

হযরত আব্বাস (রাযি.) সুদের উপর ঋণ দিতেন। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিলেন, আমি আমার চাচা আব্বাস-এর সম্পূর্ণ সুদ রহিত করে দিলাম। যার-যার কাছে তিনি সুদ পাওনা আছেন, সেগুলো আর পরিশোধ করতে হবে না।

বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস (রাযি.)-এর যে-সুদ রহিত ঘোষণা করেছিলেন, তার পরিমাণ ছিল দশ হাজার মিছকাল সোনা। প্রায় চার মাশায় এক মিছকাল হয়। আর এই দশ হাজার মিছকাল মূলধন ছিল না। বরং এই পরিমাণটি ছিল সুদ, যা তিনি মানুষের কাছে পাওনা ছিলেন। আপনারাই বলুন, যে বিনিয়োগের বিপরীতে দশ হাজার মিছকাল সোনা সুদ আসে, সেই ঋণ কি শুধু খাওয়া-পরার প্রয়োজনে গ্রহণ করা হয়েছিল? বলা অনাবশ্যক যে, উক্ত ঋণ ব্যবসার জন্যই নেওয়া হয়েছিল।

সাহাবাযুগে ব্যাংকিং-এর একটি দৃষ্টান্ত

বুখারী শরীফের কিতাবুল জিহাদে আছে, হযরত যুবায়র ইবনে আওয়াম (রাযি.) নিজের কাছে হুবহু এ-যুগের ব্যাংকিং সিস্টেমের মতো একটি সিস্টেম বানিয়ে নিয়েছিলেন। মানুষ তাঁর কাছে বড়-বড় অংকের আমানত রাখত।

তখন তিনি বলে নিতেন :

لٰكِنَّهُ سَلَفٌ

'আমানত নয় – এই অর্থ আমি ঋণ হিসেবে গ্রহণ করছি।'

অর্থাৎ– তোমার এই অর্থ আমার দায়িত্বে ঋণ হিসেবে থাকল।

প্রশ্ন হলো, তিনি এমনটি কেন করতেন? হাফিয ইবনে হাজ্‌র রহ. ফাত্‌হুল বারীতে তার কারণ এই লিখেছেন যে, ঋণের এই পদ্ধতিতে উভয় পক্ষেরই লাভ

---

৬৮. সহীহ মুসলিম কিতাবুল হাজ্জ : হাদীস নং ১২৩৭; সুনানে আবু দাউদ কিতাবুল মানাসিক : হাদীস নং ১৬২৮; সুনানে আবু দাউদ কিতাবুল মানাসিক : হাদীস নং ১৬২৮; সুনানে দারেমী কিতাবুল মানাসিক : হাদীস নং ১৭৭৪

ছিল। যারা আমানত রাখত, তাদের লাভ এই ছিল যে, যদি অর্থগুলো আমানত হিসেবে রাখা হতো, তা হলে হেফাজতের সঙ্গে রাখা সত্ত্বেও যদি তা খোয়া যেত বা চুরি হয়ে যেত, তা হলে হযরত যুবাইর ইবনে আওয়ামকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হতো না। কারণ, আমানতের কোনো ক্ষতিপূরণ (অনেক সময়) দিতে হয় না। পক্ষান্তরে ঋণের অর্থ হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। ঋণ গ্রহীতাকে তার জরিমানা আদায় করতে হয়। কাজেই হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাযি.) অর্থগুলো ঋণ হিসেবে রাখার কারণে যারা আমানত রাখত, তাদের লাভ হলো যে; তাদের সম্পদগুলো নিরাপদ হয়ে গেল এবং ক্ষতিপূরণযোগ্য হয়ে গেল। আবার বিপরীতে হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাযি.)-এর লাভ হলো, তাঁর এই অধিকার অর্জিত হয়ে গেল যে, এই অর্থগুলোকে তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজে লাগাতে পারতেন। এই অর্থকে তিনি ব্যবসায় বিনিয়োগ করতেন। তারই ধারাবাহিকতায় মৃত্যুর সময় তাঁর দায়িত্বে যে ঋণ ছিল, সে সম্পর্কে তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাযি.) বলেন :

فَحَسِبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِأَتَيْ أَلْفٍ

'আমি তাঁর ঋণগুলো হিসাব করে দেখলাম যে, তার পরিমাণ বাইশ লাখ দিনার।'[৬৯]

বলাবাহুল্য, এত বড় ঋণ 'বাণিজ্যিক ঋণ'ই ছিল। 'সারফি ঋণ' ছিল না। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে 'বাণিজ্যিক ঋণে'র প্রচলন ছিল।

তারীখে তাবারীতে আছে, হযরত উমর (রাযি.)-এর খেলাফত আমলে আবু সুফিয়ান (রাযি.)–এর স্ত্রী হিন্দ বিনতে উত্‌বা উমর (রাযি.)-এর কাছে এসে বাইতুল মাল থেকে ঋণ চেয়েছিল। হযতর উমর (রাযি.) তাকে ঋণ প্রদান করেছিলেন। হিন্দ বিনতে উত্‌বা বিলাদে কাল্‌ব গিয়ে সেই অর্থ দ্বারা ব্যবসা করেছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উক্ত ঋণ জঠরজ্বালা মেটানোর জন্য কিংবা মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের জন্য গ্রহণ করা হয়নি; বরং ব্যবসার জন্য গ্রহণ করেছিলেন।

নবুওত ও সাহাবাযুগে এ-রকম আরও বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমি তাক্‌মিলায়ে ফাত্‌হিল মুল্‌হিম-এ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। প্রয়োজন বোধ করলে সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

---

৬৯. সহীহ বুখারী কিতাবু ফার্‌জিল খুমুসি : হাদীস নং ২৮৯৭; শারহু ইব্‌নি বাত্তাল ৯/৩৬৩ : হাদীস নং–৩১২৯; হিলয়াতুল আওলিয়া ১/৯১; আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী ৬/২৮৬; আত-তাবাকাতু লিইবনি সা'দ ৩/১৯

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, একথা একদম ভুল যে, নবীযুগে বাণিজ্যিক ঋণ ছিল না। বরং ইতিহাস প্রমাণ করছে, সে-যুগেও বাণিজ্যিক ঋণের প্রচলন ছিল। ইসলাম সুদ হারাম ঘোষণা করার পর তার উপর সুদের লেনদেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই যে যুক্তি ও দলিলের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক সুদকে হালাল বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে, তার ভূমিকা ও ফলাফল দু-ই ভুল প্রমাণিত হলো।

সুদ জায়েয হওয়ার পক্ষে আরও একটি দলিল

যারা সুদকে জায়েয বলেন, তাদের পক্ষ থেকে আরও একটি দলিল প্রদান করা হয় যে, কেউ যদি খাওয়ার জন্য কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কারও কাছে ঋণ চায় আর ঋণদাতা এই ঋণের বিপরীতে সদু দাবি করে, তা হলে এটি অবিচার বলে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ব্যবসা করার জন্য ঋণ গ্রহণ করে এবং এই ঋণের অর্থ ব্যবসায় বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে, তা হলে এ ক্ষেত্রে ঋণদাতার সুদ দাবি করা অবিচার বলে বিবেচিত হবে না। এখানে অন্যায় বা অবিচারের কোনো বিষয় নেই। এই দলিলের সমর্থনে তারা কুরআনের এই আয়াতটি উপস্থাপন করে থাকেন :

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ

'তোমরা যদি সুদ থেকে তাওবা কর, তা হলে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরাও অবিচার করবে না, তোমাদের উপরও অবিচার করা হবে না।'[৭০]

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, সুদ হারাম হওয়ার কারণ হলো 'অবিচার'। আর এই অবিচার 'সারফি সুদে' পাওয়া গেলেও 'বাণিজ্যিক সুদে' পাওয়া যায় না। কাজেই 'বাণিজ্যিক সুদ' হারাম না হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

কারণ ও বিধানে পার্থক্য

এই দলিলের মধ্যে একাধিক ভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে। প্রথম ভ্রান্তিটি হলো, এই দলিলের মধ্যে 'অবিচার'কে রিবা হারাম হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ অবিচার দূর করা রিবা হারাম কারণ নয়; বরং এটি রিবা হারাম হওয়ার হেকমত। আর বিধান নির্ভর করে কারণের উপর – হেকমতের উপর নয়। কারণ পাওয়া গেলেই বিধান জারি হয়ে যায় – হেকমতের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকুক আর না থাকুক।

---

৭০. সূরা বাকারা : ২৭৮

এর একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত হলো, আপনারা দেখে থাকবেন, রাস্তার উপর সিগন্যাল বসানো থাকে। তাতে তিন ধরনের বাতি থাকে। লাল, হলুদ ও সবুজ। যখন লাল বাতি জ্বলে, তখনকার জন্য বিধান হলো, থেমে যাও। আর সবুজ বাতি জ্বলার অর্থ হলো, চলো। সিগন্যালের এই ব্যবস্থাপনা এজন্য চালু করা হয়েছে যে, এর মাধ্যমে ট্রাফিকে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং দুর্ঘটনা রোধ হবে। তো এখানে এই যে লাল বাতি দ্বারা বুঝানো হয়েছে, থেমে যাও; এটি হলো, বিধানের কারণ। আর এর মাধ্যমে দুর্ঘটনা রোধ হওয়া এই বিধানের হেকমত। এক ব্যক্তি রাত বারোটার সময় গাড়ি চালিয়ে সিগন্যালের কাছে এল। তখন লাল বাতি জ্বলছিল। কিন্তু চার দিকে কোথাও আর কোনো গাড়ি নেই। কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা নেই। এমতাবস্থায় তার জন্য আইন কী হবে? বলা বাহুল্য যে, এ সময়েও তার জন্য বিধান হলো, থেমে যাও। কারণ, এই মুহূর্তে যদিও সিগন্যাল মান্য করার হেকমত বিদ্যমান নেই; কিন্তু কারণ বিদ্যমান আছে। আর কারণ বিদ্যমান থাকলে হেকমত বিদ্যমান থাকুক আর না থাকুক বিধান কার্যকর হবে। কাজেই এই অবস্থায়ও চালকের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া জরুরি। যদি সে না দাঁড়ায়, তাহলে আইন অমান্য করার দায়ে তাকে গ্রেফতার করা হবে এবং শাস্তির মুখোমুখী করা হবে।

মদ হারাম হওয়ার হেকমত

অনুরূপভাবে শরীয়তের যত বিধান আছে, সমস্ত বিধান কারণের উপর নির্ভরশীল – হেকমতের উপর নয়। দুনিয়ার আইনেও এই নীতি কার্যকর, শরীয়তের আইনেও এই নীতি কার্যকর। পবিত্র কুরআন মদ সম্পর্কে বলেছে :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطٰنُ أَنْ يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ۝٩١

'শয়তান মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তারপরও কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?'[৭১]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মদ ও জুয়ার হারাম হওয়ার একটি হেকমত বর্ণনা করেছেন যে, মদপান ও জুয়ার ফলে পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ জন্ম নেয় এবং মানুষ এর কারণে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়। এখন যদি কেউ বলে, মদ-জুয়া তখনই হারাম হবে, যখন এসবের ফলে পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি হবে, বিদ্বেষ জন্ম নেবে। যদি শত্রুতা ও বিদ্বেষ না জন্মায়, তা হলে এগুলো

---

৭১. মায়েদা : ৯১

হারাম হবে না। বলা অনাবশ্যক যে, এই বক্তব্য সঠিক বলে গ্রাহ্য হবে না। কারণ, শত্রুতা ও বিদ্বেষ জন্ম নেওয়া মদ-জুয়ার হারাম হওয়ার হেকমত - কারণ নয়।

অন্যথায় আজকাল তো মানুষ বলে থাকে, মদ শত্রুতা সৃষ্টি করার পরিবর্তে বন্ধুত্ব তৈরি করে। আর সেজন্যই বর্তমানে দুই বন্ধু যখন মিলিত হয়, তখন একজনের মদের পেয়ালা আরেকজনের মদের পেয়ালার সঙ্গে ধাক্কা খায়। এটিই প্রমাণ করে, মদ আমাদের দুজনের মাঝে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছে।

প্রশ্ন হলো, মদ যদি দুজনের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করার পরিবর্তে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে, তা হলে কি মদ হালাল হয়ে যাবে? কিংবা যদি কেউ বলে, আমি তো মদপান করছি; কিন্তু কই আল্লাহর স্মরণ থেকে তো আমি উদাসীন হচ্ছি না; কাজেই আমার জন্য মদ হালাল। তো এই ব্যক্তির জন্য মদ হালাল হয়ে যাবে কি? বলা বাহুল্য যে, এই ব্যক্তির জন্য মদ হালাল হবে না। কারণ, আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হওয়া মদ হারাম হওয়ার হেকমত - কারণ নয়। আর বিধানের নির্ভরতা কারণের উপর – হেকমতের উপর নয়।

সুদের ব্যাপারটিও ঠিক অনুরূপ যে, 'অবিচার' সুদ হারাম হওয়ার কারণ নয় - হেকমত। 'তোমরাও অবিচার করবে না; আবার তোমাদের উপরও অবিচার করা হবে না' কথাটি সুদ হারাম হওয়ার হেকমত হিসেবে বলা হয়েছে। এটি সুদ হারাম হওয়ার কারণ নয়। কাজেই সুদ হারাম হওয়ার সম্পর্ক অবিচার পাওয়া-না-পাওয়ার সঙ্গে নয়। বরং এর সম্পর্ক হলো, সুদের হাকিকত পাওয়া পাওয়া-না পাওয়ার সঙ্গে। যেখানেই সুদের হাকিকত পাওয়া যাবে, সেখানেই হারামের বিধার কার্যকর হয়ে যাবে–অবিচার পাওয়া যাক আর না যাক।

এ হলো একটি বিভ্রান্তি।

শরীয়তের বিধানে ধনী আর গরিবের কোনো পার্থক্য নেই

দ্বিতীয় বিভ্রান্তি হলো, যারা 'সার্‌ফি ঋণের সুদ'কে জায়েয বলেন, তাদের বক্তব্য হচ্ছে, এই ঋণে কোনো ব্যক্তি যদি সুদ দাবি করে, তা হলে যেহেতু সার্‌ফি ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তিরা গরিব মানুষ হয়, তাই তাদের থেকে সুদ দাবি করা জুলুম। কিন্তু বাণিজ্যিক ঋণের সুদ এমন নয়। কারণ, এই ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তিরা পুঁজিপতি ও ধনী হয়; তাদের থেকে সুদ দাবি করায় জুলুমের কিছু নেই। এটিও একটি ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি। অথচ আসল প্রশ্নটি হলো, ঋণের উপর সুদ দাবি করা জায়েয, নাকি না-জায়েয? আপনি যদি বলেন, ঋণের উপর সুদ গ্রহণ করা জায়েয নয়, তা হলে তাতে ধনী-গরিবের কোনো পার্থক্য না থাকা উচিত।

বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝুন। এক ব্যক্তি রুটি বিক্রি করছে। একটি রুটি তৈরি করতে খরচ পড়ে বারো আনা। চার আনা লাভ ধরে একটি রুটির মূল্য নির্ধারণ করেছে এক টাকা। সে ধনী আর গরিবের মাঝে কোনো পার্থক্য রাখেনি যে, গরিবদেরকে কম দামে রুটি দেবে আর ধনীদের থেকে বেশি নেবে। বরং সবাইকে একই দামে রুটি দিচ্ছে। কিন্তু কেউ একথা বলছে না যে, তুমি একটি রুটির বিনিময়ে গরিবদের কাছ থেকে এক টাকা নিয়ে জুলুম করছ। কারণ, সে তার ন্যায্য পাওনা-ই উসুল করছে। আর ধনী-গরিব সকলের কাছ থেকে মুনাফা অর্জন করা জায়েয আছে। এতে কোনো প্রকার অবিচার নেই।

ঠিক তদ্রূপ একজন গরিব মানুষ কারও কাছে থেকে ঋণ চায় আর ঋণদাতা তার নিকট থেকে সুদ দাবি করে। তো আপনি বলছেন, যেহেতু ঋণগ্রহীতা লোকটি গরিব; তাই তাই তার থেকে সুদ দাবি করা অবিচার। প্রশ্ন হলো, এক ব্যক্তি একজন গরিব মানুষের কাছে মুনাফায় রুটি বিক্রি করছে; কিন্তু তাতে কোনো অবিচার হচ্ছে না; কিন্তু আরেকজন সেই গরিব লোকটিকেই ঋণ দিয়ে সুদ দাবি করছে; এটি অবিচার হবে কেন? আপনারা এ কেমন কথা বলছেন?

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, এখানে অবিচারের কারণ 'দারিদ্র' নয়। বরং অবিচারের আসল কারণ এখানে অতিরিক্তি 'অর্থ'। আর এই কারণ গরিবের ঋণের মধ্যে যেমন পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি ধনী-পুঁজিপতিদের ঋণের মাঝেও পাওয়া যাচ্ছে। আমার আলোচনার ফলাফল দাঁড়াল, রুটি তৈরি করে লাভে বিক্রি করা অবিচার নয়; বরং জায়েয ও সুবিচারের অনুকূল। কিন্তু (ঋণের) অর্থের উপর বাড়তি দাবি করা সুবিচারেরও পরিপন্থী আবার শরীয়তেরও খেলাফ। কারণ, অর্থ এমন কোনো বস্তু নয়, যার উপর মুনাফা দাবি করা যেতে পারে। কাজেই অর্থ ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি ধনী হোক বা গরিব উভয় অবস্থাতেই তার উপর সুদ হারাম হওয়ার বিধান কার্যকর হবে।

লাভ-লোকসান উভয়ে অংশীদার হতে হবে

যারা বাণিজ্যিক সুদকে জায়েয বলেন, তারা একটি কথা এও বলেন যে, বাণিজ্যিক সুদে জুলুম নেই। এটিও একদম ভুল কথা। বিষয়টিকে খানিক বিশ্লেষণের সঙ্গে বোঝা দরকার। দেখুন, শরীয়ত এই মূলনীতি বর্ণনা করেছে যে, তুমি যদি কাউকে ঋণ প্রদান কর, তা হলে আগে এই সিদ্ধান্ত নাও, এই ঋণের মাধ্যমে তুমি তাকে সাহায্য করতে চাও, নাকি তার কারবারে অংশীদার হতে চাও। যদি ঋণ প্রদানে তোমার উদ্দেশ্য হয় তাকে সাহায্য করা, তা হলে তাকে শুধু সাহায্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে দাও। তখন এই ঋণের বিপরীতে তোমার জন্য তার থেকে বাড়তি দাবি করা জায়েয হবে না। আর যদি এই

অর্থের মাধ্যমে তুমি তার কারবারে অংশীদার হতে চাও, তা হলে তোমাকে তার কারবারের লাভ-লোকসান উভয়ের অংশীদার হতে হবে। এটা হতে পারবে না যে, আপনি তাকে বলে দেবেন, আমি তোমার লাভের অংশীদার হব; কিন্তু লোকসানের অংশীদার হব না।

বাণিজ্যিক সুদে ঋণদাতা ব্যাংক পুঁজিপতিকে বলে দেয়, আমি এই ঋণের উপর তোমার থেকে পনেরো শতাংশ সুদ নেব। তোমার ব্যবসায় লাভ হোক বা লোকসান হোক আমি তা দেখব না। তোমার লাভ-লোকসানের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমার কেবল সুদ দরকার। বলা বাহুল্য যে, এই চরিত্র ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী।

বেশি অবিচার ঋণদাতার উপর

এই বাণিজ্যিক সুদ একটি গোলকধাঁধা। এর প্রতিটি সুরতেই অবিচার। যদি পুঁজিপতি ব্যবসায়ীর মুনাফা হয়, তা হলেও জুলুম, যদি লোকসান হয়, তা হলেও জুলুম। লাভের সুরতে ঋণদাতার উপর জুলুম। আর লোকসানের সুরতে ঋণগ্রহীতার উপর জুলুম। বর্তমান বিশ্বের ব্যাংকগুলোতে যে ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে, তাতে বেশি জুলুম হচ্ছে ঋণদাতার উপর।

কথাটি বুঝতে হলে আগে আরও একটি বিষয় বুঝতে হবে যে, সাধারণত ব্যাংকগুলোতে জনসাধারণের রাখা আমানত থাকে। যেন দেশের সাধারণ মানুষের অর্থ দ্বারা-ই একটি ব্যাংক অস্তিত্ব লাভ করে। কিন্তু এই জনসাধারণই যদি ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে যায়, তা হলে ব্যাংক তাদের ঋণ দেবে না। বরং ব্যাংক ঋণ দেবে সেই পুঁজিপতিকে, যার কাছে আগে থেকেই পুঁজি আছে; এখন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তিনি তার ব্যবসার পরিধি আরও সম্প্রসারিত করতে চাচ্ছেন। কিংবা এমন পুঁজিপতিকে দেবে, যার মিল-ফ্যাক্টরি আছে; তিনি তার এই ব্যবসাকে আরও বড় করতে চাচ্ছেন।

এবার হচ্ছে কী? ধরুন, একজন পুঁজিপতি পনেরো শতাংশ সুদের ভিত্তিতে ব্যাংক থেকে এক লাখ টাকা ঋণ নিল। তার সঙ্গে নিজের থেকে আরও কিছু যোগ করে কারবার শুরু করল। অনেক সময় কারবারে শতভাগ মুনাফা হয়ে যায়। আবার অনেক সময় কমও হয়। মনে করুন, এই ব্যবসায়ী তার কারবারে শতভাগ মুনাফা করল, যার ফলে তার এক লাখ টাকা দুলাখ টাকা হয়ে গেল। এক লাখ আসল পুঁজি আর এক লাখ মুনাফার অর্থ। এই মুনাফা থেকে সে পনেরো শতাংশ ব্যাংকের সুদ পরিশোধ করল। অবশিষ্ট পঁচাশি হাজার টাকা নিজের পকেটে রেখে দিল। তারপর ব্যাংক এই পনেরো হাজার টাকা থেকে নিজের খরচাদি কেটে রাখার পর সাত হাজার টাকা সেই জনসাধারণকে দিল,

যাদের অর্থ দ্বারা ব্যবসায়ী ব্যবসা করে এক লাখ টাকা আয় করেছিল এবং তার থেকে পঁচাশি হাজার টাকা নিজের পকেটে রেখেছিল। এর দ্বারা অনুমান করুন, এই জনসাধারণের উপর কী পরিমাণ অবিচার হচ্ছে! কিন্তু সেই জনসাধারণ খুবই আনন্দিত যে, আমি সাত হাজার টাকা মুনাফা পেয়ে গেছি। অথচ তার এক লাখ টাকায় এক লাখ টাকা মুনাফা হয়েছিল।

আরও দেখুন, জনসাধারণ যে সাত হাজার টাকা পেয়েছিল, পুঁজিপতি ব্যবসায়ী সেই টাকাগুলোও অন্যভাবে জনসাধারণ থেকে উসুল করে নিচ্ছে। তা এভাবে যে, ব্যবসায়ীদের নিয়ম হলো, তারা ব্যাংককে যে-সুদ প্রদান করে, তা তাদের পণ্যের উৎপাদনব্যয়ের সঙ্গে যোগ করে নেয়। যেমন– এই ব্যবসায়ী ব্যাংক থেকে নেওয়া এক লাখ টাকা দ্বারা কাপড় প্রস্তুত করলেন। তিনি এই কাপড়গুলোর বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের আগে হিসাব করে দেখবেন, এগুলো প্রস্তুত করতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে। তখন সেই ব্যয়ের সঙ্গে ব্যাংকের সুদ বাবদ প্রদত্ত পনেরো হাজার টাকাও যোগ করে নিচ্ছেন। তারপর নিজের মুনাফা ধার্য করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করেন। তাতে এই কাপড়গুলোর উৎপাদনব্যয়ে আপনা-আপনি পনেরো শতাংশ বেড়ে যাচ্ছে। তারপর জনসাধারণ যখন বাজারে গিয়ে এই কাপড়গুলো ক্রয় করবে, তখন তারা সেই পনেরো শতাংশ সুদের টাকাও পরিশোধ করে আসবে, যা ব্যবসায়ী ব্যাংককে দিয়ে এসেছে। এভাবে একজন পুঁজিপতি একদিকে জনসাধারণকে মাত্র সাত শতাংশ মুনাফা প্রদান করছে, অপরদিকে তাদের থেকে সুদ বাবত পনেরো শতাংশ উসুলও করে নিচ্ছে। কিন্তু তারপরও জনসাধারণ খুশি যে, আমি সাত শতাংশ মুনাফা পেয়ে গেছি। অথচ বাস্তবতা হলো, তিনি যে-এক লাখ টাকা ব্যাংকে আমানত রেখেছিলেন, তার থেকে ফেরত পেয়েছেন মাত্র বিরানব্বই হাজার টাকা।

এই বিশ্লেষণ সেই অবস্থার জন্য, যেখানে ব্যবসায়ী ব্যবসা করে লাভবান হলেন। কিন্তু যদি তার লোকসান হয়ে যায়, তা হলে সেই সুরতে তার লোকসানের প্রতিকারের জন্য সে ব্যাংক থেকে আরও ঋণ গ্রহণ করে। এভাবে তার ঋণের পরিমাণ বাড়তে থাকে, যার ফলে ব্যাংকটি দেউলিয়া হয়ে যায়। আর একটি ব্যাংকের দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো, যে লোকগুলো এই ব্যাংকে আমানত রেখেছিল, তারা সেসব আর ফেরত পাবে না। যেমনটি কিছুদিন আগে আমাদের বিসিআইসি ব্যাংকের বেলায় ঘটেছিল। যেন এই সুরতে সমস্ত লোকসান জনসাধারণেরই হলো। ব্যবসায়ীর কোনোই ক্ষতি হলো না।

এর দ্বারা অনুমান করে নিন, 'বাণিজ্যিক ঋণের সুদ'-এর কারণে যে অবিচারটি হচ্ছে, তা 'সারফি ঋণের সুদ'কেও হার মানিয়ে দিল। কারণ, ব্যবসায় অর্থের ব্যবহার হচ্ছে পুরোটা জনসাধারণের। কিন্তু লাভ হলে তার

মালিক পুঁজিপতি আর লোকসান হলে তার মালিক জনসাধারণ। এর চেয়ে বড় জুলুম আর কী হতে পারে? এ হলো লোকসানের সেই সুরত, যেখানে স্বয়ং ব্যাংকই দেউলিয়া হয়ে যায়। কিন্তু যদি ব্যবসা চলাকালে পুঁজির আংশিক ক্ষতি হয়ে যায়; যেমন– ব্যবসায়ী কাপড় তৈরি করার জন্য তুলা ক্রয় করেছিল। সেই তুলায় আগুন ধরে গেল। তো এই ক্ষতির প্রতিকারের জন্য উক্ত পুঁজিপতির সামনে আরেকটি পথ খোলা আছে। তা হলো, ইন্সুরেন্স কোম্পানি।

ইন্সুরেন্স কোম্পানি তার সেই ক্ষতি পূরণ করে দেবে। আর ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে যে-অর্থ আছে, তারও মালিক গরিব জনগণ। সেই জনগণ, যারা তাদের গাড়িগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত রাস্তায় নামাতে পারে না, যতক্ষণ-না তার ইন্সুরেন্স করিয়ে নেবে।

জনসাধারণের গাড়ি একসিডেন্ট তো কালে-ভদ্রেই হয়ে থাকে; কিন্তু বীমার কিস্তি তাদেরকে প্রতি মাসে যথারীতিই পরিশোধ করতে হয়। কাজেই এখানে দেখতে পাচ্ছি, পুঁজিপতিরা জনসাধারণেরই অর্থ দ্বারা তাদের লোকসানের ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

সুদের গুনাহের সর্বনিম্ন স্তর মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করা

এসব গোলকধাঁধা এজন্য তৈরি করা হলো, যাতে যদি লাভ হয়, তা হলে তা যেন পুঁজিপতির পকেটে ঢোকে। আর যদি লোকসান হয়, তা হলে তার ঘানি যেন জনসাধারণ টানে। এর ফলে সম্পদ নিচের দিকে নামার পরিবর্তে উপর দিকে উঠছে। ধনী আরও ধনী হচ্ছে। গরিব আরও গরিব আরও গরিব হচ্ছে। সুদের এই অপকারিকতাগুলোর কারণেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

اَلرِّبَا سَبْعُوْنَ بَابًا أَدْنَاهَا كَالَّذِيْ يَقَعُ عَلٰى أُمِّهٖ

'সুদের (গুনাহের) সত্তরটি স্তর আছে। সর্বনিম্ন স্তর হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে তার মায়ের উপর উপগত হয়।'[৭২]

আল্লাহপাক আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

কাজেই একথা বলা যে, বাণিজ্যিক সুদে জুলুম নেই, এটি একদম ভুল কথা। এর চেয়ে বড় অবিচার আর কী হতে পারে যে, গোটা একটি জাতিকে অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে?

---

৭২. আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব : হাদীছ নং ২৮৪৭ (৩/৫); শু'আবুল ঈমান : হাদীছ নং ৫৫২ (৪/৩৯৪)

আজ সমগ্র বিশ্বে সুদি ব্যবস্থা চালু আছে। আর এই ব্যবস্থা গোটা পৃথিবীকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়ে দিয়েছে।

তবে ইনশাআল্লাহ এমন একটি সময় আসবে, যখন মানুষের সামনে এর বাস্তবতা উন্মোচিত হয়ে যাবে। মানুষ বুঝতে সক্ষম হবে, পবিত্র কুরআন কেন সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

আল্লাহপাক আমাদেরকে বুঝবার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : তাকরীরে তিরমিযী– খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৭-৫৭

সুদ খেলে কৃপণতা বাড়ে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এক বাণীতে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেছেন :

> 'সুদ খেলে কৃপণতা বাড়ে। কারণ, সুদ খাওয়ার কারণই হলো কৃপণতা। কাজেই একজন সুদখোর মহাজন সুদ যত খেতে থাকে, তার কৃপণত তত বাড়তে থাকে। এমনকি একটি সময় এমনও আসে যে, সে নিজের দেহের জন্যও ব্যয় করতে রাজি হয় না।'[৭৩]

সম্পদ বৃদ্ধির ফলে মানুষের মধ্যে উদারতা ও অমুখাপেক্ষিতা তৈরি হওয়ার কথা থাকলেও কৃপণতার বৈশিষ্ট হলো, সম্পদ যত বাড়ে, কৃপণতার মাত্রা ও সম্পদের মোহ তত বৃদ্ধি পায়। একজন মানুষ যদি কৃপণ হয়, তা হলে তার সম্পদের পরিমাণ যতই হোক-না কেন, তার ফলে তার মধ্যে তুষ্টি তৈরি না হয়ে সম্পদ অর্জনের চাহিদা আরও বাড়তে থাকে। নিয়ম হলো, সম্পদের পরিমাণ যত বাড়বে, নিজের মধ্যে স্বনির্ভরতা তত বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু কৃপণের মধ্যে তা সৃষ্টি হয় না এবং ব্যয় করার মানসিকতাও তৈরি হয় না। বরং সম্পদের মোহ আরও বেড়ে যায়। এক হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغٰى أَنْ يَكُوْنَ لَهٗ وَادِيَانِ وَلَوْ كَانَ لَهٗ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهٗ ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ

'আদমের সন্তানদের স্বভাব হলো, তাদের যদি সোনার একটি উপত্যকা জুটে যায়, তা হলে দুটির অন্বেষণে নেমে পড়ে। যদি দুটি জুটে যায়, তা হলে তৃতীয় আরও একটির লোভে পড়ে।'[৭৪]

---

৭৩. আনফাসে ঈসা ॥ পৃষ্ঠা : ১৯১

৭৪. বুখারী, হাদীছ নং ৫৯৫৯; মুসলিম, হাদীছ নং ১৭৩৮; তিরমিযী, হাদীছ নং ২২৫৯; মুসনাদে আহমাদ, ১২২৫৬

তারপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত চমৎকার একটি বাক্যে মানুষের এই চরিত্রের সারমর্ম ব্যক্ত করেছেন।

বলেছেন :

وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ

'আসল কথা হলো, আদমসন্তানের পেট (কবরের) মাটি ছাড়া আর কিছুতে ভরতে পারে না।'

মানুষের পেট তখনই ভরবে, যখন তার মধ্যে মাটি পুরবে। মানুষ যদি কানা'আত তথা হালাল ও স্বাভাবিক উপায়ে যখন যা জোটে, তাতে সন্তুষ্ট হওয়ার মতো চরিত্র সৃষ্টি না করে এবং অন্তরে সম্পদের মোহ বাড়তে থাকে, তা হলে এমন ব্যক্তির পেট কোনো কিছুতেই ভরতে পারে না।

এক সওদাগরের বিস্ময়কর ঘটনা

শেখ সা'দীর কবিতার চারটি চরণ আছে :

آن شنیده اتی کہ در صحرائے غور
رخت سالار افتادہ اسپ طور
گفت چشم تنگ دنیادار را
یا قناعت پر کند یا خاک گور

'আমি তোমাকে একটি ঘটনা শোনাচ্ছি। গাওর মরু উপত্যকায় বড় এক ব্যবসায়ীর ব্যবসাপণ্য খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিল। মালগুলো ওখানে পতিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। তার খচ্চরটিও ওখানে মৃত পড়ে ছিল। সওদাগর নিজেও ওখানে মারা গিয়েছিল। তার মালপত্রগুলো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল। সেগুলো ভাববাচ্যে বলছিল, দুনিয়াদারের সংকীর্ণ দৃষ্টিকে মাত্র দুটি জিনিস ভরতে পারে। একটি হলো কানা'আত (অল্পেতুষ্টি) আর অপরটি কবরের মাটি। তৃতীয় আর কোনো বস্তু তাকে ভরতে পারে না।'

মোটকথা, কৃপণতার বৈশিষ্ট হলো, সম্পদ যত বাড়তে থাকবে, লোভও তত বাড়তে থাকবে এবং ব্যয়ের পথে তত বেশি প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে থাকবে।

বড় এক পুঁজিপতির উক্তি

করাচিতে বড় মাপের একজন পুঁজিপতি আছেন। পাকিস্তানের নামকরা শীর্ষস্থানীয় দু-চারজন ধনীর একজন। মিলিয়নপতি-বিলিয়নপতি হবেন হয়ত। একদিন তিনি আমার কাছে এলেন। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ পাক আ[illegible] অনেক অর্থ দান করেছেন। আপনার অনেকগুলো মিল-কারখানা

আছে। সব কিছুই আপনি করে নিয়েছেন। এবার মুনাফার চিন্তা বাদ দিয়ে কিছু কাজ আল্লাহর জন্য করুন। যেমন– এমন একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করুন, যেটি সুদ ছাড়া চলবে। আপনার কাছে যেহেতু বিপুল অর্থ আছে; তাই আপনি এ কাজটি করতে পারেন।

তিনি বললেন, মাওলানা সাহেব! সেই ব্যাংকটি কীভাবে চলবে? আমি বললাম, আল্লাহ চাহেন তো চলবে। কিন্তু আপনি এই ব্যাংকটি এই নিয়তে করবেন যে, এখানে যা বিনিয়োগ করলাম, সবই গেছে। বিলিয়ন-মিলিয়ন টাকা যেহেতু আপনার আছে, এমতাবস্থায় কয়েক কোটি গেলে তাতে আপনার এমন কী আর আসবে-যাবে। এখানে কয়েক কোটি টাকা বিনিয়োগ করে তার কথা আপনি ভুলে যাবেন।

তিনি চেহারায় বিস্ময় ফুটিয়ে বললেন, কী বললেন; এই টাকার কথা আমি ভুলে যাব? আমি বললাম, হ্যাঁ, আপনি ভুলে যাবেন যে, আপনার এই টাকাগুলো কোথাও গেছে। তবে আল্লাহপাক চাইলে তাতে মুনাফাও দিতে পারেন। কিন্তু আপনাকে তার কথা ভুলে যেতে হবে। শেষে তিনি বললেন, মাওলানা সাহেব! কথা তো আপনি ঠিকই বলছেন; কিন্তু হাতের খুজলিকে আমি কী করব?

গরিব ও ধনীর ব্যয়ের পার্থক্য

এ হলো সম্পদ বাড়ানোর খুজলি। হযরত থানভী রহ. বলেন, এই কৃপণতাও পরে ধীরে-ধীরে খুজলির রূপ ধারণ করে। তারপর মানুষের কাছে যত সম্পদই আসুক-না কেন, তার লোভ মিটে না। আমি নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি, গরিব মানুষেরা যতটা মনের খুশিতে দান করে, মসজিদ-মাদরাসায় চাঁদা দেয়, কোটিপতি-মিলিয়নপতি-বিলিয়নপতিরা অতটুকু মনের খুশিতে দান করে না। অথচ ধনী লোকটির কাছে সুযোগ বেশি আছে। গরিবের অতটা সুযোগ নেই। এসবই সম্পদের লোভের কুফল।

সুদখুরির মানসিকতা কৃপণতা জন্ম দেয়

এই কৃপণতার সবচেয়ে বড় উপকরণ হলো সুদ। কারণ, সুদের অর্থ হলো, কাজ কিছুই করবে না, কোনো ঝুঁকি মাথায় নেবে না; কিন্তু পয়সা দিয়ে পয়সা বানাও। এটি কৃপণের কাজ। আর সুদখুরির মানসিকতা যেহেতু মানুষের মধ্যে কৃপণতা সৃষ্টি করে, তাই দুনিয়াতে যত সুদখোর জাতি অতীত হয়েছে, সব চেয়ে বেশি কঞ্জুসও তাদেরই মাঝে বিদ্যমান আছে। জগতে সব চেয়ে বড় সুদখোর জাতি হলো ইহুদি। কুরআন ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে :

وَاَخۡذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدۡ نُهُوۡا عَنۡهُ

'...আর তারা সুদ গ্রহণ করত। অথচ তাদেরকে সুদ খেতে বারণ করা হয়েছিল।'[৭৫]

আজও পৃথিবীর সমস্ত সুদি কারবার সেই ইহুদিদেরই হাতে। আর এরা-ই জগতের সব চেয়ে কঞ্জুস জাতি। সারা পৃথিবীতে এরা কৃপণ জাতি হিসেবে পরিচিত।

এক সুদখোর ইহুদির ঘটনা

আপনারা 'শাইলাক'-এর ঘটনা শুনে থাকবেন। এটি রোমের একটি ঘটনা। এক ইহুদি ছিল। তার নাম 'শাইলাক'। একলোক ঠেকায় পড়ে তার কাছে কিছু টাকা ধার আনতে গিয়েছিল। শাইলাক বলল, আমি সুদ ছাড়া ঋণ দেই না। লোকটি বাধ্য হয়ে সুদের চুক্তিতে ঋণ গ্রহণ করল। শাইলাক তাকে বলে দিল, এত দিনের মধ্যে পারিশোধ করতে হবে আর আমাকে মূল টাকার অতিরিক্ত এত টাকা সুদ দিতে হবে।

মেয়াদ শেষ হয়ে গেল এবং ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত দিনটি এসে পড়ল। শাইলাক ঋণের টাকা উসুল করার জন্য ঋণগ্রহীতার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। কিন্তু যেহেতু ঋণগ্রহীতা লোকটি গরিব ছিল; তাই সে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলো। বলল, আমার কাছে তো কোনোই টাকা নেই যে, আপনাকে দেব। থাকলে দিয়ে দিতাম। শাইলাক আরেকটি তারিখ ধার্য করে দিয়ে বলল, এই তারিখের মধ্যে দিয়ে দিয়ো আর তোমার সুদ দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তখন তোমাকে ডাবল সুদ আদায় করতে হবে।

সেই তারিখটিও এল। শাইলাক তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। ঋণগ্রহীতা বলল, আপনি তো সুদ ডাবল করে দিয়েছেন; যা আদায় করতে আমি অপারগ। কাজেই সুদের অংশটা বাদ দিয়ে আসল টাকাটা নিয়ে নিন এবং আমাকে এই ঋণের দায় থেকে মুক্তি দিন। শাইলাক বলল, না, তা হবে না–আমাকে পুরোপুরি-ই দিতে হবে। একটি টাকাও আমি তোমাকে মাফ করতে পারব না। তবে এটুকু করতে পারি যে, আমি তোমাকে আরেকটি তারিখ ঠিক করে দিয়ে যাচ্ছি; সেই তারিখে যদি না দাও, তা হলে আমি তোমার শরীর থেকে এক পাউন্ড গোশত কেটে নিয়ে তা চিবিয়ে খাব। আর টাকা তো আলাদা উসুল করবই।

---

৭৫. সূরা নিসা : ১৬১

সেই তারিখটিও এসে পড়ল। গরিব ঋণগ্রহীতা বেচারা টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলো। শাইলাক তার ঘরে ছুরি নিয়ে হাজির হলো। গরিব বেচারা পেরেশান হয়ে গেল এবং কোনোমতে পালিয়ে রাজদরবারে রাজার কাছে চলে গেল। গিয়ে রাজাকে বলল, মহারাজ! আমি একটি বিপদে পড়েছি; আপনি আমাকে রক্ষা করুন। শাইলাক আমার গায়ের গোশত কেটে নিতে চাচ্ছে।

আদালতে মামলা হলো। ঋণগ্রহীতা লোকটিকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হলো। বিচারের জন্য এজলাস বসল। শাইলাক আদালতে জোরালো বক্তব্য দিল। তাতে সে বলল, মাননীয় আদালত! আমার সঙ্গে সুবিচার করুন। এই লোকটি এতদিন যাবত আমার সঙ্গে টালবাহানা করছে। আমার থেকে সুদের উপর ঋণ নিয়ে এখন পরিশোধ করছে না। শেষ পর্যন্ত সে নিজেই আমাকে তার গায়ের গোশত কেটে দেবে বলে এখন তাও দিচ্ছে না। আমি আদালতের কাছে এর সুবিচার কামনা করছি। আমি আশা করি, আদালত আমার পক্ষে এই ডিক্রি জারি করবেন, যাতে আমি তার গোশত কেটে নিতে পারি। কারণ, আমার জানামতে এটি-ই ন্যায়বিচারে দাবি।

ঋণগ্রহীতা গরিব লোকটি কারাগারে বন্দী ছিল। তাকে আদালতে হাজির করা হয়নি। তার পক্ষে তার স্ত্রী আদালতে এল। সে স্বামীর পক্ষে বক্তব্য দিল। বলল, মহামান্য আদালত! সুদখোর শাইলাক আপনার কাছে সুবিচার দাবি করেছে। তার দাবি অনুসারে সুবিচারের দাবি হলো, তাকে আমার ঋণগ্রহীতা স্বামীর গায়ের গোশত কেটে নেওয়ার অধিকার প্রদান করা। আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, আল্লাহ যদি আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সুবিচারই করেন, তা হলে আমাদের ঠিকানা কোথায় হবে? এই জগতে সুবিচারই সব কিছু নয়। দয়া বলেও একটি কথা সংসারে আছে। আল্লাহপাক আমাদের উপর দয়া করবেন। আল্লাহর দয়া ছাড়া আমরা মুক্তি পাব না।

বাদশাহ দয়ার ভিত্তিতে লোকটির পক্ষে রায় প্রদান করলেন।

তো আমি বলতে চাচ্ছিলাম, শাইলাক-এর মতো ইহুদি জাতি সারা জগতে কৃপণ হিসেবে প্রসিদ্ধ।

হিন্দু সুদখোর জাতি

ইহুদিদের পর দুনিয়াতে দ্বিতীয় পর্যায়ের বড় সুদখোর জাতি হলো হিন্দু। আপনারা হিন্দু 'বেনিয়া'দের কথা শুনে থাকবেন। ভারতবর্ষে হিন্দু ব্যবসায়ীদেরকে 'মহাজন'ও বলা হয়। এরা সুদখোর সম্প্রদায়। এদের কৃপণতা কার্পণ্যের উপমা। তারা এক-একটি পাইয়ের হিসাব করে থাকে।

হিন্দী ভাষার একটি প্রবাদ

'মামার আব্বাজি মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ. হিন্দী ভাষার একটি প্রবাদ শোনাতেন। প্রবাদটি হলো :

لالہ جی گئے پاؤنے، چار دن میں آئے، لالہ جی کے گھر آ گئے چار پاؤنے، لالہ جی نہ گئے نہ آئے

হিন্দু বেনিয়াদের 'লালাজি' বলা হয়। 'পাওনে' অর্থ অতিথি। তো প্রবাদটির অর্থ হলো, লালাজি এক বাড়িতে মেহমান হয়ে চারদিন থাকলেন। তাতে তার চার দিনের ব্যয় সাশ্রয় হলো। চারদিন পর যখন ফিরে এলেন, তখন চার ব্যক্তি তার বাড়িতে মেহমান হলো। তারা একদিন বেড়াল। চারদিন অন্যের বাড়িতে মেহমান হয়ে তিনি যতটুকু সাশ্রয় করেছিলেন, তা শেষ হয়ে গেল। খরচ তার সমান-সমান হয়ে গেল। ফলে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, আর যাবও না, কাউকে আসতেও দেব না।

মোটকথা, তারা এভাবে হিসাব করে চলে, যেন একটি পাইও খরচ না হয়। মূলত সুদের মানসিকতা-ই এই কার্পণ্য জন্ম দেয়।

অর্থনৈতিক পাপ কার্পণ্য জন্ম দেয়

মনে রাখবেন, যার অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধিবিধানের কোনো তোয়াক্কা নেই, তারই অবস্থা এমন হয় যে, তার কাছে যত অর্থই আসুক-না কেন, সে যত বিত্তেরই অধিকারী হোক-না কেন, লোভ তার ততই বাড়তে থাকে। অর্থ ব্যয় করতে তাদের ততই হৃদয় কাঁপে। গরিব মানুষেরা নির্ভাবনায় ব্যয় করবে। কিন্তু যারা কাড়ি-কাড়ি টাকার মালিক – যারা অর্থের সাপ হয়ে বসে আছে, তারা ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে না। মনে রাখবেন, এই অর্থনৈতিক পাপ কৃপণতা জন্ম দেয়। আর কৃপণতার কারণে সম্পদের মোহ আরও বাড়তে থাকে।

বেশি-বেশি এই দু'আটি করুন

এর থেকে বাঁচার একটিমাত্র পথ আছে। তা হলো, মানুষ নিজেকে শরীয়তের অনুগামী বানাবে, অন্তরে কানা'আত সৃষ্টি করবে এবং বেশি-বেশি করে এই দু'আটি করবে :

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِيْ مِنْكَ بِخَيْرٍ

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে-সম্পদ দান করেছেন, তার উপর আমাকে কানা'আত দান করুন এবং তাতে আমাকে বরকত দিন। আল্লাহপাক যখন অল্প সম্পদে বরকত দিয়ে দেন, তখন সেই সম্পদ লাখ-কোটি টাকার চেয়েও বেশি উপকার দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর দেওয়া রিযিকে যদি বরকত না থাকে, তা হলে কোটি টাকাও বেকার হয়ে যায়। তার দ্বারা কোনোই উপকার হয় না।

তারপর নবীজি বলেছেন, হে আল্লাহ! যে সম্পদ আমার কাছে মজুদ নেই, তার বদলে আপনি আমাকে সেই জিনিসটি দান করুন, যেটি আপনার দৃষ্টিতে কল্যাণ। অর্থাৎ– কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ আমি তার কী জানব! আমার জ্ঞান তো সীমিত। আমার চিন্তা সে পর্যন্ত পৌঁছুবার ক্ষমতা রাখে না। কাজেই হে আল্লাহ! এই বিষয়টি আমি আপনার উপর ছেড়ে দিলাম যে, যে জিনিস আমার কাছে মজুদ নেই, তার বদলে আপনি আমাকে সেই সম্পদ দান করুন, যেটি আপনার দৃষ্টিতে ভালো ও কল্যাণকর।[৭৬]

হালাল পন্থায় সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা করা জায়েয

তবে একথাটিও বুঝে নিন যে, আল্লাহর কাছে কানা'আতের দু'আ তো করবেন; কিন্তু জায়েয ও হালাল পন্থায় সেই সম্পদে প্রবৃদ্ধি ঘটানোর চেষ্টা করা কানা'আতের পরিপন্থী নয়। তার দলীল হলো, খোদ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবসার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যদি হালাল পন্থায় সম্পদ বাড়ানো জায়েয না হতো, তা হলে নবীজি ব্যবসার প্রতি উৎসাহ দিতেন না। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, জায়েয ও হালাল পন্থায় সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা করার অনুমতি আছে।

কিন্তু বিশ্বাস রাখতে হবে, হালাল পন্থায় আল্লাহপাক যা-কিছু দান করবেন, তা তাঁর নেয়ামত। তার জন্য আল্লাহপাকের শোকর আদায় করে তাকে কাজে লাগাতে হবে। আর না-জায়েয পন্থায় সম্পদ অর্জনের চেষ্টা কখনও করবেন না। এমন চিন্তাও কখনও মনের মাঝে স্থান দেবেন না। আর অন্তরে সেই সম্পদের লোভ জন্ম নিতে দেবেন না।

আল্লাহপাক আমাদেরকে একথাগুলো বুঝবার ও সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী মাজালিস– খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১১০-১২১

---

৭৬. মুসনাদে ইবনে আবী শায়বা ॥ খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১০৩; কান্‌যুল উম্মাল ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৯০, হাদীস নং-৫০৭৪; আল-মুস্‌তাদ্‌রাক ॥ হাদীস নং ১৮৩১; আল-আদাবুল মুফ্‌রাদ : হাদীস নং-৭০৯

কোনো বস্তু হালাল বা হারাম হওয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا نُرْسِلُ كِلَابًا لَنَا مُعَلَّمَةً قَالَ كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ غَيْرُهَا قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ مَا خَزَقَ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ

হযরত আদী ইবনে হাতেম রাযি. (যিনি বিখ্যাত দাতা হাতেম তাঈ-এর পুত্র। পূর্বে খ্রিস্টান ছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বর্ণনাভঙ্গিতে মনে হয়, তিনি প্রায়ই শিকারে যেতেন। হাদীসের শিকার অধ্যায়ে তাঁর সূত্রে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে) বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার প্রশিক্ষিত কুকুরকে শিকারের জন্য প্রেরণ করি। তো যখন সে কোনো প্রাণীকে শিকার করে আমার কাছে নিয়ে আসে, তখন অনেক সময় সেটি মৃত থাকে। প্রশ্ন হলো, এই প্রাণী খাওয়া আমার জন্য হালাল হবে কি?

উত্তরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার শিকারী কুকুর যে প্রাণীকে শিকার করে তোমার কাছে নিয়ে আসে, তাকে তুমি খেতে পার। অর্থাৎ– যদি সে শিকারকরা প্রাণী থেকে নিজে না খেয়ে পুরোপুরি অক্ষত অবস্থায় তোমার কাছে নিয়ে আসে, সেটি খাওয়া তোমার জন্য জায়েয আছে। কিন্তু শিকার করার পর কুকুর যদি তার থেকে কিছু খেয়ে থাকে, তা হলে সেটি খাওয়া তোমার জন্য জায়েয নেই – সেটি তুমি খেতে পারবে না।[৭৭]

কারণ, তখন সেই শিকার وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ (হিংস্র জন্তুর খাওয়া প্রাণী)র অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআন এ ধরনের শিকার খেতে বারণ করেছে। তা

---

৭৭. সুনানে তিরমিযী ॥ হাদীস নং-১৩৮৫; সহীহ বুখারী ॥ হাদীস নং-৫০৫৩; সহীহ মুসলিম ॥ হাদীস নং-৩৫১০; সুনানে নাসায়ী ॥ হাদীস নং-৪১৯০; সুনানে আবু দাউদ ॥ হাদীস নং-২৪৬৪; সুনানে ইবনে মাজা ॥ হাদীস নং-৩১৯৯; মুসনাদে আহমাদ ॥ হাদীস নং-১৭৫৩৪; সুনানে দারেমী ॥ হাদীস নং-১৯১৮

ছাড়া শিকারী কুকুরের তা খাওয়া প্রমাণ করে, এই প্রাণীটা সে তোমার জন্য শিকার করেনি। বরং একে সে নিজের জন্য শিকার করেছে। তাই তাকে খাওয়া তোমার জন্য হালাল হবে না।

হযরত আদী ইবনে হাতেম রাযি. আবার জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এমন যদি হয়, কুকুর সেই প্রাণীকে হত্যা করে ফেলেছে এবং আমি তাকে যবাই করার সুযোগই পেলাম না, তা হলেও কি সেটা আমার জন্য হালাল হবে?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যা, তখনও এই প্রাণী তোমার জন্য হালাল হবে। যতক্ষণ-না তাকে শিকার করার কাজে অন্য কোনো কুকুর অংশ না নেয়।

অর্থাৎ– তুমি তো তাকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে ছেড়েছিলে যে, যাও; আমার জন্য প্রাণী শিকার করে নিয়ে আসো। সে গিয়ে শিকারের উপর আক্রমণ চালাল। আর তখন অন্য কোনো কুকুরও এসে তার সঙ্গে আক্রমণে শরীক হলো। দুজনে মিলে প্রাণীটিকে মেরে ফেলল। এমতাবস্থায় এই প্রাণীটি খাওয়া তোমার জন্য হালাল হবে না। কারণ, তুমি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' তোমার কুকুরটিকে ছাড়ার সময় পড়েছিলে; অপরটির উপর পড়নি। আর প্রাণীটি মৃত্যুবরণ করেছে উভয়ের আক্রমণে। তাই এই প্রাণী খাওয়া তোমার জন্য জায়েয হবে না।

যদি শরীয়ত অনুমোদিত ও অননুমোদিত দুটি কারণ একত্র হয়ে যায়, তা হলে প্রাণী হালাল নয়

এই হাদীস দ্বারা ফুকাহায়ে কেরাম মাসআলা বের করেছেন, কোনো প্রাণীর মৃত্যুতে যদি দুটি কারণ একত্র হয়ে যায়, যার একটি শরীয়ত অনুমোদিত আর অপরটি শরীয়ত অননুমোদিত, তা হলে এই সুরতে প্রাণীটি হালাল হবে না।

যেমন– আপনি কোনো পাখির গায়ে তীর ছুড়লেন। তীরের আঘাত খাওয়ার পর পাাখিটি পানিতে পড়ে গেল এবং তাকে পানির মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। আপনি তো জানতে পারলেন না, তার মৃত্যু কীভাবে হলো। তীরের আঘাতে হলো, নাকি পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে হলো। শরীয়তে বিধান হলো, যে প্রাণী তীরবিদ্ধ হয়ে মারা যায়, (তীর নিক্ষেপকালে বিসমিল্লাহ...বলে থাকলে) তা খাওয়া হালাল।

আর যে-প্রাণী পানিতে ডুবে মারা যায়, তাকে খাওয়া হালাল নয়। কিন্তু এখানে যেহেতু তার মৃত্যুর দুটি কারণ একত্র হয়েছে, তাই এই প্রাণী খাওয়া হালাল হবে না।

হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে মূলনীতি

এই মাসআলাটির ভিত্তি একটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তা হলো, গোশতের বেলায় আসল হলো হারাম হওয়া। অপর দিকে অন্যান্য বিষয়ে আসল হালাল ও নাজায়েয হওয়া। কাজেই অন্যান্য জিনিস ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয ও হালাল মনে করা হবে, যতক্ষণ-না তার মাঝে নিশ্চিতভাবে হারাম হওয়ার দলীল পাওয়া যাবে।

যেমন– রুটির আসল হলো হালাল হওয়া। চাই সেই রুটি আপনি একজন কাফেরের কাছ থেকেই ক্রয় করুন-না কেন। রুটি খাওয়া অতক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণিত না হবে যে, এর মধ্যে অমুক হারাম কিংবা নাপাক জিনিসের মিশ্রণ ঘটেছে। তখন এ রুটি খাওয়া হারাম হবে। কিন্তু গোশতের আসল হলো হারাম হওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা প্রমাণিত না হবে যে, এই প্রাণীটা শরীয়তের বিধান মোতাবেক (কোনো মুসলিমকর্তৃক) জবাই করা হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত গোশত হারামই মনে করা হবে। কাজেই কোনো কাফের যদি গোশত বিক্রি করে, তা হলে যতক্ষণ-না শরয়ী দলীল দ্বারা আপনার কাছে এ কথা প্রমাণিত হবে যে, এই পশুটা শরীয়তের বিধান অনুসারে জবাই করা হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই গোশত ক্রয় করে খাওয়া জায়েয ও হালাল হবে না। কাজেই গোশতকে হালাল বলতে হলে দলীলের প্রয়োজন আছে। কিন্তু অন্যান্য জিনিসের বেলায় বিধান হলো, সেগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করতে হলে দলীল আবশ্যক।

মনে রাখবেন, হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে এটি হলো মূলনীতি। একথাটি সব সময় মনে রাখা একান্ত আবশ্যক।

শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে কোনো বস্তুকে হারাম বলা যাবে না

আজকাল বিশেষ করে অমুসলিম দেশগুলোতে এ ব্যাপারটি বড় ধরনের একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। শুধু তা-ই নয় – এই সমস্যাটি এখন মুসলিম দেশগুলোতেও তৈরি হয়েছে। সমস্যাটি হলো, অমুসলিম দেশগুলোতে এমন বহু জিনিস বিক্রি হয়, যেগুলোর উপাদানে নাপাক কিংবা হারাম কোনো বস্তু থাকার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই উল্লিখিত মূলনীতিগুলোর আওতায় আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, যদি তাতে কোনো না-জায়েয উপাদান থাকার প্রমাণ পাওয়া না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে খাওয়া জায়েয হবে।

যেমন– পাউরুটি। কোনো-কোনো পাউরুটির ব্যাপারে শোনা গেছে যে, তাতে কোনো নাপাক বা হারাম কোনো বস্তু যুক্ত থাকে। যেমন– বলা হচ্ছে,

তাতে নাকি মৃত পশুর অথবা শূকরের চর্বি দেওয়া হয়। কিন্তু যেহেতু পাউরুটির আসল হলো হালাল হওয়া, সেজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চয়তার সঙ্গে জানা না যাবে যে, তাতে কোনো নাপাক বা হারাম বস্তুর মিশ্রণ আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পাউরুটি খাওয়ার সুযোগ আছে। এ ক্ষেত্রে বেশি পেরেশান হওয়ার দরকার নেই। তবে যদি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বাজারে কোনো পাউরুটিই এমন নেই, যা কোনো-না-কোনো নাপাক বা হারাম উপাদানের মিশ্রণ থেকে মুক্ত, তা হলে এই অবস্থায় পাউরুটি খাওয়া জায়েয হবে না।

প্যাকেটজাত গোশত

কিন্তু গোশতের ব্যাপারটি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানা না যাবে যে, এই গোশত শরীয়তের বিধান অনুযায়ী জবাই করা হালাল পশুর, ততক্ষণ পর্যন্ত এই গোশত খাওয়া হালাল হবে না। কাজেই আজকাল প্যাকিংকরা অবস্থায় যেসব গোশত অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি দেশ থেকে আসে, এসব গোশতের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। দুঃখের বিষয় হলো, ইদানীং সৌদি আরবেও এই গোশতের ব্যাপক প্রচলন হয়ে গেছে। গোশতের এই পাত্রের গায়ে লেখা থাকে :

مَذْبُوْحٌ عَلَى الطَّرِيْقَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

'ইসলামী পদ্ধতিতে জবাইকৃত।'

এই লেখা দেখে মুসলমান ধোঁকায় পড়ে উক্ত গোশত ভক্ষণ করে থাকে। অথচ শুধু পাত্রের গায়ের এই লেখা দ্বারা নিশ্চিত হওয়া যায় না যে, আসলেই এগুলোকে শরীয়তের বিধান অনুসারে জবাই করা হয়েছে। আমাদেরকে তদন্ত করে দেখতে হবে, এই কথাটি যারা লিখেছে, তারা কে বা কারা এবং কথাটি তারা কীসের উপর ভিত্তি করে লিখেছে। সত্যিই কি পশুটাকে তারা শরীয়তের বিধান অনুসারে জবাই করেছে, নাকি প্রতারণামূলকভাবে একথাটি লেখা হচ্ছে। তদন্তের মাধ্যমে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এই গোশত খাওয়া জায়েয হবে না।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, অনেকে আমাকে বলেছে, এটি একটি সীল বৈ কিছু নয়, যাকে পাত্রের গায়ে সেঁটে দেওয়া হয় মাত্র। এমনকি 'ইসলামী পদ্ধতিতে জবাইকৃত' এই সীল মাছের প্যাকেটের গায়েও লাগানো থাকে। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, এই লেখার কোনোই মূল্য নেই। এটি শুধুই পণ্যটিকে বাজারে খাওয়ানোর একটি কৌশলমাত্র।

এই মাসআলা অমুসলিম দেশগুলোর গোশতের ব্যাপারে প্রযোজ্য। কিন্তু যে অঞ্চলে মুসলমানের বসতি আছে, সেখানে যেহেতু এটাই স্বাভাবিক যে, ওখানকার মানুষ শরীয়ত মোতাবেকই পশু জবাই করে থাকবে, তাই ওখানকার

গোশতের ব্যাপারে ধরে নিতে হবে, এই গোশত শরীয়ত মোতাবেক জবাই করা হালাল পশুর। কাজেই এমন গোশতের ব্যাপারে তদন্ত করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু যে শহরে সাধারণত শরীয়তসম্মত উপায়ে জবাই না করা গোশতের অধিক প্রচলন; সেখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এখানকার গোশত যথাযথ তদন্ত ছাড়া খাওয়া জায়েয ও হালাল হবে না।

এই পার্থক্যের কারণ কী?

এই যে মূলনীতিটি আমি বর্ণনা করলাম, অন্যান্য বস্তুর মাঝে আসল হলো বস্তুটির হালাল হওয়া আর একমাত্র গোশতই এমন একটি বস্তু, যার আসল হারাম হওয়া। এই পার্থক্যের কারণ কী? তো এর কারণ হলো, গোশত হয় প্রাণীর। জীবিত প্রাণী খাওয়া সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। কোনো জন্তু তখনই হালাল হবে, যখন তাকে শরীয়তের বিধান অনুসারে জবাই করা হবে। এজন্য প্রাণীর আসল হারাম হওয়া।

এই হারাম হওয়াকে বিদূরিত করার জন্য শরীয়ত জবাইয়ের বিশেষ একটি পদ্ধতি ঠিক করে দিয়েছে যে, তোমরা যদি প্রাণীকে এই পদ্ধতিতে জবাই কর, তা হলে তা হালাল হয়ে যাবে। আর যদি এই পদ্ধতিতে জবাই না কর, তা হলে হারামই রয়ে যাবে।

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, জীবজন্তুর মাঝে আসল হলো হারাম হওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে সঠিক পদ্ধতিতে জবাই করার প্রমাণ পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা হালাল হবে না।

মোটকথা, হাদীসে এই যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাযি.)কে বলেছেন, তুমি তোমরা কুকুরের শিকার-করা-প্রাণী খেতে পার, যতক্ষণ-না তার সঙ্গে অন্য কোনো কুকুর শরীক হবে। এর কারণ এই ছিল যে, যেহেতু প্রাণীর বেলায় আসল হারাম হওয়া, তাই শিকার করার সময় যখন অন্য আরেকটা কুকুর অংশগ্রহণ করেছে, ফলে এখন বলা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই জন্তুর মৃত্যু কি তোমার প্রেরিত শিকারী কুকুরের আক্রমণ দ্বারা হয়েছে, নাকি অপর কুকুরটার আক্রমণ দ্বারা হয়েছে। ফলে এখানে সন্দেহ তৈরি হয়ে গেছে, এই জন্তুটার মৃত্যু শরীয়তনির্ধারিত পদ্ধতিতে হয়েছে, নাকি সে অনুযায়ী হয়নি। এই সন্দেহের কারণে প্রাণীটার মাঝে হারাম হওয়া এসে পড়েছে ব্যাপার কিন্তু এমন নয়। বরং ব্যাপার হলো, প্রাণীটি আগে থেকেই হারাম ছিল। এখানে হারাম হওয়া বিদূতির হয়ে হালাল হওয়ার ঘটনাটি ঘটতে পারেনি।

শুধু সন্দেহের কারণে হুরমত (হারাম হওয়া) প্রমাণিত হয় না

আর যেসব বস্তুর মাঝে হালাল হওয়া আসল, সেগুলোর মধ্যে শুধু সন্দেহের কারণে হুরমত (হারাম হওয়া) আসে না। যেমন– মুআত্তা ইমাম মালেক-এ হযরত ওমর (রাযি.)-এর একটি বিখ্যাত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কোনো একটি বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। পথে অযুর জন্য পানির প্রয়োজন দেখা দিল। তিনি একটি কূপ দেখতে পেলেন। হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) সঙ্গে ছিলেন। তিনি দেখলেন, সম্মুখ দিক থেকে কূপের মালিক আসছে। কাছে এসে পৌঁছার পর জিজ্ঞেস করলেন :

يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟

'ওহে কূপের মালিক! তোমার এই কূপে পানি পান করার জন্য কোনো হিংস্র জীবজন্তু আসে নাকি?'

তার একথা জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য ছিল, যদি এই কূপ থেকে পানি পান করার জন্য কোনো হিংস্র জীব-জন্তু এসে থাকে, তা হলে তাদের উচ্ছিষ্ট কূপে পড়ে থাকবে আর সে কারণে কূপের পানি নাপাক বলে বিবেচিত হবে আর তার দ্বারা অযু করা জায়েয হবে না।

কিন্তু কূপের মালিক কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই হযরত ওমর (রাযি.) বলে উঠলেন :

يَا صَاحِبُ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا

'শোনো-শোনো ওহে কূপের মালিক! এই তথ্য তুমি আমাদের দিয়ো না।'[৭৮]

হযরত ওমর (রাযি.) এজন্য বারণ করলেন যে, পানির আসল হলো পবিত্র হওয়া। ফলে মূলত এই পানি দ্বারা অযু করা জায়েয। কিন্তু কূপটি ছিল খোলা। তাই সন্দেহ তৈরি হয়ে গেল, হিংস্র জীব-জন্তু পানি পান করার জন্য এই কূপে আসে কি-না।

কিন্তু এই সন্দেহের কারণে এর পবিত্রতা বিনষ্ট হবে না। তাই যতক্ষণ-না কোনো কারণে এই পানি নাপাক হওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাবে, ততক্ষণ একে নাপাক বলা যাবে না। আর সেজন্যই হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর প্রশ্নের উত্তরে কূপের মালিক যদি বলে দিত, হ্যাঁ, মাঝে-মধ্যে জীব-জন্তুরা পানি পান করার জন্য এখানে আসে, তা হলে এই কারণেও শুধু সন্দেহ তৈরি হতো। আর নিছক সন্দেহের উপর ভিত্তি করে পাক পানি নাপাক হয়ে যায় না।

---

৭৮. মুআত্তা ইমাম মালিক ॥ কিতাবুত-তাহারাত : হাদীস নং-৩৯

এতে শুধু অযথা মনে একটি খটকা জাগত যে, এই পানি দ্বারা অযু করা জায়েয হবে কি-না। সেজন্যই হযরত ওমর (রাযি.) 'না হে কূপের মালিক! এই তথ্য তুমি আমাকে দিয়ো না' বলে সংশয় ও মনের খটকার মূলই উপড়ে ফেললেন।

বেশি তদন্তের দরকার নেই

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, মুবাহ বস্তুর মধ্যে যদি সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায়, তা হলে এই সন্দেহের কারণে সেই বস্তুটি হারাম হয়ে যায় না। আর হযরত ওমর (রাযি.)-এর এই আমল দ্বারা প্রমাণিত হলো, কোনো বস্তুর ব্যাপারে বেশি তদন্ত করার দরকার নেই যে, মানুষ প্রতিটি বস্তু খুটিয়ে-খুটিয়ে দেখবে, এর মাঝে হারাম কোনো বস্তুর মিশ্রণ ঘটেছে কি-না। অমুক জিনিসটিতে কী-কী উপাদান আছে। কারণ, শরীয়ত যখন তোমাকে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও এই বস্তুটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে, এমতাবস্থায় এই অজ্ঞতাও তোমার জন্য আল্লাহপাকের একটি নেয়ামত। কাজেই তদন্তের মাধ্যমে এই নেয়ামতটিকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করো না।

অনেকের এই অভ্যাস আছে যে, তারা যে-কোনো বস্তুর তত্ত্ব আবিষ্কারের পেছনে লেগে যায়, চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে থাকে। যেমন– এই ডালডা ঘিয়ের মধ্যে অমুক বস্তুটির মিশ্রণ আছে। এখন সে তার তদন্তের পেছনে লেগে গেল। আমার আব্বাজির কাছে এক ব্যক্তি আসা-যাওয়া করত। তার বিশাল এক তদন্তের বিষয় ছিল, ডালডা ঘিয়ের মাঝে এমন একটি বস্তুর মিশ্রণ আছে, যেটি হারাম বা নাপাক। প্রতিদিনই সে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এনে আব্বাজিকে দেখাত যে দেখুন, পত্রিকায় একথা লিখেছে।

আব্বাজি বলতেন, এই পত্রিকাটি আমি পড়ি না; তুমি এটি নিয়ে যাও আর নিজেই পড়ো।

মোটকথা, এসকল বস্তুতে সর্বসাধারণের ব্যাপক সম্পৃক্ততা আছে। সব মানুষই জিনিসগুলো ব্যবহার করে। এমতাবস্থায় আমাদের জন্য এটা জরুরি নয় যে, আমরা খুটিয়ে-খুটিয়ে দেখব, কোন জিনিসে কী উপাদান আছে বা পণ্যটিতে কোনো হারাম বা নাপাক কোনো উপাদান আছে কি-না। যদি আমরা তা-ই করতে যাই, তা হলে জগতের কোনো বস্তুই হালাল থাকবে না।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : তাকরীরে তিরমিযী– খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২৫-১৩০

হারাম সম্পদ থেকে বেঁচে থাকুন এবং সব সময় সত্য বলুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ فِي طُعْمٍ

'যে ব্যক্তির মধ্যে এই চারটি জিনিস বিদ্যমান থাকবে, দুনিয়ার কোনো জিনিসেরই বঞ্চনা তার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। সেই গুণগুলো হলো, সচ্চরিত্র, খাদ্য-খাবারে পবিত্রতা, সত্য কথা বলা ও আমানতের হেফাযত করা।'[৭৯]

এই চারটি গুণ যদি আল্লাহপাক কাউকে দান করেন, তা হলে সে দুনিয়ার আর কোনো নেয়ামত না পেলেও কল্যাণের জন্য তার এই গুণগুলোই যথেষ্ট।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে যে চারটি গুণের কথা বলেছেন, তার প্রথমটি হলো সচ্চরিত্র। আমি ইতিপূর্বে এ বিষয়টির উপর আলোচনা করেছি। আল্লাহপাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন।

দ্বিতীয় গুণটি হলো খাদ্য-খাবারে পবিত্রতা। মানুষ যা-কিছু খাবে, যে রিযিক তার হাতে আসবে, তা যেন হালাল ও পবিত্র হয়।

---

৭৯. মুসনাদে আহমাদ ॥ হাদীস নং- ৬৩৬৫; কানযুল উম্মাল ১৫/৮৫৮ ॥ হাদীস নং- ৪৩৪১৩; আয-যাওয়াজির ২/১০৭; মাজমাউয-যাওয়ায়িদ... ১১/২০৫ ॥ হাদীস নং- ১৮১২৩; শু'আবুল ঈমান ৪/২০৫ ॥ হাদীস নং ৪৮০১; আত-তারগীব... ৩/৩৬৫ ॥ হাদীস নং-৪৪৩৯; আদ-দুররুল মানছূর ২/৫৭২

সম্পদের পবিত্রতা দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

পবিত্র হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, শুধু দেখতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে, জীবাণু থেকে মুক্ত হবে; এসব থাকতে হবে, সে ভিন্ন কথা। মানুষ যেসব খাদ্য-খাবার খাবে, সেগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, জীবাণুমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে। কিন্তু এই হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পবিত্রতার কথা বলেছেন, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হারাম খাবার থেকে পরহেয করা এবং হালাল সম্পদ ও হালাল খাবার অর্জন করা। যখনই যা খাবে, তা যেন হালাল হয়, তার নিশ্চয়তা বিধান করা। ঈমানের যেকটি ভিত আছে, এটি তার একটি যে, মানুষ যা-কিছুই ভক্ষণ করবে, তার প্রতিটি গ্রাসই যেন হালাল হয়। কারণ, হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ

'যে গোশত হারাম দ্বারা তৈরি হয়, তার জন্য জাহান্নামই অধিক উপযোগী।'[৮০]

বলা অনাবশ্যক যে, মানুষ যে-খাবার খায়, তার দ্বারা তার শরীরের প্রবৃদ্ধি ঘটে। তার দ্বারা গোশত তৈরি হয়, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হয়, শরীরে শক্তি আসে। কাজেই যে গোশত ও যে শরীর হারাম সম্পদ ও হারাম খাদ্য দ্বারা তৈরি ও গঠিত হবে, জাহান্নামই তার উপযুক্ত ঠিকানা হবে, এটাই স্বাভাবিক। এমন শরীর জাহান্নামের ইন্ধন হবে।

এজন্য খাদ্য-খাবারে হালালের নিশ্চয়তা বিধান করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। মুসলমানকে এ ব্যাপারে সিরিয়াস হতে হবে যে, আমি যা অর্জন ও উপার্জন করব এবং যা-কিছু আহার করব, তা অবশ্যই হালাল হতে হবে। কোনো হারাম খাবার যেন আমার পেটে না যায় এ ব্যাপারে মুসলমানকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

দুনিয়াতে হারাম সম্পদে বরকত নেই

হারাম সম্পদের যে আপদ আখেরাতে ভোগ করতে হবে, তা আলাদা বিষয়। এ ব্যাপারেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হারাম দ্বারা গঠিত গোশত জাহান্নামের ইন্ধন হবে। কিন্তু তার আগে এই দুনিয়াতেও আল্লাহপাক হারামের কুফল দেখিয়ে থাকেন। আর তা হলো বরকতহীনতা। হারাম সম্পদে বরকত নেই। হারাম পন্থায় উপার্জিত অর্থ ও

৮০. সুনানে তিরমিযী ॥ কিতাবুল জুমু'আ : হাদীস নং-৫৫৮; মুসনাদে আহমাদ ॥ হাদীস নং-১৩৯১৯, ১৪৭৪৬

হারাম খাবারকে আল্লাহপাক দুনিয়াতে আপদে পরিণত করে দেন। বাহ্যিক চোখে দেখা যাবে, অনেক সম্পদ জমে গেছে। ব্যাংক-ব্যালেন্স অনেক হয়ে গেছে। কিন্তু বিপদ একের-পর-এক আসছে। কখনও চুরি হচ্ছে। কখনও ডাকাতি হচ্ছে। কখনও ছিনতাইয়ের শিকার হচ্ছে। রোগ-ব্যাধি একের-পর-এক লেগেই থাকছে। পেরেশানি আর অশান্তির অন্ত নেই।

এসবই হলো হারামের বরকতহীনতা। আল্লাহপাক হারামে বরকত রাখেননি। আল্লাহপাক হারামে আরাম রাখেননি।

তো একটা ক্ষতি দুনিয়াতে এই হয় যে, হারামে বরকত থাকে না। অর্থ-সম্পদ গণনায় অনেক হয়ে যায়; কিন্তু বরকত নেই। আজকাল আমাদেরই চারপাশে আমরা এর অজস্র দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছি। স্বচ্ছল ও ধনী পরিবার। আয়-রোজগার অনেক। কিন্তু অভিযোগ-অনুযোগের শেষ নেই। কারণ, তার সম্পদ হালাল নয়। তার সম্পদে বরকত নেই। তার এই অনুভূতি, এই বুঝ নেই যে, সম্পদ আমাকে হালাল উপার্জন করতে হবে, খাবার আমাকে হালাল খেতে হবে। তার এই বিশ্বাস নেই যে, আমার সম্পদ যদি হালাল না হয়, তা হলে তাতে কোনো বরকত থাকবে না। ফলে সে কাড়ি-কাড়ি অর্থের মালিক হচ্ছে বটে; কিন্তু আল্লাহপাক তাতে বরকত দিচ্ছেন না। এই বরকতহীন সম্পদ তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের অকল্যাণ ও অমঙ্গলের কারণ হচ্ছে।

হারাম সম্পদের সব চেয়ে বড় ক্ষতি

হারাম বস্তুর এর চেয়েও ভয়াবহ আরেকটি বরকতহীনতা হলো, হারাম গোশত, হারাম খাবার, হারাম জীবিকা মানুষের ভেতর থেকে ঈমানের অনুভূতিকে ছিনিয়ে নেয়। আল্লাহপাক আমাদেরকে রক্ষা করুন। ঈমানের যে অনুভূতি আছে, হারাম সম্পদ তাকে ভেতর থেকে বের করে দেয়। তখন মানুষে মধ্যে ভালো-মন্দের পার্থক্য থাকে না। বিবেক খারাপ হয়ে যায়। জ্ঞান উল্টে যায়। ভালোকে খারাপ আর খারাপকে ভালো বুঝতে শুরু করে। আল্লাহপাক যাদেরকে ঈমানের অনুভূতি, ঈমানের নূর দান করেছেন, তারা এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেন যে, আমার থেকে কোন সম্পদটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। যদি হারামের সামান্য একটু আবরণও এসে পড়ে, তা হলে তারা বুঝতে সক্ষম হন, মনের ভেতর একটি অন্ধকারের ছাপ পড়ে গেছে।

মাওলানা ইয়াকুব নানুতভী রহ.-এর একটি ঘটনা

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতভী রহ. হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর উস্তায ছিলেন। হযরত থানভী রহ. তাঁর একটি

ঘটনা লিখেছেন। নানুতভী রহ. একবার এক দাওয়াতে গিয়েছিলেন। ওখানে খানা খেলেন। পরে জানতে পারলেন, মেজবান লোকটির উপার্জনে সমস্য আছে। তিনি বলেছেন, এই কয়েক লোকমা খাবারের অন্ধকার আমি কয়েক সপ্তাহ যাবত অনুভব করতে থাকি। আর এই কয়েকটি সপ্তাহ আমার অন্ত পাপের প্রেরণা জাগতে থাকে। আমার অন্তরে বারবার এই ইচ্ছা জাগতে থা যে, আমি অমুক পাপটি করব, অমুক গুনাহটি করব।

হারাম খাদ্য খাওয়ার দরুন এমনটি হয়ে থাকে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক একথাটিই এভাবে বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাবার খাও আর নেক আমল করো।'[81]

মুফাসসিরগণ বলেছেন, মানুষ যখন হালাল খাবার খাওয়ার প্রতি[illegible]বান হয়, তখন তার মধ্যে নেক আমল করার অনুপ্রেরণা তৈরি হয়। আর য[illegible] হারাম খেতে শুরু করে, তখন অন্তরে পাপের প্রবণতা জাগ্রত হয়। বোঝে, [illegible] কাজটি খারাপ। কিন্তু তারপরও সেটি ছাড়তে পারে না, অন্তরে ছাড়ার সাহস[illegible]গে না। এজন্য হয় না যে, তার খাদ্য-খাবারে হালালের কোনো ভাবনা [illegible] হালাল-হারাম নির্বিশেষে সব খাবারই সে খায়।

আমাকে হালালই খেতে হবে। কোনো অবস্থাতেই হারাম খ[illegible] যাবে না, এই অনুভূতি তার নেই। আল্লাহই জানেন, কতভাবে হারাম খ[illegible] তার মুখে যায়, পেটে যায়। এই খাবারই তার মধ্যে পাপের প্রবণ[illegible] সৃষ্টি করে। আল্লাহপাক হালাল জীবিকা আর নেক আমলের মধ্যে, হারাম[illegible]দ্য আর বদ-আমলের মাঝে এই একটি সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছেন। হার[illegible] সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া আর গুনাহের জড়িয়ে পড়া, হালালকে বাধ্যতামূলক[illegible]র নেওয়া আর নেকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে নেওয়া সমান কথা।

তো দুনিয়ার জীবনে হারাম জীবিকার যে কটি ক্ষ[illegible]আছে, তার মধ্যে একটি হলো বরকতহীনতা। টাকা-পয়সা অনেক হয়ে গে[illegible] কিন্তু কাজ সমাধা হচ্ছে না। আরেকটি ভয়াবহ ক্ষতি হলো, তার ফলে ম[illegible]র অন্তরে গুনাহের প্রবণতা সৃষ্টি হয়, অন্তরে অন্ধকার নেমে আসে। প্র[illegible]থম এই আঁধারের অনুভূতি জাগলেও পরে সেই অনুভূতিটুকুও হারিয়ে যা[illegible] তখন মানুষ একের-পর-এর পাপ করতে থাকে; কিন্তু তার মধ্যে এই অন[illegible] থাকে না যে, আমি খারাপ কিছু করছি, আমি জাহান্নামের দিকে ধাবিত হ[illegible]

---

৮১. মুমিনূন : ৫১

হারাম সম্পদ অনুভূতিহীনতা সৃষ্টি করে

যাদের ঈমান আছে, তাদের অবস্থা হলো, যদি কখনও তাদের দ্বারা কোনো অন্যায়-অপরাধ হয়ে যায়, কোনো গুনাহের কাজ তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায়, তখন তাদের অন্তরে তার জন্য অনুশোচনা জাগ্রত হয়। তারা লজ্জিত হয় যে, আমি এই গুনাহটি করে ফেললাম! তখন ছোট একটি গুনাহও তার কাছে পাহাড়ের সমান বড় মনে হয়। লজ্জায়-অনুশোচনায় তার মাথাটা নত হয়ে আসে। আল্লাহর সমীপে কান্নাকাটি করে যে, হে আল্লাহ! আমার দ্বারা একটি ভুল হয়ে গেছে; আপনি আমাকে মাফ করে দিন। কিন্তু যখন অনুভূতিহীনতা জন্মে যায়, উদাসীনতা সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, সে গুনাহ করতেই থাকে। যদি কখনও মনে এই ভাবনা আসে যে, আমি তো অন্যায় করছি, আল্লাহর নাফরমানি করছি, তখন সঙ্গে-সঙ্গে সেই অনুভূতিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, যেন একটি মাছি এসে নাকের উপর বসেছিল আর সে তাকে তাড়িয়ে দিল। তারপর ধীরে-ধীরে সে পুরোপুরি বেপরোয়া হয়ে যায়, উদাসীন হয়ে যায়। অবলীলায় গুনাহ করতে থাকে। এতটুকু অনুভূতিও অবশিষ্ট থাকে না।

হারামখোরের দু'আ কবুল হয় না

হারাম জীবিকার তৃতীয় ক্ষতি হলো, মানুষের জীবিকা হালাল না হলে তার দু'আ কবুল হয় না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

'বহু মানুষ এমন আছে, তাদের মাথার চুলগুলো এলোমেলো ও ধুলামলিন। তারা খুব কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, হে আল্লাহ! আপনি আমার এই কাজটি করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমার এই কাজটি করে দিন। কিন্তু তার অবস্থা হলো, তার খাবারও হারাম। তার পোশাকও হারাম। তার শরীরও হারাম অর্থে প্রতিপালিত। বলো, এমন লোকের দু'আ কীভাবে কবুল হবে?'[৮২]

তো দুনিয়ার জীবনেই হারামখোরির তৃতীয় ক্ষতি হলো, একজন হারামখোর আল্লাহর কাছে দু'আ করে; কিন্তু তার কোনো দু'আ-ই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। আজকাল বহু মানুষকে এই অভিযোগ করতে শোনা যায়, অনেক দু'আ করলাম; কিন্তু কবুল হচ্ছে না। এর কারণ হলো, আপনার খাবার হালাল নয়। উপার্জন ও খাবার হালাল হওয়ার প্রতি আপনার কোনো খেয়াল নেই। ফলে

৮২. সহীহ মুসলিম কিতাবুয যাকাত : হাদীস নং ১৬৮৬; সুনানে তিরমিযী কিতাবু তাফসীরিল কুরআন : হাদীস নং ২৯১৫; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং ৭৯৯৮; সুনানে দারেমী কিতাবুর রিকাক : হাদীস নং ২৬০১

ঘটনা লিখেছেন। নানুতভী রহ. একবার এক দাওয়াতে গিয়েছিলেন। ওখানে খানা খেলেন। পরে জানতে পারলেন, মেজবান লোকটির উপার্জনে সমস্যা আছে। তিনি বলেছেন, এই কয়েক লোকমা খাবারের অন্ধকার আমি কয়েক সপ্তাহ যাবত অনুভব করতে থাকি। আর এই কয়েকটি সপ্তাহ আমার অন্তরে পাপের প্রেরণা জাগতে থাকে। আমার অন্তরে বারবার এই ইচ্ছা জাগতে থাকে যে, আমি অমুক পাপটি করব, অমুক গুনাহটি করব।

হারাম খাদ্য খাওয়ার দরুন এমনটি হয়ে থাকে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক একথাটিই এভাবে বলেছেন :

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا

'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাবার খাও আর নেক আমল করো।'[৮১]

মুফাসসিরগণ বলেছেন, মানুষ যখন হালাল খাবার খাওয়ার প্রতি যত্নবান হয়, তখন তার মধ্যে নেক আমল করার অনুপ্রেরণা তৈরি হয়। আর যখন হারাম খেতে শুরু করে, তখন অন্তরে পাপের প্রবণতা জাগ্রত হয়। বোঝে, এই কাজটি খারাপ। কিন্তু তারপরও সেটি ছাড়তে পারে না, অন্তরে ছাড়ার সাহস জাগে না। এজন্য হয় না যে, তার খাদ্য-খাবারে হালালের কোনো ভাবনা নেই। হালাল-হারাম নির্বিশেষে সব খাবারই সে খায়।

আমাকে হালালই খেতে হবে। কোনো অবস্থাতেই হারাম খাওয়া যাবে না, এই অনুভূতি তার নেই। আল্লাহই জানেন, কতভাবে হারাম খাবার তার মুখে যায়, পেটে যায়। এই খাবারই তার মধ্যে পাপের প্রবণতা সৃষ্টি করে। আল্লাহপাক হালাল জীবিকা আর নেক আমলের মধ্যে, হারাম খাদ্য আর বদ-আমলের মাঝে এই একটি সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছেন। হারামের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া আর গুনাহের জড়িয়ে পড়া, হালালকে বাধ্যতামূলক করে নেওয়া আর নেকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে নেওয়া সমান কথা।

তো দুনিয়ার জীবনে হারাম জীবিকার যে কটি ক্ষতি আছে, তার মধ্যে একটি হলো বরকতহীনতা। টাকা-পয়সা অনেক হয়ে গেছে। কিন্তু কাজ সমাধা হচ্ছে না। আরেকটি ভয়াবহ ক্ষতি হলো, তার ফলে মানুষের অন্তরে গুনাহের প্রবণতা সৃষ্টি হয়, অন্তরে অন্ধকার নেমে আসে। প্রথম-প্রথম এই আঁধারের অনুভূতি জাগলেও পরে সেই অনুভূতিটুকুও হারিয়ে যায়। তখন মানুষ একের-পর-এর পাপ করতে থাকে; কিন্তু তার মধ্যে এই অনুভূতি থাকে না যে, আমি খারাপ কিছু করছি, আমি জাহান্নামের দিকে ধাবিত হচ্ছি।

---

৮১. মুমিনূন : ৫১

হারাম সম্পদ অনুভূতিহীনতা সৃষ্টি করে

যাদের ঈমান আছে, তাদের অবস্থা হলো, যদি কখনও তাদের দ্বারা কোনো অন্যায়-অপরাধ হয়ে যায়, কোনো গুনাহের কাজ তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায়, তখন তাদের অন্তরে তার জন্য অনুশোচনা জাগ্রত হয়। তারা লজ্জিত হয় যে, আমি এই গুনাহটি করে ফেললাম! তখন ছোট একটি গুনাহও তার কাছে পাহাড়ের সমান বড় মনে হয়। লজ্জায়-অনুশোচনায় তার মাথাটা নত হয়ে আসে। আল্লাহর সমীপে কান্নাকাটি করে যে, হে আল্লাহ! আমার দ্বারা একটি ভুল হয়ে গেছে; আপনি আমাকে মাফ করে দিন। কিন্তু যখন অনুভূতিহীনতা জন্মে যায়, উদাসীনতা সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, সে গুনাহ করতেই থাকে। যদি কখনও মনে এই ভাবনা আসে যে, আমি তো অন্যায় করছি, আল্লাহর নাফরমানি করছি, তখন সঙ্গে-সঙ্গে সেই অনুভূতিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, যেন একটি মাছি এসে নাকের উপর বসেছিল আর সে তাকে তাড়িয়ে দিল। তারপর ধীরে-ধীরে সে পুরোপুরি বেপরোয়া হয়ে যায়, উদাসীন হয়ে যায়। অবলীলায় গুনাহ করতে থাকে। এতটুকু অনুভূতিও অবশিষ্ট থাকে না।

হারামখোরের দু'আ কবুল হয় না

হারাম জীবিকার তৃতীয় ক্ষতি হলো, মানুষের জীবিকা হালাল না হলে তার দু'আ কবুল হয় না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

'বহু মানুষ এমন আছে, তাদের মাথার চুলগুলো এলোমেলো ও ধুলামলিন। তারা খুব কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, হে আল্লাহ! আপনি আমার এই কাজটি করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমার এই কাজটি করে দিন। কিন্তু তার অবস্থা হলো, তার খাবারও হারাম। তার পোশাকও হারাম। তার শরীরও হারাম অর্থে প্রতিপালিত। বলো, এমন লোকের দু'আ কীভাবে কবুল হবে?'[৮২]

তো দুনিয়ার জীবনেই হারামখোরির তৃতীয় ক্ষতি হলো, একজন হারামখোর আল্লাহর কাছে দু'আ করে; কিন্তু তার কোনো দু'আ-ই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। আজকাল বহু মানুষকে এই অভিযোগ করতে শোনা যায়, অনেক দু'আ করলাম; কিন্তু কবুল হচ্ছে না। এর কারণ হলো, আপনার খাবার হালাল নয়। উপার্জন ও খাবার হালাল হওয়ার প্রতি আপনার কোনো খেয়াল নেই। ফলে

৮২. সহীহ মুসলিম কিতাবুয যাকাত : হাদীস নং ১৬৮৬; সুনানে তিরমিযী কিতাবু তাফসীরিল কুরআন : হাদীস নং ২৯১৫; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং ৭৯৯৮; সুনানে দারেমী কিতাবুর রিকাক : হাদীস নং ২৬০১

আপনি যা কিছু আহার করছেন, তাতে হারামের সংমিশ্রণ থেকে যাচ্ছে। আর এজন্যই আপনার দু'আ কবুল হচ্ছে না।

তো হারামের তিনটি ক্ষতি দুনিয়াতেই প্রকাশ পায়। একটি হলো বরকতহীনতা। আরেকটি গুনাহের প্রবণতা তৈরি হওয়া। অপরটি দু'আ কবুল না হওয়া। আখেরাতের শাস্তি তো আলাদা আছেই।

জীবিকা হারাম হওয়ার বিভিন্ন প্রকার

জীবিকা হারাম হওয়ার বিভিন্ন আকার আছে। কোনো-কোনো হারাম এমন, যা প্রতিজন মানুষেরই জানা আছে। যেমন– চুরি করে সম্পদ অর্জন করা। ডাকাতি করা। সুদ খাওয়া। ঘুষ খাওয়া। জুয়া খেলা। প্রতিজন মুসলমানই জানে, এই কাজগুলো হারাম এবং এগুলোর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করাও হারাম। কিন্তু হারাম উপার্জনের অনেকগুলো আকার এমন আছে, যেগুলোর ব্যাপারে অনেকেরই জানা নেই যে, এই পদ্ধতিতে অর্থ উপার্জন করা হারাম এবং আমি হারাম উপায়ে উপার্জন করছি এবং হারাম খাচ্ছি।

মিথ্যা বলে পণ্য বিক্রি করা হারাম

যেমন– একলোক ব্যবসায়ী। তার অভ্যাস হলো, পণ্য বিক্রি করার সময় সে মিথ্যা বলে এবং ভুল তথ্য পরিবেশন করে ক্রেতাকে প্রতারিত করে। তো এর দ্বারা সে যে-অর্থ উপার্জন করল, তার এই আমদানি হারাম হলো। কারণ, এই উপার্জনে সে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে।

একটি পণ্য তৈরী এক দেশের। কিন্তু আপনি ক্রেতাকে মিথ্যা ও ভুল তথ্য প্রদান করলেন যে, এটি অমুক দেশের তৈরী। যে দেশের তৈরী নয়, আপনি পণ্যটিকে সে দেশের তৈরী বলে চালিয়ে দিলেন। আপনি মিথ্যা বললেন এবং ধোঁকা দিলেন। তো এখানে যে মুনাফা করলেন, তা হালাল হলো না। এই উপার্জন থেকে আপনি যা খেলেন, হারাম খেলেন। আপনার জীবিকা হারাম হয়ে গেল। এদিকেও মানুষের কোনো খেয়াল নেই।

চাকুরিতে কাজ চুরি হারাম

যেমন– এক ব্যক্তি কোথাও চাকুরি করছে। ডিউটির জন্য সময় নির্ধারিত আছে আট ঘণ্টা। তার জন্য কর্তব্য হলো, এই কর্মকালের সবটুকু সময় চাকুরির কাজে ব্যয় করতে হবে। এখন যদি কোনো ব্যক্তি এই আট ঘণ্টা সময় পুরোপুরি কাজ না করে – অফিসে বিলম্বে যায় এবং আগে-ভাগে বেরিয়ে আসে কিংবা মধ্যখানে নিজের কাজ করে বা কাজ ফেলে রেখে আড্ডা মারে, এমনকি

অফিসের কাজ বাদ দিয়ে নফল নামায পড়ে বা অফিসের কাজ থাকা সত্ত্বেও তা না করে কুরআন তেলাওয়াত করে, তো এসবও হারাম।

এভাবে প্রতিষ্ঠানের যে সময়টুকু নষ্ট করা হলো, তার বেতন তার জন্য হারাম ও না-জায়েয হবে। কিন্তু এই সময়টুকুর বেতনও আপনি আপনার ন্যায্য পাওনার সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

এখন কী হলো? দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝুন। একটি বালতিতে পানি ভর্তি আছে। আপনি সেই পানিগুলোর মধ্যে এক ফোঁটা পেশাব ঢেলে দিলেন। তা হলে পেশাবের এই একটি ফোঁটা পুরো বালতিটিকে নাপাক করে দেবে কি-না? অবশ্যই করবে।

তো হারাম অর্থ যদিও অল্প হয়, তা যখন মানুষের হালাল জীবিকার সঙ্গে মিশে যায়, তখন তা পুরো সম্পদে নাপাক ছড়িয়ে দেয় এবং সম্পূর্ণ জীবিকা হারাম হয়ে যায়। আর তখন মানুষ যা খায়, সবই হারাম খায়। আর তাতে হারামের বরকতহীনতা এসে পড়ে।

এবার দেখুন, আমরা কত মানুষ আছি, যারা চাকুরি করি। কিন্তু চাকুরিতে প্রতিষ্ঠানকে সময় পুরোপুরি দেই না। যে দায়িত্ব পালনের শর্তে মাস শেষে বেতন গ্রহণ করি, সেই দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করি না। কিন্তু বেতন-ভাতা ঠিকই পুরোপুরি গ্রহণ করি। এই বেতন হালাল হচ্ছে না। আল্লাহপাক আমাদের প্রত্যেককে এর থেকে নিরাপদ রাখুন।

হযরত থানভী রহ.-এর মাদরাসার নীতিমালা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ)-এর একটি মাদরাসা ছিল। সেখানকার উস্তাযদের জন্য বেতন ধার্য ছিল। সেখানে প্রথম দিন থেকেই এই নিয়ম ছিল যে, প্রত্যেক উস্তায মাদরাসার জন্য নির্ধারিত সময়ে যদি নিজের কোনো কাজ করতেন, মানে কোনো একটি সময় যদি মাদরাসার কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যয় করতেন, তা হলে সেটি নোট করে রাখতেন যে, আমার একজন মেহমান এসেছিল; আমি এতটা থেকে এতটা পর্যন্ত তাকে সময় দিয়েছি এবং এই সময়টিকে আমি মাদরাসার কাজ থেকে বিরত থেকেছি।

তারপর যখন বেতন নেওয়ার সময় আসত, তখন এই সময়গুলো হিসাব করে অফিসে নোট দিতেন যে, আমি এক মাসে এত সময় মাদরাসার কাজ করিনি। অতএব আমার বেতন থেকে এই সময়গুলোর বেতন কর্তন করে রাখা হোক। এই সময়গুলোর বেতন গ্রহণ করা আমার জন্য হালাল হবে না। কারণ, এই সময়গুলো আমি আমার নিজের কাজে ব্যয় করেছি। হযরতের মাদরাসার প্রত্যেক উস্তায এই নীতির অনুসরণ করতেন।

আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দারুল উলূমেও এই নীতির অনুসরণ করা হয়। প্রত্যেক উস্তায নিজ-নিজ দায়িত্বে হিসাব রাখেন এবং মাসের শেষে অফিসে নোট জমা দেন যে, এ মাসে আমি এতটুকু সময় ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করেছি। অতএব আমার বেতন থেকে এই সময়গুলোর বেতন কর্তন করে রাখা হোক।

বর্তমানে যুগটা-ই এমন যে, প্রতিজন মানুষ নিজের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত। প্রত্যেকে নিজের অধিকার আদায়ের জন্য এক পায়ে খাড়া যে, আমার পাওনাটা পেতে হবে। কিন্তু তার যিম্মায় অন্যের যে পাওনা রয়েছে, তা আদায় হচ্ছে কি-না তার কোনো খবর নেই।

এ হাদীসখানা আজকাল মানুষের খুব মনে আছে :

أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

'ঘাম শোকানোর আগেই শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।'[৮৩]

তো একলোক কোথাও মজুরি খাটছে। তার এই হাদীসটি ভালোভাবে মুখস্থ আছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শ্রমিকের গায়ের ঘাম শোকানোর আগে-আগে তার মজুরি পরিশোধ করে দাও। একব্যক্তি আমার কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলে আমি বললাম, কথা তো ঠিক আছে যে, গায়ের ঘাম শোকানোর আগে-আগে শ্রমিকের মজুরি দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তোমাকে এটাও তো দেখতে হবে যে, মালিকের কাজ করে সে ঘাম ঝরিয়েছে কি-না। ঘাম যদি না-ই ঝরিয়ে থাকে, শোকানোর আগে পারিশ্রমিক দিবে কীভাবে?

তো তোমার যতটুকু দায়িত্ব, তা তুমি যথাযথভাবে পালন করো। তারপর তোমার পাওনা দাবি করো। কিন্তু যদি আপনার অবস্থা হয় এই যে, আপনি আপনার কর্তব্যে অবহেলা করছেন, আপনি আপনার দায়িত্ব ঠিকমতো আদায় করছেন না; কিন্তু দাবি করছেন, আমার পাওনাটা ঠিকঠিক আদায় করে দাও, তা হলে পবিত্র কুরআন এই কর্মনীতিকে সমর্থন করে না। এই পন্থায় বেতন-ভাতা গ্রহণ করা হারাম। আপনি কাজ করলেন না; কিন্তু বেতন নিলেন। এর থেকে পরহেয করা জরুরি।

মোটকথা, মানুষের দেখতে হবে, আমার উপার্জন হালাল কি-না। এ ব্যাপারে প্রতিজন মানুষকে সচেতন হতে হবে। আপনার আয়ের মাধ্যম যদি ব্যবসা হয়, তা হলে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, এখানে কোনো অসদুপায় অবলম্বন করা হচ্ছে কি-না। ব্যবসা যেন পুরোপুরি সততা ও স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যদি কোনো অসদুপায়

---

৮৩. সুনানে ইবনে মাজা কিতাবুল আহকাম : হাদীস নং–২৪৩৪

অবলম্বন না করে সম্পূর্ণ শরীয়তের বিধান অনুসারে ব্যবসা করতে পারেন, তাহলে আপনার এই উপার্জন হালাল।

যদি আপনার আয়ের উৎস চাকুরি হয়, তা হলে লক্ষ্য রাখতে হবে, বেতনের বিপরীতে আপনার যে ডিউটি আছে, তাতে কোনো ঘাপলা হচ্ছে কি-না। যদি এমনটি করতে পারেন, তা হলে আপনার উপার্জন হালাল। অন্যথায় আপনার উপার্জনে হারামের সংমিশ্রণ ঘটছে।

বরকতহীনতা এ দুর্নীতিরই শাস্তি

মানুষ এসে-এসে আমাকে মাসআলা জিজ্ঞেস করে, আমি সরকারের যে বিভাগে চাকুরি করি, সেখানকার কয়েকজন কমকর্তা সময়মতো অফিসে আসে না। এসে বড়জোর দু-তিন ঘণ্টা থাকে। কিন্তু আমার উপর চাপ সৃষ্টি করে, আমি যেন পুরো সময়ের হাজিরি লিপিবদ্ধ করি। আমাকে তারা বাধ্য করে। আমি উত্তর দেই, এটা জায়েয নয় যে, কাজ কিছুই হচ্ছে না; কিন্তু সময়মতো বেতন নিতে হাজির হয়ে যাচ্ছে। এই উপার্জন হারাম। আপনারা এই যে বরকতহীনতা দেখতে পাচ্ছেন, তা এই হারাম উপার্জনেরই ফলাফল।

এই যে লুটমার চলছে। কারুর জীবন-সম্ভ্রমই নিরাপদ নয়, এই পরিস্থিতি এমনি-এমনি তৈরি হয়নি। অদৃশ্য কিছু কারণে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে। আমরা এসবের কারণ চোখে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো শাস্তি, যেগুলো আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলো হারামখোরির সাজা।

জাতি আজ নানা অপরাধে জড়িত। জাতি সুদখোর হয়ে গেছে। তার ফলে গোটা জাতি তার শাস্তি ভোগ করছে। মনে রাখবেন, হারাম আমদানির উপকারিতা কেউই পায় না। সবাই বিপদের শিকার হয়ে থাকে। কারুরই জীবনে শান্তি আসে না। যে লোক এক জায়গা থেকে ঘুষ নেয়, তাকে দশ জায়গায় ঘুষ দিতে হয়। যদি হিসাব করে দেখেন, তা হলে দেখবেন, ফলাফল জিরো। এক জায়গা থেকে নিয়েছেন আর দশ জায়গায় দিয়ে শেষ করে ফেলেছেন। ফলাফল বরকতহীনতা আর অন্ধকার। পরকালের শাস্তি তো আলাদা আছেই । এর কারণে পাপের সয়লাব চলছে।

আল্লাহপাক আমাদেরকে বিষয়টি বুঝবার তাওফীক দান করুন। আমাদের অন্তরে হারামের প্রতি ঘৃণা ও হালালের প্রতি যত্নবান হওয়ার আগ্রহ দান করুন। যে লোকমাটি পেটে যাচ্ছে, তা যেন হালাল হয়, সেদিকে পুরোপুরি খেয়াল রাখার তাওফীক দান করুন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কঠোর সাবধানতা

একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির জানাযা পড়াতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে এক মহিলার বাড়ি ছিল। মহিলার মনে সখ জাগল, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার এত কাছাকাছি এসেছেন; আমি তাঁকে দাওয়াত করে আমার ঘরে আনব এবং কিছু খাওয়াব। মহিলা নবীজির কাছে আমন্ত্রণ পাঠাল। নবীজি তার দাওয়াত কবুল করলেন। তিনি এলেন। মহিলা তাঁর সম্মুখে খাবার পেশ করল। তিনি খাবারের প্রথম লোকমাটি মুখে দিয়েই হঠাৎ থেমে গেলেন এবং লোকমাটি বের করে ফেললেন। তারপর বললেন, মনে হচ্ছে, এই ছাগলটি মালিকের অনুমতি ছাড়া ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। মহিলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হলো। মহিলা বলল, আমি একজনকে ছাগল ক্রয় করে আনতে পাঠিয়েছিলাম; কিন্তু পাওয়া যায়নি। তারপর এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে কিনতে চেয়েছিলাম। সেও বিক্রি করতে অস্বীকার করল। আমি তার স্ত্রীকে বললাম, একটি ছাগল তুমি বিক্রি করে দাও। তো সে তার স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে এই ছাগলটি আমার কাছে বিক্রি করেছে। তারই গোশত আমি আপনাকে খেতে দিয়েছি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই গোশতগুলো বন্দীদের খাইয়ে দাও।[৮৪]

তা ছাড়া নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ مُّسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ

'কোনো মুসলমানের সম্পদ তার মনের সন্তুষ্টি ব্যতীত হালাল নয়।'[৮৫]

কারও সম্পদ তার সন্তুষ্টি ছাড়া হালাল নয়

মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং ভালো করে বুঝুন। কারও সম্পদ তার মনের সন্তুষ্টি ব্যতীত হালাল নয়। আপনি যদি জোর করে সম্পদ হস্তগত করেন আর তাতে তার সম্মতি ও সন্তুষ্টি না থাকে, তা হলে এই সম্পদ আপনার জন্য হালাল হবে না। এমনকি সে যদি আপনাকে সম্পদটি নিজহাতে দিয়েও দেয়, তবুও হালাল হবে না। আপনি কারও মাথায় চড়ে বসলেন। প্রবল চাপ ও পীড়াপীড়ির কারণে বাধ্য হয়ে সে আপনাকে তার সম্পদটি দিয়ে দিল যে, নাও

---

৮৪. সুনানে আবী দাউদ কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং-২৮৯৪; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং-২১৪৭১

৮৫. কানযুল উম্মাল : হাদীস নং-৩৯৭; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং-১৯৭৭৪; জামিউল আহাদীস : হাদীস নং-১৭৬১৫; কাশফুল খাফা : হাদীস নং-৩১০১

ভাই! এভাবে দিয়ে সে আপনার থেকে মুক্তি পেল। তো আপনি যদি কারও থেকে এভাবে তার সম্পদ হস্তগত করেন, তা হলে এই সম্পদ আপনার জন্য হালাল হবে না। কারণ, বাহ্যিক চোখে যদিও দেখা যাচ্ছে, সম্পদটি সে আপনাকে নিজের হাতে ধরে প্রদান করেছে; কিন্তু এই লেনদেনে তার মনের সন্তুষ্টি ছিল না। সেজন্য এই সম্পদ হালাল হবে না। ক্রয়-বিক্রয়ের বেলায়ও অনেক সময় এমন আচরণ হয়ে যায়। যেমন– আপনি কিছু ক্রয় করতে বাজারে গেলেন। বিক্রেতা আপনাকে দাম বলল যে, ঠিক এত টাকা। কিন্তু আপনি কম দিলেন। এত কম দিলেন যে, ক্রেতা তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করল না। কিন্তু আপনার প্রবল চাপ ও পীড়াপীড়ির কারণে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে পণ্যটা আপনাকে দিয়ে দিল। কিন্তু তাতে তার মনের সন্তুষ্টি ছিল না। তো এই যে আপনি তাকে কম দিলেন, এটি আপনার জন্য হালাল হয়নি। এই সম্পদ আপনার জন্য পবিত্র নয়। আজকাল মানুষ চাঁদা সংগহে এই নীতির খেলাফ করে থাকে। মনের সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে অপরের পকেটের টাকা হস্তগত করে থাকে।

কয়েকটি সামাজিক অপরাধ

চাঁদা তোলার বেলায় অনেক সময়ই এমন হয়ে থাকে যে, দিতে মন চাচ্ছে না। দেওয়ার ক্ষেত্রে মনের সম্মতি নেই। কিন্তু তারপরও পারিপার্শ্বিকতার কারণে চাপে পড়ে এই ভয়ে দেয় যে, না দিলে মানুষ আমার বদনাম করবে। এই সম্পদও হালাল নয়।

মানুষ বিবাহ-শাদিতে উপহার দেয়। ভেতর থেকে মন চায় না, দেই। কিন্তু এজন্য দেয় যে, না দিলে লোকে মন্দ বলবে। বদনাম হবে। নাক-কান কাটা যাবে। তো এই দানও মনের সন্তুষ্টির দান নয়। এ কারণে এই সম্পদও হালাল নয়। ব্যাপার শুধু এটুকুই নয় যে, অনুমতি পেতে হবে। বরং অনুমতির সঙ্গে মনের সম্মতি, মনের সন্তুষ্টিও থাকতে হবে। যদি মনের সন্তুষ্টি না থাকে, তা হলে কোনোমতেই হালাল হবে না।

কিন্তু এই বিষয়টি এমন যে, এর প্রতি আমাদের কোনো খেয়াল নেই। এ বিষয়টির প্রতি আমাদের চোখ যায়-ই না। আমরা মনে করি, হারাম তো সেই সম্পদ, যাকে চুরির মাধ্যমে অর্জন করা হবে, জুয়ার মাধ্যমে অর্জন করা হবে। কিন্তু অপরের সম্পদ নিজের সম্পদে পরিণত হতে হলে যে মনের সন্তুষ্টিও থাকা শর্ত, একথাটি আমাদের অনেকেরই জানা নেই। এ বিষয়টিকে আমরা মোটেও গুরুত্ব দেই না।

আপনি কারও বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। কিন্তু এখন বাড়ির মালিক চাচ্ছেন, আপনি তার বাড়িটি ছেড়ে দিন; বাড়ি তার নিজের দরকার। কিংবা অন্য কোনো

কারণে তিনি আপনাকে বাড়ি খালি করে দিতে বলেছেন। কিন্তু আপনি বললেন, না, আমি ছাড়ব না। তো যতদিন আপনি বিনা অনুমতিতে অন্যের বাড়িতে থাকবেন, ততদিন আপনার এই বসবাস হারাম বলে বিবেচিত হবে। এভাবে অপরের বাড়িতে থাকা হারাম। কারণ, আপনি মালিকের অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া তার বাড়িটি ব্যবহার করছেন।

হারাম-হালালের বেলায় মানুষ আজকাল বড় বেশি উদাসীন হয়ে পড়েছে। এই কাজটি আমি হারাম করছি, না হালাল করছি, এই খাবার আমি হালাল খাচ্ছি, না হারাম খাচ্ছি, এদিকে মানুষ মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হারাম চলছে। ঘুম থেকে জাগ্রহ হওয়ার পর থেকে আবার ঘুমানো পর্যন্ত সমস্ত কাজ হারাম চলছে। কিন্তু কারুরই কোনো খবর নেই।

তো সারকথা হলো, কারও সম্পদ তার সম্মতি ও মনের সন্তুষ্টি ব্যতীত হালাল হয় না। চাই তা সামান্য সময়ের জন্যই হোক-না কেন। অপরের কোনো সম্পদ ব্যবহার করতে হলে মুখের অনুমতির পাশাপাশি তার মনের সন্তুষ্টিও আবশ্যক। এছাড়া হালাল হবে না। চাই দুজনের মাঝে ঘনিষ্ট আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বই থাকুক-না কেন। আপনি যে জিনিসটি নিতে চাচ্ছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি শতভাগ নিশ্চিত না হবেন যে, এতে তার মনের সন্তুষ্টি আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা গ্রহণ করা বা ব্যবহার করা আপনার জন্য জায়েয ও হালাল হবে না।

কারও ঘরে টেলিফোন রাখা আছে। আপনি রিসিভারটা তুলেই ডায়ালিং শুরু করে দিলেন। মালিককে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করলেন না, আমি ফোন করতে পারব কি-না। ব্যস আপনার কারও সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন দেখা দিল আর অমনি ফোন করলেন। এসব কাজ মালিকের অনুমতি ছাড়া চলছে। এজন্য এগুলো হারাম ও নাজায়েয। এসব ব্যাধি আজকাল সমাজে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ে।

তো আমার ভাইয়েরা! আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের জীবনটার উপর খানিক দয়া করুন। অন্তত এতটুকু তো না হলে চলে না যে, যা কিছু খাচ্ছেন, তা যেন হালাল হয়। অপরের কাছ থেকে যা কিছু অর্জন করছেন, তাতে যেন তার মালিকের মনের সন্তুষ্টি থাকা নিশ্চিত হয়। প্রতিজ্ঞা করুন এবং নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিন, যা কিছু পেটে দেবেন, তা যেন অবশ্যই হালাল হয়।

হালাল-হারামের পার্থক্য মুছে যাচ্ছে

একটি সময় ছিল, তখন মানুষের মাঝে হালাল-হারামের বাছ-বিচার ছিল যে, যে গ্রাসটা-ই আমি মুখে দিচ্ছি, তা হালাল, না হারাম। মানুষ যখন জানতে পারত, আমি যে গোশতগুলো খেয়েছি, তা সদকার ছিল, তখন মানুষ বিচলিত

হয়ে পড়ত যে, হায় আমি সদকার গোশত খেয়ে ফেলেছি। সদকার গোশত খাওয়াকেও মানুষ বদনামের কারণ মনে করত যে, মুসলমান সদকার গোশত খাচ্ছে! কিন্তু এ যুগের অবস্থা হলো, আজকাল প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রে Imported (আমদানিকৃত) গোশত আসছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে আসছে। নিউজিল্যান্ড থেকে আসছে। ব্রাজিল ইত্যাদি দেশ থেকে আসছে। কিন্তু মুসলমান জানবার প্রয়োজন বোধ করছে না, এই গোশত হালাল, না হারাম। এল আর অমনি খাওয়া শুরু হয়ে গেল। এর পেছনে ক্রেতার ভিড় লেগে গেল, যেন দীর্ঘদিন না পাওয়ার পর এবার গোশত এল। ব্যস, খাওয়া শুরু হয়ে গেল। মনে এই প্রশ্ন জাগল না, পশুটভ হালাল তরিকায় জবাই করা হয়েছে কি-না।

করাচিতে প্রথম যখন ম্যাকডোনাল-এর খাবারের দোকান খুলল, তখন যেন এক তুফান আরম্ভ হয়ে গেল। মানুষ দলে-দলে খাওয়ার জন্য এ দোকানে যেতে লাগল। এমন লোকের সংখ্যা হাজারে এক-দুজন ছিল, যারা জিজ্ঞেস করত, এটা যেহেতু ইহুদি কোম্পানি, তাই এদের খাবারে যে গোশত ব্যবহার করা হয়, তা হালাল কি-না। আমরা অনুসন্ধান করে জানলাম, আলহামদুলিল্লাহ এটা হারাম নয়; বরং হালাল বলেই প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, আমি জানতে পেয়েছি, পশুগুলোকে হালাল ও শরীয়তসম্মত উপায়েই জবাই করা হয়।

কিন্তু এখানে দেখার বিষয়টি হলো, এ কোম্পানি আমাদের দেশে আসার পর এর পেছনে লাইন লাগানোর আগে এখানকার মুসলমানদের মনে এই প্রশ্ন জাগ্রত হওয়া দরকার ছিল, এগুলো হালাল, না হারাম। যথাযথ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত খাওয়া থেকে বিরত থাকা আবশ্যক ছিল। আমাদের মাঝে হালাল-হারামের ভাবনা থাকা দরকার ছিল। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমাদের মধ্য থেকে সেই ভাবনা উঠে গেছে। মুসলমানদের মাঝে এখন হারাম-হালালের তমিয নেই। আর সেজন্যই আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে না যে, আমি যে-খাবারগুলো খাচ্ছি, সেগুলো হালাল, না হারাম। ফলে এই হারাম খাবার আমাদের পেটে গিয়ে কতই-না অনাচার জন্ম দিচ্ছে। আমাদের চরিত্র ও আমল বরবাদ করে দিচ্ছে।

তো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) বর্ণনা করছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমার চরিত্রে যদি হালাল-হারামের পার্থক্য করার স্বভাব জন্মে যায়, তা হলে ধরে নিয়ো, জগতের সমস্ত নেয়ামত তোমার মাঝে একত্র হয়ে গেছে – তুমি দুনিয়ার সমস্ত নেয়ামত পেয়ে গেছ। আগে দেখো, জিনিসটি হালাল, না হারাম। এটি হালাল উপায়ে অর্জিত হয়েছে, না-কি হারাম উপায়ে। যে অর্থ দ্বারা এই খাবার ক্রয় করা হয়েছে, তা হালাল ছিল, না-কি হারাম ছিল। নিজের মধ্যে এই ভাবনা সৃষ্টি করে নিতে হবে। তা

হলে আল্লাহপাক জীবনে বরকত ও আলো দান করবেন। এক-একটি পয়সার মধ্যে আলো অনুভব করবেন। এক-একটি টাকার মধ্যে বরকত প্রত্যক্ষ করবেন।

আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

সততাকে নিজের প্রতীক বানিয়ে নিন

তৃতীয় গুণ এই বলেছেন যে, যে কথা মুখ থেকে বের হবে, কলম থেকে বের হবে, তাতে যেন মিথ্যার লেশও না থাকে। এই মিথ্যা এত বড় আপদ যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কাফির-মুশরিকরাও মিথ্যা বলাকে দোষ মনে করত। হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.) তখনও মুসলমান হননি। ইসলামের শত্রু ছিলেন। তিনি সম্রাট হেরাক্লিয়াসের দরবারে গেলেন। হেরাক্লিয়াস নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে চাইলেন। তিনি হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.)কে দরবারে তলব করলেন। আবু সুফিয়ান (রাযি.) বলেন, আমার মন চাচ্ছিল, নবীজির বিরুদ্ধে কিছু কথা বানিয়ে বলি। কিন্তু সমস্যা এই দাঁড়াল যে, যদি তাঁর বিরুদ্ধে বানিয়ে বলি. তা হলে আমার কথাগুলো মিথ্যা হয়ে যায়। কিন্তু মিথ্যা বলতে আমার মন সায় দিল না। আমি মিথ্যা বলতে পারলাম না।[৮৬]

তো হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.) কাফির থাকা অবস্থায় একথা বলছেন। তার অর্থ হলো, মিথ্যা বলা কাফির-মুশরিকদের কাছেও অন্যায়-অপরাধ বলে বিবেচিত। সেকালে অমুসলিমরাও মিথ্যা বলাকে পাপ মনে করত। কিন্তু আজকালকার সমাজে মিথ্যা একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলার আগে চিন্তা করা হয় না, আমি যে কথাটি বলতে যাচ্ছি, সেটি বাস্তব, না অবাস্তব।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ

'সত্য বলা মুক্তি দেয় আর মিথ্যা বলা ধ্বংস করে।'[৮৭]

হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর সততা

সাহাবায়ে কেরাম কঠিন-থেকে-কঠিনতর পরিস্থিতিতেও মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকতেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আপন

---

৮৬. সহীহ বুখারী কিতাবু বাদ্ইল ওয়াহ্‌য়ি ॥ হাদীস নং-৬; সহীহ মুসলিম কিতাবুল জিহাদ ॥ হাদীস নং-৩৩২২; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং-২২৫২

৮৭. কানযুল উম্মাল : ৩/৪২৯, হাদীস নং-৭২৯৪; কাশ্‌ফুল খাফা ১/৪০৭, হাদীস নং-১৩০৭

মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করছিলেন, তখন হযরত আবুবকর (রাযি.) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মক্কার মুশরিকরা নবীজিকে খুঁজে ধরে নিতে সবদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। তারা নবীজির মাথার মূল্য নির্ধারণ করেছে যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মদকে ধরে আনতে পারবে, তাকে একশো উট পুরস্কার দেওয়া হবে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার পানে এগিয়ে চলছেন। হযরত আবুবকর (রাযি.) তাঁর সঙ্গে আছেন। পথে এক জায়গায় একলোক তাঁদের দেখতে পেল, যে কিনা হযরত আবুবকর (রাযি.)কে চেনে; কিন্তু নবীজিকে চেনে না। সে হযরত আবুবকর (রাযি.)কে জিজ্ঞেস করল, ইনি কে? হযরত আবুবকর (রাযি.) চিন্তা করলেন, আমি যদি নবীজির নাম বলি, তা হলে সমস্যা হতে পারে। হয়ত লোকটি গিয়ে তথ্য ফাঁস করে দেবে আর কাফিরদের পরিকল্পনা সফল হয়ে যাবে এবং আল্লাহর রাসূল বিপদে পড়ে যাবেন। আবার মিথ্যাও তো বলা যাবে না। আল্লাহপাক এ ধরনের পরিস্থিতিতে মুমিনকে সাহায্য করে থাকেন। হযরত আবুবকর (রাযি.) উত্তর দিলেন, 'ইনি আমার পথপ্রদর্শক, যিনি আমাকে পথ দেখান।'[৮৮]

তো এই সঙ্গিন পরিস্থিতিতেও হযরত আবুবকর (রাযি.) সরাসরি মিথ্যা বলেননি। উত্তর শুনে লোকটি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল যে, উনি একজন লোকের সহায়তায় কোথাও যাচ্ছেন আর তিনি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তো হযরত আবুবকর (রাযি.) যে কথাটি বলেছেন, তিনি তার অর্থ নিয়েছেন, ইনি আমার দ্বীনের পথপ্রদর্শক। দ্বীন-ধর্মের বেলায় ইনি আমাকে পথ দেখান।

তো মুখ থেকে মিথ্যা কথা বের করা এটি মুসলমানের স্বভাব নয়। অথচ কোনো-কোনো জটিল পরিস্থিতে নিজের জীবন রক্ষার্থে মিথ্যা বলার অনুমতিও আছে। তেমন পরিস্থিতিতে মিথ্যা বললে আল্লাহপাক ক্ষমা করে দেন। কিন্তু মুসলমান যথাসম্ভব মিথ্যা বলবে না। এটি মুমিনের কাজ নয়।

মিথ্যার অর্থ শুধু এই নয় যে, আপনি জেনে-শুনে মিথ্যা বলবেন। বরং বাস্তবের পরিপন্থী যত কথা আছে, সবই মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। ছুটি নিতে মিথ্যা মেডিকেল সার্টিফিকেট বানানো হয়। এটিও মিথ্যা। এটিও হারাম। মুখে মিথ্যা কথা বলা যেমন যেমন হারাম, এটিও ঠিক তেমন হারাম। মিথ্যা সার্টিফিকেট দেওয়া ও নেওয়া হচ্ছে।

সার্টিফিকেট মূলত সাক্ষ্য। পবিত্র কুরআনে মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেওয়াকে শিরকের সমপর্যায়ের অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

---

৮৮. হায়াতুস সাহাব ১/৪৫১

আল্লাহপাক বলেছেন :

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ ۝

'তোমরা মূর্তিগুলোর অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকো আর মিথ্যা কথন থেকে বিরত থাকো।'[৮৯]

মিথ্যা সার্টিফিকেট প্রদান মিথ্যা স্বাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত

এই যে মিথ্যা সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে, এটি হলো মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান। আল্লাহপাক মিথ্যা সাক্ষ্য আর মূর্তিপূজাকে এক পর্যায়ের অপরাধ বলে সাব্যস্ত করেছেন। এটি একটি মারাত্মক গুনাহ।

আল্লাহপাক আমাদেরকে এর থেকে হেফাযত করুন।

তারপরও আমরা অভিযোগ করি যে, আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি আর অন্যান্য জাতি এগিয়ে যাচ্ছে। বিজাতীরা রোজ-রোজ আমাদের পেটাচ্ছে। অথচ আমরা স্বভাব-চরিত্রকে এমন বানিয়ে রেখেছি।

আপনারা-ই বলুন, আমরা অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হব না তো আর কী হব? আমরা পিটুনি খাব না তো কী খাব? অথচ আমাদের সমাজে আল্লাহর বিধানের প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ হচ্ছে। তো মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য হাজির করা, মিথ্যা সার্টিফিকেট বানানো এসবই মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। একজন মুসলমানের মুখ থেকে, কলম থেকে, পদক্ষেপ থেকে বাস্তবের পরিপন্থী কোনো কথা বের না হওয়া উচিত। অনেক ভালো-ভালো দ্বীনদার ও পাক্কা নামাযী, তাহাজ্জুদগুযার এখানে এসে পিছলে যায়। এমন লোকেরাও মিথ্যা সার্টিফিকেট বানানোকে কোনো অপরাধ মনে করে না। প্রয়োজন হলে মিথ্যা বলাকে কোনো দোষই মনে করে না।

এটি মুসলমানের চরিত্র নয়।

অপরের গোপনীয় বিষয়গুলোকে গোপন রাখুন

তো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) বলেন, মানুষের মধ্যে দ্বিতীয় যে গুণটি থাকা দরকার, তা হলো সত্যতা। তারপর তিনি সর্বশেষ গুণটি বলেছেন :

حِفْظُ أَمَانَةٍ

'আমানতের হেফাযত করা।'

আপনার কাছে কোনো কিছু আমানত আছে। আপনার কর্তব্য হলো, আপনি এই আমানতকে হেফাযত করবেন। এতে কোনো খেয়ানত করবেন না। এতে

---

৮৯. সূরা হাজ্জ : ৩

অন্যায়ভাবে কোনো হস্তক্ষেপ করবেন না, তছরুফ করবেন না। দুর্নীতি করবেন না। যেমন– আপনার কাছে কেউ কিছু টাকা আমানত রেখেছে। এখন আপনার কর্তব্য হলো, আপনি তা হেফাযত করবেন। এটিও আমানতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বহু আমানত এমন আছে, যেগুলোর আমানত হওয়ার ব্যাপারে আমাদের কোনো ধারণা-ই নেই। আমরা মনেই করি না, এগুলোও আমানত। হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

اَلْمَجَالِسُ أَمَانَةٌ

'মজলিসগুলো আমানতের দায়ে আবদ্ধ থাকে।'[৯০]

কেউ যদি আপনাকে তার কোনো গোপন বিষয় অবহিত করে, তা হলে এটিও আপনার কাছে তার আমানত। আপনি যদি তার এই গোপন বিষয়টি অন্যদের কাছে ফাঁস করে দেন, তা হলে এটিও আমানতের খেয়ানত হবে। কেউ এই বিশ্বাসে তার একান্ত নিজস্ব একটি কথা আপনার কাছে বলল যে, কথাটি আপনার পর্যন্তই যেন সীমাবদ্ধ থাকে। এমতাবস্থায় তার অনুমতি ব্যতিরেকে এই কথাটি অন্য কারও কাছে বলা আপনার জন্য জায়েয হবে না। এটিও আমানতে খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। আপনি কারও কাছ থেকে কোনো বস্তু ধার নিয়েছেন। এটিও আপনার কাছে আমানত যে, যথাসময়ে এই বস্তুটি তার হাতে ফেরত দিতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا

'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন, যেন তোমরা আমানতগুলোকে তার মালিকের কাছে পৌছিয়ে দাও।'[৯১]

মানুষ ঋণ গ্রহণ করে; কিন্তু পরিশোধের বেলায় গড়িমসি করে। আমানত রাখে; কিন্তু তাকে ভুল ও অন্যায় পন্থায় ব্যবহার করে। এসবই আমানতে খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে দয়া করে এই অন্যায়-অপরাধগুলো থেকে মুক্তি দান করুন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) যে চারটি গুণের কথা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহপাক সেগুলোকে আমাদের মাঝে সৃষ্টি করে দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলন : মুহাম্মদ ওয়ায়েস সরওয়ার

---

৯০. সুনানে আবু দাউদ কিতাবুল আদাব : হাদীস নং-৪২২৬; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং-১৪১৬৬

৯১. নিসা : ৫৮

হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা বাকারায় আল্লাহপাক বলেছেন :

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۝

'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ ভোগ করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে ভোগ করার লক্ষ্যে তা বিচারকদের কাছে পেশ করো না।'[৯২]

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে হারাম পদ্ধতিতে সম্পদ উপার্জন ও ব্যবহার করাকে অতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণত প্রতিটি জাতি ও প্রতিটি ধর্ম এ ব্যাপারে একমত যে, সম্পদ অর্জনের কিছু পদ্ধতি পছন্দনীয় ও বৈধ আর কিছু পদ্ধতি অপছন্দনীয় ও অবৈধ। যেমন– চুরি-ডাকাতি ও প্রতারণার মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করাকে সমগ্র জগত খারাপ ও অন্যায় মনে করে। কিন্তু এই মাধ্যমগুলোর বৈধাবৈধের সর্বজনগ্রাহ্য কোনো মাপকাঠি কোনো জাতি-গোষ্ঠির কাছে নেই। তার সঠিক ও গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি সেটিই হতে পারে, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। কারণ, এই বিশ্বজগতকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি-ই তাঁর বান্দাদের প্রকৃত সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত আছেন। ফলে ইসলাম হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েযের যে আইন তৈরি করেছে, তা আল্লাহপাকের অহী থেকেই সংগৃহীত। এগুলো অহীয়ে এলাহীরই বিধান। এই আইনে প্রতিটি ক্ষেত্রে এদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, কোনো মানুষই যেন তার সামর্থ্যানুযায়ী পরিশ্রম করে জীবন নির্বাহের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে।

---

৯২. সূরা বাকারা : ১৮৮

আবার কোনো মানুষই যেন অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে কিংবা অপরের ক্ষতি করে সম্পদকে গুটিকতক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে না পারে। বরং কারুর যেকোনো মালিকানা-ই অর্জিত হোক-না কেন, তা যেন আল্লাহর আইন অনুসারে হয়।

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহপাক এই পুরো বিষয়গুলোই ব্যক্ত করেছেন। এর মধ্যে সুদ, জুয়া, ঘুষ, ভেজাল, প্রতারণা মিথ্যা মামলা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত আছে, যেগুলোকে আল্লাহপাক হারাম ও না-জায়েয সাব্যস্ত করেছেন।

আল্লাহপাক বলেছেন :

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

'তোমরা পরস্পর নিজেদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না।'

এখানে প্রথমত একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এই আয়াতে পবিত্র কুরআন 'আম্‌ওয়ালাকুম' শব্দ ব্যবহার করেছে, যার মূল অর্থ 'তোমাদের সম্পদ'। অর্থাৎ– আল্লাহপাক বলেছেন, 'তোমরা পরস্পর নিজেদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না।' বর্ণনার এই ধারা ব্যবহার করে আল্লাহপাক বোঝাতে চেয়েছেন, শোনো আমার বান্দারা! এই যে তোমরা একজন অপরজনের সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ করছ; একটু চিন্তা করে দেখো, তোমার নিজের সম্পদের প্রতি তোমার যতটুকু মায়া আছে, অপরেরও তার সম্পদের প্রতি অতটুকু মায়া আছে। কেউ যদি তোমার সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ করে, তাতে তোমার যেমন লাগে, তুমি যখন অন্যের সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ কর, তখন তারও তেমনই লাগে। কাজেই অপরের সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ করার সময় মনে করো, এগুলো যেন তোমারই সম্পদ, যাতে কেউ অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করছে। তারপর এর থেকে তুমি বিরত হয়ে যাও। তা ছাড়া আয়াতের এই শব্দগুলোতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, একজন মানুষ যখন অপরের সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ করা শুরু করে আর এটি রেওয়াজে পরিণত হয়ে যায়, তখন স্বভাবত তার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, অন্যরাও তার সম্পদে অনুরূপ হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। এই হিসেবে অপরের সম্পদে অবৈধ হস্তক্ষেপ মানে নিজেরই সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ করার পথ পরিষ্কার করা।

চিন্তা করুন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে যখন ভেজালের প্রচলন শুরু হয়ে যায়, তখন ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, একজন ঘি-এর মধ্যে তেল বা চর্বি মিশিয়ে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করছে। কিন্তু তার যখন দুধ ক্রয়ের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে, তখন দুধওয়ালা তার দুধে পানি মিশিয়ে তার কাছে বিক্রি করছে। যখন তার মসলার প্রয়োজন হচ্ছে, তখনও তাকে ভেজাল মসলা ক্রয় করতে হচ্ছে। সে যে উদ্দেশ্যে ঘি-এর মধ্যে তেল মিশিয়ে অপরের কাছে বিক্রি করেছিল,

অন্যরাও এই লক্ষ্যে দুধের সঙ্গে পানি মিশিয়ে, মসলার সঙ্গে ইটের গুড়া মিশিয়ে তার কাছে বিক্রি করছে। ফলাফল কী দাঁড়াল? সে একটি পণ্যে ভেজাল মিশিয়ে দশজনের কাছে বিক্রি করে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করেছিল। কিন্তু অপর দশ অসাধু ব্যবসায়ী তার সেই অর্থ তাদের ভেজাল পণ্য তার কাছে বিক্রি করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। বেচারা রোজ-রোজ অনেক মুনাফা দেখে যারপরনাই আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয় যে, আজ আমার এত টাকা মুনাফা হয়েছে; কিন্তু পরিণতি দেখছে না যে, শেষমেষ থাকছেটা কী।

কাজেই যারা অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তগত করে, তারা মূলত নিজেরই সম্পদে অপরের অন্যায় হস্তক্ষেপের দরজা-জানালা খুলে দিচ্ছে।

উপার্জনের অবৈধ পন্থা সব সময় সব কালেই অবৈধ। কিন্তু যদি কোনো পবিত্র যুগে বা পবিত্র স্থানে এই অবৈধ পন্থাগুলো অবলম্বন করা হয়, তা হলে তা আরও মারাত্মক ও জঘন্য হয়ে যায়। এর মন্দত্ব ও অপরাধ আরও বেড়ে যায়। বিশেষ করে পবিত্র রমযান মাসে। কারণ, এই মাসে একজন মুসলমান আল্লাহর বিধানের খাতিরে জায়েয ও মুবাহ কাজগুলোকেও পরিত্যাগ করে। এমতাবস্থায় যে কাজগুলো সব সময়ের জন্য হারাম ও অবৈধ, এ মাসে সেগুলো বর্জন না করা কত বড় অপরাধ হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সেজন্য পবিত্র রমযান মাসে হালাল খাদ্য খাওয়ার ব্যাপারে অধিক যত্নবান হওয়া দরকার।

হারাম থেকে বেঁচে থাকতে এবং হালাল অর্জন করতে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে নানা শিরোনামে ও নানা আঙ্গিকে তাকিদ করা হয়েছে। এক আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের কর্ম ও চরিত্রে হালাল খাদ্যের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। একজন মানুষের খাদ্য যদি হালাল না হয়, তা হলে তার আমল-আখলাক ভালো হওয়ার আশা করা কঠিন।

আল্লাহপাক বলছেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

'ওহে রাসূলগণ! তোমরা হালাল ও পবিত্র খাবার খাও আর নেক আমল করো। কারণ, তোমরা যা-কিছু করছ, আমি সব জানি।'[৯৩]

এই আয়াতে আল্লাহপাক হালাল খাওয়ার আদেশ করার পাশাপাশি নেক আমল করারও আদেশ করেছেন। এই ধারা অবলম্বন করে আল্লাহপাক বোঝাতে চেয়েছেন, একজন মানুষের পক্ষে নেক আমল করা তখনই সম্ভব হবে, যখন তার খাদ্য-খাবার হালাল হবে।

---

৯৩. সূরা মূমিনূন ৫১

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যারা হারাম খায়, তাদের দু'আ কবুল হয় না। তিনি বলেছেন, বহু মানুষ এমন আছে, যারা কষ্ট করে আল্লাহপাকের ইবাদত করে। তারপর আল্লাহর সমীপে হাত তুলে দু'আ করে এবং হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! বলে ডাকে। কিন্তু তার খাদ্য হারাম। তার পানীয় হারাম। তার পোশাক হারাম। আচ্ছা, এমন ব্যক্তির দু'আ কবুল হবে কী করে![৯৪]

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আবেদন জানালেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার জন্য দু'আ করুন, যেন আমার প্রতিটি দু'আ কবুল হয়।

উত্তরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

'শোনে সা'দ! নিজের খাদ্য-খাবারকে হালাল বানিয়ে নাও; তা হলে তোমার দু'আ কবুল হতে শুরু করবে। আমি সেই আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার জীবন; বান্দা যখন পেটে হারাম খাবার ঢোকায়, তখন চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোনো আমল কবুল হয় না। আর যে মানুষটির শরীরের গোশত হারাম দ্বারা গঠিত, তার জন্য জাহান্নামের আগুনই অধিক উপযোগী।'[৯৫]

আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে হারাম থেকে বেঁচে থাকার এবং হালাল উপার্জন ও হালাল খাওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : নশরী তাকরীরেঁ- পৃষ্ঠা : ১০৯-১১২
ফারূদ কী এসলাহ- ১০২-১০৪

---

৯৪. সহীহ মুসলিম কিতাবুয যাকাত : হাদীস নং-১৬৮৬; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং-৭৯৯৮; সুনানে দারেমী : হাদীস নং-২৬০১; তিরমিযী কিতাবু তাফসীরিল কুরআন : হাদীস নং-২৯১৫;

৯৫. জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/১০০
ইসলামী মু'আমালাত-১৪

ওজনে কম দেওয়া ও তার ভয়াবহ পরিণতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝ وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّ زَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

'মন্দ পরিণাম তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়, যারা মানুষের নিকট থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে আর যখন তাদেরকে ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে মহা দিবসে; যেদিন সমস্ত মানুষ জগতসমূহের রবের সম্মুখে দাঁড়াবে?'[৯৬]

মাপে কম দেওয়া মারাত্মক একটা গুনাহ

বুযর্গানে মুহতারাম ও বেরাদারানে আযীয!

আমি আপনাদের সম্মুখে সূরা মুতাফ্ফিফীন-এর প্রথম দিককার কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। এই আয়াতগুলোতে আল্লাহপাক আমাদেরকে মানুষের একটি আচরণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, তোমাদের এই আচরণটি মস্ত একটি পাপ। তা হলো মাপে-ওজনে কম দেওয়া। অর্থাৎ– কোনো পণ্য বিক্রি করার সময় ক্রেতা যতটুকু ক্রয় করল, তার চেয়ে কম দেওয়া।

আরবিতে মাপে বা ওজনে কম করাকে 'তাত্ফীফ' বলা হয়। আর যারা এই কাজটি করে, তাদেরকে বলা হয় 'মুতাফ্ফিফ'। এই তাত্ফীফ শুধু ব্যবসা আর লেনদেনেরই সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। বরং তাত্ফীফ-এর মর্ম আরও অনেক ব্যাপক

---

৯৬. সূরা মুতাফ্ফিফীন : ১-৬

ও সুদূরপ্রসারী। তা হলো, অপরের যে পাওনা-ই আপনার যিম্মায় অর্পিত আছে, আপনি যদি তাতে কোনো ত্রুটি করেন, তা হলে তা এই তাত্‌ফীফ-এর অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। আয়াতটির মর্ম হলো, যারা মাপে বা ওজনে কম দেয়, তাদের জন্য আক্ষেপ!

এখানে আল্লাহপাক তাত্‌ফীফ-এর মন্দ পরিণতি বোঝাতে গিয়ে 'ওয়াইলুন' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর এক অর্থ 'আক্ষেপ'। আরেক অর্থ আছে 'যন্ত্রণদায়ক শাস্তি'। এই দ্বিতীয় অর্থ অনুপাতে আয়াতটির মর্ম দাঁড়ায়, 'যারা মাপে-ওজনে কম করে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা আছে।'

এরা হলো তারা, যারা অপরের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় নিজেদের পাওনা পুরোপুরি নেয়। কিন্তু যখন অপরকে মেপে দেওয়ার সময় আসে, তখন ক্রেতার পাওনার চেয়ে কম দেয়। ওজনে-মাপে কম করে। ক্রেতা যতটুকু ক্রয় করল, যতটুকুর মূল্য পরিশোধ করল, তা পুরোপুরি দেয় না।

তারপর আল্লাহ প্রশ্ন করছেন, তাদের কি মনে নেই যে, এক মহা দিবসে তাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে, যেদিন তাদেরকে তাদের রবের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে? তারা কি সেই দিনটির কথা ভুলে গেছে? আর তখন তাদের পক্ষে তাদের ছোট-ছোট আমলগুলোকেও লুকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। সেদিন আমাদের পার্থিব জীবনের সমস্ত কর্মের ফিরিস্তি আমাদের সামনে চলে আসবে।

তো আল্লাহপাক জিজ্ঞেস করছেন, যারা মাপে-ওজনে কম করে, তারা কি এই দিনটির কথা ভুলে গেছে? এই দিনটির কথা কি তাদের মনে নেই যে, আজ ওজনে ফাঁকিবাজি করে দুনিয়ার কটি টাকা হাতিয়ে নিল; কিন্তু সেদিন তো এর জন্য তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ আচরণ সেদিন তাদের চরম এক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এজন্যই পবিত্র কুরআন বারবার মাপে-ওজনে কম করার কুফল ও শাস্তির কথা বর্ণনা করেছে এবং তার থেকে বেঁচে থাকতে তাকিদ করেছে। পবিত্র কুরআন বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে নবী হযরত শু'আইব (আ.)-এর জাতির ঘটনাও উল্লেখ করেছে।

হযরত শু'আইব (আ.)-এর জাতির অপরাধ

আল্লাহপাক হযরত শু'আইব (আ.)কে যে সময় তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করলেন, তখন তারা নানা ধরনের অন্যায় ও অপরাধের মাঝে নিমজ্জিত ছিল। তারা কুফর, শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। এছাড়া গোটা জাতি ওজনে কম দেওয়ায় অভ্যস্ত জাতি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। তারা ব্যবসা করত। কিন্তু তাতে তারা মানুষের পাওনা পুরোপুরি পরিশোধ করত না। অপরদিকে তারা

মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত ছিল যে, তারা পরিভ্রমণকারীদের ভয় দেখিয়ে তাদের সবকিছু লুটে নিত।

হযরত শু'আইব (আ.) তাদেরকে শিরক-কুফর ও মূর্তিপূজা থেকে বারণ করলেন। তাদেরকে তিনি তাওহীদের আমন্ত্রণ জানালেন এবং আল্লাহর দিকে আহ্বান করলেন। ওজনে কম দিতে ও লুটতরাজ থেকে বিরত থাকতে আদেশ করলেন। কিন্তু জাতি তার কথা শুনল না, মানল না। তারা তাদের অপরাধেই মত্ত রইল। তারা নবী হযরত শু'আইব (আ.)-এর কথা মান্য করার পরিবর্তে উল্টো তাঁকে প্রশ্ন ছুড়ল :

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا

'তারা বলল, যে শু'আইব! আচ্ছা, তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ করছে যে, আমরা সেই দেবদেবীদের পরিত্যাগ করব, আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের উপাসনা করতেন? আর আমরা আমাদের সম্পদে যথেচ্ছ আচরণ করা থেকে বিরত থাকব?'[৯৭]

এগুলো আমাদের সম্পদ। আমরা সম্পদ যেভাবে খুশি উপার্জন করব। যেভাবে মন চায় ব্যয় করব। ইচ্ছে হলে আমরা এই সম্পদ ওজনে কম দিয়ে অর্জন করব। মন চাইলে এই সম্পদ আমরা প্রতারণার মাধ্যমে অর্জন করব। তুমি কে যে আমাদেরকে বাধা দেবে?

হযরত শু'আইব (আ.) তাদের এসব বক্তব্যের উত্তরে কঠোর কোনো কথা বলেননি। তাদের সঙ্গে কঠিন কোনো আচরণ করেননি। বরং তিনি তাদেরকে মমতার সঙ্গে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখাতে থাকেন। কিন্তু তাঁর কোনো কথায়-ই কর্ণপাত করল না। তারা এসব অপরাধ থেকে বিরত হলো না। অবশেষে তারা সেই পরিণামের শিকার হয়ে গেল, যেমনটি নবী-রাসূলদের অমান্যকারীরা হয়ে থাকে। আল্লাহপাক তাদেরকে তাদের অপরাধের দুনিয়াবি শাস্তির সম্মুখীন করলেন। আল্লাহপাক তাদের উপর এমন কঠিন শাস্তি প্রেরণ করলেন, যেমনটি বোধহয় অন্য কোনো জাতির উপর প্রেরণ করেননি।

আল্লাহর শাস্তির কবলে হযরত শু'আইব (আ.)-এর জাতি

আল্লাহপাক হযরত শু'আইব (আ.)-এর জাতির উপর যে শাস্তি প্রেরণ করলেন, তার ধরন ছিল এই– প্রথমে তিনদিন যাবত তাদের এলাকার উপর প্রচণ্ড গরম পড়ল। মনে হচ্ছিল, আকাশ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গারের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। তীব্র দাবদাহে গোটা এলাকা হাঁপিয়ে উঠল। মানুষ অস্থির হয়ে গেল।

৯৭. সূরা হূদ : ৮৭

তিনদিন পর মানুষ হঠাৎ দেখল, একখণ্ড মেঘ তাদের এলাকার দিকে এগিয়ে আসছে আর তার নিচে শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। যেহেতু এলাকাবাসী তিনদিন যাবত লাগাতার তীব্র গরমে ছটফট করছিল, তাই ঠাণ্ডা বাতাসের আবহ পেয়ে তারা ছুটে এসে উক্ত মেঘখণ্ডের নিচে জড়ো হয়ে গেল, যাতে ঠাণ্ডা বাতাসে দাঁড়িয়ে গরমে দগ্ধ শরীরটাকে একটু শীতল করে নিতে পারে। কিন্তু তাদেরকে উক্ত মেঘখণ্ডের নিচে সমবেত করার পেছনে আল্লাহপাকের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। এটি ছিল তাদেরকে একত্রিত করার একটি কৌশলমাত্র। তারা এসে সমবেত হওয়ার পর তিনি সকলের উপর একসঙ্গে আযাব নাযিল করে দিলেন। যে মেঘখণ্ডটি শীতল বায়ু প্রবাহিত করছিল, তার মধ্য থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বৃষ্টি বর্ষিত হতে শুরু করল। গোটা জাতি তার নিশানায় পরিণত হয়ে ঝলসে নিঃশেষ হয়ে গেল। পবিত্র কুরআন এই ঘটনাটিকে বিবৃত করেছে এভাবে :

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

'তারা তাকে (হযরত শু'আইব আলাইহিস সালামকে) প্রত্যাখ্যান করল। ফলে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি তাদের গ্রাস করে নিল।'[৯৮]

অন্য এক জায়গায় আল্লাহপাক বলেছেন :

فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۭ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ۝

'এগুলো তাদের ঘর-বাড়ি, যেগুলোতে তাদের পর মানুষ সামান্যই বসবাস করেছে। আর আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।'[৯৯]

অর্থাৎ– তোমরা তাদের লোকালয়গুলো দেখো। তাদের ধ্বংস হওয়ার পর সেগুলো আর আবাদও হতে পারেনি। যদিওবা কিছুলোক সেগুলো আবাদ করেছে, তাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। আমি তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি, বাড়ি-ঘরের মালিক হয়ে গেছি।

তো তারা মনে করত, মাপে-ওজনে কম করলে, ক্রেতাকে ঠকালে, পণ্যে ভেজাল মেশালে সম্পদ বেড়ে যাবে আর আমরা বড়লোক হতে পারব। কিন্তু তার পরিণাম হলো খুবই ভয়াবহ – তাদের চূড়ান্ত ধ্বংস। তারা সমস্ত সম্পদ তো হারালই; উপরন্তু তারা নিজেরাও শোচনীয়রূপে ধ্বংস হয়ে গেল।

এগুলো আগুনের টুকরো

তুমি ওজনে হেরফের করে ক্রেতাকে এক তোলা, দুই তোলা বা এক ছটাক, দুই ছটাক পণ্য কম দিয়েছ এবং তার বিনিময়ে কয়েকটি কড়ি হাতিয়ে নিয়েছ। তো

---

৯৮. সূরা শু'আরা : ১৮৯

৯৯. সূরা কাসাস : ৫৮

চোখের দেখায় এগুলো অর্থ বটে; কিন্তু আসলে এগুলো আগুনের জ্বলন্ত কয়লা, যাকে তুমি তোমার পেটে ঢোকাচ্ছ। এগুলো তুমি হারাম খাচ্ছ। আর হারাম সম্পদ ও হারাম খাওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

'যারা অন্যায়ভাবে এতিমদের সম্পদ ভোগ করে, তারা মূলত তাদের পেটে আগুন ভক্ষণ করছে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা আগুনে পুড়বে।'[১০০]

চোখের দেখায় এগুলো অর্থ বা টাকা-পয়সা হলেও মূলত জ্বলন্ত আগুনের কয়লা, যা মানুষ উদরে ঢোকাচ্ছে। কারণ, সে আল্লাহর নাফরমানি করে, আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে এই অর্থ অর্জন করেছে। ফলে এই অর্থ, এই সম্পদ তার জন্য দুনিয়াতেও আপদের কারণ আবার আখেরাতেরও ধ্বংসের কারণ।

পারিশ্রমিক কম দেওয়া অপরাধ

আর তাত্‌ফীফ তথা ওজনে-মাপে কম করা শুধু ব্যবসারই সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এর অর্থ অনেক ব্যাপক। মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) সূরা মুতাফ্‌ফিফীন-এর শুরুর দিককার আয়াতগুলোর তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেন :

شِدَّةُ الْعَذَابِ يَوْمَئِذٍ لِلْمُطَفِّفِيْنَ مِنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ

'যারা নামায, যাকাত, রোযা ইত্যাকার ইবাদাতে তাত্‌ফীফ তথা ত্রুটি করে, কিয়ামতের দিন তাদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে।'[১০১]

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, ইবাদতে ত্রুটি করা এবং তাকে আদবের সঙ্গে আদায় না করাও তাত্‌ফীফ-এর অন্তর্ভুক্ত।

শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক তৎক্ষণাৎ দিয়ে দাও

একজন মহাজন তার শ্রমিকদের থেকে কাজ পুরোপুরি আদায় করে নিচ্ছেন। শ্রমিকদেরকে এতটুকুও বিশ্রামের সুযোগ দিতে প্রস্তুত নন। কিন্তু শ্রমের মূল্যটা পরিশোধ করার সময় এলে তার জীবন বেরিয়ে যায়। পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিতে মন চায় না। সময়মতো দেন না। টালবাহানা করেন। এটিও না-জায়েয ও হারাম এবং তাত্‌ফীফ-এর অন্তর্ভুক্ত।

---

১০০. সূরা নিসা : ১০

১০১. তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরি ইবনি আব্বাস ২/১২৩

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

'তোমরা শ্রমিককে তার মজুরিটা তার ঘাম শোকাবার আগে-আগেই পরিশোধ করে দাও।'[১০২]

চাকরকে খাবার কেমন দিতে হবে?

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলতেন, আপনি একজন চাকর রেখেছেন। তার সঙ্গে আপনার এই মর্মে চুক্তি হয়েছে, মাসিক এত টাকা বেতন দেবেন আর প্রতি বেলার খাবার দেবেন। কিন্তু যখন খাওয়ার সময় এল, তখন নিজে খুব করে পোলাও-জর্দা খেলেন, উন্নতমানের সুস্বাদু খাবার খেলেন আর তাকে খেতে দিলেন আপনার উচ্ছিষ্ট, যে খাবার কোনো সামাজিক বা ভদ্র মানুষ খেতে সম্মত হবে না। এগুলো আপনি চাকরকে খেতে দিলেন। এটিও তাত্‌ফীফ। কারণ, আপনি তার সঙ্গে চুক্তি করেছেন, সে আপনার কাজ করবে আর আপনি তার বিনিময়ে তাকে যা দেবেন, তার মধ্যে দুবেলা বা তিন বেলার খাবারও আছে।

তো তার অর্থ হলো, আপনি তাকে এতটুকু খাবার প্রদান করবেন, যা একজন মান্য-গণ্য মানুষ পেট ভরে খেতে পারে। কাজেই তাকে আপনার উচ্ছিষ্ট খাবার প্রদান করা তার অধিকার নষ্ট করা ও তার সঙ্গে অবিচার করার শামিল। এই আচরণও তাত্‌ফীফ-এর অন্তর্ভুক্ত।

চাকুরির সময়ে আড্ডা মারা

একব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানে আট ঘণ্টার কর্মী। তো এর অর্থ হলো, সে এই আট ঘণ্টা সময় উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে এবং এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, আমি এই আট ঘণ্টা আপনার কাজ করব আর তার বিনিময়ে আমাকে এই পরিমাণ বেতন দেবেন। এখন যদি অবস্থা এই হয় যে, সে বেতন-ভাতা পুরোপুরি গ্রহণ করল বটে; কিন্তু আট ঘণ্টার ডিউটি পুরোপুরি পালন করল না এবং এই কর্মঘণ্টার কিছু সময় আড্ডা দিয়ে কাটাল কিংবা নিজের কাজ করল, তা হলে এটিও তাত্‌ফীফ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম ও কবীরা গুনাহ হবে। যে ব্যবসায়ী মাপে-ওজনে কম দিয়ে ক্রেতা ঠকায়, সে যেমন অপরাধী, এই ব্যক্তিও ঠিক তেমন অপরাধী। কারণ, সে আট ঘন্টার পরিবর্তে সাত ঘণ্টা কাজ করেছে। এভাবে সে নিজের বেতনের বিপরীতে

১০২. সুনানে ইবনে মাজা কিতাবুল আহ্‌কাম : হাদীস নং-২৪৩৪

অন্যের যে পাওনা ছিল, তাতে কম করেছে এবং অন্যের হক নষ্ট করেছে। কাজেই যে সময়টুকু সে প্রতিষ্ঠানের কাজ না করে অন্য কাজে ব্যয় করেছে, সে সময়টুকুর বেতন তার জন্য হারাম হবে।

এক-একটি মিনিটের হিসাব দিতে হবে

একটি সময় ছিল, তখন অফিস-আদালতে ব্যক্তিগত কাজ লুকিয়ে-লুকিয়ে করা হতো। কিন্তু আজকাল অফিসগুলোর অবস্থা হলো, ব্যক্তিগত কাজ করতে হলে কোনো গোপনীয়তার প্রয়োজন হয় না। বরং প্রকাশ্যে ও সবার সামনেই করা হয়। অফিসাররা নিজেদের পাওনা ও অধিকার আদায়ের জন্য সবসময় একপায়ে খাড়া থাকে যে, বেতন বাড়াও। সুযোগ-সুবিধা বাড়াও। এর জন্য আন্দোলন হয়। মিটিং-মিছিল-শ্লোগান হয়। হরতাল হয়। অবরোধ হয়। এসব কাজের জন্য চাকুরিজীবিরা সব সময় প্রস্তুত। কিন্তু এই বেতন ও সুযোগ-সুবিধার বিপরীতে তাদের কী দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, তার কোনোই খবর নেই। এসব কর্তব্য তাদের দ্বারা পালন হচ্ছে কি-না, তার কোনোই ভাবনা নেই। এই চিন্তা তারা করে না যে, আমি যে-আট ঘণ্টার চাকুরির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম, সেই আট ঘণ্টা সময় আমি আমানতদারির সঙ্গে ব্যয় করছি কি-না। এদিকে তাদের কোনোই ভ্রূক্ষেপ নেই। মনে রাখবেন, এমন লোকদেরই সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বলেছে, সেই লোকদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে, যারা অপরের হক নষ্ট করে। যখন অপরের কাছ থেকে বুঝে নেয়, তখন পুরোপুরি নেয়। আর যখন অপরকে দেয়, তখন কম দেয়।

মনে রাখবেন, আল্লাহর কাছে এক-একটি মিনিটের হিসাব হবে। আর তখন তাতে কোনোই ছাড় দেওয়া হবে না।

দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষকগণের অবস্থা

আপনারা দারুল উলূম দেওবন্দের নাম শুনে থাকবেন। এই শেষ যুগেও আল্লাহপাক এই প্রতিষ্ঠানটিকে উম্মতের জন্য রহমত বানিয়ে দিয়েছেন। এখানে এমন-এমন ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছেন, যাঁরা সাহাবায়ে কেরামের স্মৃতিকে তাজা করে দিয়েছেন। আমি আমার আব্বাজি মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ.-এর কাছে শুনেছি, দারুল উলূম দেওবন্দের শুরুর আমলে সেখানকার শিক্ষকগণের নিয়ম ছিল, যদি কারও কাছে কোনো মেহমান আসত, যদি কেউ যদি তাঁদের কারও সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসত, তা হলে তাদের পেছনে তাঁরা যে সময়টুকু ব্যয় করতেন, ঘড়ি দেখে তা নোট করে রাখতেন যে, এই সময়টুকু আমি আমার ব্যাক্তিগত কাজে ব্যয় করেছি। এ কাজটি তারা পুরো মাসে করতেন। মাসশেষে

যখন বেতন পাওয়ার সময় আসত, তখন অফিসকে নোট দিতেন যে, এ মাসে এত ঘণ্টা সময় আমার ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় হয়েছে। কাজেই এই সময়টুকুর বেতন কর্তন করে রাখা হোক।

বেতন আবার হারাম হয়ে যায় না যেন!

কিন্তু আজকাল বেতন বাড়ানোর আবেদন ও দাবির খবর তো আপনারা প্রতিনিয়ত শুনতে পাচ্ছেন। এর জন্য আন্দোলনের সংবাদও আপনাদের কানে আসছে। কিন্তু একথাটি শোনা যায় না যে, কেউ আবেদন জানিয়েছেন, অফিস সময়ের এতটা সময় আমি আমার ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করেছি; কাজেই এই সময়টুকুর বেতন কর্তন করে রাখা হোক। এই কাজ সেই ব্যক্তি-ই করতে পারেন, যার আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভাবনা আছে। আজ প্রতিজন মানুষ নিজ-নিজ আঁচলে মুখ রেখে দেখুক, এমন কে আছে, যে পুরোপুরি আমানতদারির সঙ্গে কর্তব্য পালন করছে। নির্ধারিত সময়ের সবটুকু ডিউটির কাজে ব্যয় করছে। আজ সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করছে। আল্লাহর সৃষ্টির সবাই পেরেশোন – অস্থির। আগত নাগরিক বাইরে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘামছে। কিন্তু অফিসার ছাহেব এয়ারকন্ডিশন কক্ষে বসে অতিথিদের সঙ্গে গল্প করছেন। চা পান করছেন। নাশতা খাচ্ছেন। কিন্তু যাদের কাজ করার জন্য এখানে এসে বসেছেন, যাদের কাজের বিনিময়ে মাসের শেষে বেতন-ভাতা নিচ্ছেন, তাদের কোনো খবর নেই। এই কর্মনীতির ফলে একদিকে তো বেতন হারাম হচ্ছে; অপরদিকে আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট দেওয়ার গুনাহ আলাদা হচ্ছে।

সরকারি অফিসগুলোর অবস্থা

এক সরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল অফিসার আমাকে বলেছেন, আমার ডিউটি হলো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাজিরি লিখে রাখা। আমি এক সপ্তাহের রিপোর্ট লিখে সপ্তাহের মাথায় উর্ধ্বতন অফিসারের হাতে তুলে দেই। নিয়ম হলো, তিনি সেই অনুসারে বেতন প্রস্তুত করবেন। আমার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেশিরভাগই তরুণ-যুবক।

তাদের অবস্থা হলো, প্রথমত তারা অফিসে আসেই না। মাঝে-মধ্যে এলেও দু-এক ঘণ্টা সময়ের জন্য আসে। আর এসে এখানে গপসপ মেরে চলে যায়। অফিসের কাজ করলেও বড়জোর আধা ঘণ্টা করে। আমি হাজিরা রেজিস্টারে নোট লিখে দিলাম, এরা অফিসে আসে না। ফল এই দাঁড়াল যে; তারা পিস্তল নিয়ে আমাকে মারতে এল। বলল, আমাদের নামে হাজিরা লাগালে না কেন? কেন আমাদের নামে গরহাজির দেখালে?

নিজ অফিসের এই বিবরণ দিয়ে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন, আমি কী করব? যদি হাজিরি দেখাই, তাহলে রিপোর্ট মিথ্যা হবে। আর যদি না দেখাই, তা হলে জীবন যাবে। বলুন, আমি কী করব?

বর্তমানে এই হলো আমাদের অফিসগুলোর অবস্থা।

আল্লাহর হক আদায়েও ত্রুটি

আর সব চেয়ে বড় কর্তব্যটি হলো আল্লাহর হক। এই হক আদায়ে ত্রুটি করাও ওজনে কম দেওয়ার পর্যায়ভুক্ত। যেমন– নামায আল্লাহর হক। এই নামায আদায় করার নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি আছে। এভাবে কিয়াম করো। এভাবে রুকু করো। এভাবে সেজদা করো। এভাবে ধীর-স্থিরভাবে নামাযের রুকনগুলো আদায় করো। কিন্তু আপনি ঝটপট অস্থিরভাবে একটুখানি সময়ে নামায আদায় করে ফেললেন। না ঠিকভাবে রুকু করলেন। না ঠিকভাবে সেজদা করলেন। ব্যস, আল্লাহু আকবার বলে শুরু করলেন আর মুহূর্তমধ্যে শেষ করে ফেললেন।

এভাবে আপনি আল্লাহর হক আদায়ে ত্রুটি করলেন।

হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি ঝটপট করে নামায আদায় করে ফেলল। দেখে এক সাহাবী বললেন :

لَقَدْ طَفَّفْتَ

'তুমি নামাযে তাত্‌ফীফ করেছ।'[১০৩]

মানে তুমি আল্লাহর হক পুরোপুরি আদায় করনি।

মনে রাখবেন, যে কারুরই হক হোক – চাই আল্লাহর হোক কিংবা বান্দার – আপনি যদি তাতে ত্রুটি করেন, তা হলে তা তাত্‌ফীফ' এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। এমন ব্যক্তির উপর সেইসব সতর্কবাণী প্রযোজ্য হবে, যেগুলো তাত্‌ফীফ-এর জন্য ঘোষিত হয়েছে।

ভেজাল মেশানো অন্যের হক নষ্ট করার শামিল

অনুরূপ তাত্‌ফীফ-এর ব্যাপক মর্মে এই বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত যে, আপনি যে পণ্যটি বিক্রয় করলেন, সেটি খাঁটি নয়। বরং তার মধ্যে ভেজাল মিশিয়ে দিয়েছেন। পণ্যে ভেজাল মেশানোও মাপে-ওজনে কম করার অন্তর্ভুক্ত। তা এভাবে যে, আপনি এক সের আটা বিক্রয় করলেন। কিন্তু সেই এক সের আটার

---

১০৩. মুআত্তা ইমাম মালিক : হাদীস নং-১৯; কান্‌যুল উম্মাল ৮/৪২, হাদীস নং-২১৭৭৮; জামিউল উসূল ১/৩৩১১, হাদীস নং-৩২৬৯

মধ্যে খাঁটি আছে আধা সের। অবশিষ্ট আধা সের ভেজাল – মানে সেটুকু আটা নয়। তার ফলাফল এই দাঁড়াল যে, ক্রেতার এক সের আটা পাওয়ার যে অধিকার ছিল, তা সে পুরোপুরি পেল না। সেজন্য এটি তাত্‌ফীফ তথা অপরের পাওনা নষ্ট করার অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

যদি কোম্পানী ভেজাল মেশায়?

অনেকে যুক্তি দেখান ,আমরা তো খুচরা বিক্রেতা। পাইকার ও প্রস্তুতকারকের নিকট থেকে আমরা যেমন আনি, তেমন বিক্রি করি। আমরা তো কোনো ভেজাল মেশাই না। এর উত্তর হলো, আপনি পণ্যটি নিজে উৎপাদন করেননি। তাতে আপনি কোনো ভেজালও মেশাননি। বরং অপরের কাছ থেকে এনে বিক্রি করছেন।

এমতাবস্থায় আপনি যদি দায়মুক্ত থাকতে চান, তা হলে আপনাকে যে-কাজটি করতে হবে, তা হলো, আপনি ক্রেতাকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেবেন, এর মাঝে কী পরিমাণ আসল আর কী পরিমাণ ভেজাল আছে, তার কোনো দায়-দায়িত্ব আমি বহন করব না। তবে আমার জানামতে এতটা ভেজাল আর এতটা আসল। এভাবে বলে আপনি দায়মুক্ত হয়ে যাবেন। ভেজালের দায় তারা বহন করবে, যারা ভেজাল করেছে।

ক্রেতার সামনে খোলাসা করে দিতে হবে

কিন্তু আমাদের বাজারগুলোতে এমন বহু পণ্য আছে, যেগুলো ভেজাল ছাড়া খাঁটি মাল পাওয়া-ই যায় না। যেখান থেকেই নেবেন, ভেজালই নিতে হবে। আর সকলেরই জানা আছে যে, এই জিনিসটি পুরোপুরি খাঁটি পাওয়া যায় না। বরং তাতে কিছু-না-কিছু থাকবেই। এমন পণ্যগুলো বিক্রি করার সময় ব্যবসায়ীকে একথা বলার দরকার নেই যে, এটি খাঁটি নয় বা এখানে এতটা ভেজাল আর এতটা খাঁটি। তবে যদি অনুমিত হয়, ক্রেতার বিষয়টি জানা নেই, তা হলে তাকে বিষয়টি অবহিত করতে হবে যে, এই পণ্যটি খাঁটি নয়; বরং এর মধ্যে ভেজাল আছে।

ক্রেতাকে ত্রুটির কথা বলে দিতে হবে

অনুরূপ পণ্যটিতে যদি কোনো ত্রুটি থাকে, ক্রেতাকে বিষয়টি জানিয়ে দিতে হবে। ক্রেতা চাইলে সেই ত্রুটিসহ পণ্যটি ক্রয় করবে; অন্যথায় করবে না।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِيْ مَقْتِ اللهِ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ

'যে ব্যক্তি ক্রেতাকে না জানিয়ে কোনো দোষযুক্ত পণ্য বিক্রয় করল, সে অনবরত আল্লাহর রোষানলে পড়ে থাকবে। আর ফেরেশতারা তার উপর অভিশাপ দিতে থাকবে।'[১০৪]

ধোঁকাবাজ আমাদের লোক নয়

একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাজারে গেলেন। দূর থেকে দেখলেন, একব্যক্তি গম বিক্রি করছে। নবীজি লোকটির কাছে চলে গেলেন এবং গমের স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তলের গম উপরে নিয়ে এলেন। দেখলেন, উপরেরগুলো ভালো হলেও নিচেরগুলো পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু ক্রেতারা উপর থেকে দেখে মনে করে, গম ভালো আছে – এর মধ্যে কোনো সমস্যা নেই; তারা প্রতারিত হয় মানুষ।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নষ্ট গমগুলো উপরে রাখলে না কেন, যাতে ক্রেতারা দেখে বুঝতে পারে, তোমার পণ্যটি কেমন? হওয়া তো উচিত ছিল এমন যে, পণ্যটি দেখে মানুষ তার প্রকৃতি বুঝতে পারবে আর তারপর যার ইচ্ছা হয় নেবে আর যার মন চায় নেবে না। লোকটি উত্তর দিল, হে আল্লাহর রাসূল! বৃষ্টিতে ভিজে গমগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। সেজন্য আমি নষ্টগুলো নিচে দিয়ে রেখেছি। নবীজি বললেন, এমনটি করো না; বরং সেগুলো উপরে নিয়ে আসো। তারপর তিনি বললেন :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

'যেলোক আমাদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করল, সে আমাদের লোক নয়।'

অর্থাৎ– কোনো ব্যক্তি যদি এমন করে যে, ভালো মালের সঙ্গে ভেজাল মিশিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে – বোঝায় আমি আপনাকে ভালো ও খাঁটি মালই দিচ্ছি; কিন্তু আসলে পণ্যটি খাঁটি নয়, তা হলে সে ধোঁকাবাজ ও প্রতারক বলে গণ্য হবে। আর আমি ঘোষণা করছি, ধোঁকাবাজ-প্রতারক মুসলমান হতে পারে না। কোনো মুসলমান ধোঁকাবাজ-প্রতারক হতে পারে না। কাজেই এমন লোক আমাদের মুসলমানদের দলভুক্ত নয়।

দেখুন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত শক্ত কথা বলেছেন যে, ধোঁকাবাজ আমাদের দলভুক্ত নয়। কাজেই যখনই যে পণ্য বিক্রি করবেন, তার প্রকৃত অবস্থা ক্রেতাকে জানিয়ে দিতে হবে যে, আমার এই পণ্যটি

---

১০৪. সুনানে ইবনে মাজা : হাদীস নং- ২২৩৮

এমন। ক্রেতাকে ধোঁকা দিয়ে তাকে অন্ধকারের মধ্যে রেখে ব্যবসা করা মুনাফিকির আলামত। এটি মুসলমানের চরিত্র হতে পারে না।

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সততা

হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ.আমি-আপনি যাঁর অনুসারী। অনেক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর কাপড়ের ব্যবসা ছিল। কিন্তু এই হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে তিনি অনেক বড় অংকের মুনাফা কুরবান করে দিতেন। একবার তাঁর কাছে কাপড়ের একটি থান এল, যাতে কিছু ক্রটি ছিল। তিনি কর্মচারীদের বলে রাখলেন, এই থানটি বিক্রি করার সময় ক্রেতাকে বলে দেবে, এর মধ্যে এই দোষ আছে।

কিছুদিন পর এক কর্মচারী উক্ত থানটি বিক্রি করে দিল; কিন্তু ক্রটির কথা বলে দিতে ভুলে গেল। পরে ইমাম ছাহেব জিজ্ঞেস করলেন, কাপড়ের সেই থানটার কী হলো? কর্মচারী উত্তর দিল, সেটি তো বিক্রি করে ফেলেছি।

অন্য কোনো মালিক হলে তো তাকে বাহবা দিত যে, ভালো করেছ, তুমি দোষযুক্ত কাপড়গুলো বিক্রি করে ফেলেছ। তুমি খুব এক্সপার্ট সেলস্ম্যান। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রহ. জিজ্ঞেস করলেন, ক্রেতাকে দোষের কথা বলেছিলে? কর্মচারী বলল, না হযরত! সেকথা তো বলতে আমার মনে ছিল না।

এবার ইমাম ছাহেব কী করলেন? সারা শহর ঘুরে-ঘুরে উক্ত ক্রেতাকে খুঁজতে শুরু করলেন। অবশেষে পেলেন। তাকে বলে দিলেন, আপনি আমার দোকান থেকে কাপড়ের যে-থানটি ক্রয় করেছেন, তাতে কিছু ক্রটি ছিল। বিক্রির সময় আমার কর্মচারী আপনাকে সে সম্পর্কে অবহিত করতে ভুলে গিয়েছিল। সেজন্য আমি আপনার কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি। এখন ইচ্ছা হলে আপনি সেটি রাখতেও পারেন, আবার ইচ্ছে হলে ফেরতও দিতে পারেন।

আমাদের অবস্থা

কিন্তু আজকাল আমাদের অবস্থা হলো, শুধু এটুকু নয় যে, আমরা ক্রটির কথা বলি না। বরং পণ্যটিতে ক্রটি আছে জানা সত্ত্বেও বারবার কসম খেয়ে ক্রেতাকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করি, আমার এই পণ্যটিতে কোনো দোষ নেই। এটি ভালো, খাঁটি ও উন্নত জিনিস।

আমরা এই যে আল্লাহর গজবে নিপতিত, এই যে প্রতিনিয়ত নানা অশান্তি ও অস্থিরতার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছি, এই আপদ আমাদের উপর আমাদের এসব পাপেরই কারণে আপতিত হচ্ছে। আমরা আমাদের জীবন থেকে আল্লাহর বিধান ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর

শিক্ষামালাকে পরিত্যাগ করে দিয়েছি। পণ্য বিক্রি করার সময় আমরা পণ্যের ত্রুটির কথা গোপন রাখি। ধোঁকা-প্রতারণা আমাদের জীবনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঢুকে গেছে। আমরা মুসলমানিত্ব হারিয়ে ফেলেছি।

স্ত্রীর হক আদায়ে ত্রুটি করা গুনাহ

অনুরূপভাবে আজকাল স্বামী তার স্ত্রীর কাছ থেকে সবটুকু পাওনা উসুল করে নিতে একপায়ে খাড়া থাকে। স্ত্রী প্রতিটি কথায় আমার আনুগত্য করবে। আমার খাবার রান্না করবে। ঘরের সব কাজ আঞ্জাম দেবে। ছেলেমেয়েদেরও লালন-পালন করবে। এ সকল পাওনা স্ত্রীর কাছ থেকে উসুল করে নিতে স্বামীরা প্রস্তত। কিন্তু যখন তার হক আদায় করার সময় আসে, তখন আর কোনো খবর নেই। তখন আর কিছুই জানে না। অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক স্বামীদেরকে আদেশ করেছেন :

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।'[১০৫]

আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে নিজ স্ত্রীর কাছে উত্তম।'[১০৬]

অপর এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

'তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচারের উপদেশগুলোকে গ্রহণ করে নাও।'[১০৭]

অর্থাৎ– তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে ভালো আচরণ করো।

তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স্বামীদেরকে স্ত্রীদের হক আদায়ের ব্যাপারে এত-এত তাকিদ করছেন আর আমাদের অবস্থা হলো, আমরা স্ত্রীদের হক আদায়ে মোটেও প্রস্তুত নই। এসবই তাত্‌ফীফ-এর অন্তর্ভুক্ত এবং ইসলামের আইনে সম্পূর্ণ হারাম।

---

১০৫. সূরা নিসা : ১৯

১০৬. সুনানে তিরমিযী : হাদীস নং–১০৮২; সুনানে ইবনে মাজা কিতাবুন নিকাহ ॥ হাদীস নং–১৯৬৮; মুসনাদে আহমাদ ॥ হাদীস নং–৭০৯৫

১০৭. সহীহ মুসলিম কিতাবুর রাজা' ॥ হাদীস নং–২৬৭১; সহীহ আল-বুখারী কিতাবুন নিকাহ ॥ হাদীস নং–৪৭৮৭; সুনানে তিরমিযী : হাদীস নং–১০৮৩; সুনানে ইবনে মাজা : হাদীস নং–১৮৪১

মহর মাফ করানো হক নষ্ট করার অন্তর্ভুক্ত

সারা জীবনে একান্তভাবে একজন নারীর জন্য একটিমাত্র আর্থিক হক স্বামীর দায়িত্বে ওয়াজিব হয়। আর তা হলো মহর। স্বামী তাও পরিশোধ করে না। সারাটা জীবন কেটে গেল; পরিশোধ করার নামও নিল না। যখন মৃত্যুর সময় এল, তখন স্ত্রীকে বলল, মহর মাফ করে দাও। তো এই বেদনাময় মুহূর্তে বেচারী কী করবে? সারাটা জীবন যার সঙ্গে সংসার করলাম, জীবনের শেষ মুহূর্তে সেই লোকটি মাফ চাচ্ছে। এমতাবস্থায় মাফ না করে উপায় কী? তাই বলে, ঠিক আছে; মাফ করে দিলাম।

সারাটা জীবন স্ত্রী থেকে পাওনা উসুল করলেন। কিন্তু যখন তার একটিমাত্র পাওনা পরিশোধ করার সময় ফুরিয়ে এল, তখন বললেন, মাফ করে দাও! এর চেয়ে বড় অবিচার আর কী হতে পারে?

খোরপোষের হক নষ্ট করা

এ তো গেল মহরের কথা। এবার আসুন খোরপোষের বিষয়টি আলোচনা করে দেখা যাক। শরীয়তের বিধান হলো, স্ত্রীকে এতটুকু খোরপোষ দিতে হবে, যার উপর ভিত্তি করে সে পুরোপুরি স্বাধীনতার সঙ্গে নির্ভাবনায় জীবন অতিবাহিত করতে পারে। এখানেও যদি স্বামী ত্রুটি করে, তা হলে তা তাত্‌ফীফ-এর মধ্যে গণ্য হবে এবং হারাম হবে।

সারকথা হলো, যে-কারুরই কোনো পাওনা যদি অন্যের দায়িত্বে থাকে, তা হলে তা পুরোপুরি আদায় করতে হবে। তাতে কোনো ত্রুটি করা যাবে না। অন্যথায় এর জন্য সেই শাস্তির মুখোমুখী হতে হবে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক যার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

এগুলো আমাদের পাপের শাস্তি

আমাদের অবস্থা হলো, আমরা সভার আয়োজন করে কিছুলোক একত্রিত হয়ে পর্যালোচনা করি যে, পরিবেশ-পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে গেছে এবং দিনদিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দেশ-সমাজ অশান্তিতে ভরে গেছে। মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই, সম্পদের নিরাপত্তা নেই। দেশ অর্থনৈতিক মন্দার শিকার।

এসব পর্যালোচনা আমরা করি।

কিন্তু কেউই এসব পেরেশানি ও অশান্তির কারণ নির্ণয় করে তার প্রতিকার করতে রাজী নই। বসে আলোচনা-পর্যালোচনা করে আঁচল ঝেড়ে উঠে যার-যার মতো চলে যাই।

আমাদেরকে দেখতে হবে, এই যা-কিছু হচ্ছে, আপনা থেকে হচ্ছে না। আপনা-আপনি হচ্ছে না। কোনো একটি শক্তি এসব করছেন। এই বিশ্বজগতের একটি বালিকণাও, একটি অণুও মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমোদনের বাইরে হচ্ছে না। হতে পারে না। কাজেই আমাদের জীবনে যদি কোনো অস্থিরতা, কোনো অশান্তি এসে থাকে, তা হলে তা তাঁর ইচ্ছায়ই আসছে। যদি রাজনৈতিক অস্থিরতা এসে থাকে, তাও তাঁর ইচ্ছায় আসছে। যদি চুরি-ডাকাতির পরিমাণ বেড়ে থাকে, তাও তাঁরই ইচ্ছায় বাড়ছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এসব কেন হচ্ছে? এগুলো মূলত আল্লাহপাকের শাস্তি। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ

'তোমাদের জীবনে যত বিপদাপদই আসুক-না কেন, সবই তোমাদের হাতের অর্জন। আর তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা-ই করে দেন।'[১০৮]

অন্য এক জায়গায় আল্লাহপাক বলেছেন :

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ

'আল্লাহ যদি মানুষের প্রতিটি অপরাধের জন্য তাদের পাকড়াও করতেন, তা হলে ভূপৃষ্টে একটি প্রাণীও বেঁচে থাকত না।'[১০৯]

অপরাধের শাস্তি হিসেবে সবাই ধ্বংস হয়ে যেত।

কিন্তু অনুগ্রহবশত মানুষের অনেক পাপ আপনা থেকেই ক্ষমা করে দেন - সেগুলোর জন্য তিনি মানুষকে পাকড়াও করেন না। কিন্তু যখন মানুষ সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন দুনিয়াতেও মানুষকে কিছু শাস্তি স্বাদ আস্বাদন করান, যাতে মানুষ সাবধান ও সতর্ক হয়ে যায়। তাতে যদি মানুষ সতর্ক হয়ে যায়, তা হলে অবশিষ্ট জীবন ধ্বংস ও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। কিন্তু যদি তারপরও সাবধান না হয়, তা হলে দুনিয়ার জীবনেই মানুষ আল্লাহর শাস্তিতে নিপতিত হয়। আর আখেরাতের কঠিন শাস্তি তো আলাদা আছেই।

হারাম অর্থের কুফল

আজকাল প্রতিজন মানুষই এই ধান্দায় লিপ্ত যে, কী করে দুটি টাকা উপার্জন করব। আগামী দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না; আজই পেতে হবে। চাই তা হালাল পন্থায় হোক কিংবা হারাম পন্থায়। প্রতারণার মাধ্যমে হোক, কারও

১০৮. সূরা শূরা : ৩

১০৯. সূরা আল-ফাতির : ৪৫

পকেট মেরে হোক আমার টাকা দরকার। যেভাবে আসে আসুক। তাতে কোনো পরোয়া নেই।

মনে রাখবেন, এরূপ ধান্দা করে আপনার পকেটে কটি টাকা আসবে বটে; কিন্তু সেই অর্থ দুনিয়াতে আপনাকে শান্তি দিতে পারবে না। কারণ, অর্থগুলো আপনি অবৈধ ও হারাম পন্থায় উপার্জন করেছেন। আপনি মানুষের অপারগতা ও অক্ষমতাকে পুঁজি বানিয়ে অন্যায়ভাবে টাকাগুলো আয় করেছেন। ফলে এই পন্থায় আপনি পরিমাণে যত বিত্তেরই মালিক হোন-না কেন শান্তি সুখপাখির দেখা আপনি পাবেন না। জীবনে আপনি একতিল সুখও পাবেন না। আল্লাহ আপনাকে সুখ দেবেন না। একসময় অপর কোনো দস্যু – আপনারই মতো কেউ আপনার থেকে অর্থগুলো ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

আজকাল সমাজে এ-ই হচ্ছে। একদিকে আপনি পণ্যে ভেজাল মিশিয়ে, মিথ্যা বলে ক্রেতাকে ঠকিয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করে বিত্তের মালিক হচ্ছেন, আরেক দিকে দুজন মানুষ অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আপনার দোকানে ঢুকে ডাকাতি করে সেই টাকাগুলো নিয়ে যাচ্ছে।

বলুন, আপনি অবৈধ উপায়ে যে টাকাগুলো আয় করেছিলেন, সেগুলো আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হলো, নাকি ক্ষতিকর প্রমাণিত হলো? আপনি যদি হারামকে বর্জন করতেন, যদি এ ব্যাপারে সিরিয়াস হতেন যে, কোনো অবস্থাতেই আমি হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করব না, যতটুকুই হোক আমি হালাল খাব আর আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখতেন, তা হলে গণনায় আপনার অর্থ কম হলেও তাতে আরাম পেতেন, শান্তি পেতেন। হালাল সম্পদ আপনার জীবনের শান্তির কারণ হতো।

বিপদ ও অশান্তির কারণ গুনাহ

অনেকে বলে থাকে, আমি তো খুব আমানতদারি ও সততার সঙ্গেই অর্থ উপার্জন করেছিলাম। তারপরও আমার দোকানে ডাকাতি হলো কেন? আমি ছিনতাইয়ের কবলে পড়লাম কেন? খেয়াল করে শুনুন। ব্যাপার হলো, আপনি যদিও আমানত ও সততার সঙ্গে উপার্জন করেছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস রাখুন, আপনার দ্বারা নিশ্চয় কোনো-না-কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। কেন এমন বিশ্বাস রাখবেন? তার কারণ হলো, আল্লাহপাক বলছেন, তোমাদের জীবনে যা কিছু বিপদ আপতিত হচ্ছে, সবই তোমাদের হাতের কামাই। আল্লাহ যা বলেছেন, তা-ই সত্য; আপনি বুঝুন আর না বুঝুন। কাজেই আপনার দ্বারা কোনো-না-কোনো পাপ, কোনো-না-কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু আপনার তার খবর নেই। হতে পারে, যাকাত পুরোপুরি আদায় করেননি।

যাকাতের হিসাব ঠিক-ঠিক করেননি। কিংবা অন্য কোনো গুনাহ করেছেন, যার ফলে আপনি এই শাস্তির মুখোমুখী হয়েছেন।

আযাব সবাইকে গ্রাস করে ফেলবে

কোনো গুনাহ যখন সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে–বাধা দেওয়ার মতো কেউ না থাকে, সেই পরিস্থিতিতে যখন আযাব আসে, তখন আযাব এটা দেখে না যে, গুনাহটি কে-কে করেছে আর কে করেনি। বরং সেই আযাব ব্যাপক হয় এবং সবাইকে গ্রাস করে ফেলে। সমস্ত মানুষ তার কবলে পড়ে যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন :

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً

'তোমরা সেই আযাবকে ভয় করো, যা শুধু তোমাদের মধ্য থেকে জালিমদেরই গ্রাস করবে না।'[১১০]

বরং যারা জুলুম থেকে দূরে ছিল, যারা এই অপরাধে লিপ্ত হয়নি, তারাও এর শিকার হবে। আল্লাহর আযাব তাদেরও পাকড়াও করবে। কারণ, এরা নিজেরা জুলুম করেনি বটে; কিন্তু যারা জুলুম করেছে, তাদের বাধাও দেয়নি, তাদের হাত চেপে ধরেনি যে, এ-কাজটি তোমরা করো না। এর বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করেনি। গর্জে ওঠেনি। এর জন্য তাদের কপালে ভাঁজ পড়েনি। সেজন্য ধরে নেওয়া হবে, তারাও এই অপরাধে জড়িত ছিল।

কাজেই 'আমি তো আমানতদারি ও সততার সঙ্গেই ব্যবসা করেছি; আমার উপর বিপদ আসবে কেন?' বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

অমুসলিমদের উন্নতির কারণ

একটি সময় ছিল, যখন মুসলমানদের ব্যবসা ও লেনদেন একদম পরিচ্ছন্ন ছিল। তাতে পুরোপুরি সততা ও আমানতদারি থাকত। কোনো প্রকার ধোঁকা-প্রতারণা থাকত না। কিন্তু আজকালকার মুসলমানগণ সেসব ছেড়ে দিয়েছে। তাদের সেই চরিত্রটি অবলম্বন করেছে অমুসলিমরা – আমেরিকানরা ও অন্যান্য বিজাতিরা। তার ফলে তারা উন্নতি করছে। তাদের ব্যবসা উন্নত হচ্ছে। তারা সমগ্র পৃথিবীতে ছেয়ে গেছে। আমার আব্বাজি মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ. বলতেন, মনে রেখো, বাতিলের মাঝে উন্নতির কোনো শক্তি, কোনো চাবিকাঠি নেই। কারণ, পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন :

---

১১০. সূরা আনফাল : ২৫

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

'বাতিলের পতন ও ধ্বংস অবধারিত।'[১১১]

তাই যদি কখনও দেখতে পাও যে, বাতিল উন্নতি করছে, তা হলে বুঝে নিতে হবে, তাদের জীবনে সত্যের কোনো ছোঁয়া লেগেছে। সত্যের সেই স্পর্শই তাদেরকে উপরে উঠিয়ে দিয়েছে।

বাতিল (বিধর্মীরা) আল্লাহতে বিশ্বাস করে না। বাতিল আখেরাতে বিশ্বাস করে না। বাতিল নবী-রাসূল মানে না। এমতাবস্থায় এটাই নিয়ম ছিল যে, তারা দুনিয়াতেও অপদস্থ ও লাঞ্ছিত থাকবে। কিন্তু কিছু সত্য তাদের স্পর্শ করে ফেলেছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে-আমানত ও দিয়ানত শিক্ষা দিয়েছেন, তারা সেগুলো লুফে নিয়েছে।

তারই ফলে আল্লাহপাক তাদেরকে উন্নতি দান করেছেন। ফলে আজ তারা সমগ্র পৃথিবীতে ছেয়ে গেছে। অপরদিকে আমরা সামান্য মুনাফার খাতিরে আমানত-দিয়ানতকে পরিত্যাগ করেছি এবং তার স্থলে ধোঁকা-প্রতারণাকে কৌশল হিসেবে বরণ করে নিয়েছি। এই চিন্তা করিনি যে, এই চরিত্র আমাদের ব্যবসাকে ধ্বংস করে দিবে।

মুসলমানদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

মুসলমানদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা ব্যবসায় কখনও ধোঁকা দেয় না। মাপে-ওজনে কম দেয় না। পণ্যে ভেজাল করে না। আমানত ও সততাকে কখনও হাতছাড়া হতে দেয় না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার সামনে এমনই একটি সমাজ উপস্থাপন করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামের আদলে এমন একটি মানবকাফেলা তৈরি করে গেছেন, যাঁরা ব্যবসায় বিরাট-বিরাট লোকসান বরণ করে নিয়েছেন; কিন্তু ধোঁকা-প্রতারণাকে প্রশ্রয় দেননি। যার ফলাফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, আল্লাহপাক তাঁদের ব্যবসাকেও উন্নতি দান করেছেন, তাঁদের রাজনীতিকেও সমুন্নত করেছেন। নিজেদের চরিত্রের গুণে তাঁরা সারা পৃথিবীতে ইসলামকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। জগতে তাঁরা শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন।

কিন্তু আজ আমাদের অবস্থা হলো, শুধু সাধারণ মুসলমানই নয় – যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে আদায় করে, তারাও যখন বাজারে যায়, তখন ইসলামের এসব বিধিবিধানের কথা ভুলে যায়। যেন আল্লাহর আইন শুধু মসজিদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। বাজারের জন্য ইসলামের কোনো বিধান নেই।

---

১১১. সূরা ইস্রা : ৮১

আমি আপনাদের অনুরোধ করব, আল্লাহর ওয়াস্তে এই বিভেদ দূর করে দিন এবং জীবনের সকল বিভাগে ইসলামের সমস্ত বিধানের অনুসরণ করুন।

'তাত্‌ফীফ' বিষয়ক আলোচনার সারমর্ম

সারকথা হলো, 'তাতফীফ'-এর মধ্যে সেই সবগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত, যেখানে একজন মানুষ নিজের পাওনা পুরোপুরি উসুল করতে প্রস্তুত থাকে; কিন্তু নিজের দায়িত্বে অপরের যে পাওনা রয়েছে, তা পরিশোধে প্রস্তুত নয়।

এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

'তোমাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ-না তার মুসলমান ভাইয়ের জন্য সেই জিনিসটি পছন্দ করবে, যেটি সে নিজের জন্য পছন্দ করে।'[১১২]

এমন যেন না হয় যে, নিজের জন্য পাল্লা একটি আর অপরের জন্য আরেকটি। আপনি যখন অপরের সঙ্গে কোনো আচরণ করতে যাবেন, তখন চিন্তা করবেন, এই আচরণটি যদি অন্য কেউ আমার সঙ্গে করত, তা হলে বিষয়টি আমার কাছে কেমন লাগত। যদি প্রতীয়মান হয়, এই আচরণটি আমার কাছে অপ্রীতিকর মনে হতো, তা হলে ধরে নিন, আপনার এই আচরণটিও অপরের কাছে অপ্রীতিকর হবে। কাজেই আপনি এমন আচরণ করা থেকে বিরত থাকবেন। ধরে নেবেন, এই কাজটি আমার করা উচিত হবে না। আমাকে এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকা উচিত।

আসুন, আমরা সবাই নিজ-নিজ আঁচলে মুখ রেখে বুঝবার চেষ্টা করি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যা-কিছু করি, তার পরিসংখ্যান নিই যে, আমি কোথায়-কোথায় কার-কার হক নষ্ট করছি। আজ আমার দ্বারা মাপে-ওজনে কম করার কোনো ঘটনা ঘটেছে কি-না। আমি আজ কাউকে কোনো ধোঁকা দিয়েছি কি-না। কারও সঙ্গে আজ আমি কোনো প্রতারণা করেছি কি-না। দোষযুক্ত কোনো পণ্য তার ত্রুটিকে গোপন রেখে বিক্রি করেছি কি-না। ব্যবসা করতে গিয়ে কোনো হারাম কাজ করেছি কি-না। এসব পরিসংখ্যান নিয়ে নিজেকে সংশোধন করার কাজে আত্মনিয়োগ করা দরকার।

---

১১২. সহীহ মুসলিম কিতাবুল ঈমান ॥ হাদীস নং–৬৪; সহীহ আল-বুখারী কিতাবুল ঈমান ॥ হাদীস নং–১২; সুনানে তিরমিযী কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ... ॥ হাদীস নং–২৪৩৯; সুনানে ইবনে মাজা ॥ হাদীস নং–৬৫; সুনানে নাসায়ী আল-ঈমান ওয়া শারায়িউহু অধ্যায় ॥ হাদীস নং–[illegible]

আল্লাহপাক আমাদেরকে বিষয়টি বুঝবার ও অপরের হক পুরোপুরি আদায় করার তাওফীক দান করুন এবং তাত্‌ফীফ-এর শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত– খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১১৪-১৩৭

পরিমাপে দুমুখো নীতি

পবিত্র কুরআন মাপ-জোখে কম করাকে গুরুতর অপরাধ সাব্যস্ত করে ঠিক-ঠিক ওজন করার আদেশ প্রদান করেছে। ইসলামে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার একটি প্রমাণ হলো, এই বিধানটি আল্লাহপাক একজায়গায় বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি। বরং নানাভাবে ও নানা আঙ্গিকে যারপরনাই গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত আয়াতগুলো ও তার তরজমা অনুধাবন করুন।

সূরা আন'আম-এর ১৫২ নং আয়াত :

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ

'তোমরা ইনসাফের সঙ্গে পরিমাপ ও ওজন পূর্ণভাবে করো।'

সূরা আ'রাফ-এর ৮৫ নং আয়াত :

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ

'তোমরা পরিমাপ ও ওজন পূর্ণমাত্রায় করো এবং মানুষের জিনিসপত্রে কম করো না।'

সূরা হূদ-এর ৮৪ নং আয়াত :

وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ

'তোমরা পরিমাপ ও ওজনে কম করো না।'

সূরা হূদ-এর ৮৫ নং আয়াত :

اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ

'তোমরা পরিমাপ ও ওজন ইনসাফের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় করো।'

সূরা বানী ইসরাইল ৩৫ নং আয়াত :

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ

'যখন কোনো জিনিস পরিমাপ করবে, তখন পুরোপুরি মাপবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে।'

সূরা শু'আরার ১৮১ ও ১৮২ নং আয়াত :

اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۝ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۝ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ

'মাপে পূর্ণমাত্রায় দিবে; যারা মাপে ঘাটতি করে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না আর সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে আর মানুষের পণ্য কম দিয়ো না।'

সূরা আর-রাহমান-এর ৭ ও ৮ নং আয়াত :

وَ السَّمَآءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيْزَانَ ۝ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ۝ وَ اَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۝

'আল্লাহ আকাশকে সমুন্নত করেছেন আর স্থাপন করেছেন মানদণ্ড, যাতে তোমরা পরিমাপে জুলুম না কর এবং ইনসাফের সাথে ওজন ঠিক রাখ এবং পরিমাপে কম না দাও।'

পবিত্র কুরআন যেরূপ স্পষ্ট ভাষায় ও পরম গুরুত্বের সঙ্গে মাপ-জোখে সুবিচারের পরিচয় প্রদান করার উপর জোর দিয়েছে, তাতেই অনুমিত হয় যে, ইসলামে মাপ-জোখে ফাঁকিবাজি করা ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের এমন মৌলিক দোষগুলোর একটি, যা সামাজিক অপরাধের মূল হিসেবে বিবেচিত এবং যার মূলোৎপাটনের জন্য আল্লাহপাক দুনিয়াতে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন।

প্রশ্ন হলো, মাপ-জোখে কম করার অর্থ কি শুধু এটিই যে, মানুষ বেচাকেনার সময় ওজনে পণ্য কম দিয়ে ক্রেতাকে ঠকাবে? এর আর কোনো মর্ম নেই কি? উত্তর হলো, মাপে কম করার অর্থ সাধারণ এটিই। এটিই এর সরল অর্থ। কিন্তু পবিত্র কুরআন যে ধারায় বিষয়টি উপস্থাপন করেছে, তাতে চিন্তা করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই অপরাধটি শুধু এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এমন প্রতিটি পদক্ষেপই এর অন্তর্ভুক্ত, যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অপরের হক পদদলিত করার চেষ্টা করে কিংবা অন্যের পাওনা ঠিক-ঠিক পরিশোধ করে না।

মূলত পবিত্র কুরআন 'পাল্লা' শব্দটিকে সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও মানুষের হক পুরোপুরি আদায়ের একটি প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছে। আর সেজন্যই সূরা শূরা ও সূরা হাদীদে 'পাল্লা'কে আসমানি কিতাবের সঙ্গে মিলিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা শূরার ১৭ নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেছেন :

اَللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَ الْمِيْزَانَ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ۝

'আল্লাহ তো তিনি, যিনি সত্যসহ কিতাব আর তুলাদণ্ড অবতীর্ণ করেছেন। তুমি কি জান, সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন?

وَ اَنۡزَلۡنَا مَعَهُمُ الۡكِتٰبَ وَ الۡمِيۡزَانَ لِيَقُوۡمَ النَّاسُ بِالۡقِسۡطِ

'আর আমি তাদের (নবী-রাসূলগণের) সঙ্গে কিতাব ও তুলাদণ্ড অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।'[১১৩]

একথা সবারই জানা যে, কোনো নবী-রাসূলই হাতে করে পাল্লা নিয়ে আসেননি, যার দ্বারা পণ্য ওজন করা যেতে পারে। কাজেই এখানে 'তুলাদণ্ড' দ্বারা উদ্দেশ্য সুবিচার ও হক আদায়ের পাল্লা। তা ছাড়া তুলাদণ্ডকে কিতাবের সাথে একত্রে উল্লেখ করে একথা বোঝানো হয়েছে যে, আসমানি কিতাব যদি নৈতিক দিকনির্দেশনা সরবরাহ করে থাকে, তা হলে নবীগণের কথা ও কাজ মানুষের জন্য সেই নিখুঁত পাল্লা পরিবেশন করে থাকে, যা সত্য মিথ্যার মাঝে স্পষ্ট পার্থক্যরেখা টেনে দেয় এবং যার আলোতে অপরের পাওনা রত্তি-রত্তি করে হিসাব রাখা যায়।

এর দ্বারা এই বাস্তবতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 'মাপে-ওজনে কম করা' পরিভাষাটি একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত মর্ম ধারণ করে, যার মধ্যে সব ধরনের হক বিনষ্ট করা-ই অন্তর্ভুক্ত। কোনো ব্যক্তি যখনই অন্যের পাওনা ঠিক-ঠিকমতো আদায় না করবে, তা-ই 'ওজনে কম করা'র মধ্যে পরিগণিত হবে। তখনই সে মাপে কম দেওয়ার অপরাধে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে। আর তার এই আচরণ অতটুকুই ঘৃণ্য ও সমালোচনাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, যতটা হয় ক্রয়-বিক্রয়ে ওজনে কম দেওয়ার ক্ষেত্রে।

কাজেই মাপে-ওজনে কম করা ও সুবিচার করার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে যা-কিছু বলা হয়েছে, যা-কিছু নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, তার লক্ষ্য সেই সব ব্যক্তি, যাদের দায়িত্বে অপরের হক রয়েছে। স্বামীর বেলায় এসব নির্দেশনার অর্থ হবে, স্ত্রীর হক পুরোপুরোরি আদায় করো। স্ত্রীর বেলায় এসবের অর্থ হবে, স্বামীর হক পুরোপুরি আদায় করো। সরকারের জন্য এর অর্থ হবে, রাষ্ট্রের নাগরিকদের হক পুরোপুরি আদায় করো। নাগরিকদের বেলায় এর অর্থ হবে, সরকারের হক পুরোপুরি আদায় করো। এসব বাণীতে কর্মচারীদের জন্য নির্দেশনা হলো, মালিকের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যে-দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, যার বিনিময়ে মাসের শেষে তুমি বেতন-ভাতা গ্রহণ করে থাক, তা যথাযথভাবে আদায় করো। মালিকের জন্য এখানে আদেশ হলো, তোমরা শ্রমিক-কর্মচারীদের সেইসব পাওনা পুরোপুরি ও যথাসময়ে পরিশোধ করো, যার বিনিময়ে তোমরা তাদের থেকে শ্রম নিয়ে থাক।

---

১১৩. হাদীদ : ২৫

এক কথায় জগতে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রগুলোর একটিও বিভাগ এমন নেই, যার জন্য এই আয়াতগুলোতে আবশ্যকীয় নির্দেশনা নেই।

তারপর পবিত্র কুরআন আরও সামনে অগ্রসর হয়ে একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মাপে-ওজনে কম করার সব চেয়ে ঘৃণ্যতর আকার হলো, মানুষ নিজের ও অপরের জন্য আলাদা-আলাদা পাল্লা ঠিক করে নেবে। নিজের জন্য এক পাল্লা আর অন্যদের জন্য ভিন্ন পাল্লা। অপরের থেকে মেপে নেওয়ার সময় এক পাল্লা দ্বারা মেপে নেবে আর দেওয়ার সময় আরেক পাল্লা দিয়ে মেপে দেবে। নিজের পাওনা পুরোপুরি আদায় করে নেবে আর অপরের পাওনা কম দেবে। পবিত্র কুরআন এমন লোকদেরই জন্য যারপরনাই ক্রিয়াশীল ধারায় এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝ أَلَا يَظُنُّ أُولٰٓئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

'মন্দ পরিণাম তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের নিকট থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে মহা দিবসে; যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের রবের সম্মুখে?'[১১৪]

এখানে শব্দটি যদিও ওজনে কম দেওয়ার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে; কিন্তু এর মর্মগত ব্যাপকতার মাঝে সব ধরনের অধিকারহরণ অন্তর্ভুক্ত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'পুরোপুরি মাপা ও কম মাপা সব কাজেই হতে পারে।'

কাজেই এই আয়াতে মৌলিকভাবে একটি চরিত্রের নিন্দাবাদ করা হয়েছে। আর তা হলো, দুই রকম পাল্লা ঠিক করে নেওয়া। একটি পাল্লা অপরের কাছ থেকে নেওয়ার সময় ব্যবহার করা আর অপরটি অন্যকে দেওয়ার সময় ব্যবহার করা। নেওয়ার বেলায় এক নীতি আর দেওয়ার বেলায় এক নীতি। নিজের স্বার্থ উদ্ধারের সময় পাল্লাটা খুব ধারালো আর দেওয়ার বেলায় হাড়কিপটে। এখানে সেই লোকদের কথা বলা হয়েছে, যারা সুবিচার ও ন্যায়নীতির দোহাই দিয়ে দিনে-রাতে সমানে অর্থ হাতাচ্ছে আর অপরের হক আদায়ের সময় এলে আর ইনসাফের কথা মনে থাকে না। একদিন আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে যে এই সম্পদের হিসাব দিতে হবে এবং সম্পদের এই পাহাড় যে একদিন নিজের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে, সেই অনুভূতি ও চিন্তা তাদের নেই।

---

১১৪. সূরা তাতফীফ : ১-৬

দুঃখের বিষয় হলো, আজকাল আমরা অপরের পাওনা ও কর্তব্যের পরিমাপে আল্লাহর অবতারিত পাল্লার পরিবর্তে জীবনের প্রায় প্রতিটি বিভাগে নিজেদের তৈরি করে নেওয়া দুই রকমের পাল্লা ব্যবহার করছি এবং নিজেদেরকে পবিত্র কুরআন ঘোষিত কঠোর হুঁশিয়ারির পাত্রে পরিণত করে নিয়েছি।

একজন মহাজন যদি তার শ্রমিকের নিকট থেকে তার সম্মতি ব্যতিরেকে চুক্তির অতিরিক্ত কাজ আদায় করে নেয় আর এই বাড়তি শ্রমের জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতে প্রস্তুত না হয়, তা হলে তিনি এই দুই রকম পাল্লার কারণে কুরআন-ঘোষিত হুঁশিয়ারির অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর এভাবে বাড়তি যে শ্রমটুকু গ্রহণ করেছেন, সেটুকু তার জন্য হারাম হবে।

অনুরূপভাবে একজন শ্রমিক বা কর্মচারী যদি তার নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত শ্রম না দিয়ে কাজচুরির মহড়া দেখায় কিংবা সেই সময়ে নিজের কাজ করে; কিন্তু বেতন পুরোপুরি উসুল করে, তা হলে সেও কুরআনের এই হুঁশিয়ারির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার বেতনের সেই অংশটুকু হারাম হবে। এ ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো, ডিউটির সময়ে যদি ডিউটির কাজ বিদ্যমান থাকে, তা হলে সেই সময়ে কাজ ফেলে রেখে নফল নামায পড়া বা কুরআন তিলাওয়াত করাও জায়েয হবে না। সেই সময়ে তার কর্তব্য হলো, পূর্ণ সততার সঙ্গে নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা। এই সময়ে এটিই তার ইবাদত।

আমাদের সমাজে অনেক সময়ই দেখা যায় যে, অনেকে ডিউটির সময়ে নফল ইবাদতের নিমগ্ন হয়ে পড়ে। অথচ তার দায়িত্বে অনেক কাজ পড়ে আছে। আবার অপর দিকে কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায আদায়েরও সময় দিতে রাজি নয়। উভয় দিকেই বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ ফরজ নামায ও অন্যান্য ফরজ ইবাদত আদায় করা এবং আদায় করার সুযোগ দেওয়া সর্বাবস্থায়ই জরুরি। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব হলো যথাসময়ে ফরজ নামায আদায় করা আর প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য হলো ফরজ আদায়ের ব্যবস্থা ও সুযোগ করে দেওয়া। একজন কর্মচারী আট ঘণ্টার কাজের দায়িত্ব নিয়ে চাকুরিতে যোগদান করে। কিন্তু এই আট ঘণ্টার মধ্যে পুরো সময়টিই তো আর সে কাজ করে না। প্রাকৃতিক প্রয়োজনগুলো মেটানো কোনো রকম বলা-কওয়া ছাড়াই তার অধিকারে এসে পড়ে। কাজের ফাঁকে প্রস্রাব-পায়খানা ও পানাহার করাকে তো আর অন্যায় মনে করা হয় না। এসব কাজে যেটুকু সময়ের প্রয়োজন, ততটুকু সময় আপনা-আপনিই ডিউটি থেকে বাদ পড়ে যায়। ফরজ নামাযও অতটুকু প্রয়োজন, যতটুকু প্রয়োজন এই স্বাভাবিক কাজগুলো আঞ্জাম দেওয়া। প্রতি ওয়াক্ত নামায আদায় করতে যতটুকু সময়ের দরকার, অতটুকু সময়ও আপনা-আপনিই ডিউটি

থেকে বাদ পড়ে যাবে। তবে কর্মচারীর কর্তব্য হলো, সুন্নাতসহ ফরজ নামাযগুলো যৌক্তিক সময়ের মধ্যে শেষ করে ফেলা। এ ক্ষেত্রে না অস্বাভাবিক সময় ব্যয় করবে, না নফল পড়বে।

তো প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনাটি মধ্যখানে এসে পড়ল; তাই প্রয়োজনের তাকিদে ব্যক্ত করলাম। আমার মূল আলোচ্য ছিল, প্রতিজন মানুষকে আপন-আপন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে, আমরা আমাদের দায়িত্ব ঠিক-ঠিকভাবে আদায় ও পালন করছি কি-না। দায়িত্বপালনে আমাদের কোনো ত্রুটি হচ্ছে কি-না। আমরা নিজের জন্য এক ধরনের পাল্লা আর অপরের জন্য এক ধরনের পাল্লা তৈরি করে রেখেছি কি-না। এমন হচ্ছে কি-না যে, আমরা অপরেরর কাছ থেকে সেই জিনিস দাবি করছি, যেটি আমরা তার জায়গায় হলে দিতে প্রস্তুত থাকতাম না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এর জন্য প্রস্তুত না হব এবং কুরআন ঘোষিত হুঁশিয়ারির ভয়ে শঙ্কিত না হব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অপরের হক বিনষ্ট করা ও কর্তব্যপালনে অবহেলা করার চরিত্র বদলাবে না। ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজ থেকে সেসব অপরাধের মূলোৎপাটন হবে না, যেসব অপরাধের কারণে আজ আমাদের জীবন অশান্তিতে ভরে গেছে। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত অপরের অধিকার হরণ ও বিনষ্টের বাজার গরম থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এর কুফল মানবসমাজকে অশান্তি ছাড়া আর কিছুই দিতে সক্ষম হবে না। একজন মানুষ যদি দশজন মানুষের হক নষ্ট করে, তা হলে সেই দশজনও তার হক নষ্টের মহড়া শুরু করে দেয়। শেষমেষ বিজয় শয়তানেরই হয়। আল্লাহপাক আমাদেরকে বুঝবার তাওফীক দান করুন।

সূত্র : যিক্‌র ও ফিক্‌র– পৃষ্ঠা : ৯৭

হালাল পেশা পরিত্যাগ করবেন না

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ رُزِقَ فِيْ شَيْئٍ فَلْيَلْزَمْهُ

'যে ব্যক্তি যে কাজের মাধ্যমে জীবিকাপ্রাপ্ত হয়, সে যেন সেই কাজে লেগে থাকে।'[১১৫]

নবীজি আরও বলেছেন :

مَنْ جُعِلَتْ مَعِيْشَتُهُ فِيْ شَيْئٍ فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ حَتّٰى يَتَغَيَّرَ عَلَيْهِ

'আল্লাহর পক্ষ থেকে যার জীবিকা যে জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়েছে, সে যেন এই সময় পর্যন্ত তা ছেড়ে অন্য কোনো পেশা অবলম্বন না করে যতক্ষণ-না তা নিজে-নিজে পরিবর্তিত হয়ে যায় কিংবা তাতে অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়ে যায়।'[১১৬]

জীবিকার উপায় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে

এক ব্যক্তির জন্য আল্লাহপাক জীবিকা উপার্জনের একটি মাধ্যম ঠিক করে দিলেন। লোকটি সেই কাজে লেগে আছে এবং সেপথে তার জীবিকা আসছে। এমতাবস্থায় বিনা কারণে তার পক্ষে উপার্জনের এই অবলম্বনটি পরিত্যাগ করা ঠিক হবে না। তাকে বরং উক্ত কাজে লেগে থাকতে হবে যতক্ষণ-না উক্ত মাধ্যমটি আপনা থেকে হাতছাড়া হয় কিংবা সেটি বাদ দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। কারণ, আল্লাহ যখন আপনার জীবিকাকে একটি উপায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিলেন, তখন বুঝতে হবে, এটি আপনার জন্য আল্লাহপাকের

---

১১৫. কাশ্‌ফুল খাফা ২/১৫৭৮, হাদীস নং-২৫৮১; ফয়জুল কাদীর ৬/১৩৭, হাদীস নং-৮০৭২; আল-জামিউস সাগীর ১/১২৩৮, হাদীস নং-১২৩৭৩; শু'আবুল ঈমান ২/৮৯, হাদীস নং-১২৪১; কানযুল উম্মাল ॥ হাদীস নং-২৯৮৬; ইত্‌হাফ ॥ ৪/২৮৭

১১৬. কাশ্‌ফুল খাফা ২/১৩৭৩; কানযুল উম্মাল ॥ হাদীস নং-২৯৮৬; ইত্‌হাফ ॥ ৪/২৮৭;

একটি দান এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাকে এ কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, জীবিকা উপার্জনের হাজারো পথ ও পন্থা আছে। এমতাবস্থায় সেসবের মধ্য থেকে যখন বিশেষ একটি পন্থাকে আপনার জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে দেওয়া হলো, তখন এটি আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা পদ্ধতিকে নিজের পক্ষ থেকে বিনা কারণে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না

উপার্জন ও সম্পদ দানের খোদায়ী ব্যবস্থাপনা

দেখুন, আল্লাহপাক এই জগতে জীবিকা উপার্জন ও জীবনধারণের চমৎকার একটি ব্যবস্থাপনা তৈরি করে দিয়েছেন। এমন একটি ব্যবস্থাপনা ঠিক করে নেওয়া মানুষের মাথায় ধরত না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন :

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

'পার্থিব জীবনে আমিই তাদের মাঝে জীবিকা বণ্টন করে দিয়েছি।'[১১৭]

এই বণ্টন আল্লাহপাক এভাবে করেছেন যে, একজনের অন্তরে প্রয়োজন জাগিয়ে দিয়েছেন। আবার একজনের মনে সেই প্রয়োজন পূরণ করার পন্থা ঢেলে দিয়েছেন। একটু চিন্তা করে দেখুন, মানুষের কত রকমের প্রয়োজন আছে! তার রুটির প্রয়োজন, কাপড়ের প্রয়োজন, ঘরের প্রয়োজন, আসবাবপত্রের প্রয়োজন। জীবনধারণের জন্য মানুষের বহু কিছুর প্রয়োজন পড়ে। প্রশ্ন হলো, পৃথিবীর সব মানুষ মিলে কি কোনো কন্‌ফারেন্স করেছিল, যেখানে সবাই মিলে মানবজীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তুর তালিকা তৈরি করে নিয়েছিল? তারপর আপসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, অমুক লোক কাপড় তৈরি করবে, অমুক থালা-বাসন বানাবে, অমুক জুতার কারখানা দেবে, অমুক চাল ইত্যাদি উৎপাদন করবে?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, না, এমনটি হয়নি। তাবৎ পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একত্র হয়ে যদি এমন কিছু করার চেষ্টা করত, তা হলে তা সম্ভব হতো না। এ তো হলো আল্লাহপাকের ঠিক করে দেওয়া ব্যবস্থাপনা যে, তিনি একজনের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন, তুমি গম উৎপাদন করো। আরেকজনের অন্তরে ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছেন, তুমি আটা তৈরির কল বসাও। আরেকজনের ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়েছেন, তুমি চাল উৎপাদন করো। একজনের মনে চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছেন, তুমি ঘিয়ের দোকান দাও।

---

১১৭. যুখরুফ : ৩২

এভাবে আল্লাহপাক প্রতিজন মানুষের অন্তরে সেসব প্রয়োজনের কথা ঢেলে দিয়েছেন, যেগুলো প্রত্যেক মানুষের জীবনধারণের জন্য নিত্যদিন আবশ্যক হয়। ফলে আপনার যখন কোনো বস্তুর প্রয়োজন দেখা দেবে আর আপনার পকেটে অর্থ থাকবে, তখন বাজারে গেলেই ইনশাআল্লাহ আপনার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাবে।

জীবিকা বণ্টনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা

আমার বড় ভাই জনাব যাকী কাইফী রহ.। হযরত থানভী রহ.-এর সাহচর্যপ্রাপ্ত ছিলেন। একদিন তিনি বললেন, ব্যবসায় অনেক সময় আল্লাহপাক এমন-এমন চিত্র দেখান যে, মানুষ মহান আল্লাহর রুবুবিয়াত (রব হওয়া) ও রায্যাকিয়াত (রিযিকদাতা হওয়া)-এর সম্মুখে সিজদাবনত না হয়ে পারে না। লাহোরে 'এদারায়ে ইসলামিয়াত' নামে তাঁর ধর্মীয় কিতাবাদির একটি দোকান ছিল। তিনি যথারীতি দোকানে বসতেন। বললেন, একদিন আমি সকালবেলা দোকানে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। এমন সময় প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আমি ভাবলাম, এই মুষলধারা বৃষ্টির মধ্যে দোকানে গিয়ে কী করব। এর মধ্যে কে আসবে কিতাব কিনতে। কারণ, এমন পরিস্থিতিতে একে তো মানুষ ঘর থেকে বেরই হয় না; দু-একজন হয়ও যদি, হয় একান্ত প্রয়োজনে।

বই-কিতাব, বিশেষ করে দ্বীনি কিতাব এমন একটি পণ্য, যা দ্বারা না মানুষের ক্ষুধা নিবারণ হয়, না অন্য কোনো (সহজাত) প্রয়োজন পূরণ হয়। মানুষের যখন জগতের সব প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়, তখন গিয়ে বইয়ের কথা মনে পড়ে। কাজেই এই প্রতিকূল আবহাওয়ায়, এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে অন্তত ইসলামী কিতাব ক্রয় করতে কেউ বাজারে আসবে না। আমি দোকানে গিয়ে কী করব!

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে মনে এই চিন্তাও এল যে, আমি তো জীবিকার জন্য একটি পন্থা অবলম্বন করেছি। আল্লাহপাক এই পন্থাটিকে আমার জীবিকা উপার্জনের একটি উপায় বানিয়েছেন। কাজেই আমার কাজ হলো, আমি গিয়ে দোকান খুলে বসে পড়ব। চাই ক্রেতা আসুক কিংবা না আসুক।

ব্যস, আমি ছাতাটা মাথায় দিয়ে দোকানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বাজারে গিয়ে দোকান খুললাম এবং কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলাম। দোকান খুলে বসা আবশ্যক ছিল; তাই বসলাম। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, ছাতা মাথায় দিয়ে-দিয়ে মানুষ আসছে। এসে তারা আমার দোকান থেকে কিতাব কিনতে শুরু করল। এমন-এমন কিতাব ক্রয় করতে শুরু করল, বাহ্যিক বিবেচনায় সেগুলো এসময় কারও ক্রয় করবার কথা নয়। অন্যান্য দিন সাধারণত যে পরিমাণ বিক্রি

হয়ে থাকে, এই ঝড়ের মধ্যে আজও প্রায় সেই পরিমাণই বিক্রি হলো। আমি ভাবতে লাগলাম, এমনটি কীভাবে ঘটল! এই প্রবল ঝড় আর মুষলধারা বৃষ্টির মধ্যে কিতাব ক্রয়ের জন্য অভাবনীয়রূপে এই ক্রেতারা কোথা থেকে এল? উত্তর পেলাম, এদেরকে আমার রিযিকদাতা আল্লাহ পাঠিয়েছেন।

মহান আল্লাহ এদের অন্তরে একথা ঢেলে দিয়েছেন, তোমরা গিয়ে কিতাব ক্রয় করো। আর আমার অন্তরে এই ভাবনার উদ্রেক করেছেন যে, তুমি গিয়ে দোকান খুলে বসো। আমার অর্থের প্রয়োজন ছিল আর তাদের কিতাবের দরকার ছিল। উভয়কে দোকানে একত্রিত করে দিলেন। তারা কিতাব পেয়ে গেল আর আমার রিযিকের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

এই ব্যাস্থাপনা একমাত্র মহান আল্লাহই তৈরি করতে পারেন। কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছা করে, আমি পরিকল্পনার মাধ্যমে এবং কনফারেন্স ডেকে এই ব্যবস্থাপনা ঠিক করব, পারস্পরিক পরিকল্পনা ও সমঝোতার মাধ্যমে আমি এই ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করব, তা হলে তার জীবন শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু এই কাজটি সে করতে সক্ষম হবে না।

রাতে ঘুমোনো ও দিনে কাজ করার স্বভাবগত ব্যবস্থা

আমার আব্বাজান মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ. বলতেন, একটু ভেবে দেখুন, জগতের সব মানুষ রাতে ঘুমায় আর দিনে কাজ করে। রাতের বেলা চোখে ঘুম আসে – দিনে আসে না। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মিলে কি ইন্টারন্যশনাল কনফারেন্স করেছিল যে, তাতে সবাই একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, আমরা রাতে ঘুমাব আর দিনে কাজ করব? জানা কথা, এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। বরং মহান আল্লাহ প্রতিজন মানুষের অন্তরে একথা ঢেলে দিয়েছেন যে, তুমি রাতে ঘুমাও আর দিনে কাজ করো।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন :

وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝

'আমি রাতকে আবরণ বানিয়েছি আর দিনকে বানিয়েছি জীবিকা উপার্জনের সময়।'[১১৮]

এ বিষয়টিকে যদি মানুষের অধিকারে দিয়ে দেওয়া হতো যে, যখন ইচ্ছা কাজ করো, যখন খুশি ঘুমাও, তা হলে এর ফলে মানুষের জীবন লণ্ডভণ্ড হয়ে যেত। একজন বলত, আমি দিনে ঘুমাব, রাতে কাজ করব। কেউ বলত, আমি

১১৮. নাবা : ১০, ১১

রাতে ঘুমাব, দিনে কাজ করব। আরেকজন বলত, আমি সন্ধ্যায় ঘুমাব, সকালে কাজ করব। অপরজন বলত, আমি সন্ধ্যায় কাজ করব, সকালে ঘুমাব। এই বিরোধ ও বৈপরীত্যের ফলাফল এই দাঁড়াত যে, একজন ঘুমাত আর ঠিক সেই সময় আরেকজন খটখট করত। ফলে একজনের কাজের কারণে আরেকজনের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটত। এভাবে পৃথিবীর নিয়ম-শৃঙ্খলা ও জীবনের ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যেত।

মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ যে, তিনি প্রতিজন মানুষের অন্তরে এই বুঝ ঢেলে দিয়েছেন, তুমি দিনের বেলা কাজ করো আর রাতের বেলা আরাম করো। এ বিষয়টিকে তিনি মানুষের একটি সৃষ্টিগত চাহিদায় পরিণত করে দিয়েছেন।

জীবিকার দুয়ার বন্ধ করো না

ঠিক তদ্রূপ আল্লাহপাক মানুষের জীবনধারণের ব্যস্থাপনাটিকেও নিজে ঠিক করে দিয়েছেন এবং প্রতিজন মানুষের অন্তরে এই বুঝ ঢেলে দিয়েছেন যে, তুমি এই কাজ করো, তুমি এই কাজ করো। কাজেই তোমাকে যখন একটি কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তোমার জীবিকাকে একটি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়েছে, তখন তোমাকে বুঝে নিতে হবে, এই কাজটি আপনা-আপনি হয়ে যায়নি। বরং কোনো এক কারিগর কাজটি সম্পাদন করেছেন এবং কোনো এক স্বার্থের ভিত্তিতে করেছেন। কাজেই এখন তুমি উপযুক্ত কোনো কারণ ব্যতিরেকে জীবিকার এই হালাল উপায়টিকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করার চিন্তা করো না।

বলা তো যায় না যে, জীবিকার এই উপায়টিতে আল্লাহপাক তোমার জন্য বিশেষ কোনো কল্যাণ ও স্বার্থ রেখেছেন এবং তোমার এই কাজে জড়িত থাকার দরুন বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছে আর তুমি পৃথিবীর গোটা অর্থব্যবস্থার একটি অংশ হয়ে আছ। তাই নিজের পক্ষ থেকে জীবিকার এই অবলম্বনটিকে পরিত্যাগ করো না।

অবশ্য যদি কোনো কারণে চাকুরিটা আপনা থেকে ছুটে যায় কিংবা ব্যবসায় এমন কোনো সমস্যা তৈরি হয়ে যায় যে, সেটি আর ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না কিংবা ব্যবসায় অনবরত লোকসান যাচ্ছে, তা হলে এই পরিস্থিতিতে চলমান উপায়টিকে পরিত্যাগ করে অন্য উপায় অবলম্বন করায় কোনো দোষ নেই। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ কোনো পরিস্থিতি তৈরি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনা থেকে জীবিকার দরজা বন্ধ করবে না।

এটি আল্লাহর দান

আমাদের শায়খ ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. এই কবিতাটি পাঠ করতেন :

چیزیکہ بے طلب رسد آں دادہ خدا است
اورا تو رو مکن کہ فرستادہ خدا است

'যখন চাওয়া ব্যতীত আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বস্তু এসে পড়ে, তখন তাকে আল্লাহর দান মনে করে প্রত্যাখ্যান করা থেকে বিরত থাকো। কারণ, এটি তোমার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নেয়ামত।'

মোটকথা, যে উপায়টির সঙ্গে আল্লাহ তোমার জীবিকাকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন, তুমি তাতে জড়িয়ে থাকো যতক্ষণ-না আপনা-আপনি পারবর্তন ঘটে।

প্রতিটি বিষয় আল্লাহর পক্ষ থেকে স্থির হয়ে থাকে

এই হাদীসের আলোকে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেছেন :

'তরিকতপন্থীগণ এরই উপর সমস্ত বিষয়কে – যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার সঙ্গে ঘটে থাকে – অনুমান করেছেন। বাস্তবতার সঙ্গে যাদের পরিচয় ঘটে যায়, তারা আপনা থেকে সেগুলোতে কোনো পরিবর্তন ঘটান না। তরিকতপন্থীদের তাদের বিষয়টি 'স্পষ্ট বিষয়ের' মতো। বরং এটি অনুভবযোগ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা নিজেদের বেলায় এর প্রতি লক্ষ্য রাখেন।'

এই বক্তব্যের মর্ম হলো, আলোচ্য হাদীসে যেকথাটি বলা হয়েছে, সেটি যদিও সরাসরি জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তবু সূফীগণ এ হাদীস দ্বারা এই মাসআলাটি উদ্ভাবন করেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেকোনো বান্দার সঙ্গে যা-ই আচরণ করেন, যেমন– বিদ্যায়, সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক কিংবা অন্য কোনো বিষয়ে আল্লাহপাক যে মু'আমালা করে রেখেছেন, সেই ব্যক্তি যেন তাকে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তন না করে। বরং তার উপর বহাল থাকে।

হযরত উছমান (রাযি.) খেলাফত ছাড়লেন না কেন?

হযরত উছমান (রাযি.)-এর খেলাফত আমলের শেষ সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে একটি ঝড় উঠেছিল। তিনি নিজেই তার কারণও বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল আমাকে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তোমাকে একটি পোশাক পরাবেন; তুমি নিজ ইচ্ছায় সেটি খুলো না।'[১১৯]

---

১১৯. সুনানে তিরমিযী কিতাবুল মানাকিব ॥ হাদীস নং–৩৬৩৮; সুনানে ইবনে মাজা ॥ হাদীস নং–১০৯; মুসনাদে আহমাদ ॥ হাদীস নং–২৩৩২৬

কাজেই এই খেলাফত – যেটি আল্লাহ আমাকে দান করেছেন – এটি-ই সেই পোশাক। আমি নিজ ইচ্ছায় এটি খুলব না। শেষ পর্যন্ত ঘটেছেও তা-ই। তিনি না খেলাফত ত্যাগ করেছেন, না বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন, না তাদেরকে দমন করার আদেশ প্রদান করেছেন। অথচ তিনি তৎকালীন আমীরুল মুমিনীন ও খলীফা ছিলেন। তাঁর সেনাবাহিনী ছিল। তিনি চাইলে বিদ্রোহীদের মোকবেলা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি বললেন, যেহেতু বিদ্রোহীরা, আমার উপর অস্ত্রধারণকারীরা মুসলমান; আর আমি চাই না, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলনকারী প্রথম লোকটি আমি হই। সেমতে তিনি না খেলাফত ত্যাগ করেছেন, না বিদ্রোহীদের মোকাবেলা করেছেন। বরং নিজ বাসগৃহেই অবরুদ্ধ অবস্থায় বসে ছিলেন। এমনকি নিজের জীবন কুরবান করে দিলেন এবং শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। তিনি শহীদ হওয়াকে বরণ করে নিলেন; তবু খেলাফত ছাড়লেন না। এটি-ই সেই বিষয়, হযরত থানভী রহ. যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, যদি তোমাদের দায়িত্বে কোনো কাজ সোপর্দ করা হয়, তা হলে তাতে লেগে থাকো; নিজের পক্ষ থেকে সেটি ত্যাগ করো না।

জনসেবার পদও আল্লাহর দান

যাহোক, মহান আল্লাহ যখন তোমার জন্য দ্বীনের খেদমতের কোনো পথ নির্বাচন করে দিলেন এবং তুমি সেটি চাওয়া ব্যাতিরেকেই পেয়ে গেছ; এমতাবস্থায় সঙ্গত কোনো কারণ ছাড়া তুমি সেটি পরিত্যাগ করো না। তোমার জন্য এরই মাঝে নূর ও বরকত রয়েছে। অনুরূপ তরিকতের পথিকদের আল্লাহপাক যা কিছু দান করেন ও তাদের সাথে যে কারবার হয়ে থাকে, তাদের উচিত, সেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে ধরে নিয়ে বরণ করে নেওয়া। অনুরূপভাবে কোনো-কোনো ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহপাকের বিশেষ কারবার ঘটে থাকে। যেমন– সাহায্য-সহযোগিতার জন্য মানুষ এক ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়ে থাকে কিংবা দ্বীনের নানা বিষয়ে তার কাছে যায়। তো প্রকৃতপক্ষে এটি একটি পদমর্যাদা, যেটি আল্লাহ তাকে দান করেছেন। সেজন্য আল্লাহই মানুষের অন্তরে একথা ঢেলে দিয়েছেন যে, পারস্পরিক কায়-কারবারে অমুক ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করো, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অমুক থেকে সাহায্য নাও, বিবাদ-বিসংবাদে অমুক ব্যক্তির কাছে গিয়ে মীমাংসা চাও। মানুষের অন্তরে এ বিষয়টি আপনা থেকে জন্ম নেয়নি। বরং আল্লাহ মানুষের অন্তরে বিষয়টি ঢেলে দিয়েছেন।

তো এই পদমর্যাদা সে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। কাজেই বিধান হলো, একে যেন নিজের পক্ষ থেকে নষ্ট না করে। কারণ, এটি আল্লাহর নিকট থেকে আসা দায়িত্ব। এই চিন্তাটি মাথায় রেখেই মানুষের সেবা করে যেতে হবে।

যেমন– অনেক সময় আল্লাহপাক বংশের কোনো এক ব্যক্তিকে এই সম্মান ও পদমর্যাদা দান করে থাকেন যে, গোটা বংশের মধ্যে যেখানেই কোনো সমস্যা দেখা দিল, বিবাদ হলো কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ আঞ্জাম দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল, তা হলে সবাই সঙ্গে-সঙ্গে তার কাছে ছুটে যায় এবং তার থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে। অনেক সময় এমন ব্যক্তিবর্গ এই ভেবে ঘাবড়ে যায় যে, জগতের সব ঝামেলা আমার মাথার উপর চাপানো হচ্ছে! আসলে এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কেননা, মানুষ আপনার শরণাপন্ন হওয়া প্রমাণ করে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা অমুকের শরণাপন্ন হও। এই পদমর্যাদা আল্লাহর দান।

بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو
زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو

'জগত যাকে ঠিক বলে, তুমিও তাকে ঠিক বলো। সৃষ্টির কণ্ঠকে খোদার ডংকা মনে করো।'

কাজেই এই পদমর্যাদাকে উপেক্ষা করো না। বরং একে খুশিমনে বরণ করে নাও যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে এই সেবার দায়িত্বটি অর্পণ করা হয়েছে।

হযরত আইউব (আ.)-এর একটি ঘটনা

হযরত আইউব (আ.) একদিন গোসল করছিলেন। সেই অবস্থায় তার উপর সোনার ফড়িং আছড়ে পড়তে শুরু করল। তিনি গোসল করা বাদ দিয়ে সেগুলো কুড়াতে শুরু করলেন। আল্লাহপাক জিজ্ঞেস করলেন, আইউব, আমি কি তোমাকে বিত্তশালী বানাইনি? আমি কি তোমাকে মাল-দৌলত দেইনি? তারপরও তুমি এগুলো কুড়াতে ছুটে বেড়াচ্ছ?

উত্তরে হযরত আইউব (আ.) বললেন, হে আল্লাহ, একথা ঠিক যে, আপনি আমাকে এত দৌলত দান করেছেন যে, আমি তার শোকরও আদায় করতে পারব না। কিন্তু যে দৌলত আপনি এই মুহূর্তে আমার চাওয়া ব্যতিরেকেই আমাকে দান করেছেন, তার প্রতি আমি অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করতে পারি না। আপনি আমার উপর স্বর্ণবৃষ্টি বর্ষণ করছেন আর আমি বলে দেব, এগুলো আমার প্রয়োজন নেই, এটা হতে পারে না। আপনি যখন দিচ্ছেন, তখন আমার কর্তব্য হলো, আমি মুখাপেক্ষীর মতো সেদিকে এগিয়ে যাব এবং সেগুলো সংগ্রহ করব।[১২০]

---

১২০. সহীহ বুখারী গোসল অধ্যায় ॥ হাদীস নং-২৭; সুনানে নাসায়ী গোসল অধ্যায় ॥ হাদীস নং-৪০৬; মুসনাদে আহমাদ ॥ হাদীস নং-৭৮১২

ব্যাপার আসলে এই যে, হযরত আইউব (আ.)-এর দৃষ্টিতে সোনার টুকরা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাঁর দৃষ্টি ছিল সেই সত্তার উপর, যিনি সেগুলো দান করেছিলেন যে, এই দৌলত আমি কোন হাত থেকে গ্রহণ করছি! দাতার হাত যখন এত বিরাট হয়, তখন মানুষকে এগিয়ে গিয়ে এবং মুখাপেক্ষী হয়ে দান গ্রহণ করতে হয়। অন্যথায় সোনা সংগ্রহ করা হযরত আইউব (আ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল না।

ঈদের বখশিশ বেশি দাবি করার ঘটনা

আমি এর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি এই– আমার আব্বাজান মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ. প্রতি ঈদে আমাদেরকে ঈদ বখশিশ দিতেন। আমরা প্রতি বছর ঈদের সময় তাঁর কাছে দাবি জানাতাম, গত বছর বিশ টাকা দিয়েছিলেন। এখন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে; তাই এ বছর পঁচিশ টাকা দেবেন। তো আমরা প্রতি বছরই বাড়িয়ে চাইতাম যে, এ বছর বিশের জায়গায় পঁচিশ দিন, এ বছর পঁচিশের জায়গায় ত্রিশ দিন, এ বছর ত্রিশের জায়গায় পঁয়ত্রিশ দিন। উত্তরে আব্বাজান বলতেন, তোমরা মানুষগুলো আসলে চোর-ডাকাত; প্রতি বছরই বাড়িয়ে চাচ্ছ।

তো দেখুন, সে সময় আমরা সব কজন ভাই-ই কর্মজীবি ছিলাম। প্রত্যেকে হাজার-হাজার টাকা উপার্জন করতাম। কারুরই কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু যখন পিতার কাছে যেতাম, তখন আগ্রহ প্রকাশ করে তাঁর কাছে চাইতাম কেন? ব্যাপারটা হলো, আমাদের দৃষ্টি সেই অর্থের প্রতি ছিল না, যেগুলো আমরা বিশ-পঁচিশ, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকার আদলে লাভ করতাম। বরং আমাদের দৃষ্টি ছিল, দাতার হাতের প্রতি যে, ওই হাত থেকে কিছু পাব। তার মধ্যে যে নূর ও বরকত থাকবে, হাজার টাকা, লাখ টাকার মধ্যেও সেই নূর, সেই বরকত পাওয়া যাবে না। দুনিয়ার সাধারণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে যখন মানুষের অবস্থা এই হতে পারে, তা হলে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে – যিনি সব শাসকের বড় শাসক – বান্দার যে-সম্পর্ক, তার কী অবস্থা হবে? কাজেই যখন আল্লাহর কাছে চাইব, মুখাপেক্ষী হয়ে চাইব। আবার আল্লাহ যখন দান করবেন, তখন মুখাপেক্ষী হয়ে গ্রহণ করব। তখন অমুখাপেক্ষিতার ভাব অবলম্বন করা যাবে না। কবি বলেন :

چوں طمع خواہد ز من سلطان دین
خاک بر فرق قناعت بعد ازیں

'তিনি যখন কামনা করেন, আমি তাঁর সম্মুখে লোভ প্রকাশ করব, তখন তুষ্টতার মাথার উপর ছাই মারি। তখন তো তাতেই স্বাদ থাকবে যে, মানুষ

লোভী হয়ে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে হাত পাতবে এবং যা মিলবে, গ্রহণ করে নেবে।'

কাজেই আল্লাহপাক যাকে যে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন কিংবা যে পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, মনে করতে হবে, এটি আল্লাহপাকের দান। কাজেই তাকে নিজের পক্ষ থেকে পরিত্যাগ করো না। হ্যাঁ, যদি এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়, যার ফলে মানুষ সেসব ছাড়তে বাধ্য হয়ে পড়ে কিংবা বড় কেউ ছাড়তে পরামর্শ প্রদান করেন, তা হলে তখন ছেড়ে দেবে।

আলোচনার সারকথা

এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম, তার সারকথা হলো, নিজের বিশেষ চাওয়া ব্যতীত যা কিছু হস্তগত হবে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে বলে বিশ্বাস করতে হবে এবং তাকে মূল্যায়ন করতে হবে।

কবির ভাষায়–

چیزیکہ بے طلب رسد آں دادہ خدا است
اورا تو رد مکن کہ فرستادہ خدا است

'যখন চাওয়া ব্যতীত আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বস্তু এসে পড়ে, তখন তাকে আল্লাহর দান মনে করে প্রত্যাখ্যান করা থেকে বিরত থাকো। কারণ, এটি তোমার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নেয়ামত।'

তাকে প্রত্যাখ্যান কিংবা অবমূল্যায়ন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এ জাতীয় নেয়ামতের অবমূল্যায়ন অনেক সময় অশুভ পরিণতি ডেকে আনে। তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপদ নেমে আসে। কাজেই অপ্রত্যাশিতভাবে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে পড়ে, বিষয়টি যদি হালাল হয়, তা হলে তাকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে বরণ করে নিতে হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহপাক যাকে যে খেদমতে লাগিয়ে দিয়েছেন, তাকে সেই খেদমতে লেগে থাকা উচিত। নিজ ইচ্ছায় সেই খেদমত থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে না। কারণ, এ কাজে তোমাকে আল্লাহপাক জড়িত করে দিয়েছেন এবং তোমার থেকে খেদমতটা তিনি নিচ্ছেন।

অনুরূপভাবে আল্লাহপাক যদি কাউতে তার চাওয়া ব্যতীত কোনো ক্ষমতা বা পদমর্যাদা দান করেন, তা হলে তাকেও অবমূল্যায়ন করবে না।

যেমন– আল্লাহ তোমাকে নেতা বানিয়ে দিলেন এবং মানুষ তোমাকে তাদের কর্তা মনে করছে, তা হলে বুঝে নাও, এটি তোমার প্রতি আল্লাহপাকের

দান। আল্লাহই তোমার উপর এই সেবার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কাজেই তোমাকে এর হক আদায় করতে হবে।

আল্লাহপাক আমাদের প্রত্যেককে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং এই কথাগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত– খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৩০-১৪৪

হালাল জীবিকার অন্বেষণ একটি দ্বীনি কর্তব্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
اَمَّا بَعْدُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ • فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

হালাল জীবিকার অন্বেষণ দ্বিতীয় স্ত.রর কর্তব্য

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

'হালাল জীবিকার অন্বেষণ দ্বীনের প্রথম স্তরের ফরজগুলোর পর একটি ফরজ।'[১২১]

সনদের বিচারে হাদীসবিশারদগণ যদিও এই হাদীসটিকে দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন; কিন্তু মর্মগত দিক থেকে উম্মতের আলেমগণ একে বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। অর্থাৎ– উম্মতের সমস্ত আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, এই হাদীসের মর্ম সঠিক ও বিশুদ্ধ।

এই হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। তা হলো, হালাল জীবিকার অন্বেষণ দ্বীনের প্রথম স্তরের কর্তব্যগুলোর পর দ্বিতীয় স্তরের একটি কর্তব্য। অর্থাৎ– দ্বীনের প্রথম স্তরের কর্তব্য সেগুলো, যেগুলোকে পরিভাষায় ইসলামের রুকন বলা হয়। যেমন– নামায পড়া, যাকাত আদায় করা, রোযা রাখা, হজ করা ইত্যাদি। এগুলো দ্বীনের প্রথম স্তরের কর্তব্য। তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১২১. কান্‌যুল উম্মাল ৪/১৬ ॥ হাদীস নং–৯২৩১; কাশ্‌ফুল খাফা ২/৪৬ ॥ হাদীস নং–১৬৭১১; সুনানে বায়হাকী ২/২৪ ॥ হাদীস নং–১২০৩; আল-জামিউল কাবীর ১/১৪০৮৪ ॥ হাদীস নং–৩৫; জামিউল আহাদীস ১৪/১২৮ ॥ হাদীস নং–১৩৯৩৭;মিশকাতুল মাসাবীহ ২/১২৯ ॥ হাদীস নং–২৭৮১; শু'আবুল ঈমান ৬/৪২১ ॥ হাদীস নং–৮৭৪১

ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই দ্বীনি কর্তব্যগুলো আদায় করার পর দ্বিতীয় স্তরের কর্তব্য হলো হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা এবং হালাল রুজি রোজগারের চেষ্টা করা।

এটি সংক্ষিপ্ত একটি বাণী ও ছোট্ট একটি উপদেশ। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসের মধ্যে জ্ঞানের বিরাট এক ভাণ্ডার ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মানুষ যদি এই হাদীসের মধ্যে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে, তা হলে দ্বীনের বুঝ অর্জনের জন্য এর মধ্যে বিরাট উপকরণ রয়েছে।

হালাল জীবিকার অন্বেষণ দ্বীনের একটি অংশ

এ হাদীস দ্বারা প্রথম বিষয়টি তো এই জানা গেল যে, হালাল জীবিকা উপার্জনে আমরা যা-কিছু করে থাকি – ব্যবসা বলুন, কৃষি বলুন, চাকুরি বলুন – যা-ই করি না কেন, এর কোনোটিই দ্বীনের বাইরের বিষয় নয়। বরং এগুলোও দ্বীনের অংশ। আর ইসলাম এগুলোকে শুধু জায়েয বা বৈধই সাব্যস্ত করেনি; বরং এগুলোকে 'কর্তব্য' সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি এর কোনো একটিও কাজ না করে হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকে এবং হালাল জীবিকা অন্বেষণ না করে, তা হলে সে একটি কর্তব্য পালন না করার গুনাহে গুনাহগার হবে। কারণ, সে একটি ফরজ কর্মকে পরিত্যাগ করেছে। কারণ, ইসলামের দাবি হলো, মানুষ বেকার বসে থাকতে পারবে না, কারও বোঝা হয়ে থাকতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে হাত পাতবে না।

আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব থেকে বেঁচে থাকার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি উম্মতকে এই শিক্ষা প্রদান করেছেন যে, মানুষ যেন আপন-আপন সাধ্য ও সামর্থ অনুপাতে হালাল জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করে, যাতে অন্যের কাছে হাত পাতার প্রয়োজন দেখা না দেয়। কারণ, আল্লাহপাক আমাদের উপর যেভাবে তাঁর নিজের হকসমূহ আরোপিত করেছেন, তেমনি কিছু কর্তব্য আমাদের নিজেদের দেহ, পরিবারের সদস্যবর্গ ও স্ত্রী-সন্তান প্রমুখের জন্যও আরোপিত করে দিয়েছেন। আর হালাল জীবিকার অন্বেষণ ব্যতীত এই কর্তব্যগুলো আদায় করা সম্ভব নয়। কাজেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত এই কর্তব্যগুলো পালনের জন্য আমাদের হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা জরুরি।

ইসলামে 'বৈরাগ্য' নেই

এই হাদীস দ্বারা ইসলাম বৈরাগ্যের মূল কেটে দিয়েছে। খ্রিস্টধর্মে বৈরাগ্যের বৈধতা আছে। তারা আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এই

পন্থা ঠিক করে নিয়েছে যে, মানুষ তাদের জাগতিক কায়-কারবার পরিত্যাগ করবে। নিজের ব্যক্তিগত চাহিদাগুলোকে দলিত করে ফেলবে এবং বনে গিয়ে বসে থাকবে আর আল্লাহ-আল্লাহ জপ করবে। ব্যস, আল্লাহকে খুশি করার, তাঁর নৈকট্য অর্জন করার জন্য তাদের কাছে এছাড়া আর কোনো পথ নেই।

কিন্তু আল্লাহপাক বলছেন, আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। তাদের মাঝে আমি প্রবৃত্তিগত কিছু চাহিদা রেখেছি। তাদের ক্ষুধা লাগে। পিপাসা লাগে। দেহকে আবৃত করার জন্য কাপড়ের প্রয়োজন হয়। মাথা গোঁজার জন্য একটি ঘরের দরকার হয়। এসব চাহিদা আমি তাদের মাঝে সৃষ্টি করেছি। এখন সেই মানুষগুলোর কাছে আমার দাবি হলো, তোমরা এই চাহিদাগুলোও পূরণ করো আর সেই সঙ্গে আমার হকগুলোও আদায় করো। তখনই তোমরা পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারবে।

আর যদি তোমরা হাত গুটিয়ে বসে থাক, তা হলে এমন মানুষ যতই ইবাদত করুক-না কেন, আমার কাছে এরা গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। আমি এদেরকে আমার কাছে ভিড়তে দেব না। এরা আমার প্রিয় হতে পারবে না।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হালাল উপার্জন

দেখুন-না, যত নবী-রাসূল দুনিয়াতে আগমন করেছেন, আল্লাহপাক তাঁদের প্রত্যেকের দ্বারা হালাল জীবিকা অন্বেষণের কাজ করিয়েছেন। সকল নবী-রাসূল হালাল জীবিকা অন্বেষণে কাজ করেছেন। কেউ মজুরি খেটেছেন। কেউ কামারের কাজ করেছেন। কোনো-কোনো নবী ছাগল চরিয়েছেন। খোদ আমাদের বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার পাহাড়ে-পর্বতে মজুরির ভিত্তিতে ছাগল চরিয়েছেন। তিনি বলতেন, আমার মনে আছে, আমি আজইয়াদ পাহাড়ে মানুষের ছাগল চরাতাম।[১২২]

আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাগল চরিয়েছেন। তিনি মজুরি খেটেছেন। তিনি ব্যবসা করেছেন। ব্যবসায়িক কাজে তিনি দুবার শাম সফরে গিয়েছিলেন। হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর পণ্য নিয়ে তিনি শাম গিয়েছিলেন। তিনি কৃষিকাজ করেছেন। মদীনা থেকে খানিক দূরে জুরূফ নামক একটি অঞ্চল ছিল। নবীজি সেখানে কৃষিকাজ করেছেন।

তার অর্থ হলো, হালাল জীবিকা উপার্জনের যে কটি পন্থা আছে, তার সব কটিই আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করে দেখিয়েছেন। এর

---

১২২. সহীহ বুখারী ॥ হাদীস নং-২১০২; সহীহ মুসলিম ॥ হাদীস নং-৩৮২২; সুনানে ইবনে মাজা ॥ হাদীস নং-২১৪০; মুসনাদে আহমাদ ॥ হাদীস নং-১১৪৮২

সব কটিই তাঁর জীবন ও সুন্নতের অংশ। কাজেই কেউ যদি চাকুরি করেন, তিনি এই নিয়ত করবেন যে, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ করছি। কেউ যদি কৃষিকাজ করেন, তিনি নিয়ত করবেন, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ করছি। কেউ যদি ব্যবসা করেন, তিনি এই নিয়ত করবেন যে, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ করছি। তখন এই সবগুলো কাজই দ্বীনের অংশ হয়ে যাবে।

মুমিনের দুনিয়াও দ্বীন

অনেকে মনে করে, দ্বীন এক জিনিস আর দুনিয়া আরেক জিনিস। আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করে দিয়েছে, এই বুঝ সঠিক নয়। বাস্তবতা হলো, মুমিনের দুনিয়াও দ্বীন। এই যে জীবিকা উপার্জনের চিন্তা ও প্রচেষ্টাকে দুনিয়া মনে করা হচ্ছে, মুমিনের জন্য এটিও দ্বীন। এটিও মূলত দীনেরই অংশ। শর্ত হলো, কাজটি সঠিক পদ্ধতিতে করতে হবে এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষার অনুসরণ করে করতে হবে।

মোটকথা, এই হাদীস দ্বারা আমরা একটি বিষয় এই জানতে পারলাম যে, হালাল জীবিকার অন্বেষণও দ্বীনের একটি অংশ। এই কথাটিকে যদি আমরা অন্তরে বসিয়ে নিতে পারি, তা হলে বহুসংখ্যক ভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝির পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

সূফিয়ায়ে কেরামের তাওয়াক্কুল

সূফিয়ায়ে কেরামের কারও-কারও সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, তাঁরা কোনো পেশা অবলম্বন করেননি এবং হালাল জীবিকার অন্বেষণে কোনো কাজ করেননি। বরং তাঁরা তাওয়াক্কুল করে এভাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন যে, ব্যস, তাঁরা আপন জায়গায় বসে রয়েছেন আর আল্লাহপাক গায়েব থেকে যা-কিছু প্রেরণ করেছেন, তাঁরা তারই উপর শোকর করেছেন এবং তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। আর আল্লাহপাক কিছু না পাঠালে সবর করেছেন।

এ ব্যাপারে আমাদেরকে যা বুঝতে হবে, তা হলো, তাঁদের দু-রকম অবস্থা ছিল। হয়ত তাঁরা এমন ছিলেন যে, তাঁরা আবেগ দ্বারা পরিচালিত ছিলেন। আল্লাহর প্রেমে তাঁরা এতই মাতোয়ারা ছিলেন যে, সাধারণ হুঁশ-জ্ঞান তাঁদের ছিল না। আর এমনটি হলে তখন মানুষের উপর শরীয়তের বিধান কার্যকর থাকে না। আর সেজন্যই তাঁরা এই কর্মনীতি অবলম্বন করেছিলেন। তার মানে, এটি ছিল একান্তই তাঁদের ব্যক্তিগত বিষয় এবং শরয়ী আইনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

আরেক হতে পারে, এসব সূফিয়ায়ে কিরামের তাওয়াক্কুল এতটাই পূর্ণাঙ্গ ও পরিপক্ক ছিল যে, তাঁরা এই মর্মে সন্তুষ্ট ছিলেন যে, যদি মাসের-পর-মাসও না খেয়ে থাকতে হয়, তবু আমাদের কোনো ভাবনা নেই। আমাদেরকে না কারও সামনে হাত পাততে হবে, না কারও কাছে ধরনা দিতে হবে, না কোনো অভিযোগ করতে হবে। এই সূফীগণ অত্যন্ত শক্ত প্রাণের মানুষ ছিলেন। অনেক উঁচুস্তরের অলী ছিলেন। তাঁরা সব সময় আল্লাহর ইবাদত ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। আর সেজন্যই অনাহারকে তাঁরা কোনো বিষয়ই মনে করতেন না। আবার তাঁদের সঙ্গে অন্য কারও হকেরও কোনো সম্পর্ক ছিল না। না তাদের কোনো স্ত্রী-সন্তান ছিল, না ঘর-সংসার ছিল। কাজেই তাঁদের এই অবস্থাটি ছিল একটি ব্যতিক্রম অবস্থা। এর সঙ্গে না শরীয়তের বিধানের কোনো সম্পর্ক ছিল, না তাঁরা আমাদের জন্য অনুসরণীয় কোনো ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের মতো দুর্বল লোকদের জন্য তাঁরা অনুসরণীয় নন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য যে আদর্শ রেখে গেছেন, তা হলো, হালাল জীবিকার অন্বেষণ আর সব ফরজ আমলের পর দ্বিতীয় স্তরের একটি ফরজ কাজ।

অন্বেষণ 'হালাল জীবিকা'র হতে হবে

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, জীবিকার অন্বেষণ দ্বীনিকর্তব্য তখন হবে, যখন অন্বেষণ হালালের হবে। রুটি, কাপড়, অর্থ সত্তাগতভাবে লক্ষ্য নয়। এই নিয়ত হতে পারবে না যে, যেকোনো উপায় অবলম্বন করে হোক আমাকে অর্থ উপার্জন করতে হবে। চাই তা বৈধ পন্থায় হোক বা অবৈধ পন্থায়। হালাল তরিকায় হোক বা হারাম তরিকায়। তা-ই যদি হয়, তা হলে এই অন্বেষণ 'হালালের অন্বেষণ' হলো না, হাদীসে যার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহর রাসূল যাকে 'ফরীজা' সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, মুমিনের এই আমল তখনই দ্বীন হয়, যখন সে তাকে ইসলামের শিক্ষা অনুপাতে অর্জন করে। কিন্তু যদি সে হারাম-হালালে পার্থক্য মুছে ফেলে এবং মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনা থেকে জায়েয-না-জায়েযের ভাবনা সরিয়ে দেয়, তা হলে একজন কাফের আর একজন মুসলমানের জীবিকা অন্বেষণের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না। কাজ তো তখনই হবে, যখন সে জীবিকার অন্বেষণ করবে বটে; কিন্তু তা করবে আল্লাহপাকের ঠিক করে দেওয়া সীমানার মধ্যে অবস্থান করে। তাকে এক-একটি পয়সা সম্পর্কেও ভাবনা থাকতে হবে যে, এই অর্থ হালাল পথে আসছে, নাকি হারাম পন্থায় আসছে।

যদি তা আল্লাহপাকের অসন্তুষ্টিমূলক পন্থায় এসে থাকে, তা হলে তাকে জাহান্নামের অঙ্গার মনে করে ছুড়ে ফেলবে। চাই তা যত বড় অংকই হোক-না কেন। যত বড় সম্পদই হোক-না কেন। যদি তা হারাম পন্থায় এসে থাকে, তা

হলে তাকে লাথি মেরে সরিয়ে দেবে এবং কোনো মূল্যেই তাকে জীবনের অংশ হতে দেবে না।

শ্রমের সব উপার্জন হালাল হয় না

অনেকে উপার্জনের এমন পন্থা অবলম্বন করে রেখেছে, যা হারাম এবং শরীয়ত যার অনুমতি প্রদান করেনি। যেমন– সুদের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করে রাখল। এখন যদি কেউ তাদের বলে, এটি তো না-জায়েয ও হারাম; এই পন্থা আপনার বর্জন করা দরকার, তখন তারা উত্তর দেয়, আমরা তো আমাদের শ্রমেরই ফসল খাচ্ছি। কষ্ট করছি, সময় দিচ্ছি। তারপরও যদি এই উপার্জন হারাম হয়, তা হলে আমাদের কী করার আছে।

ভালো করে বুঝে নিন, অর্থ উপার্জনে সব শ্রমই বৈধ নয়। সেই শ্রমই বৈধ, যা আল্লাহপাকের শেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী হয়। কারও শ্রম যদি সেই পদ্ধতির পরিপন্থী হয়, তা হলে মানুষ হাজারো শ্রম দিক, কষ্ট করুক, এই উপার্জন হালাল হবে না; বরং হারাম হবে। একজন বেশ্যা নারীও তো শ্রম খাটে। সেও তো বলতে পারে, আমি শ্রমের বিনিময়ে উপার্জন করি।

কাজেই আমার উপার্জন বৈধ হওয়া দরকার। অনুরূপভাবে উপার্জনের যত উপায় আছে, সবাই বলতে পারে, আমি তো শ্রম দিচ্ছি, কষ্ট করছি; কাজেই আমার উপার্জন হালাল। কিন্তু ইসলামে এর কোনোই সুযোগ নেই। শ্রম খাটলেই উপার্জন হালাল হয় না।

এই উপার্জন হালাল, না হারাম?

কাজেই যখনই উপার্জনের কোনো পন্থা সামনে আসবে, তখন আগে দেখবে, এই পন্থা জায়েয, না-কি না-জায়েয। শরীয়ত একে হালাল করেছে, না-কি হারাম। যদি দেখা যায়, শরীয়ত এই পন্থাটিকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, তা হলে যতই লাভজনক হোক-না কেন, তাকে বর্জন করতে হবে এবং সেই পন্থাটি অবলম্বন করতে হবে, যাকে আল্লাহপাক হালাল সাব্যস্ত করেছেন, চাই তাতে মুনাফা কমই হোক-না কেন।

ব্যাংক কর্মচারীরা কী করবেন?

যেমন– অনেকে ব্যাংকে চাকুরি করেন। প্রচলিত ব্যাংকগুলোর বহু লেনদেন সুদভিত্তিক হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় যারা ওখানে চাকুরি করেন, তারা যদি সুদি কারবারের সঙ্গে জড়িত থাকেন, তা হলে তাদের এই চাকুরি হারাম ও না-জায়েয বলে বিবেচিত হবে।

আলেমগণ বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি ব্যাংকের এমন চাকুরিতে রত থাকেন আর পরে আল্লাহপাক তাকে হিদায়াত দান করেন এবং তিনি ব্যাংকের চাকুরি পরিত্যাগ করার চিন্তা করেন, তা হলে তার উচিত কোনো জায়েয ও হালাল পেশা অন্বেষণ করা। আর যখনই পেয়ে যাবেন, তৎক্ষণাৎ ব্যাংকের চাকুরি ছেড়ে দেবেন। কিন্তু জায়েয পেশার অন্বেষণ দায়সারা গোছের করলে চলবে না। একজন বেকার মানুষ যেভাবে কর্মের সন্ধানে জুতা ক্ষয় করে ফেরেন, তাকেও ঠিক সেভাবেই হন্যে হয়ে অনুসন্ধান করে ফিরতে হবে। ব্যাংকের চাকুরি ঠিক রেখে বসে-বসে ভাবলে চলবে না যে, ভালো একটা চাকুরি পেলে এটি ছেড়ে দেব।

হালাল রুজির বরকত

আল্লাহপাক হালাল রুজির মধ্যে যে বরকত রেখেছেন, তা হারামের মাঝে রাখেননি। হারাম মোটা অংকের অর্থ দ্বারাও সেই উপকারিতা অর্জিত হয় না, যা হালালের সামান্য অর্থ দ্বারা হয়। আল্লাহর রাসূল প্রতিবার অজুর পর মাঝে দু'আটি পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ

'হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহগুলো মাফ করে দিন। আমার ঘরে প্রশস্ততা দান করুন। আর আমার রুজিতে আমাকে বরকত দান করুন।'[১২৩]

আজকাল মানুষ বরকতের মূল্য জানে না। মানুষ জানে শুধু অর্থের গণনা। এই ভেবে মানুষ খুশি হয় যে, আমার ব্যাংক ব্যালেন্স অনেক বড় হয়ে গেছে। আমি বিপুল অর্থের মালিক হয়ে গেছি। কিন্তু এই অর্থ, এই বিত্ত কতটুকু কাজে লাগল, এর দ্বারা কী পরিমাণ উপকার পেলাম, কতটুকু শান্তি পেলাম, তার কোনো হিসাব মানুষ করে না। লাখপতি বা কোটিপতি হয়েছি ভেবেই খুশী। কিন্তু উপকার কী হলো, তার কোনো খবর নেই। বাস্তবতা হলো, অর্থ যদিও কম হয় আর আল্লাহপাক তাতে শান্তি দান করেন, তা হলে এরই নাম 'বরকত'।

বরকত কেনা যায় না

এই বরকত এমন একটি বস্তু, যাকে বাজার থেকে ক্রয় করে ঘরে তোলা যায় না। লাখ টাকা, কোটি টাকা ব্যয় করেও অর্জন করা যায় না। বরং এই সম্পদ আল্লাহপাকের দান, যা তাঁর দ্বীনের অনুসরণের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। আল্লাহপাক যাকে দান করেন, সে-ই এই বরকতলাভে ধন্য হয়। আল্লাহ না দিলে কেউ বরকত পায় না। আর এই বরকত আসে হালাল জীবিকার মাধ্যমে। হারাম সম্পদে বরকত আসে না। তার পরিমাণ যত বেশি-ই হোক-না কেন।

১২৩. সুনানে তিরমিযী · হাদীস নং-৩৪২২; মুসনাদে আহমাদ ‖ হাদীস নং-১৬০০৪

সেজন্য যা কিছু উপার্জন করবেন, তা যেন হালাল হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। মনে এই ভাবনা থাকতে হবে, আমি যা কিছু পেটে দেব, আমার স্ত্রী-সন্তানকে যা কিছু খাওয়াব সবই যেন হালাল হয়। আমার ও আমার অধীন কারুর পেটেই যেন একটাও হারাম দানা না ঢোকে। উপার্জনের একটা কড়িও যেন হারাম না হয়। সব উপার্জন যেন আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি মোতাবেক হয়।

প্রতিজন মানুষের অন্তরে এই ভাবনা থাকা দরকার।

বেতনের এই অংশটি হারাম হয়ে গেল

কিছু হারাম এমন আছে যে, সবাই জানে, এই সম্পদ হারাম। যেমন– সুদ হারাম। ঘুষ হারাম। কিন্তু আমাদের জীবনে এগুলো ছাড়াও আরও অনেক এমন আমদানি ঢুকে পড়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে আমাদের এই অনুভূতি-ই নেই যে, এগুলোও হারাম। যেমন– আপনি কোথাও জায়েয ও শরীয়তসমর্থিত একটি চাকুরি নিয়েছেন। কিন্তু চাকুরির জন্য যে সময়টুকু নির্ধারণ করা হয়েছে, আপনি তাতে ফাঁকি দেন। কাজ যতটুকু করার কথা ছিল, আপনি ততটুকু করেন না। আপনার প্রতিষ্ঠানকে আপনি পুরো সময় দেন না। বরং গল্প করে, আড্ডা মেরে সময় কাটিয়ে দেন। যেমন– এক ব্যক্তির ডিউটি আট ঘণ্টা। কিন্তু তিনি কোনোভাবে একটি ঘণ্টা অন্যকাজে ব্যয় করলেন। প্রতিষ্ঠানকে দিলেন সাত ঘণ্টা। তার ফল এই দাঁড়াল যে, মাসশেষে আপনি যে বেতন পাবেন, তার এক অষ্টমাংশ হারাম হয়ে গেল। আপনার উপার্জনের এই অংশটি হালাল উপার্জন হলো না। কিন্তু আমাদের এই অনুভূতিটুকু নেই যে,এই হারাম সম্পদ আমাদের আয়ের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

থানাভবন মাদরাসার উস্তাযগণের বেতন কর্তন করানো

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর খানকায় যে মাদরাসাটি ছিল, তার প্রতিজন উস্তায ও কর্মচারীর কাছে একটি করে ডায়েরি থাকত। তাতে তারা কে কতটুকু সময় মাদরাসার কাজ ছাড়া অন্য কাজে ব্যয় করেছেন, তার হিসাব নোট করে রাখতেন।

যেমন– একজন উস্তাযের ছয় ঘণ্ট পড়ানোর কথা। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তাঁর কাছে একজন মেহমান এল। তিনি তাকে কিছু সময় দিলেন। এই সময়টুকু তিনি ডায়েরিতে লিখে রাখতেন যে, আমি অমুক দিন এতটুকু সময় আমার ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করেছি। পুরো মাস তাঁরা এই নোট লিখতেন। পরে যখন বেতন নেওয়ার সময় আসত, তখন তাঁরা অফিসকে আবেদন লিখতেন, এমাসে আমার এতটুকু সময় ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় হয়েছে। কাজেই আমার বেতন থেকে এই পরিমাণ অর্থ কেটে রাখা হোক।

এভাবে প্রতিজন উস্তায ও প্রতিজন কর্মচারী আবেদন দিয়ে বেতন কর্তন করাতেন। তাঁরা মনে করতেন, আমি মাদরাসার দায়িত্ব পালনকালে যে-সময়টুকু নিজের কাজে ব্যয় করেছি, সেটুকু সময়ের মালিক আমি নই। এই সময়টুকু আমি মাদরাসার কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। কাজেই মাদরাসা থেকে এই সময়টুকুর আমি বেতন নিতে পারি না। এই সময়টুকুর বেতন আমার জন্য হারাম হয়ে গেছে। কিন্তু আজকাল আমাদের এদিকে কোনোই ভ্রূক্ষেপ নেই। আমরা শুধু সুদ খাওয়া আর ঘুষ খাওয়াকে হারাম মনে করি। কিন্তু আরও নানাভাবে যে আমাদের পেটে হারাম ঢুকছে, সেই খবর আমরা রাখি না।

রেলভ্রমণে অর্থ বাঁচানো

কিংবা আপনি রেলে ভ্রমণ করছেন। রেলের যে শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করেছেন, তার চেয়ে উন্নত শ্রেণীতে ভ্রমণ করলেন। তো এখানে উভয় শ্রেণীর ভাড়ায় যে পার্থক্য, আপনি অতটুকু অর্থ সাশ্রয় করলেন। এই অর্থ আপনার জন্য হারাম হয়ে গেল আর এই হারাম অর্থ আপনার হালাল আয়ের সঙ্গে মিশে গেল। কিন্তু আপনি বুঝলেনই না যে, এই হারাম সম্পদ আপনার হালাল সম্পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে।

অতিরিক্ত মালের ভাড়া

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর শিষ্য-মুরীদদের সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তারা যখন রেলে ভ্রমণ করতেন, তখন তাদের মালামালের অবশ্যই ওজন করিয়ে নিতেন। একজন যাত্রীর যে পরিমাণ মাল বিনা ভাড়ায় বহন করা বৈধ ছিল, তার অতিরিক্ত মালের ভাড়া তারা রেলওয়েকে পরিশোধ করে দিতেন। তারপর ভ্রমণ করতেন।

এই কাজটি সম্পাদন না করে তারা রেলে ভ্রমণ করার কথা কল্পনা-ই করতেন না।

হযরত থানভী রহ.-এর নিজের একটি ঘটনা

একবার হযরত থানভী রহ. নিজে রেলে ভ্রমণ করছিলেন। সেখানে তাঁর এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল। তিনি রেলওয়ের যে অফিসঘরে মালামাল ওজন করা হয়, সেখানে গেলেন। ঘটনাক্রমে রেলওয়ের এক নিরাপত্তাকর্মী সেখানে দাঁড়ানো ছিল, যে কিনা হযরত রহ.কে চিনত। সে জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আপনি এখানে কেন?

হযরত রহ. বললেন, এই মালগুলো ওজন করাতে এসেছি। যদি বেশি হয়, তা হলে তো ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

গার্ড বলল, এই কষ্ট আপনাকে করতে হবে না। আপনি মাল ওজন করাবার চক্করে পড়তে এলেন কেন? পথে আপনাকে কেউ ধরবে না। মাল যদি বেশিও হয়, তবু আপনাকে কেউ জিজ্ঞাসা করবে না।

হযরত হাকীমুল উম্মত রহ. গার্ডকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমার সঙ্গে কোন পর্যন্ত যাবেন?

গার্ড একটি স্টেশনের নাম উল্লেখ করে বলল, অমুক স্টেশন পর্যন্ত।

হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কী হবে?

গার্ড বলল, তারপর আমার স্থলে যেলোক দায়িত্বে আসবে, আমি তাকে বলে দেব, যেন সে আপনার মালের প্রতি খেয়াল রাখে।

হযরত এবার জিজ্ঞাসা করলেন, সেই গার্ড কোন পর্যন্ত যাবে?

গার্ড বলল, সে আপনার শেষ গন্তব্য পর্যন্ত যাবে। আপনার আর কোনো সমস্যা থাকবে না।

হযরত রহ. বললেন, আমার তো আরও সামনে যেতে হবে।

এবার গার্ড খানিক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তার সামনে আর আপনি কোথায় যাবেন? শেষ স্টেশনে পর আর কোথায় যাবেন আপনি?

হযরত রহ. বললেন, আমাকে আরও সামনে আল্লাহর কাছে যেতে হবে। সেখানে কোন গার্ড আমার সঙ্গে যাবে, যে ওখানে আমাকে রক্ষা করবে?

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এই প্রশ্নের কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন :

'এই রেল তোমার মালিকানা নয়। এর উপর তোমার কোনোই অধিকার নেই। কর্তৃপক্ষ তোমাকে এই অধিকার দেয়নি যে, তুমি কারও অতিরিক্ত মালের ভাড়া না দিয়ে ছেড়ে দেবে। কাজেই আমি তোমার কারণে দুনিয়ার পাকড়াও থেকে রক্ষা পাব ঠিক; কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় আমি যে কটি অর্থ বাঁচাব, সেগুলো আমার জন্য হারাম হবে। আর হারাম অর্থের জন্য আল্লাহর কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। তখন আমাকে কে রক্ষা করবে? কে তখন আমার পক্ষ থেকে উত্তর দেবে?'

হযরত রহ.-এর এই বক্তব্য শোনার পর লোকটির চোখ খুলে গেল। এবার সে হযরতের মালগুলো ওজন করিয়ে অতিরিক্ত মালের ভাড়া নিয়ে নিল। হযরত মালের উপযুক্ত ভাড়া পরিশোধ করেই তবে রেলে উঠলেন।

এই হারাম অর্থ হালাল জীবিকায় যুক্ত হয়ে গেল

কাজেই কেউ যদি রেল কিংবা বিমানে ভ্রমণ করার সময় অনুমতির চেয়ে বেশি মাল বিনা ভাড়ায় বহন করে, তা হলে এর ফলে যে অর্থ সাশ্রয় হলো, তা

হারাম হলো। আর এই হারাম অর্থ হালাল অর্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। তার ফলাফল এই দাঁড়াল যে, যে অর্থ নিরেট হালাল ছিল, তাতেও হারামের সংমিশ্রণ ঘটে গেল!

এই বরকতহীনতা আসবে না কেন?

আজকাল বরকতহীনতার কারণে মানুষ চরম অস্থিরতা ও অশান্তির মধ্যে জীবন অতিবাহতি করছে। সবাই কাঁদছে। লাখপতিও কাঁদছে, কোটিপতিও কাঁদছে যে, ব্যয় মেকাপ হচ্ছে না। সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। এমনটি কেন হচ্ছে? হচ্ছে বরকতহীনতার কারণে। সম্পদ আছে; কিন্তু বরকত নেই। আর বরকতহীনতা আসছে কেন? তা এইজন্য আসছে যে, আমাদের জীবন থেকে হারাম-হালালের পার্থক্য মুছে গেছে। আমাদের ভাবনা থেকে জায়েয-না-জায়েযের চিন্তা দূর হয়ে গেছে। ব্যস, নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের ব্যাপারে স্থির করে নিয়েছি যে, এগুলো হারাম; কাজেই আমাদেরকে এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু তারও বাইরে যে আরও বহু হারাম আমাদের হালাল উপার্জনের সঙ্গে মিশে পেটে যাচ্ছে, তার কোনোই ভাবনা আমাদের নেই।

টেলিফোনোর বিল ও বিদ্যুৎ চুরি

কিংবা আপনি টেলিফোন বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে নিলেন। তাদের সঙ্গে চুক্তি করে নিলেন, আপনি বিদেশে যত কল করবেন, তার বিপরীতে আপনার নামে কোনো বিল উঠবে না। এটাও এক ধরনের চুরি। এই চুরির মাধ্যমে আপনি যে পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় করবেন, তা হারাম হবে। আর এই হারাম অর্থ আপনার হালাল সম্পদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

কিংবা আপনি দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী বা কর্মকর্তাদের সঙ্গে চুক্তি করে বিদ্যুত বিল কমিয়ে নিলেন। এখানেও আপনার যে পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হবে, তা হারাম হবে আর তা আপনার হালাল অর্থের সঙ্গে মিশে পেটে যাবে।

কাজেই না জানি এভাবে কত বিভাগ এমন আছে, যেগুলোতে আমরা নিজেদের জন্য হারামের দরজা খুলে রেখেছি এবং হারাম সম্পদ আমাদের হালাল সম্পদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আর তারই ফলে আমরা বরকতহীনতার আযাবে নিপতিত হয়ে আছি।

হারাম-হালালের ভাবনা তৈরি করুন

কাজেই প্রতিটি কাজ করার সময় দেখতে হবে, আমি যে কাজটি করছি, তা বৈধ, নাকি অবৈধ। উপার্জনের জন্য আমি যে পন্থা অবলম্বন করেছি, তা হালাল,

নাকি হারাম। মানুষ যদি এভাবে হিসাব করে চলে, যেন কোনো অবৈধ অর্থ পকেটে ঢুকতে না পারে, তা হলে বিশ্বাস করুন, আপনি যদি জীবনে এক রাকাত নফল নামাযও না পড়েন, একটি দিনের জন্যও যিকির-তাসবীহ না করেন আর এভাবে হালাল খেতে-খেতে কবরে যান, তা হলে ইনশাআল্লাহ আপনি সোজা জান্নাতে চলে যেতে পারবেন।

পক্ষান্তরে যদি আপনি হারাম-হালালের কোনো ভেদাভেদ না করেন,; কিন্তু খুব বেশি-বেশি নফল আদায় করেন – তাহাজ্জুদ, ইশরাক, আওয়াবীন একদিনেরও জন্য বাদ না দেন, সব সময় যিকির-তাসবীহ চালাতে থাকেন, তবু এই ইবাদত আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না।

আল্লাহপাক দয়া করে আমাদেরকে এবং প্রতিজন মুসলমানকে হেফাযত করুন। আমীন।

এখানে মানুষ তৈরি করা হয়

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলতেন, মানুষ খানকাগুলোতে যিকির-শোগল শিখতে যায়। যদি যিকির-শোগলই শিখতে হয়, তা হলে খানকার অভাব নেই। অনেক খানকায় এসব শেখানো হয়। আপনারা তার কোনো একটিতে চলে যান। কিন্তু আমার এখানে মানুষ তৈরি করার এবং শরীয়তের বিধিবিধান পালন করানোর চেষ্টা করা হয়।

তার ফলাফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, রেলস্টেশনে যদি দাড়িওয়ালা কোনো ব্যক্তি মাল ওজন করানোর জন্য বুকিং অফিসে গিয়ে হাজির হতো, তা হলে অফিসের লোকেরা দেখেই চিনতে পারত, ইনি থানাভবনের সাথে সংশ্লিষ্ট লোক। আর সেজন্য তাকে জিজ্ঞেস করা হতো, আপনি কি থানাভবন যাচ্ছেন?

এই চরিত্রের কারণেই হযরত থানভী রহ. বলতেন, আমি যদি আমার কোনো ভক্ত-মুরীদ সম্পর্কে জানতে পারি, তার আমল ছুটে গেছে, তা হলে আমার তেমন কোনো দুঃখ আসে না। কিন্তু যদি কারও সম্পর্কে জানতে পারি, সে হালাল ও হারামকে এক করে রেখেছে এবং তার লেনদেনে হারাম-হালালের ভেদাভেদ নেই, তার হালাল-হারামের কোনো ভাবনা নেই, তা হলে আমি খুব কষ্ট পাই ও তার প্রতি আমার অনাস্থা তৈরি হয়ে যায়।

হযরত থানভী রহ.-এর এক খলীফার একটি শিক্ষামূলক ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর বড়মাপের একজন খলীফা ছিলেন। হযরত তাঁকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে খেলাফত প্রদান

করেছিলেন। একবার তিনি সফর করে হযরতের কাছে এলেন। সঙ্গে একটি ছেলেও ছিল। তো তিনি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং সালাম ও কুশলবিনিময় হলো।

হযরত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

তিনি একটি জায়গার নাম উল্লেখ করে বললেন, অমুক জায়গা থেকে।

হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, রেলে করে এসেছেন?

বললেন, হ্যাঁ, রেলে করে এসেছি।

হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সঙ্গে এই যে ছেলেটি আছে, এর টিকিট পুরো নিয়েছেন, নাকি আধা নিয়েছেন?

অনুমান করুন, খানকায় বসে পীর ছাহেব মুরীদকে জিজ্ঞেস করছেন, টিকিট পুরো নিয়েছেন, নাকি আধা নিয়েছেন! এই খানকা ছাড়া আর কোনো খানকায় এ জাতীয় প্রশ্নের তো কল্পনা-ই করা যায় না। ওসব জায়গায় খোঁজ নেওয়া হয়, আমল যা-যা দিয়েছিলাম, সব ঠিকমতো আদায় করেছ কি-না? তাহাজ্জুদ ঠিকমতো পড়েছ কি-না? ইশ্‌রাক পড়েছ কি-না? আওয়াবীন পড়েছ কি-না? কিন্তু এখানে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, বাচ্চার টিকিট পুরো নিয়েছেন, নাকি আধা নিয়েছেন?

তিনি উত্তর দিলেন, আধা নিয়েছি হযরত!

হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, এর বয়স কত?

তিনি উত্তর দিলেন, বয়স তো তেরো বছর; কিন্তু দেখতে বারো বছরের বলে মনে হয়। সেজন্যই টিকিট আধা নিয়েছি।

এই উত্তর শুনে হয়রত মনে খুব ব্যাথা পেলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে তার খেলাফত প্রত্যাহার করে নিলেন। বললেন, আমি ভুল করে ফেলেছি; তুমি আমার খেলাফত পাওয়ার যোগ্য নও। কারণ, তোমার মাঝে হারাম-হালালের ভেদাভেদ নেই। তোমার মাঝে হারাম-হালালের ভাবনা নেই। ছেলের বয়স যখন তেরো বছর হয়ে গেছে, তখন তোমাকে তার টিকিট ফুলই নেওয়া আবশ্যক ছিল। তোমার জন্য ওয়াজিব ছিল, এই ছেলের টিকিট ফুল নেওয়া। কাজেই এর জন্য হাফ টিকিট নিয়ে তুমি যে কটি টাকা সাশ্রয় করেছ, সেগুলো হারাম হয়েছে। আর যে ব্যক্তির হারাম-হালালের ভাবনা নেই, সে আমার খলীফা হওয়ার যোগ্য নয়।

হযরত রহ. তার থেকে খেলাফত প্রত্যাহার করে নিলেন।

কোনো ব্যক্তি যদি হযরত থানভী রহ.-এর দরবারে এসে বলত, হযরত! আমার মামুলাত বাদ পড়ে গেছে, তখন হযরত বলতেন, তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং আবার শুরু করে দাও। এবার যেন আর না ছোটে সেই

সাহস নিয়ে কাজ করো। মনে দৃঢ় প্রত্যয় নাও যে, ভবিষ্যতে আর মামুলাত বাদ যেতে দেব না। মামুলাত ছুটে যাওয়ার দায়ে তিনি জীবনে কারও খেলাফত প্রত্যাহার করে নেননি। কিন্তু হালাল-হারামের ভেদাভেদ না থাকার লক্ষণ দেখার পর খেলাফত প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘটনা আছে। তার কারণ হলো, যখন হালাল-হারামের ভেদাভেদ না থাকে, তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না। তাই তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

'হালাল জীবিকার অন্বেষণ প্রাথমিক স্তরের ফরজগুলোর পর একটি ফরজ।'

হারাম সম্পদ হালাল সম্পদকেও ধ্বংস করে দেয়

কাজেই আমাদের প্রত্যেককে নিজ সম্পদে এই হিসাব করে দেখতে হবে, আমার পকেটে যে অর্থ আসছে, তাতে হারামের সংমিশ্রণ আছে কি-না। হালালের সঙ্গে হারামের সংমিশ্রণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি আপনাদের বুঝবার জন্য উপস্থাপন করেছি। এর বাইরে আরও বহু পন্থায় আমাদের অজ্ঞতার কারণে হারাম সম্পদ এসে হালালের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আল্লাহর অলীগণ বলেছেন, যখন কোনো হালাল সম্পদের সঙ্গে হারাম সম্পদ মিশে যায়, তখন হারাম হালালকেও ধ্বংস করে দেয়। অর্থাৎ– হারামের সংমিশ্রণের ফলে হালালেরও বরকত, সুখ, শান্তি তিরোহিত হয়ে যায়।

তাই আমাদেরকে চিন্তা করে চলতে হবে। প্রতিজন মানুষকে নিজের সম্পদের হিসাব নিতে হবে। আয়-উপার্জন হালাল হচ্ছে, না হারাম, আবার হালালের সঙ্গে কিছু হারামেরও সংমিশ্রণ ঘটে যাচ্ছে কি-না এসব খবর আমাদেরকে রাখতে হবে।

আল্লাহপাক আমাদের প্রত্যেককে তাওফীক দান করুন। আমীন।

জীবিকার অন্বেষণ জীবনের লক্ষ্য নয়

তৃতীয় যে বিষয়টি জানা গেল, তা হলো, এই হাদীস যেখানে একদিকে জীবিকা অন্বেষণের গুরুত্ব ব্যক্ত করেছে যে, হালাল জীবিকার অন্বেষণ দ্বীনের বাইরের কোনো বিষয় নয়। বরং এটিও দ্বীনের একটি অংশ, সেখানে আলোচ্য হাদীস আমাদেরকে জীবিকা অন্বেষণের স্তরও বলে দিয়েছে যে, এর স্তর কোথায় এবং এর গুরুত্ব কতখানি। আজকের দুনিয়া জীবনোপকরণকে, অর্থ-সম্পদকে, অর্থ উপার্জন করাকে জীবনের মূল লক্ষ্য সাব্যস্ত করে রেখেছে। আজ আমাদের সমস্ত দৌড়ঝাঁপ, সমস্ত তৎপরতা এরই চার পাশে ঘুরপাক খাচ্ছে যে, কীভাবে অর্থ উপার্জন করব, কীভাবে বিত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করব, কীভাবে অর্থনৈতিক

উন্নতি সাধন করব। আর তাকেই আমরা আমাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছি।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদীসে বলে দিয়েছেন, হালাল জীবিকার অন্বেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বটে; কিন্তু তার অবস্থান দ্বীনের অন্যান্য কর্তব্যের পরে। এটি মানবজীবনের মূল লক্ষ্য নয়। এটি একটি প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজনের অধীনে মানুষকে শুধু জীবিকা উপার্জনের অনুমতি-ই প্রদান করা হয়নি, বরং তার জন্য উৎসাহ এবং তাকিদও প্রদান করা হয়েছে যে, তোমরা হালাল জীবিকার অন্বেষণ করো। কিন্তু একথাটি মনে রেখে করতে হবে যে, এই জীবিকার অন্বেষণ তোমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য নয়। বরং জীবনের মূল উদ্দেশ্য অন্য কিছু। তা হলো আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা, আল্লাহর দাসত্ব করা ও তাঁর ইবাদত করা। অর্থনীতির স্তর আসে এর পরে।

জীবিকার অন্বেষণে অন্যান্য ফরজ ত্যাগ করা জায়েয নয়

কাজেই যেখানে অর্থনীতি ও আল্লাহকর্তৃক আরোপিত বিধিবিধানে সংঘাত তৈরি হবে, সেখানে আল্লাহর বিধানকে প্রাধান্য দিতে হবে। অনেকে এ ক্ষেত্রে এসে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়িতে জড়িয়ে পড়ে। শুনেছে, জীবিকার অন্বেষণও দ্বীনের একটি অংশ; ব্যস, বিষয়টিকে এত অধিক গুরুত্ব দিয়ে ফেলল যে, উপার্জন করতে গিয়ে নামায ছুটে যাচ্ছে; তার কোনো পরোয়া নেই। রোযা ছুটে যাচ্ছে; তার কোনো পরোয়া নেই। হালাল-হারাম একাকার হয়ে যাচ্ছে; তারও কোনো পরোয়া নেই। এমন লোকদের যদি বলা হয়, ভাই নামায পড়ুন, তা হলে তারা উত্তর দেয়, আরে ভাই! আমি এই যে ব্যবসা করছি, এটিও দ্বীনের অংশ। আমাদের ধর্মে দ্বীন আর দুনিয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কাজেই আমি যা করছি, তাও দ্বীনেরই একটি অংশ।

এক ডাক্তারের যুক্তি

কিছু দিন আগে এক মহিলা আমাকে বলল, তার স্বামী ডাক্তার। তিনি যে-সময়টা চেম্বারে অতিবাহিত করেন, সেই সময়ে নামায পড়েন না। চেম্বার বন্ধ করে বাসায় ফিরে এসে তিন ওয়াক্তের নামায একসঙ্গে আদায় করেন। আমি তাকে বলি, আপনি নামাযগুলো কাজা করে ফেলছেন! এটা তো ঠিক হচ্ছে না এবং এই নিয়ম তো ভালো নয়। আপনি সময়মতো নামায আদায় করুন। তখন উত্তরে তিনি বলেন, ইসলাম জনসেবা করতে বলেছে। আমি চেম্বারে বসে মানুষকে যে চিকিৎসা প্রদান করি, এটিও জনসেবা। আর এটিও দ্বীনের একটি অংশ। কাজেই আমি যদি জনসেবার স্বার্থে নামায পরিত্যাগ করি, তাতে কোনো সমস্যা নেই।

তো দেখুন, এই ব্যক্তি হালাল উপার্জনের জন্য দ্বীনের প্রথম স্তরের দ্বীনিকর্তব্যকে পরিত্যাগ করে দিয়েছে। অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

'হালাল জীবিকার অন্বেষণ দ্বীনের প্রথম স্তরের ফরজগুলোর পর একটি ফরজ।'[১২৪]

এক কর্মকারের ঘটনা

আমি আমার আব্বাজি মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ.-এর থেকে একটি ঘটনা শুনেছি। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক নামে বড় মাপের একজন আল্লাহর অলি অতীত হয়েছেন। তিনি অনেক বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। আল্লাহপাক তাঁকে অনেক উঁচু মর্যাদা দান করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখল। জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ আপনার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, মহান আল্লাহ আমার সঙ্গে অনেক সদয় আচরণ করেছেন, আমার প্রতি খুব করুণা প্রদর্শন করেছেন এবং আমাকে অনেক নেয়ামত দান করেছেন। কিন্তু আমার বাড়ির পাশে এক কর্মকার বাস করত। আল্লাহপাক তাকে যে মর্যাদা দান করেছেন, অতটুকু আমার কপালে জোটেনি।

লোকটি সজাগ হয়ে সকালবেলা চিন্তা করতে শুরু করল, কে সেই কর্মকার, যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের মতো আল্লাহর অলীর চেয়ে বেশি মর্যাদা পেয়ে গেল। আর ব্যাপারটা আসলে কী। বিষয়টি তার মনে কৌতূহল জাগাল। জানতে ইচ্ছে হলো, সে এমন কী আমল করত, যার বদৌলতে সে এত বড় মর্যাদা পেয়ে গেল।

লোকটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের এলাকায় গেল। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারল, ঠিকই তাঁর বাড়ির পাশে এক কর্মকার বাস করত এবং সে মৃত্যুবরণ করেছে। তার ঘরে গিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলল। জিজ্ঞেস করল, আপনার স্বামী এমন কী আমল করত যে, আল্লাহপাক তাকে এত বড় মর্যাদা দিয়ে দিলেন? স্ত্রী বলল, আমার স্বামী একজন সরল-সহজ সাধারণ মানুষ

১২৪. কান্‌যুল উম্মাল ৪/১৬ ॥ হাদীস নং-৯২৩১; কাশ্‌ফুল খাফা ২/৪৬ ॥ হাদীস নং-১৬৭১; সুনানে বায়হাকী ২/২৪ ॥ হাদীস নং-১২৩০; আল-জামিউল কাবীর ১/১৪০৮৫ ॥ হাদীস নং-৩৫; জামিউল আহাদীস ১৪/১২৮ ॥ হাদীস নং-১৩৯৩৭; মিশকাতুল মাসাবীহ ২/১২৯ ॥ হাদীস নং-২৭৮১; শু'আবুল ঈমান ৬/৪২১ ॥ হাদীস নং-৮৭৪১

ছিলেন। সারা দিন লোহা পেটাতেন। কারণ, তিনি একজন কর্মকার ছিলেন। তবে তার মধ্যে একটি বিষয় ছিল যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবাকর আমাদের ঘরের সামনের ওই বাড়িটিতে বাস করতেন। রাতে যখন তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হতেন, তখন বাড়ির ছাদে নামাযে এমনভাবে দাঁড়িয়ে যেতেন, যেন একটি লাঠি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। একটুও নড়াচড়া করতেন না। আমার স্বামী যখন এই দৃশ্য দেখতেন, তখন বলতেন, আল্লাহ লোকটিকে সময়-সুযোগ দান করেছেন। তিনি রাতভর নামায পড়েন। ইবাদত করেন। তাঁকে দেখে আমার ঈর্ষা লাগে। আল্লাহ যদি আমাকেও এমন অবসর দান করতেন, তা হলে আমিও তাঁর মতো এভাবে ইবাদত করে রাত কাটাতাম। তো তিনি এর জন্য আক্ষেপ করতেন যে, আমি একজন কর্মকার মানুষ; সারা দিন লোহা পিটিয়ে ক্লান্ত হয়ে যাই আর রাত হলেই ঘুমের ঘোরে তলিয়ে যাই। ফলে তাহাজ্জুদ পড়ার সুযোগ আমার ঘটে না।

নামাযের সময় কাজ বন্ধ

তার মধ্যে আরও একটি গুণ ছিল যে, তিনি কর্মকারের কাজ করতেন। সারা দিন লোহা পেটাতেন। আর এই অবস্থায় আযান হয়ে গেলে যে অবস্থায়ই থাকতেন না কেন, আর কাজ করা সমীচীন মনে করতেন না। লোহায় বাড়ি দেওয়ার জন্য হাতুড়িটা মাথার উপর তুলে ধরেছেন। ঠিক এই অবস্থায় আযানের শব্দ কানে আসত আর অমনি তিনি কাজ বন্ধ করে দিতেন। সেই বাড়িটাও আর লোহার গায়ে দেওয়া সঙ্গত মনে করতেন না। হাতুড়িটা ওখান থেকেই ফিরিয়ে এনে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে চলে যেতেন। তিনি বলতেন, আযান শোনার পর আর কাজ করা আমার জন্য জায়েয মনে করি না।

শুনে লোকটি বলল, ব্যস, এই দুটি কারণেই আল্লাহপাক তাকে এত উঁচু মর্যাদা দান করেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের মতো আল্লাহর অলীরও তাতে ঈর্ষা লেগেছে।

সংঘাতের সময় এ কাজটি ছেড়ে দিন

দেখুন, একজন কর্মকার যে-কাজ করত, এটিও হালাল উপার্জনের কর্তব্য ছিল। কিন্তু তার নিয়ম ছিল, আযানের শব্দ শোনামাত্র কাজ বন্ধ করে দিত। কারণ, এই আযানের মাধ্যমে আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে, এটি আমার প্রথম স্তরের কর্তব্য। আর এখন আমার সেই কজটি সম্পাদন করার সময়। ফলে তিনি দ্বিতীয় স্তরের কর্তব্যটিকে সাময়িকের জন্য পরিত্যাগ করে

তার জন্য ছুটে যেতেন। আর সেজন্যই আল্লাহপাক তাকে এত উঁচু মর্যাদা দান করেছেন। কাজেই যেখানে সংঘাত বাঁধবে, সেখানে প্রথম স্তরের কর্তব্যগুলো আদায় করতে হবে এবং জীবিকার অন্বেষণের দ্বিতীয় স্তরের কর্তব্যটিকে পরিত্যাগ করতে হবে।

ব্যাপক অর্থবোধক একটি দু'আ

এই বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করেছেন :

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا

'হে আল্লাহ! আপনি দুনিয়াকে আমার সব চেয়ে বড় ভাবনা বানাবেন না। দুনিয়াকে আমার জ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানাবেন না। দুনিয়াকে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বানাবেন না।'[১২৫]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ! এমন যেন না হয় যে, দুনিয়া আমার জীবনের সব চেয়ে বড় ভাবনা, বড় চিন্তার বিষয় হয়ে গেল যে, আমি কেবলই দুনিয়ার ভাবনায় বিভোর থাকলাম। কীভাবে আমি গাড়ি-বাড়ির মালিক হব, কীভাবে ব্যাংক ব্যালেন্স হবে, কীভাবে আমি কাড়ি-কাড়ি টাকার মালিক হব এই ভাবনা আর এই চিন্তায়-ই আমার জীবনে কেটে গেল। আমার বেলায় এমনটি যেন না হয়। আমাকে তুমি এমন বানিয়ো না।

আরও দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ! তুমি দুনিয়াকে আমার জ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানিয়ো না। এমন যেন না হয় যে, আমি যা কিছু শিখলাম, যা কিছু জ্ঞান অর্জন করলাম, ব্যস, সবই দুনিয়ার শিখলাম। দুনিয়ার জ্ঞান অর্জন করতে-করতে জীবন পার করে দিলাম; কিন্তু আখেরাতের জ্ঞান কিছুই অর্জন করলাম না। এমন যেন না হয় হে আল্লাহ! আমাকে তুমি এমন বানিয়ো না।

নবীজি আরও দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ! দুনিয়াকে তুমি আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার চূড়ান্ত বানিয়ো না। এমন যেন না হয় যে, আমি যা কিছু আশা করলাম, যা কিছু আকাঙ্ক্ষা করলাম, সবই দুনিয়ার জীবনের জন্য হলো। আখেরাতের কোনোই আশা আমি পোষণ করলাম না।

যাহোক, আলোচ্য হাদীস আমাদেরকে তৃতীয় সবকটি এই প্রদান করেছে যে, হালাল জীবিকা উপার্জনের স্তর অন্যান্য দ্বীনি কর্তব্যগুলোর পরে। এই

---

১২৫. রাওজাতুল মুহাদ্দিছীন ৮/৪১॥ হাদীস নং-৩৩১৬; আল-জামিউস সাগীর ১/২১৬ ॥ হাদীস নং-২১৪৮

দুনিয়ার প্রয়োজন আছে বটে; কিন্তু এটি জীবনের লক্ষ্য হওয়ার মতো বিষয় নয়। দুনিয়া এমন কোনো বিষয় নয় যে, মানুষ দিন-রাত কেবল এরই ধান্ধায়, এই ভাবনায় লিপ্ত থাকবে। এ ছাড়া আর কোনো ভাবনা মাথায় থাকবে না। দুনিয়া এমন কোনো বিষয় নয়।

সারকথা

সারকথা হলো, এই হাদীস দ্বারা আমরা তিনটি বিষয় জানতে পারলাম।

এক. হালাল জীবিকা অন্বেষণ করাও দ্বীনের একটি অংশ।

দুই. উপার্জন হালাল করতে হবে এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

তিন. এই অর্থনৈতিক তৎপরতাকে তার যথাস্থানে রাখতে হবে। জীবনে এর যা অবস্থান, একে সেখানেই রাখতে হবে। একে জীবনের মূল লক্ষ্য বানানো যাবে না। মনে রাখতে হবে, এর অবস্থান অন্যান্য দ্বীনি কর্তব্যের পরে। হালাল জীবিকা অর্জন করতে গিয়ে দ্বীনের কোনো একটি বিধানকে লঙ্ঘন করা যাবে না।

আল্লাহপাক আমাদেরকে বিষয়টি যথাযথভাবে বুঝবার ও সে অনুপাতে কাজ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত– খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১৮৪-২০৬

লেনদেন পরিষ্কার রাখুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ • فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

'হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা করা বৈধ।'[১২৬]

এই যে আয়াতটি আপনাদের সম্মুখে তিলাওয়াত করেছি, এটি দ্বীনের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ সম্পর্কিত। দ্বীনের সেই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটি হলো 'লেনদেনের স্বচ্ছতা'। অর্থাৎ– মানুষের লেনদেন ভালো ও পরিচ্ছন্ন হওয়া দ্বীনের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, ইসলাম এ বিষয়টিকে যতখানি গুরুত্ব প্রদান করেছে, আমরা একে ততখানি অবহেলার সাথে আমাদের জীবন থেকে বের করে দিয়েছি। আমরা দ্বীনকে কয়েকটি ইবাদত, যেমন– নামায, রোযা, হজ, যাকাত, ওমরা ও ওজায়েফ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছি। কিন্তু টাকা-পয়সার লেনদেনবিষয়ক যে অধ্যায়টি আছে, তাকে আমরা একদম স্বাধীন ছেড়ে দিয়েছি, দ্বীনের সঙ্গে এর কোনোই সম্পর্ক নেই। অথচ আমরা যদি ইসলামী শরীয়ার প্রতি গভীর দৃষ্টি দেই, তাহলে দেখতে পাব, ইসলামে ইবাদতবিষয়ক যে বিধানগুলো আছে, তার পরিমাণ এক চতুর্থাংশ। আর তিন চতুর্থাংশ বিধান লেনদেন ও সামাজিকতা বিষয়ক।

তিন চতুর্থাংশ দ্বীন লেনদেনের মাঝে

ফিক্‌হ-এর একটি কিতাব আছে, যেটি আমাদের দ্বীনি মাদরাসাগুলোতে পড়ানো হয় এবং সেটি পড়ে মানুষ আলেম হয়। তার নাম 'আল-হিদায়া'।

---

১২৬. সূরা নিসা : ২৯

পাক-পবিত্রতা থেকে শুরু করে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টন পর্যন্ত শরীয়তের যত বিধান আছে, সব এই কিতাবটিতে লিখা আছে। কিতাবটি চার খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ড ইবাদত-বিষয়ক, যাতে পবিত্রতার বিধান, নামাযের বিধান, যাকাত, রোযা ও হজের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। অবশিষ্ট তিন খণ্ড লেনদেন ও সামাজিকতা বিষয়ক।

এখান থেকেই আমরা প্রমাণ পেয়ে যাচ্ছি যে, দ্বীনের বিধিবিধানের চার ভাগের এক ভাগের সম্পর্ক ইবাদতের সাথে। অবশিষ্ট তিন ভাগ লেনদেন বিষয়ক।

খারাপ লেনদেনের ক্রিয়া ইবাদতের উপর

তদুপরি আল্লাহপাক এই লেনদেনকে এতখানি মর্যাদা প্রদান করেছেন যে, মানুষ যদি টাকা-পয়সার লেনদেনে হারাম-হালাল ও জায়েয-না-জায়েযের পার্থক্য না রাখে, হারাম-হালালকে একাকার করে ফেলে, তা হলে ইবাদতের উপরও এর প্রভাব পড়ে। তার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, যদিও আইনত ইবাদত শুদ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তার গ্রহণযোগ্যতা ও প্রতিদান স্থগিত হয়ে যায়। আর দু'আ করলে তা কবুল হয় না।

এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

'বহু মানুষ এমন আছে, যারা আল্লাহর সম্মুখে অতিশয় বিনয় প্রকাশ করে থাকে। তাদের মাথার চুলগুলো এলোমেলো। তারা কেঁদে-কেঁদে আল্লাহর কাছে দু'আ করে, হে আল্লাহ! আপনি আমার এই সমস্যাটি দূর করে দিন, আমার এই মনোবাঞ্ছা পূরণ করে দিন। বড় কাকুতি-মিনতি করে তারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানায়। কিন্তু তাদের খাবার হারাম। তাদের পানীয় হারাম। তাদের পোশাক হারাম। তাদের শরীরটা হারাম যে, সেটি হারাম উপার্জন দ্বারা গঠিত হয়েছে। এমন ব্যক্তির দু'আ কী করে কবুল হবে? [১২৭]

এমন ব্যক্তির দু'আ কবুল হয় না।

লেনদেনের প্রতিকার খুবই কঠিন বিষয়

আর যত ইবাদত আছে, যদি তাতে কোনো ত্রুটি হয়ে যায়, তা হলে তার প্রতিকার সহজ। যেমন– আপনার নামায ছুটে গেল। তো এর প্রতিকার হলো, আপনি এই নামায কাজা পড়ে নেবেন। জীবদ্দশায় যদি কাজা আদায় করা সম্ভব না হয়, তা হলে এই সুযোগ আছে যে, মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে যাবেন,

---

১২৭. সুনানে তিরমিযী ॥ হাদীস নং–২৯১৫; সহীহ মুসলিম ॥ হাদীস নং–১৬৮৭; সুনানে দারেমী ॥ হাদীস নং–২৬০১; মুসনাদে আহমাদ ॥ হাদীস নং–৭৯৯৮

তোমরা আমার সম্পদ দ্বারা আমার এই নামাযগুলোর ফিদ্ইয়া পরিশোধ করে দিয়ো। আবার এর জন্য তাওবা করেও আল্লাহর নিকট থেকে ক্ষমা নেওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু কেউ যদি অন্যের কোনো সম্পদ অন্যায় ও অবৈধভাবে গ্রাস করে, তা হলে এর কোনো প্রতিকার নেই যতক্ষণ-না মালিক ক্ষমা করে। আপনি কারও সম্পদ কুক্ষিগত করে হাজারোবার তাওবা করুন, হাজারো রাকাত নফল নামায পড়ুন, আপনার এই অপরাধ মাফ হবে না।

এজন্য লেনদেনের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে এটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়।

হযরত থানভী রহ. ও লেনদেন

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর দরবারে তাসাওউফ ও তরীকতের শিক্ষামালায় লেনদেনকে সব চেয়ে বেশি ও প্রথম স্তরের গুরুত্ব প্রদান করা হতো। তিনি বলতেন, আমি যদি আমার কোনো ভক্ত-মুরীদ সম্পর্কে জানতে পারি, তার আমল ছুটে গেছে, তা হলে আমার তেমন কোনো দুঃখ আসে না। কিন্তু যদি কারও সম্পর্কে জানতে পারি, সে হালাল ও হারামকে এক করে রেখেছে এবং তার লেনদেনে হারাম-হালালের ভেদাভেদ নেই, তার হালাল-হারামের কোনো ভাবনা নেই, তা হলে আমি খুব কষ্ট পাই ও তার প্রতি আমার অনাস্থা তৈরি হয়ে যায়।

হযরত থানভী রহ.-এর একটি শিক্ষামূলক ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর একজন মুরীদ ছিলেন, যাঁকে খেলাফতও প্রদান করেছিলেন এবং বায়'আত করারও অনুমতি প্রদান করেছিলেন। একবার তিনি সফর করে হযরতের কাছে এলেন। সঙ্গে একটি বালকও ছিল। তো তিনি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং সালাম ও কুশলবিনিময় হলো।

হযরত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

তিনি একটি জায়গার নাম উল্লেখ করে বললেন, অমুক জায়গা থেকে।

হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, রেলে করে এসেছেন?

বললেন, হ্যাঁ, রেলে করে এসেছি।

হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সঙ্গে এই যে ছেলেটি আছে, এর টিকিট ফুল নিয়েছেন, নাকি হাফ নিয়েছেন?

অনুমান করুন, খানকায় বসে পীর ছাহেব মুরীদকে জিজ্ঞেস করছেন, টিকিট ফুল নিয়েছেন, নাকি হাফ নিয়েছেন! এই খানকা ছাড়া আর কোনো খানকায় এ-জাতীয়

প্রশ্নের তো কল্পনা-ই করা যায় না। ওসব জায়গায় খোঁজ নেওয়া হয়, আমল যা-যা দিয়েছিলাম, সব ঠিকমতো আদায় করেছ কি-না? তাহাজ্জুদ ঠিকমতো পড়েছ কি-না? ইশ্‌রাক পড়েছ কি-না? আওয়াবীন পড়েছ কি-না? কিন্তু এখানে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, বাচ্চার টিকিট ফুল নিয়েছ, না-কি হাফ নিয়েছ!

তিনি উত্তর দিলেন, হাফ নিয়েছি হযরত!

হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, এর বয়স কত?

তিনি উত্তর দিলেন, বয়স তো তেরো বছর; কিন্তু দেখতে বারো বছরের বলে মনে হয়। সেজন্যই টিকিট হাফ নিয়েছি।

হযরত রহ. বললেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মনে হচ্ছে, তাসাওউফ-তরীকতের বাতাসও আপনার গায়ে লাগেনি। আজও আপনার এই বুঝ হয়নি যে, ছেলেটিকে আপনি যে ভ্রমণ করিয়েছেন, এটি হারাম হয়েছে। আইন হলো, বয়স বারো বছরের বেশি হলে পুরো টিকিট লাগবে। কিন্তু আপনি কিনা তোরো বছর বয়সের ছেলের জন্য হাফ টিকিট ক্রয় করেছেন। এর অর্থ হলো, আপনি রেলওয়ের অর্ধেক টিকিট কুক্ষিগত করেছেন এবং চুরি করেছেন। আর যেলোক অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করে ও চুরি করে, তাসাওউফ ও তরীকতে তার কোনো স্থান নেই।'

তাই হযরত রহ. তার থেকে খেলাফত প্রত্যাহার করে নিলেন।

অথচ ইবাদত, নফল, তাহাজ্জুদ, ইশরাক ইত্যাদিতে তার কোনোই ত্রুটি ছিল না। এদিক থেকে তিনি খুবই পরিপক্ব ছিলেন। কিন্তু ভুল একটি করেছেন যে, ছেলের জন্য ফুলের জায়গায় হাফ টিকিট ক্রয় করেছেন। আর এই অপরাধের দায়ে হযরত থানভী রহ. তার খেলাফত ছিনিয়ে নিলেন।

হযরত থানভী রহ.-এর আরও একটি ঘটনা

হযরত থানভী রহ.-এর পক্ষ থেকে তাঁর মুরীদ ও ভক্ত-অনুসারীদের জন্য নির্দেশনা ছিল, যখন তোমরা রেলে ভ্রমণ করবে এবং সঙ্গে মালামাল সেই পরিমাণের চেয়ে বেশি হবে, যতটুকু বিনা ভাড়ায় বহন করার অনুমতি আছে, তা হলে মাল ওজন করিয়ে ভাড়া পরিশোধ করে ভ্রমণ করো। অতিরিক্ত মালের ভাড়া না দিয়ে কেউ ভ্রমণ করো না।

একবার হযরত থানভী রহ. নিজে রেলে ভ্রমণ করছিলেন। সেখানে তাঁর এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল। তিনি রেলওয়ের যে অফিসঘরে মালামাল ওজন করা হয়, সেখানে গেলেন। ঘটনাক্রমে রেলওয়ের এক নিরাপত্তাকর্মী সেখানে দাঁড়ানো ছিল, যে কিনা হযরত (রহ.)কে চিনত। সে জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আপনি এখানে কেন?

হযরত রহ. বললেন, এই মালগুলো ওজন করাতে এসেছি। যদি বেশি হয়, তা হলে তো ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

গার্ড বলল, এই কষ্ট আপনাকে করতে হবে না। আপনি মাল ওজন করাবার চক্করে পড়তে এলেন কেন? পথে আপনাকে কেউ ধরবে না। মাল যদি বেশিও হয়, তবু আপনাকে কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। জরিমানা করার তো প্রশ্নই আসে না।

হযরত হাকীমুল উম্মত রহ. গার্ডকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমার সঙ্গে কোন পর্যন্ত যাবেন?

গার্ড একটি স্টেশনের নাম উল্লেখ করে বলল, অমুক স্টেশন পর্যন্ত।

হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কী হবে?

গার্ড বলল, তারপর আমার স্থলে যেলোক দায়িত্বে আসবে, আমি তাকে বলে দেব, যেন সে আপনার মালের প্রতি খেয়াল রাখে।

হযরত এবার জিজ্ঞাসা করলেন, সেই গার্ড কোন পর্যন্ত যাবে?

গার্ড বলল, সে আপনার শেষ গন্তব্য পর্যন্ত যাবে। আপনার আর কোনো সমস্যা থাকবে না।

হযরত রহ. বললেন, আমার তো আরও সামনে যেতে হবে।

এবার গার্ড খানিক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এর সামনে আপনি আর কোথায় যাবেন? শেষ স্টেশনে পর আর কোথায় যাবেন আপনি?

হযরত রহ. বললেন, আমাকে আরও সম্মুখে আল্লাহর সামনে যেতে হবে। সেখানে কোন গার্ড আমার সঙ্গে যাবে, যে ওখানে আমাকে রক্ষা করবে?

ওখানে প্রসিদ্ধ ছিল যে, কোনো ব্যক্তি যদি রেলওয়ের অফিসে মালপত্র ওজন করাতে যেত, তা হলে মানুষ মনে করত, ইনি নিশ্চয় থানাভবন খানকার সঙ্গে সম্পৃক্ত লোক। হযরত থানভী (রহ)-এর বহু কথা ও আদর্শ তাঁর ভক্ত-অনুসারীরা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু 'শরীয়তের বিধানের বাইরে অন্যায়ভাবে একটি পয়সাও যেন পকেটে না ঢোকে' হযরতের এই নীতি ও আদর্শ দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। আজ কত মানুষ এ ধরনের লেনদেনের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তাদের কল্পনায়ও আসে না যে, এই লেনদেন ও কারবারটি আমি ইসলামী আইনের পরিপন্থী করছি। আল্লাহর আইনে এটি নাজায়েয ও হারাম। আমরা যদি অন্যায়ভাবে কিছু অর্থ সাশ্রয় করি, তা হলে এই অর্থ হারাম হলো। আর সেই হারাম সম্পদ অন্য সম্পদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ফলে তার কুপ্রভাব আমাদের পুরো সম্পদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর সেই সম্পদ থেকেই আমার আহার করছি। তারই দ্বারা আমরা পোশাক পরিধান করছি। ফলাফল এই দাঁড়াচ্ছে যে, আমাদের গোটা জীবনই হারাম হয়ে যাচ্ছে। আর যেহেতু

আমরা অনুভূতিহীন হয়ে গেছি, তাই হারাম সম্পদ আর হারাম উপার্জনের ফলাফল আমরা অনুভব করতে পারছি না।

এই হারাম সম্পদ আমাদের জীবনে কী অনাচার সৃষ্টি করছে, আমরা তাও অনুভব করতে পারছি না। আল্লাহপাক যাঁদেরকে অনুভূতি দান করেছেন, তাঁরা বুঝতে পারেন, হারাম কী জিনিস।

মাওলানা ইয়াকুব ছাহেব রহ.-এর অনুভূতি

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর বিশিষ্ট উস্তায হযরত মাওলানা ইয়াকুব ছাহেব রহ.। ইনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি বলতেন,একবার আমি এক ব্যক্তির বাড়িতে দাওয়াত খেতে গেলাম। ওখানে খানা খেলাম। পরে জানতে পারলাম, মেজবানের উপার্জন হালাল হওয়া নিশ্চিত নয়। তিনি বলেন, খাওয়ার পর কয়েক মাস পর্যন্ত আমি এই কয়েকটি লোকমার কুফল অন্তরে অনুভব করতে থাকলাম। এই কয়েক মাস আমার অন্তরে কেবলই গুনাহ করার প্রেরণা জাগ্রত হতে থাকল যে, মন চাইত, আমি অমুক গুনাহটি করি, অমুক গুনাহটি করি। হারাম খাওয়ার ফলে অন্তরে এই অন্ধকার সৃষ্টি হয়।

হারামের দুটি প্রকার

এই যে আজ আমাদের অন্তর থেকে পাপের প্রতি অনীহা মুছে যাচ্ছে এবং পাপের পাপ হওয়ার অনুভূতি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, তার প্রধান কারণ হলো, আমাদের সম্পদে হারামের মিশ্রণ ঘটে গেছে। হারাম দুই রকম হয়ে থাকে। এক হলো প্রকাশ্য হারাম, যার হারাম হওয়ার ব্যাপারটি সবাই জানে ও বিশ্বাস করে যে, এটি হারাম। যেমন– সুদের সম্পদ, ঘুষের সম্পদ, জুয়ার সম্পদ, ধোঁকা ও প্রতারণার সম্পদ ইত্যাদি। কিন্তু হারামের আরেকটি প্রকার আছে, যার হারাম হওয়ার ব্যাপারে অনেকেরই এই অনুভূতি নেই যে, এটি হারাম। অথচ এটিও হারাম। এই হারাম বস্তু, হারাম সম্পদ আমাদের কারবারের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বোঝা দরকার।

মালিকানা নির্দিষ্ট হতে হবে

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা হলো, লেনদেন চাই আপন ভাইয়ের সঙ্গেই হোক-না কেন, পিতা-পুত্রের মাঝে হোক-না কেন, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে হোক-না কেন; একেবারে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হতে হবে। তাতে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা ও অপরিচ্ছন্নতা থাকতে পারবে না। আর

মালিকানা পরস্পরে নির্ধারিত হতে হবে যে, কোনটা পিতার, কোনটা পুত্রের। কোনটা স্বামীর, কোনটা স্ত্রীর। কোনটা এই ভাইয়ের, কোনটা অন্য ভাইয়ের। এ বিষয়গুলো স্পষ্ট ও পরিষ্কার হতে হবে। এটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা। যেমন- এক হাদীসে তিনি বলেছেন :

تَعَاشَرُوْا كَالْإِخْوَانِ وَتَعَامَلُوْا كَالْأَجَانِبِ

'তোমরা পরস্পর আচরণ করো ভাইদের মতো আর লেনদেন করো অপরিচিতের মতো।'

যেমন- ভাইয়ের সঙ্গেও যদি বাকির লেনদেন করতে হয়, তা হলে তাও লিখে রাখো যে, এই লেনদেন বাকিতে করা হয়েছে এবং এত দিন পর পরিশোধ হবে।

পিতা-পুত্রের যৌথ কারবার

আজ আমাদের গোটা সমাজের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, কোথাও স্বচ্ছতা নেই। যদি পিতা-পুত্র মিলে যৌথভাবে কারবার করে, তাও এমনিতেই চলে। কোনো স্পষ্টতা নেই যে, এখানে পিতার অবস্থান কী আর পুত্রের অবস্থান কী। ছেলে বাপের সঙ্গে এই যে কারবারটা করছে, এখানে কি সে একজন অংশীদার, নাকি একজন কর্মচারী। নাকি এমনিতেই পিতাকে সাহায্য করছে। এসব ব্যাপারে কোনোই স্বচ্ছতা থাকে না। জিজ্ঞেস করলে কেউই এর কোনো সদুত্তর দিতে পারে না। কিন্তু ব্যবসা চলছে। মিল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। দোকান সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসা বড় হচ্ছে। সম্পদের পরিমাণ বাড়ছে। কিন্তু কেউই বলতে পারছে না, এখানে কার অবস্থান কী এবং কার অংশ কতটুকু।

যদি পরামর্শ দেওয়া হয়, বিষয়টিকে পরিষ্কার করে নিন, তা হলে উত্তর দেয়, এ তো আত্মমর্যাদার ব্যাপার। ভাইয়ে-ভাইয়ে স্বচ্ছতার আবার প্রয়োজন কী? পিতা-পুত্র মিলে ব্যবসা করছি; এখানে আবার স্বচ্ছতার দরকার কী? শেষ পর্যন্ত ফলাফল যা দাঁড়ায়, তা হলো, যখন বিবাহ করে সংসার পাতল, সন্তান জন্মাল; একজন খরচ কম করল, আরেকজন বেশি করল। এক ভাই বাড়ি বানাল; কিন্তু আরেকজন এখনও একটি দোকানও বানাতে পারল না। ব্যস, ফিসফাস শুরু হয়ে গেল। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের ধারা শুরু হয়ে গেল। পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেল। এবার পরস্পরে বিবাদ শুরু হয়ে গেল। ঝগড়া শুরু হয়ে গেল যে, অমুক বেশি খেয়ে ফেলেছে। আমি কম খেয়েছি। আর ইতিমধ্যে যদি পিতার মৃত্যু হয়ে থাকে, তা হলে তো ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধের আর সীমা থাকে না। তারপর এই সমস্যার সমাধানের আর কোনো সুযোগ থাকে না।

পিতার মৃত্যুর পর তাৎক্ষণিকভাবে তার ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন করে ফেলুন

পিতা মৃত্যুবরণ করলে ইসলামের বিধান হলো, তাৎক্ষণিকভাবে তার রেখে-যাওয়া-সমস্ত সম্পদ বণ্টন করে ফেলো। মীরাছ বণ্টনে বিলম্ব করা হারাম। কিন্তু আজকাল যা হচ্ছে, তা হলো, পিতার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি বণ্টন করা হয় না। মৃত ব্যক্তির বড় ছেলে কারবার দখল করে নেয়। মেয়েরা চুপ করে বসে থাকে। তারা জানেই না, বাবার সম্পত্তিতে আমাদের কোনো পাওনা আছে কি-না, কোনো হক আছে কি-না।

এমনকি এই অবস্থায় দশ বছর, বিশ বছর সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। এর মধ্যে ওয়ারিশদের মধ্য থেকেও কেউ মারা গেল কিংবা কোনো ভাই কারবারে নিজের অর্থ ঢুকিয়ে ফেলল। তারপর তাদের সন্তানরা বড় হলো। এবার বিবাদের বহর আরও বড় হয়ে গেল। বিবাদ এমনভাবে ডাল-পালা ছড়াল যে, কোথা থেকে কী হচ্ছে কিছুই বুঝবার উপায় থাকল না। সমস্যার সমাধানের কোনোই সুযোগ থাকল না।

বাড়ির মালিকানায় কার অংশ কতটুকু

কিংবা একটি বাড়ি নির্মাণ হচ্ছে। নির্মাণের সময় কিছু টাকা পিতা ব্যয় করেছেন। কিছু এক পুত্র দিয়েছে। কিছু দিয়েছে আরেক পুত্র। কিছু আরেকজন। কিন্তু এটা জানা নেই, কে কোন হিসাবে, কোনহারে এবং কীভাবে এই অর্থ ব্যয় করল। এটাও কারও জানা নেই, এই যে আমি টাকা দিচ্ছি, এই টাকা আমি ঋণ হিসেবে দিচ্ছি এবং পরে ফেরত পাব, নাকি এমনিতেই কাউকে দিয়ে দিচ্ছি, নাকি এর বিনিময়ে আমি বাড়ির মালিকানার অংশ পাব। এর কোনোই খবর নেই।

ফলাফল কী দাঁড়াল? বাড়ি তৈরি হয়ে গেল এবং তাতে বসবাস শুরু হলো। কিছু দিন পর পিতা মারা গেলেন। এবার ভাইদের মধ্যে সমস্যা শুরু হয়ে গেল। বাড়িটিকে কেন্দ্র করে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। সমাধানের জন্য এবার মুফতী ছাহেবের কথা মনে পড়ল। এক ভাই বলছে, এই বাড়ির নির্মাণকাজে আমি এত টাকা ব্যয় করেছি; কাজেই আমার এত অংশ পাওয়া দরকার। আরেক ভাই বলল, আমি এত টাকা ব্যয় করেছি; কাজেই এই বাড়িতে আমার মালিকানা এই। কিন্তু মুফতী ছাহেব যখন জিজ্ঞেস করেন, বাড়িনির্মাণের সময় আপনি যে টাকা দিয়েছিলেন, তখন আপনার নিয়ত কী ছিল? আপনি কি এই টাকা ঋণ হিসেবে দিয়েছিলেন? বাড়ির মালিকানায় অংশীদার হওয়ার নিয়তে দিয়েছিলেন?

নাকি পিতাকে সাহায্য হিসেবে প্রদান করেছিলেন? সে সময় কথা কী হয়েছিল? তখন উত্তর পাওয়া যায়, দেওয়ার সময় তো আমরা এত কিছু চিন্তা করিনি। এর কোনোটি-ই তো তখন মাথায় ছিল না। এখন আপনি আমাদেরকে একটি সমাধান বের করে দিন।

যখন তালগোল পেকে গেল; সবাই দিশা হারিয়ে ফেলল, তখন মুফতী ছাহেবের কাছে এসে বলে, আমাদেরকে একটা সমাধান বের করে দিন! এসব এজন্য হচ্ছে যে, লেনদেনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শিক্ষা প্রদান করেছেন, আমরা তার অনুসরণ করি না। নফল চলছে। তাহাজ্জুদ চলছে। ইশরাক-আওয়াবীন চলছে। কিন্তু লেনদেনে আমাদের জন্য আমাদের নবীজির শিক্ষা কী, সেই খবর আমরা রাখি না।

ফলে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত সমস্যা তৈরি হচ্ছে। কোন জিনিসটি কার, এই মালিকানা আমরা স্পষ্ট না করার কারণে আমাদের জীবনে অনেক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এসব কাজ আমরা হারাম করছি। আর যখন আমি জানি না, এখানে আমার মালিকানা কতটুকু, তখন তার থেকে আমি যা-কিছু ভোগ করছি, তা হালাল হচ্ছে কি-না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে যাচ্ছে। আর শরীয়তের বিধান হলো, কোনো বস্তুর হালাল হওয়া যদি সংশয়যুক্ত হয়, তখন তা হারাম হিসেবেই ধর্তব্য হবে। এ ধরনের সম্পদ ভোগ করা জায়েয নয়।

মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ.-এর মালিকানা স্পষ্ট করা

আমার আব্বাজি মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ.-এর একটি ব্যক্তিগত কক্ষ ছিল। ওই কক্ষে তিনি বিশ্রাম করতেন। একটি চৌকি বিছানো থাকত। তার উপর তিনি শয়ন করতেন। আবার তারই উপর বসে লেখা-পড়ার কাজ সারতেন। ওখানেই লোকজন এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করত। আমি দেখতাম, বাইরে থেকে যদি কোনো জিনিস উক্ত কক্ষে আসত, তা হলে কাজ সমাধা হওয়ার পর সঙ্গে-সঙ্গে তিনি সেটি ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। যেমন– তিনি এক গ্লাস পানি চাইলেন। অন্য কক্ষ থেকে কেউ গ্লাসে করে পানি এনে দিল। তিনি পানিটুকু পান করেই বলতেন, গ্লাসটা নিয়ে যাও এবং যেখান থেকে এনেছ, সেখানে রেখে আসো। যদি গ্লাস ফেরত নিতে বিলম্ব হতো, তা হলে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন। এভাবে প্লেট, জগ, গ্লাস যা কিছু বাইরে থেকে আসত, সঙ্গে-সঙ্গে ফেরত পাঠিয়ে দিতেন।

একদিন আমি বললাম, এগুলো ফেরত নিতে যদি বিলম্ব হয়, তা হলে দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন। তিনি বললেন, তুমি বুঝতে পারনি। ব্যাপার হলো, আমি আমার অসিয়তনামায় লিখেছি, এই কক্ষে যা-কিছু মালপত্র আছে,

সবগুলোর মালিক আমি। আর অন্যান্য কামরায় যেসব মাল আছে, সেগুলোর মালিক তোমাদের আম্মাজান। সেজন্যই আমি ভয় করি, যদি কখনও অন্য কোনো কক্ষের কোনো সামান আমার কক্ষে আসে আর সেই অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়ে যায়, তা হলে অসিয়তনামার ভাষ্য অনুযায়ী এগুলোর মালিক আমি হব। অথচ এটির মালিক আমি নই। এজন্যই আমি অন্য কোনো কক্ষের কোনো জিনিস এনে আমার কক্ষে না রেখে তাড়াতাড়ি ফেরত দিতে চাই।

ডাক্তার আব্দুল হাই রহ.-এর সতর্কতা

যখন আব্বাজি মৃত্যুবরণ করলেন, তখন আমার শায়খ ডাক্তার আব্দুল হাই রহ. আমাদের সমবেদনা জানাতে এবং সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এলেন। আব্বাজির সঙ্গে হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহ.-এর গভীর হৃদ্যতা ছিল, যেমনটি আমর-আপনার কল্পনাও করা সম্ভব নয়। তিনি দুর্বল ছিলেন এবং এই দুর্বল শরীর নিয়েই আমাদের কাছে ছুটে এসেছিলেন। বিশেষ করে সে সময় তাঁর দুর্বলতা খুব বেশি ছিল। আমি চিন্তা করলাম, এর জন্য তো কিছু একটা করা দরকার। এমন দুর্বলতার সময় আব্বাজি একটি হালুয়া খেতেন। সেই হালুয়ার একটা কৌটা আমাদের ঘরে ছিল। আমি কৌটাটা এনে হযরতের খেদমতে পেশ করে বললাম, হযরত! এখান থেকে এক চামুচ খেয়ে নিন। কিন্তুকৌটা দেখেই হযরত বললেন, এটি আমি কীভাবে খাব? এটি তো এখন মীরাছের সম্পত্তি হয়ে গেছে। এখন এটি কাউকে প্রদান করা তোমার জন্য জায়েয হবে না। যদিও তা এক চামুচ হয়। আমি বললাম, হযরত! আব্বাজির যে কজন ওয়ারিশ আছে, আল্লাহপাকের মেহেরবানিতে আমরা সবাই সাবালক ও এখানে উপস্থিত আছি। আমরা সবাই সম্মত যে, আপনি এখান থেকে এক চামুচ খেয়ে নিন। এবার হযরত রহ. এক চামুচ হালুয়া খেয়ে নিলেন।

হিসাবটা সেদিনই করে নিন

এই প্রক্রিয়ায় হযরত রহ. আমাদেরকে এই শিক্ষা প্রদান করলেন যে, ব্যাপার এমন নয় যে, মানুষ লাগামহীনভাবে জীবন যাপন করবে এবং কোনো হিসাব থাকবে না। মনে করুন, সব কজন ওয়ারিশের মাঝে যদি একজনও নাবালক থাকত কিংবা একজন অনুপস্থিত থাকত অথবা কোনো একজনের সম্মতি না থাকত, তা হলে এই হালুয়ার এক চামুচও হারাম বলে বিবেচিত হতো। কারণ, শরীয়তের বিধান হলো, একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করার সঙ্গে-সঙ্গে তার মীরাছ বণ্টন করে ফেলো। কিংবা অন্তত হিসাব করে রাখো যে, অমুকের এত অংশ, অমুকের এত অংশ। আর তার রেখে-যাওয়া সম্পত্তির

পরিমাণ এই। কারণ, অনেক সময় বণ্টনে বেশ বিলম্ব হয়ে যায়। কোনো-কোনো জিনিস এমন থাকে, যেগুলোর মূল্য নির্ধারণ করতে হয়। আবার কোনো-কোনো জিনিস বিক্রয় করতে হয়। ফলে বণ্টনে বিলম্ব হয়ে গেলে সমস্যা দেখা দেয়। কাজেই সেদিনই বণ্টন করে নেওয়া দরকার। বর্তমানে আমাদের সমাজে যত বিবাদ দেখা যাচ্ছে, সেসবের প্রধান একটি কারণ হিসাব পরিষ্কার না হওয়া এবং লেনদেন স্বচ্ছ না হওয়া।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. ও তাসাওউফের কিতাব

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ রহ.। ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সমস্ত গবেষণার ফসল স্বীয় লেখনির মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছানোর কৃতিত্বের অধিকারী। আমাদের মাথার উপর তাঁর অনুগ্রহ এত বেশি যে, জীবন শেষ করেও আমরা তাঁর ঋণ শোধ করতে পারব না। তাঁর লিখিত কিতাবগুলো কয়েকটি উটের বোঝার সমান ছিল। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি এত কিতাব লিখলেন; কিন্তু তাসাওউফের উপর কোনো কিতাব লিখলেন না। এর কারণ কী? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি কী করে বলছ, আমি তাসাওউফের উপর কোনো কিতাব লিখিনি? আমার লিখিত 'কিতাবুল বুয়ূ'ই তো তাসাওউফের কিতাব।

এই উত্তরের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ইসলামের ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের যে বিধান আছে, প্রকৃতপক্ষে এগুলোই তাসাওউফ। কারণ, তাসাওউফ মানে শরীয়তের বিধানগুলো যথাযথভাবে পালন করা। আর শরীয়তের যথাযথ অনুসরণ ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন-বিষয়ক বিধানগুলোর অনুসরণের মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে।

অন্যের জিনিস ব্যবহার করা

অনুরূপভাবে অন্যের জিনিস ব্যবহার করা হারাম। যেমন– আপনার বন্ধু বা ভাই। তার কোনো একটি জিনিস আপনার ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু তার অনুমতি ছাড়া জিনিসটি ব্যবহার করা জায়েয হবে না। বরং তা হারাম হবে। অবশ্য আপনি যদি নিশ্চিত হন যে, তার এই জিনিসটি ব্যবহার করলে সে অসন্তুষ্ট হবে না; বরং খুশি হবে, এতে তার সম্মতি থাকবে, তা হলে ব্যবহার করা জায়েয হবে। কিন্তু যেখানে সামান্যতম সন্দেহও থাকবে, সে আপনার সহোদর ভাই-ই হোক-না কেন, পুত্রই হোক-না কেন, পিতা-ই হোক-না কেন, তার কোনো জিনিস ব্যবহার করা জায়েয হবে না। হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

'কোনো মুসলমানের সম্পদ তার মনের সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে হালাল হবে না।'[১২৮]

এই হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'অনুমতি' শব্দ ব্যবহার করেননি। একথা বলেননি যে, মালিকের অনুমতি ব্যতীত হালাল হবে না। বরং খুশিমনে দেওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। বলেছেন, যতক্ষণ-না সম্পদটির মালিক খুশিমনে না দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না। যদি খুশিমনে দেয়, তবেই হালাল হবে। এমন যদি হয়, আপনি অন্যের জিনিস ব্যবহার করছেন; কিন্তু এতে তার মনের সন্তুষ্টি থাকার নিশ্চয়তা নেই, তা হলে আপনার জন্য এই ব্যবহার জায়েয হচ্ছে না।

এমন চাঁদা হালাল নয়

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. মাদরাসা ও বিভিন্ন সংগঠনের চাঁদার ব্যাপারে বলতেন, অন্যের উপর চাপ সৃষ্টি করে চাঁদা আদায় করা হালাল নয়। যেমন– আপনি প্রকাশ্য জনসভায় চাঁদা তুলতে শুরু করলেন। মজমায় এক ব্যক্তি লজ্জায় পড়ে এই ভেবে চাঁদা দিল যে, সবাই দিচ্ছে; এমতাবস্থায় আমি যদি না দেই, তা হলে আমার নাক-কান কাটা যাবে। কিন্তু তার মনে চাঁদা দেওয়ার কোনোই আগ্রহ নেই। তো এই চাঁদা মনের সন্তুষ্টি ব্যতীত প্রদান করা হলো। কাজেই এই চাঁদা হালাল হলো না।

এ বিষয়টির উপর হযরত থানভী রহ. স্বতন্ত্র একটি কিতাব রচনা করেছেন। তাতে তিনি কোন অবস্থায় চাঁদা গ্রহণ করা জায়েয হবে আর কোন অবস্থায় জায়েয হবে না, তার বিবরণ প্রদান করেছেন।

প্রত্যেকের মালিকানা স্পষ্ট হওয়া চাই

যাহোক, এই মূলনীতিটি মনে রাখুন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অপরের মনের সন্তুষ্টির নিশ্চয়তা না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপরের জিনিস ব্যবহার করা হালাল নয়। চাই তিনি পিতা হোন, পুত্র হোন, স্বামী হোন, স্ত্রী হোন, ভাই হোন, বোন হোন বা অন্য কোনো আপন-আত্মীয় হোন। এই নীতিটি ভুলে যাওয়ার কারণে আমাদের সম্পদে হারামের মিশ্রণ ঘটছে। কোনো ব্যক্তি যদি বলে, আমি তো কোনো অন্যায় করছি না – আমি ঘুষ খাচ্ছি না, সুদ খাচ্ছি না,

---

১২৮. কানযুল উম্মাল ১/৯১ ॥ হাদীস নং-৩৯৮; কাশ্‌ফুল খাফা ২/৩৭০ ॥ হাদীস নং-৩১০১; মুসনাদে আহমাদ ॥ হাদীস নং-১৯৭৭৪; জামিউল আহাদীস ১৭/৮০ ॥ হাদীস নং-১৭৬১৫

চুরি করছি না, ডাকাতি করছি না। কাজেই আমার সম্পদ তো হালাল। আমার সম্পদ হারাম হবে কেন। কিন্তু তার জানা নেই, এই মূলনীতিটির কথা স্মরণ না থাকার কারণে, এই নীতির অনুসরণ না করার কারণে হালালের সঙ্গে হারামের মিশ্রণ ঘটে যাচ্ছে। এই মিশ্রণ হালাল সম্পদকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে। তার বরকত নষ্ট করে দিচ্ছে। তার উপকারিতা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। সর্বোপরি এই হারামের কারণে মানুষের স্বভাব গুনাহের প্রতি ধাবিত হচ্ছে এবং রূহানিয়াতের ক্ষতিসাধন করছে।

এজন্য লেনদেনকে পরিচ্ছন্ন রাখার ভাবনা ভাবতে হবে, যেন লেনদেনে কোনো প্রকার অস্বচ্ছতা ও ঝামেলা না থাকে। মুমিনের লেনদেন হতে হবে আয়নার মতো একদম পরিষ্কার। প্রতিটি জিনিসের মালিকানা স্পষ্ট থাকবে এটি অমুকের, এটি অমুকের। তারপর ভাইয়ের মতো বসবাস করো। অন্য কারও যদি তোমার কোনো জিনিস ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় আর সে তোমার কাছে সেই জিনিসটি চায়, তা হলে তুমি তাকে তা দাও। কিন্তু মালিকানা স্পষ্ট থাকতে হবে, যাতে পরে কোনো ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটতে না পারে।

মসজিদে নববীর জন্য বিনামূল্যে জমি গ্রহণ করলেন না

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনা এলেন, তখন তাঁর সামনে প্রথম কাজ এই ছিল যে, এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করতে হবে – সেই মসজিদে নববী, যাতে এক রাকাত নামায আদায় করলে পঞ্চাশ হাজার রাকাতের সাওয়াব পাওয়া যায়। তাঁর একটি জায়গা পছন্দ হয়ে গেল। জায়গাটা খালি পড়ে ছিল। নবীজি খবর নিলেন, এই জমির মালিক কে। জানতে পারলেন, এটি বনু নাজ্জারের লোকদের জমি। বনু নাজ্জারের লোকেরা যখন জানতে পারল, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তাদের একটি জমি পছন্দ হয়েছে, তখন তারা এসে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল! এ আমাদের বিরাট সৌভাগ্য যে, আমাদের জমিতে মসজিদ নির্মিত হবে। এই জমিটি আমরা আপনাকে বিনামূল্যে দিয়ে দিচ্ছি। আপনি এখানে মসজিদ নির্মাণ করুন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, আমি বিনামূল্যে নেব না। তোমরা এই জমির মূল্য বলো; আমি তোমাদের কাছ থেকে এই জমি ক্রয় করে এখানে মসজিদ নির্মাণ করব।[১২৯]

---

১২৯. সহীহ বুখারী ॥ হাদীস নং-৪১০; সহীহ মুসলিম ॥ হাদীস নং-৮১৬; মুসনাদে আহমাদ ॥ হাদীস নং-১১৮৮৫; সুনানে নাসায়ী ॥ হাদীস নং-৬৯৫;

মসজিদ নির্মাণের জন্য বল প্রয়োগ করা

বিজ্ঞ আলেমগণ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, বনু নাজ্জারের লোকেরা যখন মসজিদ নির্মাণের জন্য জমিটি বিনামূল্যে দান করার প্রস্তাব করেছিল, তখন এই জমি গ্রহণ করা জায়েয ছিল। তাতে অন্যায়ের কিছু ছিল না। কিন্তু যেহেতু মদীনায় ইসলামের এটি-ই প্রথম মসজিদ নির্মিত হতে যাচ্ছে, যেটি বাইতুল্লাহর পর দ্বিতীয় মর্যাদার অধিকারী মসজিদ বলে স্বীকৃতি লাভ করবে, তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমিটি এভাবে বিনামূল্যে গ্রহণ করা ভালো মনে করলেন না। অন্যথায় এর সূত্র ধরে ভবিষ্যতের জন্য এই নিয়ম চালু হয়ে যেতে পারে যে, মসজিদ নির্মাণের জন্য মানুষ জমি ক্রয় না করে কেবলই বিনামূল্যে চাঁদা করা শুরু করে দেবে আর তার জন্য মানুষের উপর চাপও প্রয়োগ করবে। এই ভাবনা মাথায় রেখেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমিটি বিনামূল্যে গ্রহণ না করে উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করে ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণ করলেন, যাতে লেনদেন পরিষ্কার থাকে এবং কোনো রকম ঝামেলা অবশিষ্ট না থাকে।

পুরো বছরের খরচ প্রদান করা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রীগণ প্রকৃত অর্থেই তাঁর জীবনসঙ্গিনী হওয়ার যোগ্য ছিলেন। আল্লাহপাক তাঁদের অন্তর থেকে দুনিয়ার মোহ দূর করে দিয়েছিলেন এবং আখেরাতের ভালবাসা তাদের হৃদয়ে ভরে দিয়েছিলেন। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নীতি এই ছিল যে, তাঁদের পুরো এক বছরের ভরণ-পোষণ বছরের শুরুতেই একসঙ্গে দিয়ে দিতেন এবং বলতেন, এগুলো তোমাদের খরচা; তোমরা একে যেভাবে খুশি ব্যয় করতে পার।[১৩০]

অপর দিকে তাঁরা নবীজির স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের হাত সব সময় দান-খয়রাতের জন্য উন্মুক্ত থাকত। ফলে তাঁরা আবশ্যক পরিমাণ সম্পদ রেখে বাকিটা দান করে দিতেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিয়ম ছিল, এক বছরের খরচা একসঙ্গে দিয়ে দিতেন।

লেনদেনে স্ত্রীদের মাঝে নবীজির সমতা রক্ষা করা

আল্লাহপাক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর থেকে এই বাধ্যবাধকতা তুলে নিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীগণের সঙ্গে সমান আচরণ

---

১৩০. সহীহ মুসলিম ॥ হাদীস নং–২৮৯৭

করবেন। বরং তাঁকে স্ত্রীদের সঙ্গে যেমন খুশি আচরণ করার স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন। যাকে খুশি বেশি দিন, যাকে মন চায় কম দিন। এর জন্য আমি আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করব না। এ কারণে স্ত্রীদের মাঝে সমতা রক্ষা করে চলা তাঁর জন্য ফরজ ছিল না। পক্ষান্তরে উম্মতের প্রতিজন লোকের জন্য সমতা বজায় রাখা ফরজ। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে কখনও এই অধিকার প্রয়োগ করেননি। বরং প্রতিটি জিনিসে, প্রতিটি সম্পদে সমতা বজায় রেখেছেন এবং প্রত্যেকের মালিকানা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সারা জীবন তাঁদের হক পুরোপুরি আদায় করেছেন।

সারকথা

যাহোক, এই হাদীস ও আয়াতগুলোতে যে মূলনীতিটি বর্ণনা করা হয়েছে, আমরা যাকে ভুলে বসেছি, তা হলো লেনদেনের পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতা। অর্থাৎ– লেনদেন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হতে হবে এবং তাতে কোনো রকম অস্পষ্টতা ও জটিলতা থাকতে পারবে না। একজন মানুষ চাই সে পুরুষ হোক কিংবা নারী তার লেনদেন পরিষ্কার থাকতে হবে। এটি ছাড়া আয়-ব্যয় শরীয়তের সীমানার ভেতরে থাকে না।

আল্লাহপাক আমাদের প্রত্যেককে এই বিধানটি বুঝবার ও সে মোতাবেক আমল করার তাওফীক দান করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত– খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৭৪-৯২
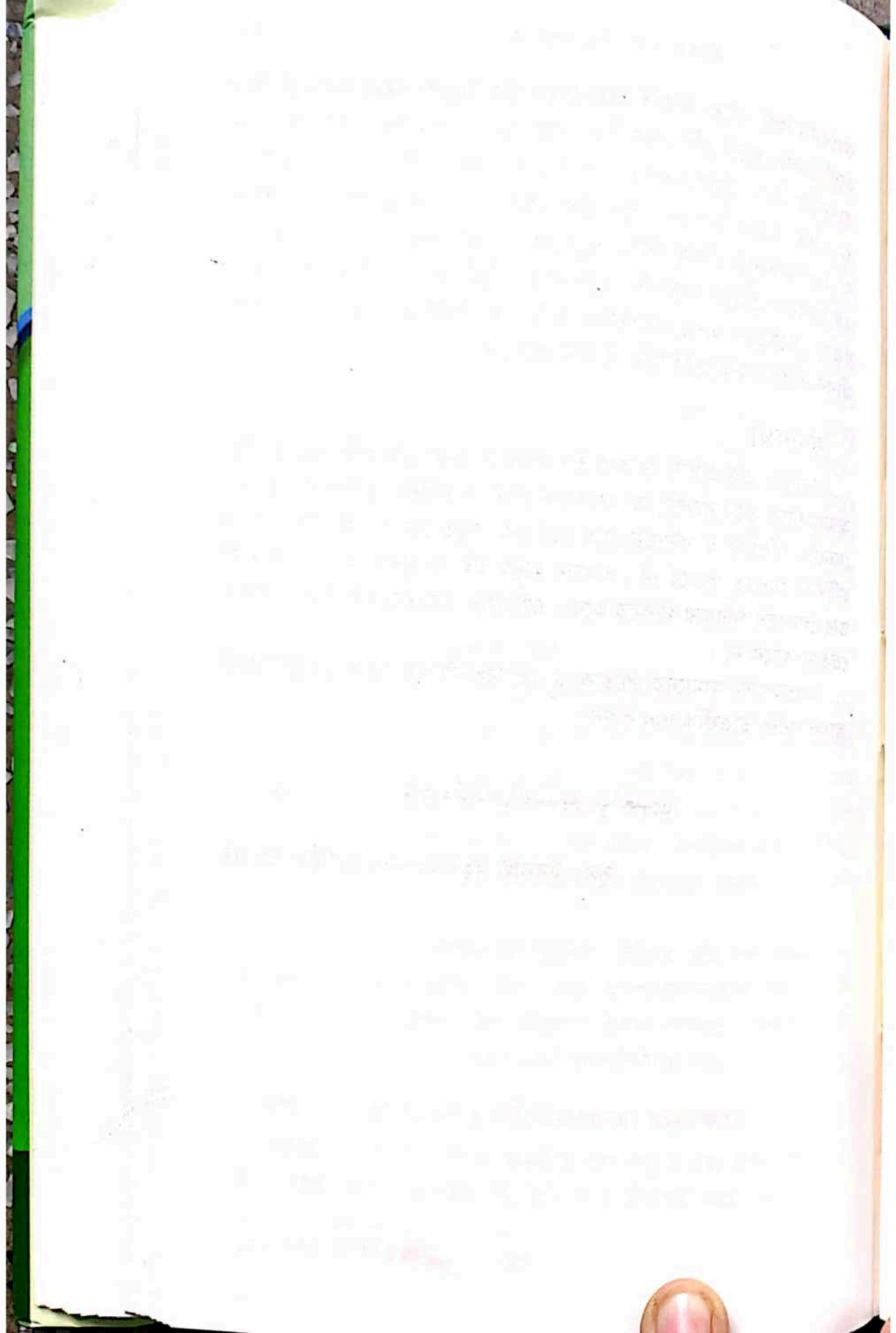
লেনদেনে পরিচ্ছন্নতা ও ঝগড়া-বিবাদ

আমাদের সমাজে পারস্পরিক কলহ ও ঝগড়া-বিবাদের যে ঝড় বইছে, তার সামান্য ধারণা আমরা আদালতে দায়ের হওয়া মামলাগুলো থেকে লাভ করতে পারি। কিন্তু এই চিত্র নিশ্চয় বাস্তবতার তুলনায় একেবারেই কম। পারস্পরিক বিবাদ নিরসনে আদালতে যে কটি মামলা দায়ের হয়ে থাকে, বিবাদ-বিসম্বাদের ঘটনা বাস্তরে তার চেয়ে বহু গুণ বেশি। কারণ, বহুসংখক ঘটনা এমন ঘটে, যার বিপরীতে আদালতে মামলা দায়ের হয় না। আদালতে মামলা দায়ের করতে হলে অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। তারপর মামলা চালাতে সময়, শ্রম ও অর্থের যে জোগানটা দিতে হয়, তা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না বলে তারা মামলা করতে আদালতে যায় না।

অনেকের আবার প্রচলিত বিচারব্যবস্থা ও এখানে এসে সুবিচার পাওয়ার ব্যাপারে আস্থাহীনতার কারণে আদালতে না এসে নীরবে নির্যাতন সহ্য করে যায় আর আশা ও অপেক্ষায় থাকে যে, মহান আল্লাহ কবে এর সুবিচার করবেন। বাস্তবতাও প্রায় এ রকমই যে, সাধারণত নির্যাতিত ব্যক্তিরা আদালতে গিয়ে সুবিচার পায় না এবং বিচারের রায়ের জন্য বছরের-পর-বছর অপেক্ষা করতে হয়। এমন হয় যে, একটি মামলার রায় পেতে কয়েক পুরুষের জুতা ক্ষয় হয়ে যায় এবং বিচারপ্রার্থীরা এই মামলার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফলে এহেন তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে নিরীহ মানুষ নির্যাতিত হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় না।

তো বলছিলাম, আমাদের সমাজে পরস্পর কলহ ও ঝগড়া-বিবাদের ঝড় বইছে। প্রশ্ন হলো, এসব বিবাদের কারণ কী? কোন সূত্রে এসব বিবাদ জন্ম নিচ্ছে? উত্তর হলো, আমরা যদি একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকাই, তা হলে দেখতে পাব, এখানেও সব চেয়ে বড় ও প্রধান কারণ হলো লেনদেনের সেই অস্বচ্ছতা। জমি-জিরাতের বিবাদ দেখতে-না-দেখতে পরম বন্ধুকেও মুহূর্তমধ্যে ঘোর শত্রুতে পরিণত করে দেয়। পারস্পরিক হৃদ্যতা ও ভালবাসার ঘরে আগুন লাগিয়ে ভস্ম করে দেয়।

এই বিবাদ ও কলহের অনেক কারণ আছে। প্রধান কারণটি হলো, লেনদেনে অস্বচ্ছতা ও অপরিচ্ছন্নতা। আমাদের ধর্মের একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো, 'জীবন যাপন করো আপন ভাইয়ের মতো। কিন্তু লেনদেন করো অপরিচিতের মতো।'

মানে নিত্যদিনকার জীবন যাপনে একজন আরেকজন এমনভাবে আচরণ করো, যেন তোমরা এক মায়ের দুই সন্তান – যেন তোমরা আপন ভাই। কিন্তু আপন ভাইয়ের সঙ্গেও যদি টাকা-পয়সা বা জমি-জিরাতের লেনদেন করতে হয়, তা হলে এমনভাবে করো, যেন তোমরা অপরিচিত – কেউ কাউকে চেন না। দুজনের মাঝে পরম বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকলেও লেনদেন যেন পরিচ্ছন্ন হয়। কোনো অস্পষ্টতা, কোনো সংশয়-সন্দেহ যেন না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রেখো। যদি পারস্পরিক হৃদ্যতা, ভালবাসা ও সুসম্পর্ক থাকা অবস্থায় দ্বীনের এই শিক্ষাটির উপর আমল কর, তা হলে তোমাদের এই সম্পর্ক অটুট থাকবে। অনেক সমস্যা ও বিবাদ থেকে তোমরা মুক্ত থাকতে পারবে।

কিন্তু আমাদের সমাজে ইসলামের এই মূল্যবান নীতিটির অনুসরণ না থাকার মতো। এই মূল্যবান নীতিটি আমাদের কাছে চরমভাবে অবহেলিত। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এ রকম :

১. অনেক সময় কয়েক ভাই কিংবা পিতা-পুত্র মিলে যৌথভাবে একটি কারবার পরিচালনা করে এবং কোনো হিসাব ছাড়া প্রত্যেকে যৌথ তহবিল থেকে নিয়ে যার-যার ইচ্ছামতো ব্যয় করে। এই কারবারে কার অবস্থান কী এমন কোনো সিদ্ধান্ত থাকে না। সবাই কি এই কারবারে বেতনের ভিত্তিতে কাজ করছে? নাকি তারা কারবারের অংশীদার? বেতনের ভিত্তিতে হলে কার বেতন কত? অংশীদার হলে কার অংশ কত? এ রকম কোনোই স্বচ্ছতা থাকে না। ব্যস, যার যখন যা মন চাইল, নিল আর খরচ করল। কেউ যদি প্রস্তাব বা পরামর্শ প্রদান করে যে, বিষয়গুলো স্থির করে নেওয়া দরকার, তা হলে একে সম্প্রীতি ও ঐক্যের পরিপন্থী মনে করা হয়। মনে করা হয়, এই নিয়ম পালন করা হলে ভাইয়ে-ভাইয়ে, পিতায়-পুত্রে খাতির নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত এসব কী দেখছি? আমরা হরদমই দেখতে পাচ্ছি যে, এ ধরনের কারবারের ফলাফল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নানা রকম সমস্যা বিবাদ জন্ম দিচ্ছে। প্রথমে অন্তরে ধীরে-ধীরে মনোমালিন্য জন্ম নিতে থাকে। বিশেষ করে ভাইয়েরা যখন একজন-একজন করে বিবাহ করে, তখন সবাই ভাবতে থাকে, অন্যরা বোধহয় আমার চেয়ে বেশি খরচ করছে। তহবিল থেকে অন্যরা মনে হয় আমার চেয়ে বেশি নিচ্ছে। আমি বোধহয় ঠকে যাচ্ছি। সবাই এমনটি ভাবতে থাকে। তারপর উপরে-উপরে খাতির বহাল থাকলেও ভেতরে-ভেতরে বিরোধ দানা বাঁধতে থাকে।

অবশেষ এই মনোমালিন্য আর সংশয় দুয়ে মিলে পাহাড়ে পরিণত হয়, তখন বিস্ফোরণ ঘটে। আন্তরিকতা, হৃদ্যতা ও সম্প্রীতির সব দাবি বালির বাঁধের মতো উড়ে যায়। মুখের ভাষা 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে আর 'তুমি' থেকে

'তুই'য়ে বদলে যায়। ঝগড়া থেকে শুরু হয়ে ইতিহাস মামলা পর্যন্ত গড়ায়। ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে আদালতে দাঁড়ায়। এক ভাই আরেক ভাইকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। ভাইয়ে-ভাইয়ে কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়। এক ভাই আরেক ভাইয়ের চেহারা দেখতে নারাজ হয়ে যায়। কারবারে যে-অংশ যার হাতে আসে, সে-ই মনে করে, এটি আমার সম্পদ; সে-ই তা হাত করে নেয়। যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ কুক্ষিগত করার মহড়া শুরু হয়ে যায়। সবার জীবন থেকে ন্যায়-অন্যায়ের ভেদাভেদ উঠে যায়। একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতায় নেমে পড়ে।

যেহেতু বছরের-পর-বছর পরিচালিত যৌথ কারবারটির না কোনো নীতিমালা ছিল, না কোনো নিয়ম স্থির করা ছিল, না কোনো হিসাব ছিল, সেজন্য সমস্যার সমাধানে বসেও কোনে কূল-কিনারা খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনভাবে জট লেগে যায় যে, কী করে এই সমস্যার সমাধান করা হবে, কেউই তার কোনো আগা-মাথা ধরতে পারে না। বিবদমান পক্ষগুলোর প্রত্যেকেই ঘটনাপ্রবাহকে আপন-আপন স্বার্থের আয়নায় দেখার চেষ্টা করে বিধায় সমঝোতার সর্বজনগ্রাহ্য কোনো ফর্মুলা বের করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এসব অনাচার সাধারণত এ কারণে তৈরি হয় যে, কারবারের শুরুতে কিংবা একাধিক ব্যক্তির অংশগ্রহণের সময় আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে নেওয়া হয় না যে, কারবারটি কীভাবে পরিচালিত হবে। যদি শুরুতেই স্পষ্ট করে নেওয়া হতো যে, কার অবস্থান কী এবং কার অংশ ও অধিকার কতটুকু, তা হলে সমস্যা ও জটিলতা তৈরি হওয়ার পথ শুরুতেই বন্ধ হয়ে যেত।

সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াতটি পবিত্র কুরআনের সব চেয়ে বড় আয়াত। এই আয়াতে আল্লাহপাক সমস্ত মুসলমানকে এই নির্দেশনা প্রদান করেছেন যে, তোমরা যখন বাকির লেনদেন করবে, তখন চুক্তিটি লিখে নিয়ো।

এই আয়াতের শুরুতে আল্লাহপাক বলছেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অপরের সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার করবে, তখন লিখে রাখবে...।'[১৩১]

বাকির কারবার একটি সাধারণ লেনদেন। এই লেনদেনই যখন লিখে রাখার আদেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন বড় কারবারে জটিল বিষয়গুলো স্থির করে লিখে রাখা কতখানি প্রয়োজন, তা আমরা চিন্তা করলেই অনুমান করতে পারি।

---

১৩১. বাকারা : ২৮২

আল্লাহপাক এই বিধানটি এজন্য প্রদান করেছেন, যাতে ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা বা বিবাদ তৈরি হতে না পারে। আর যদি হয়েও যায়, তা হলে যেন সমাধান করা সহজ হয়।

কাজেই কোনো কারবারে যদি একাধিক ব্যক্তি কাজ করে, তা হলে প্রথম পদক্ষেপেই ঠিক করে নিতে হবে, এখানে কার অবস্থান কী। এমনকি যদি পিতার কারবারে পুত্র সম্পৃক্ত হয়, তা হলেও প্রথম দিনই সিদ্ধান্ত করে নিতে হবে, সে বেতনের ভিত্তিতে কাজ করবে, নাকি কারবারের যথারীতি অংশীদার হবে। নাকি কোনো প্রকার সুযোগ-সুবিধা না নিয়ে এমনিতেই পিতাকে সহযোগিতা করবে। যদি সিদ্ধান্ত হয়, সে বেতনের ভিত্তিতে কাজ করবে, তা হলে ঠিক করে নিতে হবে, তার বেতন কত। আর তখন এটাও স্পষ্ট করে নিতে হবে যে, এই কারবারে তার কোনো অংশীদারিত্ব থাকবে না। আর যদি এই সিদ্ধান্ত হয় যে, পুত্র পিতার কারবারে অংশীদার হবে, তা হলে তখনকার জন্য শর্ত থাকবে, তাকে এই কারবারে কিছু বিনিয়োগও করতে হবে। বিনিয়োগ ছাড়া কারবারে অংশীদার হওয়া যায় না। পুত্রের যদি কোনো অর্থ না থাকে, তা হলে পিতা কিছু অর্থ দান করে বলতে পারেন, এই টাকা দ্বারা তুমি আমার কারবারের একটি অংশ ক্রয় করে নাও।

দ্বিতীয় পর্যায়ে যা করতে হবে, তা হলো, যা-যা সিদ্ধান্ত হবে, সবগুলো ধারা চুক্তির আকারে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। তা ছাড়া এই পদ্ধতিতে এটাও ঠিক করে নিতে হবে, এখানে মুনাফার কে কত অংশ পাবে, যাতে পরে কোনো সমস্যা তৈরি হতে না পারে।

যদি কোনো একজন অংশীদারের কাজ বেশি করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তা হলে এটাও স্থির করে নিতে হবে যে, এই বাড়তি কাজ তিনি কোন কথার উপর করবেন। এই কাজ কি তিনি কোনো বিনিময় ছাড়া এমনিতেই করবেন, নাকি এর জন্য তাকে বাড়তি কোনো সুবিধা প্রদান করা হবে। যদি বাড়তি কোনো সুবিধা প্রদান করার সিদ্ধান্ত হয়, তা হলে তা কী হবে এবং কীভাবে প্রদান করা হবে।

মোটকথা, প্রতিটি পক্ষের দায়িত্ব ও প্রাপ্য এতটুকু স্পষ্ট থাকতে হবে, যাতে কোনো সমস্যা তৈরি হতে না পারে, কোনো অস্পষ্টতা যেন অবশিষ্ট না থাকে।

কোনো কারবার যদি এসব নিয়মনীতির অনুসরণ ছাড়াই শুরু হয়ে যায়, তা হলে তাদের উচিত, বিষয়টিকে এভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ফেলে না রেখে নিয়মগুলো কার্যকর করে নেওয়া। এ ক্ষেত্রে লজ্জা, মানবতা ও মানুষের ভর্ৎসনা-তিরস্কারকে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার সুযোগ না দিয়ে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ এই

বিধানটির অনুসরণ করা-ই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে। মনে রাখবেন, লেনদেনের স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতাকে মানবতা ও ঐক্যের পরিপন্থী জ্ঞান করা অনেক বড় একটি প্রবঞ্চনা। বরং এটি ঐক্য ও পারস্পরিক হৃদ্যতা-আন্তকিরতার একটি নিয়ামক। লেনদেনে স্বচ্ছত না থাকলেই বরং ঐক্য বিনষ্ট হয় ও আন্তরিকতা ক্ষুন্ন হয়।

আর সেজন্যই ইসলামের শিক্ষা হলো, 'বসবাস করো ভাইয়ের মতো; কিন্তু লেনদেন করো অপরিচিতের মতো।'

২. অনুরূপভাবে এমনও হয়ে থাকে যে, পিতা একটি বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছেন। ছেলেরাও যার-যার সাধ্য-সামর্থ্য অনুপাতে তাতে কিছু-কিছু অর্থ প্রদান করল। কিন্তু যে যা দিল, কোনোই চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকেই দিল এবং এর কোনো হিসাব থাকল না। এমন কোনো সিদ্ধান্তও হলো না যে, সন্তানরা এই অর্থ কোন কথার উপর দিল। পিতাকে এমনিতেই দিয়ে দিল, নাকি এর বিনিময়ে বাড়ির মালিকানার অংশ নেবে, নাকি পিতাকে ঋণ দিল।

ব্যাপার যদি প্রথমটি হয়, তা হলে এর বিনিময়ে ছেলে না বাড়ির মালিকানায় কোনো অংশ পাবে, না পিতার কাছ থেকে এই অর্থ ফেরত নিতে পারবে। যদি ঋণ দিয়ে থাকে, তা হলে পিতা একা বাড়ির মালিক হবেন। কিন্তু প্রদত্ত অর্থ যেকোনো সময় ফেরত নিতে পারবে এবং পিতাও তাকে উক্ত অর্থ ফেরত দিতে হবে। এই অর্থ পিতার দায়িত্বে ঋণ হিসেবে থাকবে।

পদ্ধতি যদি তৃতীয়টি হয় যে, ছেলে পিতার এই বাড়ির অংশীদারত্বের ভিত্তিতে এই অর্থ প্রদান করেছে, তা হলে সে আনুপাতিকহারে বাড়ির মালিকানায় অংশীদার হবে এবং বাড়ির মূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি তার সম্পদেও প্রবৃদ্ধি ঘটবে।

তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক-একটি পদ্ধতির দাবি ও ফলাফল আলাদা। কিন্তু যেহেতু টাকা দেওয়ার সময় এর কোনোটিই স্পষ্ট করা হয়নি, কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি, তাই ভবিষ্যতের জন্য সমস্যার সূত্র তৈরি হয়ে রইল। এক সময় বাড়ির মূল্যমান বাড়বে। তখন মনে-মনে হিসাব সব পাল্টে যাবে। এক-একজন এক রকম চিন্তা করবে। সবাই নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখার চেষ্টার করবে। আর সমস্যা ও বিরোধ ডাল-পালা গজাতে থাকবে। বিশেষ করে পিতার মৃত্যুর পর যখন তার ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টনের পালা আসবে, এই বিরোধ একটি সমাধান-অযোগ্য সমস্যার রূপ ধারণ করবে। এর সূত্র ধরে ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে আর এই বিবাদ গোটা বংশের উপর প্রভাব ফেলবে।

এটি কাল্পনিক কোনো সমস্যা নয়। যেখানে-যেখানে এই অনিয়ম আছে, সেখানেই এমন অশান্তির আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলছে।

যদি নির্মাণকাজ শুরু করার আগেই ইসলামের বিধান অনুসারে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থির করে নেওয়া হয় আর তা লিখে সংরক্ষণ করে রাখা হয়, তা হলে পারিবারিক বিবাদের এই ধারা ও পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

৩. যখন পরিবারের বড় কেউ মৃত্যুবরণ করে, তখন শরীয়তের বিধান হলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার ত্যাজ্য সম্পত্তিগুলো শরয়ী ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টিত হয়ে যাক। কিন্তু আমাদের সমাজে ইসলামের এই বিধানটির ব্যাপারে চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। অনেক সময় এমনও হয় যে, যার যা হাতে আসে, নিয়ে যায় এবং হারাম-হালালের কোনোই বাছ-বিচার করা হয় না। অনেক সময় এমনও হয় যে, কেউ কোনো দুর্নীতি করে না বটে; কিন্তু অজ্ঞতা কিংবা অবহেলার কারণে মীরাছ বন্টনই হয় না। মৃত ব্যক্তি যদি কোনো কারবার রেখে গিয়ে থাকেন, তা হলে যে ছেলে মরহুমের জীবদ্দশায় এই কারবারে কাজ করত, সে-ই সব দখল করে রাখে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত হয় না যে, এখন এই কারবারের মালিকানায় কার অংশ কতটুকু। শরয়ী ওয়ারিশদের অংশ কিভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। যারা এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে, তাদের বেতন-ভাতা কীভাবে পরিশোধ করা হবে। সম্পত্তির কোন জিনিসটি কে পাবে। এসব ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত তো হয়ই না, বরং উল্টো কেউ এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাকে বাঁকা চোখে দেখা হয় এবং এমন চিন্তাকে দূষণীয় মনে করা হয় যে, লোকটার মৃত্যুর পর এখন পর্যন্ত তার কাফনও ময়লা হলো না; অথচ তার সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারার চিন্তা শুরু হয়ে গেছে!

অথচ এই বাটোয়ারা এক দিকে যেমন শরীয়তের বিধান, অপর দিকে লেনদেনের স্বচ্ছতারও দাবি। এই বিধান লঙ্ঘনের পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ওয়ারিশদের আপন-আপন পাওনার কথা মনে পড়তে শুরু করে আর মনোমালিন্য তৈরি হতে থাকে। ত্যাজ্য সম্পত্তির নানা জিনিসের দাম বেড়ে যায়। আগের মূল্যে আর বর্তমান মূল্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু আগে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখা হয়নি, তাই এবার বিষয়টি তালগোল পাকিয়ে যায়। ফলে উপযুক্ত কোনো সমাধান খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়ে আর বিবাদ-কলহের মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটে। যদি ইসলামের বিধান অনুপাতে তাৎক্ষণিকভাবে ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন করে ফেলা হয় এবং সবগুলো সিদ্ধান্ত পারস্পকির সম্মতির ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়, তা হলে আর ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা দেখা দেওয়ার সুযোগ থাকে না আর পারস্পরিক সম্প্রীতিও অটুট থাকে।

এখানে আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি বিষয় তুলে ধরলাম। অন্যথায় যদি সমাজে ছড়িয়ে থাকা ঝগড়া-বিবাদগুলোর খোঁজ নেই, তা হলে আমরা বুঝতে পারব, লেনদেনে অপরিচ্ছন্নতা ও অস্বচ্ছতা আমাদের সমাজের এমন এক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে, যার আগুনে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। লেনদেন ছোট হোক কিংবা বড়; পরিচ্ছন্ন হতে হবে। তার শর্তাবলি ও নীতিমালায় কোনো রকম অস্পষ্টতা থাকতে পারবে না। আর এই কাজগুলো করতে হবে খোলামনে। কোনো প্রকার লজ্জা বা মানবতাকে এখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে দেওয়া যাবে না। এই নীতিমালা অনুসারে লেনদেন করে এবার যত পার অপরের সঙ্গে সদাচার করো। 'বসবাস করো ভাইয়ের মতো আর লেনদেন করো অপরিচিতের মতো' কথাটির এটি-ই মর্ম।

সূত্র : যিকর্ ও ফিক্‌র– পৃষ্ঠা : ৮৩
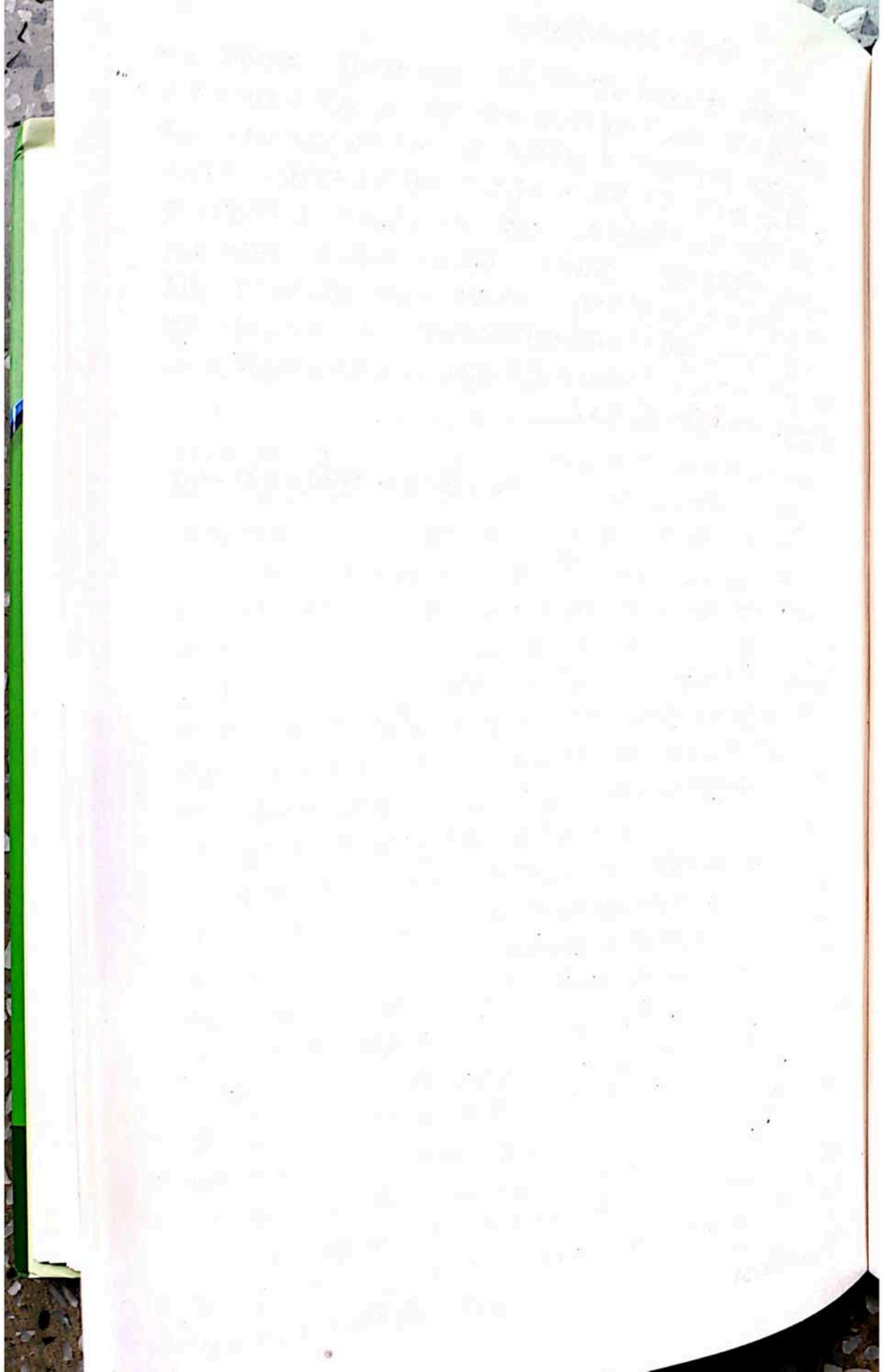
আমাদের অর্থনীতি

একটি জাতির অর্থনৈতিক অবস্থাকে ভালো তখন বলা যায়, যখন তার প্রতিজন সদস্য যার-যার নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল জিনিস সহজে লাভ করতে সক্ষম হয়। দেশের উৎপাদন ও আমদানি যদি বেশি হয়, তা হলে দেশের সকল নাগরিক তার বরকত দ্বারা উপকৃত হয় এবং সম্পদ বণ্টনে কাউকে কারও বিরুদ্ধে অবিচারের কোনো অভিযোগ করতে হয় না। পক্ষান্তরে যদি দেশের সমস্ত সম্পদ গুটিকতক মানুষের হাতে কুক্ষিগত হয়ে যায়, জাতির বেশিরভাগ মানুষকে খাদ্যাভাবের কান্না কাঁদতে হয়, ধনীদের সম্পদের পাহাড় আরও উঁচু হতে থাকে এবং শ্রমজীবি মানুষের নুন আনতে পান্তা ফুরানোর দশা তৈরি হয়, তখন দেশের মাটি যদিও সোনা উদ্গীরন করতে থাকে কিংবা কারখানাগুলোতে যদিও মণি-মুক্তা উৎপাদন হতে শুরু করে, তাতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বলা যাবে না। এটি সেই সামাজিক দেউলিয়াত্ব, যার উপস্থিতিতে কোনো জাতির উন্নতির শিখরে আরোহণের প্রশ্নই আসে না।

এটি আমাদেরই কর্মেরই কুফল যে, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, উপর থেকে দেখলে প্রতীয়মান হয়, দেশ বিগত ২৬ বছরে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসার প্রতিটি অঙ্গনে বেশ উন্নতি সাধন করেছে। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি যখন গঠিত হয়, তখন আমাদের হাতে কিছুই ছিল না। কিন্তু আজ আল্লাহর ফযলে অনেক কিছু আছে। কিন্তু সাধারণ নাগরিকদের ব্যক্তিজীবন অধ্যয়ন করলে আমরা জানতে পারব, দেশের সমুদয় সম্পদ গুটিকতক পরিবারের হাতে কুক্ষিগত হয়ে আছে, যার দ্বারা সর্বসাধারণের কোনোই উপকার হচ্ছে না। চারটা ডাল-ভাতের প্রচেষ্টায় তাদের এখন আগের চেয়েও বেশি গলদঘর্ম হতে হচ্ছে। বিত্তের এই চমক তাদের মলিন মুখে হাসির আভা ফোটাতে পারেনি। তাদের জীবন এখন আগের চেয়েও বেশি দুর্দশার শিকার।

এমনটি কেন হলো? এই প্রশ্নের উত্তর একেবারে পরিষ্কার। আমাদের দেশে দীর্ঘদিন যাবত আধা জাগিরদারি ও আধা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অত্যন্ত ঘৃণ্য চেহারা নিয়ে প্রচলিত আছে। পশ্চিমাদের দুশো বছরের গোলামি আমাদের মন-মস্তিষ্ককে এমন ছাঁচে ঢেলে সাজিয়েছে যে, আমরা নিজেদের সমস্যাবলিকে নিজেদের মতো করে চিন্তা করার পরিবর্তে চোখ বন্ধ করে তাদেরই শেখানো ধারায় সমাধানের চেষ্টা করে থাকি। জীবনের অন্যান্য বিভাগগুলোর মতো

আমাদের অর্থনীতির ইমারতকেও আমরা সেই ভিত্তিগুলোরই উপর নির্মাণ করেছি, যাব উপর পুঁজিবাদী শাসকরা তাদের সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বলা অনাবশ্যক যে, এমত পরিস্থিতিতে আমরা সেই অস্থিরতা ও অশান্তি ছাড়া আর কিছু পেতে পারি না, যা পুঁজিবাদী অর্থনীতির কপালে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

বছরের-পর-বছর পরীক্ষা করার পর এখন আমাদের এই অনুভূতি আলহামদুলিল্লাহ জন্মাতে শুরু করেছে যে, এই পথ উন্নতির নয় – ধ্বংসের। আমাদের অধিকাংশ মানুষ এখন ভাবতে বাধ্য হচ্ছে যে, আমাদের অর্থনৈতিক অসমতার দায় সবটুকুই বিদ্যমান পুঁজিবাদী ও জাগিরদারি ব্যবস্থার ঘাড়ে বর্তায়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, এখনও আমাদের মস্তিষ্ক পশ্চিমাদের চিন্তাগত প্রভাব থেকে এতটা মুক্ত হতে পারেনি যে, নিজেদের মাথায় বিকল্প পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারি। তার পরিবর্তে আমরা এখনও সমস্যার সমাধান পেতে আমরা সেই পশ্চিমাদেরই দ্বারস্থ হচ্ছি এবং এমন কোনো সমাধান মেনে নিতে প্রস্তুত হইনি, যেটি পশ্চিমাদের দ্বারা স্বীকৃত নয়।

ফলে আমাদের মধ্য থেকে একটি শ্রেণী খুব জোরে-সোরে সমাজতন্ত্রের স্লোগান দিয়ে বেড়াচ্ছে। অথচ সমাজতন্ত্রও পশ্চিমাদেরই সেই বস্তুবাদী সভ্যতার ফসল, যে সভ্যতা পুঁজিবাদকে জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান না তার কাছে ছিল, না এর কাছে আছে। ওটা যদি বাড়াবাড়ি ছিল. তা হলে এটা হলো ছাড়াছাড়ি। ভারসাম্য ওটাতেও ছিল না, এটাতেও নেই। শ্রমজীবি মানুষ ও কৃষক শ্রেণী যদি ওখানে নিপীড়িত ও নির্যাতিত ছিল, তা হলে এখানেও তারা কম অসহায় নয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রাসাদ যে ভিত্তির উপর নির্মাণ করা হয়েছিল, তা ছিল এই – মানুষ পুঁজির একচ্ছত্র মালিক। দৈনন্দিন জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়াও উৎপাদনের উপরও তাদের মালিকানা শর্তহীন ও স্বাধীন। তারা যেভাবে খুশি তা ব্যবহার করতে পারবে, যে কাজে ইচ্ছা লাগাতে পারবে। যে পদ্ধতি ও পন্থায় ইচ্ছা তার দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। নিজের উৎপাদিত পণ্যের যা খুশি মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে। যত লোক দ্বারা যেভাবে ইচ্ছা কাজ নিতে পারবে। এক কথায় পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় নিজের কায়-কারবারে মানুষ পুরোপুরি স্বাধীন। এখানে রাষ্ট্রের কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ চলবে না। যদিও নানা সমস্যায় পড়ে অভিজ্ঞতার আলোকে ধীরে-ধীরে এই শর্তহীন মালিকানার উপর কিছু-কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপও করা হয়েছে। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি আজও বহাল আছে যে, মানুষ পুঁজির একচ্ছত্র মালিক এবং কিছু সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাসহ সম্পদের পাহাড় গড়া যে কারও জন্য বৈধ। এই দৃষ্টিভঙ্গির

উপর ভিত্তি করে সুদ, জুয়া, লটারি ও মজুদদারিকে এই ব্যবস্থায় মায়ের দুধের মতো উপকারী ও উপাদেয় মনে করা হয়। আর এই বিষয়গুলো এই অর্থব্যবস্থার চার মূল উপাদানের মর্যাদা রাখে।

এই অর্থব্যবস্থার যে কুফল জগত প্রত্যক্ষ করেছে এবং আজও প্রত্যক্ষ করছে, তা হলো, সমাজে সম্পদের প্রবাহ অতিশয় অসম ও ভারসাম্যহীনভাবে চলছে। একজন পুঁজিপতি সুদ, জুয়া, লটারি ও মজুদদারি এই চারটি পন্থা অবলম্বন করে এই চারদিকে হাত মেরে বিপুল পরিমাণ অর্থ হস্তগত করে এবং সম্পদের এই বিশাল ভাণ্ডারকে পুঁজি বানিয়ে গোটা বাজারের নিয়ন্ত্রণ হাত করে নেয়। কৃত্রিমভাবে পণ্যমূল্য বাড়ায়-কমায়। অপ্রয়োজনীয় এমনকি ক্ষতিকর পণ্যগুলোকে জোরপূর্বক বাজারে ছড়িয়ে দেয় এবং জাতির প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কৃত্রিম সংকট তৈরি করে অধিক মুনাফা লুটে নেয়। এমনকি এই ব্যবস্থায় একাধিকবার দেখা দেখে গেছে, ঠিক যে সময়টিকে সমাজের মানুষ খাদ্যের অভাবে অনাহারে-অর্ধাহারে দিশেহারা হয়ে জীবন অতিবাহিত করছে, তখন অতি মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে খাদ্যদ্রব্য ভর্তি জাহাজটিকে সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছে বা গুদামে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, যাতে এই পণ্যগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে বাজারে এসে ন্যায্য মূল্যে ভোক্তা সাধারণের চাহিদ পূরণ করতে না পারে এবং পণ্যটির যে মূল্য ব্যবসায়ীরা নির্ধারণ করে নিয়েছে, তাতে কোনো প্রকার প্রভাব পড়তে না পারে।

বলাবাহুল্য যে, পুঁজিপতিদের এই কারবারি কানামাছি খেলার মধ্যে সাধারণ মানুষেরা উন্নতি করার সুযোগ পায় না। তাদের আয় সীমিত থাকে আর ব্যয় দিন-দিন বাড়তে থাকে। তাদের জীবন গুটিকতক মানুষের ব্যক্তিস্বার্থের অনুগামী হয়ে থাকে। সম্পদের এই কুক্ষিগতকরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সমগ্র জাতির শুধু অর্থনীতিরই উপর পতিত হয় না, বরং নৈতিকতা ও চরিত্রের উপরও এর এর প্রভাব পড়ে থাকে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিও এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে না।

সমাজতন্ত্র মাঠে এল। সে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই ত্রুটিগুলো দেখল ঠিক; কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ও সুস্থ মস্তিষ্কে তার কোনো প্রতিকার করতে সক্ষম হলো না এরং সে বিষয়টির ঠিক অপর প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। পুঁজিপতিরা বলেছিল, মানুষ ব্যক্তিগতভাবে তার উৎপাদনের মালিক। মানে সেখানে ব্যক্তিমালিকানা শর্তহীনভাবে স্বীকৃত ছিল। সমাজতন্ত্র এসে বলল, কোনো ব্যক্তি কোনোভাবেই উৎপাদনের মালিক নয়। জমি ও কারখানাগুলোকে জাগিরদার ও পুঁজিপতিদের মালিকানা থেকে একদম বের করে দাও। তা হলে সেই বাঁশটি আর থাকবে না, যার দ্বারা অবিচারের বাঁশি বাজানো হয়।

তারা নীতি ঠিক করল, শ্রমজীবি জনতার নির্বাচনের মাধ্যমে একটি কমিটি বানাও আর দেশের সমস্ত জমি ও মিল-কারখানাগুলো ব্যক্তিমালিকানা থেকে বের করে এনে তার হাতে তুলে দাও। এই দলটি একটি সরকার গঠন করে একটি পরিকল্পিত অর্থনীতির রূপ দান করবে। তারা-ই সিদ্ধান্ত দেবে, কোন জিনিস উৎপাদন করতে হবে। তারপর তারা-ই শ্রমজীবি মানুষগুলোকে কাজে লাগিয়ে পণ্য ও ফসল উৎপাদন করবে এবং তারা-ই এই উৎপাদিত পণ্য ও ফসলগুলোকে আনুপাতিকহারে শ্রমিকদের মাঝে বিতরণ করে দেবে।

এই প্রস্তাবনাটি অত্যন্ত জোরে-শোরে উপস্থাপন করা হলো এবং বলা হলো, এই কর্মনীতির মাঝে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিটি দুঃখ ও বেদনার উপশম রয়েছে। কিন্তু ফলাফল কী দাঁড়াল? গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এই অর্থব্যবস্থা শুধু নতুন কিছু সমস্যার জন্ম দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং শ্রমিকদের আগেকার আপদগুলোকেও প্রায় সেভাবেই বহাল রাখল।

এই নীতিটি বাস্তবায়ন করতে গেলে কী পরিমাণ সমস্যার মুখোমুখী হতে হবে এবং এই ব্যবস্থাটি চরম একনায়কতন্ত্র ছাড়া চলতে পারে কিনা, এই ব্যবস্থাটি চালু হলে শ্রমজীবি মানুষের কোনো স্বাধীনতা থাকবে কি-না এবং এই ব্যবস্থায় আদর্শ ও নীতি-নৈতিকতার কোনো বালাই আছে কি-না এসব আলোচনা না হয় পরে করলাম। তার আগে আমরা অন্য একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। আর তা হলো, একমাত্র শ্রমজীবি ও সাধারণ মানুষের নামে আত্মপ্রকাশ করা এই ব্যবস্থাটিতে জনসাধারণ রাষ্ট্রের সম্পদের কত অংশ পায়? বলাবাহুল্য যে, যে লোকগুলো সরকার পরিচালনা করে, তারা সমাজের বড়জোর পাঁচ ভাগ। এই লোকগুলো আকাশ থেকে নেমে আসা ফেরেশতা হয় না।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকের বেলায় একজন ব্যক্তি পুঁজিপতির নিয়ত যদি খারাপ হতে পারে, তা হলে সরকার নামক এই দলটির নিয়ত খারাপ হতে পারবে না কেন? একজন নাগরিক যদি একটি কারখানার মালিক হয়ে তার অধীনদের উপর অবিচার করতে পারে, তা হলে এই দলটি রাষ্ট্রের সমস্ত ভূ-সম্পত্তি, সমস্ত মিল-কারখানা ও সমস্ত সম্পদের অধিকর্তা হয়ে তাদের অধীনদের অধিকারে খড়গ চালাবে না কেন?

ঘটনা হলো, এই ব্যবস্থায় ছোট-ছোট পুঁজিপতিদের অবসান ঘটে ঠিক; কিন্তু তাদের সবার জায়গায় বিরাট এক পুঁজিপতির আবির্ভাব ঘটে, যে কিনা বিত্তের এই বিশাল-বিস্তৃত ঝিলটিকে নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করার সুযোগ পায়। আর সেজন্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের অতি সামান্য একটি অংশ শ্রমজীবি মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়। অবশিষ্ট

সমস্ত সম্পদ শাসক দলটির দয়া ও করুণার হাতে পড়ে থাকে। সেই সম্পদকে তারা যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করে।

বাইরের দেশগুলো তো দেখতে পাচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক দেশের শিল্প ও ব্যবসা সমগ্র বিশ্বকে ছেয়ে ফেলছে। ওই দেশে উৎপাদন ও শিল্পের রমরমা অবস্থা চলছে। ওখানকার শিল্প তারকার মতো জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু মানুষ এই চিন্তাটি করে না যে, এই উন্নতির জন্য ওখানকার শ্রমজীবি মানুষগুলোকে কী পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করতে হচ্ছে এবং এই সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার থেকে তাদের থলেতে কতটুকু পড়ছে।

অন্যথায় বাস্তবতা হলো, পুঁজিবাদী দেশগুলোতে উন্নতির অর্থ যেমন গুটিকতক মানুষের উন্নতি, তেমনি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও উন্নতি মানে বিশেষ একটি শ্রেণীর উন্নতি।

সাধারণ ও শ্রমজীবি মানুষের অবস্থা একই রকম যে, দুই জায়গায়ই মনিব তাদের যতটুকু দিতে সম্মত হয়, তারা তার চেয়ে বেশি পায় না। অবশ্য দুয়ের মাঝে একটি পার্থক্য এই আছে যে, ওখানে যদি শ্রমিকরা মনে করে, আমরা বঞ্চিত হচ্ছি, আমাদেরকে ঠকানো হচ্ছে, বেতন-ভাতা যা পাচ্ছি, তাতে আমাদের চলে না, তা হলে তারা আন্দোলন, হরতাল ও অবরোধ ইত্যাদি করে চোখের পানি মোছার চেষ্টা করার সুযোগ আছে। কিন্তু এখানে তাও নেই।

তার বিপরীতে ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতির রাজপথ পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের মধ্যখান দিয়ে চলাচল করে থাকে। ইসলামের বক্তব্য হলো, এই বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি সম্পদ – চাই তা ভূমি ও কারখানার আদলে হোক বা টাকা-পয়সার আদলে হোক বা ব্যবহার্য বস্তুর আদলে হোক – এগুলোর প্রকৃত মালিক হলেন এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা। জগতের সমস্ত সম্পদ তাঁর মালিকানাধীন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলছেন :

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

'আকাশমণ্ডলিতে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর।'[১৩২]

তবে উপকৃত হওয়ার জন্য, কাজে লাগানোর জন্য এসব সম্পদ তিনি তাঁর বান্দাদের দান করে থাকেন।

---

১৩২. সূরা বাকারা : ২৮৪

إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

'নিঃসন্দেহে পৃথিবীটা আল্লাহর। তবে তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে খুশি তার মালিক বানিয়ে দেন।'[১৩৩]

তো মানুষের হাতে, মানুষের মালিকানায় যা-কিছু আছে, সবই যখন আল্লাহর দান, এমতাবস্থায় একথা বোঝা কঠিন নয় যে, তার ব্যবহারও তাঁরই মর্জি অনুসারে হতে হবে। এই সম্পদকে পুঁজি বানিয়ে অপরের উপর নিপীড়ন চালানো, একে নিজের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ হতে পারে না। আল্লাহপাক এই অনুমতি কাউতে দিতে পারেন না। এই চরিত্র আল্লাহপাক সহ্য করতে পারেন না। মানুষের কাজ হলো, সে অপরের রক্ত চোষার পরিবর্তে নিজের শেষ গন্তব্য আখেরাতের ভাবনাকে সামনে রেখে অপরের সঙ্গে ভালো আচরণ করবে। আল্লাহপাক বলছেন :

وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ ؕ

'আল্লাহ তোমাকে যা-কিছু দান করেছেন, তার মাঝে তুমি আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান করো। আর তোমার দুনিয়ার অংশের কথা ভুলে যেয়ো না। আর মানুষের উপকার করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর পৃথিবীতে অনাচারের পথ খুঁজে বেড়িয়ো না।'[১৩৪]

এই নির্দেশনাগুলোর সারমর্ম হলো, আল্লাহপাক মানুষকে ব্যক্তিমালিকানা দান করেছেন। ইসলামে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত। কিন্তু এই মালিকানা স্বাধীন, শর্তহীন ও লাগামহীন নয়। বরং আল্লাহপ্রদত্ত এই সম্পদের ব্যবহার আল্লাহপ্রদত্ত আইন ও বিধানের অধীন। মানুষ তাকে আপন-আপন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু তাকে পুঁজি বানিয়ে অন্যের উপর দস্যুতা করার অধিকার আল্লাহ দান করেননি। একে আল্লাহর বিধান অনুপাতে উপার্জন করতে হবে এবং আল্লাহরই আইন অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির যত দোষ ও সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি, মৌলিকভাবে তার কারণ চারটি। সুদ, জুয়া, লটারি ও মজুদদারির বৈধতা। একজন পুঁজিপতি এক দিকে সুদ, জুয়া, লটারি ও মজুদদারির মাধ্যমে গোটা জাতির সম্পদ টেনে-টেনে নিজের পকেটে ঢোকায় আর অপর দিকে এই সম্পদ গরিব, নিঃস্ব ও অসহায় মানুষদের পেছনে ব্যয় করতে প্রবৃত্ত হয় না। তারা

---

১৩৩. সূরা আ'রাফ : ১২৮

১৩৪. সূরা আল-কাসাস : ৭৭

ভদ্রতার খাতিরে যদি কাউকে কিছু দান করে, তা হলে তাকে নিজের করুণা মনে করে। অন্যথায় এ জাতীয় ব্যয় করতে তাদের উপর কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না।

ইসলাম প্রথমত উপার্জনের অবৈধ উপায় ও পন্থাগুলো একদম বন্ধ করে দিয়েছে। সুদ, জুয়া, লটারি ও মজুদদারির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনকে ইসলাম ঘৃণ্যতম অপরাধ সাব্যস্ত করে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

'হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা করা বৈধ।'[১৩৫]

সুদের সমস্যা হলো, বিনিয়োগ গ্রহীতার যদি ব্যবসায় লোকসান হয়ে যায়, তা হলে তার ক্ষতির সবটুকুই তাকে বহন করতে হয়। ঋণদাতার মুনাফা সকল অবস্থাতেই ঠিক থাকে। আর যদি ব্যবসায়ী লাভবান হয়, তা হলে মুনাফার সবটুকুই তার পকেটে থাকে।

ঋণদাতাকে তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগও পেতে কষ্ট হয়। এভাবে সম্পদ ছড়িয়ে যাওয়ার পরিবর্তে আরও গুটিয়ে আসে এবং সমান্তরাল পদ্ধতিতে ঘুরতে পারে না। ইসলাম তার পরিবর্তে অংশীদারত্ব ও মুদারাবা পদ্ধতির বিধান প্রদান করেছে, যাতে লাভ হলেও উভয়ের হয়, লোকসান হলেও উভয় পক্ষই তার দায় বহন করে।

জুয়া-লটারিতেও সমস্ত জাতির কিছু-কিছু অর্থ এক জায়গায় এসে পুঞ্জিভূত হয়। তারপর সেই অর্থ এক বা একাধিক পুঁজিপতির পকেটে গিয়ে ঢোকে। এখানেও সম্পদের স্বাভাবিক গতি থেমে যায়। ইসলাম কায়-কারবারের এ-জাতীয় সবগুলো পদ্ধতির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দিয়েছে, যেগুলোতে এক পক্ষের লাভ আর অপর পক্ষের লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিংবা যার মাধ্যমে গোটা জাতির সম্পদ এক জায়গায় গিয়ে পুঞ্জিভূত হতে শুরু করে।

উপার্জনের সবগুলো অবৈধ পন্থার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পাশাপাশি ইসলাম সম্পদকে পুঁজিপতিদের থেকে নিয়ে গরিবদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে যাকাত-ফিতরা ইত্যাদির বিধান প্রদান করেছে। এই ব্যয় তার করুণা নয়; বরং এটি তার বাধ্যতামূলক একটি ব্যয়। সম্পদ থাকলেই একজন বিত্তবান ব্যক্তি এটি করতে বাধ্য, যাকে আইনের মাধ্যমে উসুল করা যায়। যাকাত ছাড়াও উশর, সাদাকাতুল ফিত্‌র, কুরবানি, কাফ্‌ফারা, অসিয়ত ও মিরাছ

---

১৩৫. সূরা নিসা : ২৯

এগুলো ছোট-বড় সেই খাত, যেগুলোর মাধ্যমে সম্পদের ঝিল থেকে চারদিকে খাল বের হয়ে গোটা সমাজের শস্যখামারকে সবুজ-সতেজ করে তোলে।

এসব আইনগত বিধিনিষেধের পাশাপাশি ইসলাম সামগ্রিকভাবে যে মানসিকতা বিনির্মাণ করে, তার ভিত্তি মনের পাষাণতা, কার্পণ্য, নির্মমতা ও স্বার্থপরতার পরিবর্তে সমবেদনা, উদারতা দানশীলতা এবং সর্বোপরি আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর সেজন্যই ইসলামের একজন অনুসারীর পক্ষে এমনটি সম্ভব নয় যে, সে শুধু আইনগত দায়িত্বগুলো পালন করেই ক্ষান্ত হবে এবং তারপর মানুষের দুঃখ-বেদনা থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখবে। তাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে যে, এই জগত দিনকতকের জাঁকজমক মাত্র। সম্পদ ও অর্থ-বিত্তের সেই স্তূপের নাম সুখ নয়, যাকে এখানে সঞ্চিত করা হচ্ছে।

বরং সুখ হলো, আত্মার সেই প্রশান্তির নাম, যা আপন ভাইয়ের মুখে মুচকি হাসির রেখা দেখার পর সৃষ্টি হয় এবং যার দ্বারা আখেরাতের আগত জীবনের আনন্দের সদা প্রস্ফুটিত ফুলেরা খেলা করে।

আর সেজন্যই আমরা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পাতা উল্টালেই দেখতে পাই, তার শিক্ষামালা 'ইন্‌ফাক ফী সাবীলিল্লাহ' তথা 'আল্লাহর পথে ব্যয় করা'র নির্দেশনায় পরিপূর্ণ।

কুরআনে এমনও বলা হয়েছে :

وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

'তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে। তুমি বলে দাও, তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্তটুকু।'[১৩৬]

মোটকথা, একদিকে পুঁজিপতিদের আয়ের অবৈধ উৎসগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছে এবং অপর দিকে তাদের ব্যয়ের খাতগুলো বাড়িয়ে দিয়ে সম্পদের প্রবাহের মোড় সাধারণ সমাজের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। আক্ষেপের বিষয় হলো, অধুনা বিশ্বে এই কথাগুলো নিছক 'দৃষ্টিভঙ্গি' হয়েই রইল। অর্থনীতির এই পূত-পবিত্র ব্যবস্থাটি বর্তমান বিশ্বের কোথাও চালু নেই। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটির বাস্তব ফলাফল দেখতে হলে আমাদেরকে ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে হবে, যে যুগে মানুষ যাকাতের অর্থ নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে ঘুরে বেড়াত; কিন্তু যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত একজন মানুষও খুঁজে পেত না।

---

১৩৬. সূরা বাকারা : ২১৯

এটা আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, এমন একটি সুন্দর ও সুষম অর্থনীতি হাতে থাকা সত্ত্বেও প্রথমে আমরা আমাদের অর্থব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী চিন্তা-চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। আর এখন যখন তার কুফল সামনে আসতে শুরু করল, তখন আমাদের এমন কিছুলোক সমাজতন্ত্রের স্লোগান তুলতে শুরু করেছেন যে, সমাধান হলো, পুঁজিবাদী অর্থনীতির পরিবর্তে সমাজবাদী অর্থনীতির চালু করা। ইতিপূর্বে এরাই পুঁজিবাদী অর্থনীতির ঘৃণ্যতম অভিশাপ সুদ, জুয়া ইত্যাদিকে ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ সাব্যস্ত করতে কুরআন ও হাদীসের ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর এখন তারা সমাজতন্ত্রকে ইসলামী বানানো মানসে কুরআনের আয়াত ও আল্লাহর রাসূলের হাদীসের যা-তা ব্যখ্যা প্রদান করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। ইসলামকে যদি ভালো নাও লাগে, তারপরও যেহেতু সমস্যার সমাধান একটা করা দরকার, তাই একটিবারের জন্য হলেও এ কাজটি করুন-না যে, পশ্চিমা চিন্তাধারা থেকে কিছু সময়ের জন্য সরে এসে ইসলামী নীতিমালার উপর গভীর একটা গবেষণা চালান যে, সত্যিই এখানে আমাদের বিদ্যমান সমস্যার কোনো সমাধান আছে কি-না।

যারা ভুলবশত পুঁজিবাদ ও সমাজবাদকে নিজেদের মুক্তির পথ ভেবে বসে আছেন, আমি অতিশয় মমতার সঙ্গে তাদের প্রতি এই নিবেদন জানাচ্ছি যে, আপনার অনৈসলামী কোনো মতাদর্শে জোড়া-তালি লাগানোর পরিবর্তে ঠাণ্ডা মাথায় ইসলামকে বুঝবার চেষ্টা করুন।

একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের প্রকৃত মর্যাদা হলো, তারা পরের যাত্রা শুভ করে নিজের নাক কাটানোর পরিবর্তে না শুধু নিজেরাই ইসলামের বাস্তব নমুনায় পরিণত হবে, বরং সমগ্র বিশ্বকেও ইসলামের দাওয়াত দিবে যে, তোমরা বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির গোলক ধাঁধায় ফেঁসে গেছ।

মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের মনযিল সেই পথে চলা ছাড়া হাতে আসতে পারে না, যেটি আজ থেকে চৌদ্দশো বছর আগে মানবতার দরদী মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখিয়ে গেছেন।

সূত্র : হামারা মা'আশী নেযাম- পৃষ্ঠা : ৯

মুসলিম উম্মাহর অর্থব্যবস্থা ও ইসলামের ভিত্তিতে তাদের ঐক্য

'একবিংশ শতাব্দি ও মুসলিম উম্মাহ' এই বিষয়ের উপর 'মুতামার আল-আলামুল ইসলামী' ১৯৯৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করেছিল। উক্ত কনফারেন্সে শায়খুল ইসলাম জস্টিস মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব মুদ্দা যিল্লুহুকে এ বিষয়ের উপর আলোচনা পেশ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি সেখানে ইংরেজিতে একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন। এই নিবন্ধটি তারই অনুবাদ।

সম্মানিত চেয়ারম্যান ও উপস্থিত সুধীমণ্ডলি!

এটি আমার জন্য বিরাট এক সম্মান যে, আমি এমন একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছি, যেটি 'মুতামার আল-আলামুল ইসলামী' মুসলমানদের ইতিহাসের একটি নাজুক মুহূর্তে আয়োজন করেছে। নতুন শতাব্দির আগমন সমগ্র বিশ্বে চিন্তা ও কাজের জগতে নতুন একটি দিগন্ত উন্মোচন করছে। মুসলিম উম্মাহ হিসেবে আমাদের পক্ষে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সমস্যাবলির সমাধান নিয়ে চিন্তা করা, তার গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করা এবং অনাগত সময়ে আন্তর্জাতিক সমস্যাবলির সমাধানের জন্য নিজেদের কর্মকৌশল ঠিক করা একটি প্রশংসনীয় কাজ। আমি 'মুতামার আল-আলামুল ইসলামী'র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, তারা আমার জন্য এমন একটি পরিবেশের ব্যবস্থা করেছেন, যেখানে আমি এ বিষয়ে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি।

উনবিংশ শতাব্দি রাজনৈতিক নিপীড়নের শতাব্দি ছিল। এই শতকে ইউরোপের শক্তিমান জাতিগুলো এশীয় ও আফ্রিকান দেশগুলোসহ ইসলামী দেশগুলোর উপর তাদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বর্তমান শতাব্দি – যেটি এখন তার শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করছে – পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে ধীরে-ধীরে স্বাধীনতা অর্জনের দৃশ্য অবলোকন করেছে। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে এটি-ই সেই শতাব্দি ছিল, যাতে বহু ইসলামী রাষ্ট্র হয়ত সংগ্রাম করে কিংবা শান্তিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। অবশ্য নিজেদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা

অর্জনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করলেও এখনও পর্যন্ত শিক্ষা, অর্থনীতি ও পরিকল্পনা প্রস্তুত করার অঙ্গনগুলোতে আমরা তেমন কোনো সফলতা অর্জন করতে পারিনি। আর এ কারণেই আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ রাজনৈতিক স্বাধীনতার যথার্থ ফলাফল ভোগ করতে সক্ষম হয়নি।

এখন মুসলিম বিশ্ব নতুন শতকটিকে এই আশার সঙ্গে মূল্যায়ন করছে যে, ইনশাআল্লাহ এটি তার জন্য পরিপূর্ণ ও প্রকৃত স্বাধীনতা নিয়ে আসবে, যাতে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন জাতি নিজেদের হারানো ঐতিহ্য পুনরায় অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং পবিত্র কুরআন ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষামালার আলোকে প্রস্তুত নীতিমালা অনুপাতে জীবন যাপনে তারা স্বাধীন থাকতে পারবে।

একথাটিও স্পষ্ট যে, এই আশা শুধু স্বপ্ন আর বাসনা দ্বারাই পূর্ণ হবে না। এই প্রিয় লক্ষ্যটি অর্জন করতে হলে আমাদেরকে আমাদের সামগ্রিক জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলাতে হবে এবং যেরূপ আমরা আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে চেষ্টা করেছি, পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনে আমাদেরকে তার চেয়েও বেশি চেষ্টা করতে হবে। আমাদেরকে আমাদের কর্মনীতি ও পরিকল্পনাগুলোর ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা করতে হবে। আমাদের খুব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে। লক্ষ্য অর্জনে আমাদেরকে সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি, বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ও একটি জোরালো পরিকল্পনার প্রয়োজন হবে। আর এ ধরনের আন্তর্জাতিক সেমিনারগুলো থেকে যদি পুরোপুরি উপকার লাভ করা যায়, তা হলে এই লক্ষ্য অর্জনে আমরা আমাদের পরিচ্ছন্ন চিন্তাশক্তিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।
এই ফোরামে আমাকে যে বিষয়টির উপর আলোচনা পেশ করতে বলা হয়েছে, তার শিরোনাম হলো, 'মুসলিম উম্মাহর অর্থব্যবস্থা ও ইসলামের ভিত্তিতে তাদের ঐক্য'। এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে আপনাদের সম্মুখে আমার আলোচনাকে আমি এমন দুটি সূক্ষ্ম বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব, যেগুলো মুসলিম উম্মাহ হিসেবে আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১. মনগড়া স্বয়ংসম্পূর্ণতা

আমরা সকলেই জানি, প্রায় সব কটি মুসলিম রাষ্ট্র তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে পরনির্ভরশীল এবং এটি এই উম্মাহর একটি স্বতন্ত্র সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে আজ সমস্ত মুসলিম উম্মাহ সংকটাপন্ন ও সমস্যায় জর্জরিত। তার মৌলিক কারণটি হলো, অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র পশ্চিমা দেশগুলো কিংবা আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে মোটা-মোটা অংকের

ঋণ নিচ্ছে। কোনো-কোনো দেশ এই সুদী ঋণ উন্নয়নমূলক কাজের পরিবর্তে নিজেদের দৈনন্দিন ব্যয় মেটানোর জন্য গ্রহণ করে থাকে। বরং এর চেয়েও ভয়ানক ব্যাপার হলো, এই ঋণ তারা বিগত ঋণের সুদ পরিশোধ করার জন্য গ্রহণ করছে, যার ফলে তাদের ঋণের পরিধি ভয়ানক আকারে বেড়ে গেছে।

বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরশীলতা আমাদের এমন একটি মৌলিক ব্যাধি, যার কারণে আমাদের অর্থনৈতিক জীবন এতটা প্রভাবিত হয়েছে যে, আমাদের জাতীয় স্বকীয়তা প্রায় নিঃশেষ হতে চলেছে এবং এই পরিস্থিতি আমাদেরকে বাধ্য করছে, আমরা যেন ঋণদাতা গোষ্ঠীগুলোর দাবির সামনে, বরং অনেক সময় এমনসব দাবির সামনে মাথানত করতে বাধ্য হচ্ছি, যা কিনা আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

আর এ বিষয়টিও কারও অজানা নয় যে, দাতা গোষ্ঠীগুলো ঋণ প্রদানের আগে ঋণগ্রহীতার উপর কতগুলো শর্ত আরোপ করে নেয়। আর সেই শর্তগুলো আমাদেরকে স্বতন্ত্রভাবে সব সময় বৈদেশিক চাপের মধ্যে রাখে। অনেক সময় আমাদেরকে নিজস্ব লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা তৈরি করে এবং বাধ্য করে, আমরা যেন অন্যদের দেখানো পথে চলি।

সারকথা হলো, বৈদেশিক ঋণের কুফল এতটাই স্পষ্ট যে, তা বলে বোঝানোর দরকার হয় না।

ঋণ গ্রহণ করা ইসলামের দৃষ্টিতেও এতই অপছন্দনীয় কাজ যে, একান্ত ঠেকায় না পড়লে এতে জড়িত না হওয়া উচিত। কেউ যদি ঋণ নিয়ে সেই ঋণ পরিশোধ না করে মৃত্যুবরণ করত, তা হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন না।[১৩৭]

এর থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি, ইসলামে ঋণ গ্রহণ করা কতটা অপছন্দনীয়।

শুধু তা-ই নয়। ইসলামী আইনবিশারদগণ প্রশ্ন তুলেছেন, অমুসলিমদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত উপঢৌকন কোনো মুসলিম শাসকের জন্য গ্রহণ করা জায়েয হবে কি? তাঁরা এই প্রশ্নের উত্তরও খুঁজে বের করেছেন। তা হলো, এটি শুধু তখন জায়েয হবে, যখন এই উপঢৌকন গ্রহণ করার ফলে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের বিপক্ষে কোনো প্রকার চাপ না থাকবে।

এই উত্তর উপঢৌকন গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রদান করা হয়েছে। আপনারা এর থেকেই অনুমান করে নিতে পারেন, ঋণ গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে তার উত্তর কী হবে।

---

১৩৭. বুখারী শরীফ ॥ হাদীস নং-২১২৭; মুসনাদে আহমাদ ॥ হাদীস নং-১৩৬৪৩

ইসলামের মূলনীতির আলোকে বর্ণিত এই নির্দেশনাগুলো দাবি করছে, যত সমস্যা বা সংকটই থাকুক-না কেন, মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের থেকে ঋণ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা দরকার। অমুসলিমরা ঋণ সাধলেও প্রত্যাখ্যান করা উচিত। কিন্তু আমাদের অবস্থা হলো, আমাদের উপকরণ ও সম্পদের কোনো অভাব নেই। উপকরণের স্বল্পতার কারণে আমাদের বর্তমান অবস্থা তৈরি হয়নি। বরং বাস্তবতা হলো, মুসলমানগণ সামগ্রিকভাবে বর্তমানে যতটা ধনী, গোটা ইতিহাসে তত ধনী তারা এর আগে কখনও ছিল না। বর্তমানে তাদের হাতে প্রাকৃতিক সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার মজুদ আছে। সমগ্র বিশ্বে প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো আজ মুসলমানদের দখলে। তাদের অবস্থান পৃথিবীর ঠিক মধ্যখানে। তারা মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত এমন একটি ভৌগোলিক শিকলে জুড়ে আছে যে, তাদের মধ্যখানে ইসরাইল ও ভারত ছাড়া আর কোনো দেশ অন্তরায় নয়। তারা পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ তেল উৎপাদন করে। পৃথিবীর কাঁচামাল উৎপাদনে তাদের ভূমিকা শতকরা চল্লিশ ভাগ।

এসব বাস্তবতা ছাড়াও মুসলমানদের যেসব নগদ অর্থ পশ্চিমা দেশগুলোতে আমানত বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে রাখা আছে, তার পরিমাণও এত বেশি যে, তাদের সমুদয় ঋণ পরিশোধ করেও তা প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)-এর সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট মোতাবেক এই ব্যাংকের সদস্য দেশগুলোর বৈদেশিক ঋণের মোট পরিমাণ ৬১৮.৮ বিলিয়ন ডলার। অপর দিকে পশ্চিমা দেশগুলোতে রাখা মুসলমানদের সম্পদ ও আমানতের পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশি। একথা সত্য যে, এই অর্থ ও আমানতের সঠিক কোনো রেকর্ড নেই। কারণ, তার মালিকরা নানা অজুহাতে তা প্রকাশ করে না। তবে অর্থনীতিবিদগণের ধারণা হলো, উপসাগরীয় যুদ্ধের পর আরব মুসলমানরা তাদের ২৫০ বিলিয়ন ডলার নিজ-নিজ দেশে ফিরিয়ে এনেছিল। তা ছাড়া পশ্চিমা বিশ্বে রাখা মুসলমানদের সম্পদ ও আমানতের আনুমানিক পরিমাণ ৮০০ থেকে ১০০০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে। তার কার্যত অর্থ হলো, আমরা আমাদেরই সঞ্চিত অর্থের একটি অংশ আমরাই সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করছি।

এই আনুমানিক অংকটিকে যদি বাড়াবাড়িমিশ্রিত মনে করা হয়, তা হলেও এই বাস্তবতাকে বোধহয় কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, এত বিশাল অংকের অর্থকে যদি নিজেদেরই কাছে রেখে সঠিক পদ্ধতিতে মুসলিম বিশ্বের

জন্য ব্যবহার করা হতো, তা হলে মুসলিম উম্মাহ কোনো অবস্থাতেই ৬০০ বিলিয়ন ডলার বা তারও অধিক ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হতো না।

যদি এদিক থেকে বিবেচনা করা হয় এবং পরিসংখ্যান গ্রহণ করা হয়, তা হলে একথা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, এই যে আমরা বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি, প্রকৃতপক্ষে এটি আমাদের নিজেদেরই গড়া সমস্যা। এর জন্য আমরা অন্য কাউকে দায়ী করতে পারি না। যেসব কারণে মানুষ নিজেদের পুঁজি বিদেশে সরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে, আমরা কখনও সেই কারণগুলো দূর করার চেষ্টা করিনি। আমরা আমাদের লোকদের মাঝে আস্থা ও আত্মবিশ্বাস তৈরি করার চেষ্টা করিনি। আমরা আমাদের বর্তমান অবিচার ও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থা থেকে জাতিকে মুক্তি দান করিনি। আমরা কখনও পুঁজি বিনিয়োগের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরিতে সক্ষম হইনি। আমরা কখনও আমাদের রাষ্ট্রগুলোকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যবস্থা উপহার দেইনি। আমরা কখনও আমাদের সামগ্রিক পুঁজি দ্বারা উত্তম কোনো পন্থায় উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্র নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ করিনি। সর্বোপরি সামগ্রিকভাবে আমরা ইসলামী ঐক্যের চেতনাকে শাণিত করার ও মুসলিম উম্মাহ শক্তিকে কার্যকর বানানোর ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছি।

উম্মাহর এই বেদনাদায়ক চিত্র নতুন শতাব্দির ব্যয়বহুল উৎসব-অনুষ্ঠানাদির আয়োজনের মাধ্যমে বদলানো সম্ভব হবে না। আমাদেরকে দক্ষতা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে সময়ের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করতে হবে। যেমনটি আমি আগেও বলেছি। আমাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতাদের বৈদেশিক নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য এমনসব উপায় ও পন্থা-পদ্ধতি খুঁজে বের করতে হবে, যেগুলো আমাদের কাছে আগে থেকেই বিদ্যমান আছে। যে-বিষয়টি আমাদের সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন, তা হলো, মুসলিম উম্মাহর পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে নতুন-নতুন পলিসি উদ্ভাবন করা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলছেন :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'মুমিনগণ পরস্পর ভাই-ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইগণের মাঝে শান্তিস্থাপন করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।'[১৩৮]

কুরআন-হাদীসের শিক্ষামালা ও ইসলামের বিধিবিধান এই মূলনীতি নির্দেশ করছে যে, সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে একপ্রাণ হয়ে কাজ করতে হবে।

---

১৩৮. সূরা হুজুরাত ॥ ১০

ভৌগোলিক সীমানা তাদের মাঝে জাতিগত বিভেদ তৈরি করতে পারে না। ভৌগোলিক সীমানাকে শুধু একটি দেশের ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ বিষয়াদিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। কিন্তু সমস্ত মুসলিম বিশ্বকে বিশেষ করে নিজেদের যৌথ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের জন্য অবশিষ্ট বিশ্বের মোকাবেলায় একপ্রাণ ও একমুখী হয়ে ভাবতে হবে।

আজ সেই দিনটি বিগত হয়ে গেছে, যখন প্রযুক্তিগত যোগ্যতার সূত্র ধরে স্রেফ গুটিকতক পশ্চিমা রাষ্ট্রের একক আধিপত্য ছিল। এখন মুসলমানদের এতটুকু দক্ষতা ও যোগ্যতা আছে যে, অন্তত মুসলমানদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনগুলোকে তারা সমাধা করার ক্ষমতা রাখে। এই পরিস্থিতিতে এখন প্রয়োজন হলো, আমরা উম্মাহর সেবার জন্য দ্বীনিচেতনার সঙ্গে এই যোগ্যতাটিকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হব। কিন্তু এর জন্য আবশ্যক হলো, আমাদের রাষ্ট্রগুলোার শাসকবর্গকে একযোগে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এটিই তাদের সব চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, যার মোকাবেলা তাদেরকে শুধু উম্মাহর কল্যাণের জন্যই নয় – নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেও জরুরি। এ বিষয়ে বড় একটি দায়িত্ব 'অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কনফারেন্স' তথা ওআইসি-এর উপর বর্তায় যে, তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে মুসলিম যোগ্যতার একটি ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম তৈরি করবে।

২. নিজেদের অর্থব্যবস্থার পুনর্গঠন

দ্বিতীয় যে সূক্ষ্ম বিষয়টির প্রতি আমি আজকের এই কনফারেন্সে উপস্থিত সুধিমণ্ডলির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করব, তা হলো, আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ইসলামী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। বিংশ শতাব্দি সমাজতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব-লড়াই এবং পরিশেষে সমাজতন্ত্রের পতনের দৃশ্য অবলোকন করেছে। পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলো সমাজতন্ত্রের পতনে এমনভাবে উৎসব পালন করছে, যেন এটি তাদের শুধু রাজনৈতিকই নয়–বরং তাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিজয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অনুরূপভাবে কম্যুনিজমের পতনকেও তারা পুঁজিবাদী চিন্তা-চেতনা বাস্তবসম্মত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে দাবি করছে। তারা দাবি করছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা-ই এখন মানবতার জন্য একমাত্র ব্যবস্থা, যাকে গ্রহণ করা ব্যতীত আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থনৈতিক নিপীড়নমূলক নীতিমালার, বিশেষ করে সম্পদের অসম বণ্টনের ফলাফল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যা বিগত কয়েক শতাব্দিকাল যাবত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। সমাজ[illegible] সেই

সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে এবং সমাজের উপর তার কুপ্রভাবগুলোর সমালোচনায় সরগরম ছিল।

সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার কারণ এটা ছিল না যে, পুঁজিবাদ সঠিক মতবাদ। বরং তার কারণ ছিল স্বয়ং তার উপস্থাপিত বিকল্প ব্যবস্থায় বিদ্যমান ত্রুটিগুলো। কাজেই সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার অর্থ কখনই এটা নয় যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মাঝে কোনো ত্রুটি নেই। বরং তার মাঝে অনেক ত্রুটি এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান আছে এবং সেসবের কোনো সংশোধন হয়নি। যেসব দেশ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনুসরণ করছে, তারা এখনও পর্যন্ত সম্পদের অসম বণ্টনে লিপ্ত। ধনী ও নির্ধনের মাঝে বিরাট ব্যবধান এবং সম্পদের মাঝে অবস্থান করেও দরিদ্রতা তাদের অর্থব্যবস্থার একটি বড় সমস্যা। এগুলো পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার প্রকৃত সমস্যা। এই সমস্যাগুলোর যদি যথাযথ সমাধান না করা যায়, তা হলে এগুলো অন্য এমন কোনো প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিতে পারে, যেটি সমাজতন্ত্রের চেয়েও অধিক কঠোর ও জুলুমবাজ হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়েছে এখনও বেশি দিন হয়নি। ইতিমধ্যে মধ্য এশিয়ার কোনো-কোনো রাষ্ট্র পুনরায় সমাজন্ত্রের দিকে ফিরে যাওয়ার চিন্তা শুরু করেছে। তার বাস্তবতা আমরা সেই পার্লামেন্ট নির্বাচনের ফলাফল থেকেই উপলব্ধি করতে পারি, যেখানে কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলো আপন-আপন পার্লামেন্টগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। এর কারণ এটি নয় যে, কমুনিজমের কাছে সত্যিই কোনো কল্যাণ বা শান্তির বার্তা আছে। বরং এটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কুফল ও সম্পদের অসম বণ্টনের প্রতিক্রিয়া।

এজন্য বিশ্ব এখন তৃতীয় এমন একটি ব্যবস্থার তীব্র মুখাপেক্ষী, যে ব্যবস্থা তাকে এই দুই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সেইসব অপকারিতা থেকে মুক্তি দান করবে, যেসবের যাঁতাকলে মানবতা আজ কয়েক শতাব্দি যাবত নিষ্পেষিত হচ্ছে। এই তৃতীয় ব্যবস্থাটির জন্য মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে ইসলামী নিয়মনীতির উপর কাজ করা যেতে পারে। আমরা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে নববী থেকে যেসব অর্থনৈতিক মূলনীতি প্রাপ্ত হয়েছি, আজকের বিশ্বের সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে তা পুরোপুরিই যথেষ্ট ও যথার্থ। কারণ, ইসলাম যেখানে ব্যক্তিমালিকানা ও বাজারভিত্তিক অর্থনীতির অনুমতি প্রদান করে, সেখানে সে বুঝে-শুনে সম্পদ বণ্টনের একটি ইনসাফ ও বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিও উপস্থাপন করে, যা কিনা মানবতাকে অর্থনৈতিক জীবনের অসমতাগুলো থেকে মুক্তিদানের ক্ষমতা রাখে এবং এমন একটি অর্থব্যবস্থা উপহার দেয়, যার মাঝে 'ব্যক্তিস্বার্থের সঞ্চালক' (Motive Of Personal Profit) সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের সঙ্গে দুধ-চিনির হয়ে চলতে পারে। সমাজতন্ত্রের একটি মৌলিক দোষ ছিল, পুঁজিবাদী

ব্যবস্থার অসম ও অবিচারমূলক অর্থবন্টনে নিরাশ হয়ে মানুষ ব্যক্তিমালিকানার বাস্তব ধারণা ও বাজারভিত্তিক শক্তিগুলোর উপর আক্রমণ করে এমন একটি অর্থব্যবস্থা উপস্থাপন করেছিল, যা ছিল পুরোপুরি অবাস্তব, কৃত্রিম ও চরম অবিচারমূলক। ব্যক্তিমালিকানার স্বাধীনতার অস্বীকৃতি মানুষের উৎপাদনি চেতনাকে শুধু নিঃশেষই করে দেয়নি, বরং ব্যাপক রাজনৈতিক শক্তি জনগণের ভাগ্যকে শাসক শ্রেণীর হাতে তুলে দিয়েছে।

অভিজ্ঞতা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা ও অসমতার মূল কারণ না ছিল ব্যক্তিমালিকানা, না ছিল বাজারশক্তি। বরং পুঁজিবাদী দেশগুলোতে অর্থনৈতিক অসমতা ও ভারসাম্যহীনতার মূল কারণ ছিল ব্যক্তিস্বার্থের লাগামহীন ব্যবহার এবং বৈধ ও অবৈধ উপার্জনের মাঝে পার্থক্য করার মানদণ্ডের অনুপস্থিতি। ফলে সমস্ত সম্পদকে গুটিকতক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। সুদ, জুয়া, লটারি ও অনৈতিক যেকোনো পন্থা-পদ্ধতিতে অধিক থেকে অধিকতর মুনাফা অর্জনের অনুমতি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে আছে। পুঁজিবাদের এই মানসিকতা-ই বাজারে একচেটিয়া অধিকার (Monopoly) চরিত্রের জন্ম দিয়েছে। যার ফলে চাহিদা ও সরবরাহের শক্তিগুলো হয় একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে, না হয় তার কার্যকারিতাকে তার ভরপুর প্রভাব দ্বারা থামিয়ে দিয়েছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতি মানবতার সঙ্গে যে মশকারাটি করেছে, তা হলো, তার দৃষ্টিভঙ্গি এক দিকে চাহিদা ও সরবরাহকে চাঙ্গা করে তুলতে 'কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা যাবে না' (Laisez Fair) নীতির কথা ঘোষণা করছে, আর অপর দিকে কারবারের উল্লিখিত ভুল উপায়গুলোর অনুমতি প্রদান করে ব্যবসার স্বাভাবিক গতিতে হস্তক্ষেপ করছে। পুঁজিবাদীরা ব্যবসায় একচেটিয়া পরিবেশ তৈরি করে নিজেদের অবিচারমূলক সিদ্ধান্তকে সংখাগরিষ্ঠ জনতার উপর চাপিয়ে দেয়, যার মাধ্যমে বাজারশক্তিগুলোতে তাদের প্রকৃত ভূমিকা পালনে বাধা তৈরি হয়। সুদের স্বতন্ত্র একটি চরিত্র হলো, সে বিত্তবান শিল্পপতিদের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করবে। কারণ, সমাজের গরিব শ্রেণীর মানুষগুলো খেয়ে-না-খেয়ে তাদের সঞ্চিত যে অর্থগুলো ব্যাংকে জমা করে, তার দ্বারা এই বিত্তবান শিল্পপতিরা-ই লাভবান ও উপকৃত হয়। এই অর্থ দ্বারা তারা মোটা অংকের মুনাফা অর্জন করলেও তার মালিক গরিব বেচারারা পায় নির্দিষ্ট পরিমাণের কিছু সুদ। মোটের উপর এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বিত্তশালী লোকেরা আমানতকারীদের অর্থগুলোকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাদের কিছুই দিচ্ছে না। কারণ, শিল্পপতিরা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যে সুদ পরিশোধ করে, শিল্পপতিরা তাদের পণ্যমূল্যের সঙ্গে যোগ করে জনগণ থেকে তা ফিরিয়ে নেয়।

অনুরূপভাবে জুয়া হাজার-হাজার মানুষের সম্পদ গুটিকতক মানুষের হাতে কুক্ষিগত করার বিরাট একটি মাধ্যম এবং বিনাশ্রমে অর্জিত সম্পদের মালিক হওয়ার লালসাকে বাড়িয়ে তোলার একটি ধ্বংসাত্মক উপায়। লটারির লেনদেনও স্বাভাবিক বাজারশক্তিকে প্রভাবিত করা ও সম্পদের অসম বণ্টনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

সারকথা হলো, হারাম-হালালের ভেদাভেদ নেই এমন অর্থব্যবস্থা সমাজের উপর তার কুপ্রভাব থেকে বেপরোয়া হয়ে সব ধরনের বাণিজ্যিক তৎপরতার জন্য উন্মুক্ত।

ইসলাম শুধু বাজারশক্তিকেই স্বীকার করে না, বরং তার জন্য এমন একটি মেকানিজমও তৈরি করে দেয়, যার ফলে সে ব্যবসার একচেটিয়া চরিত্রের প্রতিবন্ধকতা ছাড়া-ই আপন শক্তিতে সক্রিয় থাকে। সুস্থ উৎপাদন ও সুষম বণ্টনের পরিবেশ বহাল রাখতে ইসলাম অর্থনৈতিক তৎপরতাগুলোর উপর দু-ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে থাকে। প্রথম প্রকার নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ইসলাম ব্যবসা ও উপার্জনকে এমন কিছু বিশেষ ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে, যা একেবারে স্পষ্টভাবে হালাল ও হারামের মাঝে ব্যবধান তৈরি করে দিয়েছে। এই রীতিটি ব্যবসায় একচেটিয়া চরিত্রকে প্রতিহত করতে এবং ভুল ও অনৈতিক উপার্জন এবং সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের পরিপন্থী বাণিজ্যিক তৎপরতাগুলোকে বিলুপ্ত করে দিতে সহায়তা করে। সাধারণ মানুষের সঞ্চিত অর্থ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে। ইসলামী অর্থনীতি এ ক্ষেত্রে সুদের পরিবর্তে মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণকে এই উন্নয়নের ফলাফলে সরাসরি অংশীদার বানিয়ে নেয়, যার ফলে সমাজে একটি ভারসাম্যপূর্ণ স্বচ্ছলতা চলে আসে এবং ধনী ও গরিবের মধ্যকার ব্যবধান কমে যায়।

দ্বিতীয় প্রকারের নিয়ন্ত্রণ যাকাত, সাধারণ দান-অনুদান ও অন্যান্য আর্থিক দায়িত্ব আরোপ করার মাধ্যমে কার্যকর করা হয়েছে। তার অর্থ হলো, হালাল আমদানিও পুনরায় এমন লোকদের মাঝে বণ্টন করা হবে, যারা ব্যবসার সুবর্ণ সুযোগ না পাওয়ার কারণে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করার মতো উপার্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

সারকথা হলো, সম্পদকে স্বতন্ত্র এক ঘূর্ণন ও বিস্তারের মধ্যে রাখার স্বার্থে এবং তাকে কুক্ষিগত করার ক্ষেত্র ও সুযোগগুলোকে বন্ধ করে দিতে ভুল ও অবৈধ আমদানির সবগুলো পথ ইসলামে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং যাকাত, দান ও উত্তরাধিকারের আইন প্রবর্তন করা হয়েছে।

যেহেতু বর্তমান শতাব্দিতে বিশ্ব সমাজতন্ত্রের পতনও প্রত্যক্ষ করেছে, আবার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নানা অসমতা ও ভারসাম্যহীনতার ক্ষতও এখনও পর্যন্ত শোকাতে পারেনি, তাই এখন মুসলমানদের জন্য এটি মোক্ষম সুযোগ যে, তারা বিশ্বকে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উদ্ভাবিত তথা ইসলামী অর্থনীতির দিকে মানুষকে আহ্বান জানাবে, যেটি পরস্পরবিরোধী দুই প্রান্তের মধ্যখানে একটি সুষম ও শান্তিময় ভারসাম্য তৈরি করে দেবে।

কিন্তু আমাদের জন্য একটি অস্বস্তিকর সমস্যা হলো, ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতিগুলো এখনও দৃষ্টিভঙ্গির পর্যায়েই রয়েছে, যেটি এখনও পর্যন্ত কার্যকররূপে আমাদের সামনে বাস্তবায়িত নেই। এমনকি মুসলিম দেশগুলোও আজও পর্যন্ত নিজেদের অর্থনীতিকে ইসলামী নিয়ম-নীতির উপর ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করেনি। অধিকাংশ দেশ অদ্যাবধি পুঁজিবাদী অর্থনীতিরই অনুসরণ করছে। আর তাও করছে এমন অপরিপক্ব ও অপূর্ণ পন্থায় যে, সে কারণে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত দেশগুলোর তুলনায় মন্দ-থেকে-মন্দতর হতে চলেছে। আর দুর্ভাগ্য হলো, সুস্পষ্ট ইসলামী মূলনীতির উপস্থিতি সত্ত্বেও মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক অসমতা ও ভারসাম্যহীনতা পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি।

এহেন দুঃখজনক পরিস্থিতি আজীবন এভাবে চলতে পারে না। আমরা যদি আমাদের কর্মনীতির সংশোধনের প্রতি মনোযোগী না হই, তা হলে এর ভয়াবহ যে পরিণতি আমাদের গ্রাস করবে, তাকে সামাল দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এমন ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে যদি আমরা রক্ষা পেতে চাই, তা হলে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের অর্থনীতিকে কুরআন-সুন্নাহর ছাঁচে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। আমরা যদি ইসলামী মূলনীতি অনুসারে একটি অর্থব্যবস্থা চালু করার যোগ্য হয়ে যাই, তা হলে নতুন শতাব্দির আগমন মুহূর্তে এটি আমাদের পক্ষ থেকে বিশ্বমানবতার জন্য মূল্যবান উপহার বলে বিবেচিত হবে।

আমি আশা করি, ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিগুলোকে যদি আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করি, তাহলে অবশিষ্ট বিশ্ব তাকে বরণ করে নিতে এখনকার তুলনায় আরও অধিক আগ্রহী ও উৎসাহী হবে।

আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং যথাযথভাবে তার অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী মাওয়ায়েয– খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২১৯-২৩২

ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি : সমস্যা ও সমাধান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ • فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

সম্মানিত সভাপতি ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজকের এই সভার আলোচ্যবিষয় **'ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি : সমস্যা ও সমাধান'** নির্ধারণ করা হয়েছে এবং আমি অধমকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করতে ফরমায়েশ করা হয়েছে। এ বিষয়টি মূলত অনেক বিশ্লেষণ ও দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ, যার জন্য এক ঘণ্টা সময়ও যথেষ্ট নয়। বরং আমার কাছে এখানে 'যথেষ্ট' শব্দটিও অপর্যাপ্ত বলে মনে হচ্ছে। আর সেজন্য আমি ভূমিকায় সময় ব্যয় না করে মূল আলোচনায় ঢুকে যেতে চাই, যাতে এই স্বল্প সময়ে বিষয়টির উপর সবিস্তার আলোচনা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে পারি। অন্যথায় আসল ব্যাপার হলো, এই বিষয়বস্তু এক ঘণ্টার নয়, এমনকি একটি সভারও আলোচ্য নয়। এ বিষয়ের উপর অনেক বড়-বড় গ্রন্থ লেখা হয়েছে ও লেখা হচ্ছে। কাজেই সংক্ষিপ্ত পরিসরের একটি বৈঠকের আলোচনায় এর হক আদায় করা সম্ভব নয়।

আধুনিক অর্থনৈতিক সমস্যা এত বেশি এবং এর প্রকার এত অসংখ্য যে, যদি আমি তার কোনো একটি সমস্যা বেছে নিয়ে তার উপর আলোচনায় প্রবৃত্ত হই আর অন্যান্য সমস্যাগুলো এড়িয়ে যাই, তা হলে তাও কঠিন এক পরীক্ষা হয়ে দাঁড়াবে। সেজন্য আমি চাচ্ছি, অর্থনীতির খুঁটিনাটি সমস্যা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে ইসলামের অর্থনীতিবিষয়ক শিক্ষামালার মৌলিক কাঠামোটি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরব, যাতে অন্তত ইসলামী অর্থনীতির মূল দৃষ্টিভঙ্গিগুলো আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। কারণ, যতগুলো শাখাগত সমস্যা আছে, তার সবই মূলত মৌলিক চিন্তাধারার সাথে সম্পৃক্ত এবং সে সবের যে সমাধান অনুসন্ধান করা হবে, তাও এই মূল দৃষ্টিভঙ্গির আদলেই খুঁজে বের করতে হবে।

কাজেই সর্বপ্রথম ও বুনিয়াদি প্রয়োজন হলো, আমাদের কাছে ইসলামী অর্থনীতির ধারণা স্পষ্ট হতে হবে এবং একথাটি জানতে হবে যে, ইসলামী অর্থনীতি কী জিনিস, তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কী-কী এবং অন্যান্য অর্থনীতি থেকে তার স্বাতন্ত্র কী ।

যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিষয়গুলো স্পষ্ট না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থনীতিবিষয়ক কোনো সমস্যার সমাধান আমাদের বুঝে আসবে না। আর সেজন্যই আমি এখানে আপনাদের সম্মুখে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত অর্থব্যবস্থাগুলোর সঙ্গে তার তুলনা পেশ করতে চাই। আমি মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমাকে সাহায্য করেন এবং এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আমাকে এই বিষয়টির উপর যথাযথ আলোচনা উপস্থাপন করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান

ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে সর্বপ্রথম যেকথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে, তা হলো, আমরা যে অর্থে 'অর্থনীতি' পরিভাষাটি ব্যবহার করে থাকি, নিরেট এই অর্থে ইসলাম কোনো অর্থনৈতিক মতবাদ নয়। সাধারণ অর্থে ইসলাম কোনো অর্থব্যবস্থার নাম নয়। বরং আমি একটু আগ বাড়িয়ে একথাও বলব যে, ইসলামকে একটি অর্থব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করা, ইসলামকে নিছক একটি অর্থব্যবস্থা মনে করা সঠিক নয়, যেমনটি কম্যুনিজম বা ক্যাপিটালিজম।

কাজেই আমরা যখন ইসলামী অর্থনীতির কথা বলি কিংবা ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি ও তার মূলনীতি নিয়ে কথা বলি, তখন আমাদের এমনটি আশা রাখা উচিত নয় যে, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলে অর্থনীতির সে রকমই দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে, যেমনটি আদম স্মিথ ও মার্শাল প্রমুখ অর্থনীতিবিদের গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান আছে। কারণ, ইসলাম মূলত কোনো অর্থব্যবস্থা নয়। বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, অর্থনীতি যার একটি ক্ষুদ্র শাখা। এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বটে; কিন্তু এটি জীবনের মূল লক্ষ্য নয়। ইসলাম একে অতিশয় গুরুত্ব প্রদান করেছে ঠিক; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেনি।

কাজেই আমি যখন আপনাদের সম্মুখে অর্থনীতি বিষয়ে আলোচনা করব, তখন একথাটি মাথায় রাখতে হবে যে, কেউ যদি কুরআন ও হাদীসে সে ধরনের কোনো অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিভাষা অনুসন্ধান করে, যেমনটি অর্থনীতির সাধারণ গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়, তা হলে এখানে তা পাওয়া যাবে না। কিন্তু কুরআন-হাদীসে সেই মৌলিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান আছে, যাকে ভিত্তি

বানিয়ে একটি অর্থনীতির ইমারত নির্মাণ করা সম্ভব। আর সেজন্যই আমি আমার লেখনি ও বক্তব্যে 'ইসলামের অর্থব্যস্থা' না বলে 'ইসলামের অর্থনৈতিক শিক্ষামালা' বলতে বেশি পছন্দ করি। ইসলামের সেই শিক্ষামালার আলোকে অর্থনীতির রূপ কী দাঁড়ায়? অর্থনীতির কেমন একটি কাঠামো সামনে আসে? এই প্রশ্ন অর্থনীতির একজন ছাত্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'অর্থব্যবস্থা' জীবনের মূল লক্ষ্য নয়

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, অর্থনীতি নিঃসন্দেহে ইসলামের শিক্ষামালার একটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। আর ইসলামের অর্থনৈতিক শিক্ষামালার বিস্তৃতির অনুমান আপনি এভাবে করতে পারেন যে, যদি ইসলামী ফিক্হ-এর যেকোনো গ্রন্থকে আপনি চার ভাগে ভাগ করেন, তা হলে দেখবেন, তার দুই ভাগই অর্থব্যবস্থা বিষয়ক।

আপনি ফিক্হ-এর বিখ্যাত কিতাব 'আল-হিদায়া'র নাম অবশ্যই শুনে থাকবেন। এই কিতাবটি চারটি খণ্ড আছে, যার সর্বশেষ দুখণ্ডের পুরোটাই অর্থব্যবস্থাবিষয়ক। এর দ্বারাই আপনি ইসলামের অর্থনৈতিক শিক্ষামালার বিস্তৃতি অনুমান করতে পারেন। কিন্তু একথাটি সব সময় মনে রাখতে হবে যে, অন্যান্য অর্থব্যবস্থাগুলোর মতো ইসলামে অর্থনীতি মানবীয় জীবনের মৌলিক কোনো লক্ষ্য নয়।

কিন্তু ধর্মহীন অর্থব্যবস্থা অর্থনীতিকে মানুষের জীবনের সব চেয়ে বড় মৌলিক বিষয় সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এই ভিত্তির উপর সবকিছুর ইমারত নির্মাণ করা হয়েছে। অবশ্য ইসলামে অর্থনব্যবস্থার গুরুত্ব আছে অবশ্যই। কিন্তু তা মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্যবস্তু নয়।

আসল গন্তব্য আখেরাত

ইসলামের দৃষ্টিতে মৌলিক বিষয় হলো, এই জগত মানুষের শেষ গন্তব্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। বরং এটি শেষ গন্তব্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছতে একটি মনযিল মাত্র। এটি জীবনের একটি ধাপ। এটি চলার পথের একটি বিশ্রামাগার। এটি একটি অন্তবর্তীকালীন যুগ। এই অন্তবর্তীকালীন যুগটিকেও অবশ্যই ভালোভাবে কাটানোর আবশ্যকতা আছে।

কিন্তু এটা মনে করা যাবে না যে, আমার সব প্রচেষ্টা, সকল শ্রম-সাধনা, সমুদয় দৌড়ঝাপ, সকল শক্তি এই ইহজাগতিক জীবন ও তার অর্থব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খাবে। এই বুঝ ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও ইসলামের মৌল চেতনার সঙ্গে একটুও খাপ খায় না।

ইসলাম এক দিকে দুনিয়াকে এতটা গুরুত্ব প্রদান করেছে যে, পবিত্র কুরআন দুনিয়াবি স্বার্থাবলিকে 'খায়র' (কল্যাণ) ও 'আল্লাহর অনুগ্রহ' বলে আখ্যায়িত করেছে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

'হালাল উপার্জনের অন্বেষণ অন্যান্য ফরজের পর একটি ফরজ।'[১৩৯]

অর্থাৎ– হালাল উপায়ে অর্থ উপার্জন করা মানুষের উপর আল্লাহপাকের আরোপিত অন্যান্য ফরজগুলো আদায় করার পর দ্বিতীয় স্তরের একটি ফরজ। সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, কিন্তু খবরদার, নিজের সকল চেষ্টা-সাধনার কেন্দ্র যেন এই দুনিয়া না হয়। এমন যেন না হয় যে, দুনিয়াই হলো তোমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। কারণ, এই দুনিয়াবি জীবনের পর তোমাদের সম্মুখে আরও একটি জীবন আসছে। আর সেই জীবন হবে চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর। তার কল্যাণ-অকল্যাণ, তার সাফল্য-ব্যর্থতা-ই মূলত মানুষের জীবনের মূল ও আসল বিষয়। এই জীবনই মানুষের আসল জীবন।

দুনিয়াবি জীবনের উৎকৃষ্ট উপমা

মাওলানা রূমী রহ. ইসলামের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে চমৎকার একটি উপমার মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন :

آب اندر زیر کشتی پشتی است

آب در کشتی ہلاک کشتی است

দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হলো পানির মতো আর মানুষ হলো নৌকার মতো। যেভাবে নৌকা পানি ছাড়া চলতে পারে না, তেমনি মানুষও দুনিয়া ও তার সম্পদরাশি ব্যাতিরেকে বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু পানি যেমন নৌকার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত উপকারী, যতক্ষণ পর্যন্ত এই পানি নৌকার আশপাশে ও তলে অবস্থান করে। কিন্তু এই পানি যদি নৌকার ভেতরে ঢুকে পড়ে, তা হলে তখন এই পানি নৌকাকে ভাসিয়ে রাখার পরিবর্তে ডুবিয়ে দেবে।

---

১৩৯. কান্‌যুল উম্মাল ৪/১৬ ॥ হাদীস নং-৯২৩১; কাশফুল খাফা ২/৪৬ ॥ হাদীস নং-১৬৭১; সুনানে বায়হাকী ২/২৪ ॥ হাদীস নং-১২০৩; আল-জামিউল কাবীর ১/১৪০৮৫ ॥ হাদীস নং-৩৫; জামিউল আহাদীস ১৪/১২৮ ॥ হাদীস নং-১৩৯৩৭; মিশকাতুল মাসাবীহ ২/১২৯ ॥ হাদীস নং-২৭৮১; শু'আবুল ঈমান ৬/৪২১ ॥ হাদীস নং-৮৭৪১

অনুরূপভাবে দুনিয়ার এই সমুদয় সম্পদ মানুষের জন্য খুবই উপকারী। মানুষ এগুলো ব্যতীত জীবন ধারণ করতে পারে না। কিন্তু জাগতিক এই সম্পদ ততক্ষণ পর্যন্ত উপকার করবে, যতক্ষণ তা মানুষের হৃদয়তরির আশেপাশে ও তলে অবস্থান করবে। কিন্তু যদি তা মানুষের হৃদয়তরির ভেতরে ঢুকে পড়ে, তা হলে এই দুনিয়া ও তার সম্পদ মানুষকে ডুবিয়ে দেবে এবং ধ্বংস করে দেবে।

সম্পদ ও অর্থব্যবস্থার ব্যাপারে ইসলাম এই দৃষ্টিভঙ্গি-ই লালন করে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অর্থব্যবস্থা একটা ফালতু বিষয়। তার কারণ, ইসলাম বৈরাগ্যের জীবন অবলম্বন করার শিক্ষা প্রদান করে না। বরং অর্থব্যবস্থা বড় কাজের ও দরকারি বিষয়। শর্ত হলো, তাকে সীমানার ভেতরে ব্যবহার করতে হবে এবং তাকে জীবনের মূল লক্ষ্য ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বানানো যাবে না।

এই দুটি সূক্ষ্মতত্ত্বের বিশ্লেষণের পর আমাদেরকে সর্বপ্রথম জানতে হবে, কোনো একটি অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাবলি কী হয় এবং পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সেগুলোকে কীভাবে সমাধান করে। তারপর তৃতীয় পর্যায়ে আমাদেরকে জানতে হবে, ইসলাম সেই সমস্যাগুলোর সমাধান কীভাবে দিয়েছে।

'অর্থনীতি' বলতে কী বোঝায়?

প্রথম প্রশ্ন ছিল, কোনো অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলো কী? অর্থনীতির একজন প্রাথমিক স্তরের ছাত্রও একথা জানে যে, কোনো অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা চারটি। সেই সমস্যাগুলো বুঝবার আগে আমাদেরকে 'অর্থনীতি' পরিভাষাটির বিশ্লেষণ জানতে হবে। অর্থনীতিকে ইংরেজিতে Economics (ইকোনমিক্স) আর আরবিতে 'ইক্‌তিসাদ' বলা হয়। অভিধান খুলে দেখুন এই শব্দ দুটির শাব্দিক অর্থ কী। 'ইকোনমিক্স'-এর অর্থ লেখা হয়েছে, মানুষ তাদের প্রয়োজনগুলোকে যথেষ্ট পরিমাণে পূরণ করবে। তো 'ইকোনমিক্স' শব্দটির মধ্যেও 'যথেষ্ট'র ধারণা বিদ্যমান আছে। আর আরবিতে এর অনুবাদ করা হয় 'ইক্‌তিসাদ'। ইক্‌তিসাদ শব্দটির মধ্যে 'যথেষ্ট'র ধারণা বিদ্যমান। কাজেই ইকোনমিক্স-এর সব চেয়ে বড় সমস্যাটি হলো মানুষের প্রয়োজনাদি। শুধু প্রয়োজনই নয়; বরং অন্তহীন চাহিদাও এর অন্তর্ভুক্ত। আর এই প্রয়োজন ও চাহিদাগুলোকে পূরণ করার জন্য দুনিয়াতে যে উপকরণ আছে, তার পরিমাণ কম ও সীমিত। উপকরণও যদি অতটুকু হতো, যতটুকু প্রয়োজন ও চাহিদা, তা হলে কোনো অর্থনীতি বিদ্যার প্রয়োজনই হতো না।

অর্থনীতি বিদ্যার প্রয়োজন এজন্য দেখা দিয়েছে যে, মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা বেশি; কিন্তু তার তুলনায় উপকরণ কম। আর সেজন্যই এই বুদ্ধি খুঁজে

বের করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে যে, এই দুয়ের মাঝে কীভাবে সমন্বয় সাধন করা হবে, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রয়োজন ও চাহিদাগুলোকে পূরণ করতে পারব। আর এটিই মূলত অর্থনীতি বিদ্যার বিষয়বস্তু। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই কোনো একটি অর্থনীতিকে যে কটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তার সংখ্যা চারটি।

১. অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ (Determination Of Priorites)

অর্থনীতিকে সর্বপ্রথম যে সমস্যাটির সম্মুখীন হতে হয়, অর্থনৈতিক পরিভাষায় তাকে 'অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ' বা 'ডিটারমিনেশন অফ প্রায়রিটি' বলা হয়। অর্থাৎ– একজন মানুষের কাছে উপকরণ আছে কম; কিন্তু তার প্রয়োজন ও চাহিদা অনেক। এমতাবস্থায় সে কোন চাহিদাটিকে আগে পূরণ করবে আর কোনটিকে পরে স্থান দেবে।

এটি হলো অর্থনীতির সব চেয়ে বড় সমস্যা।

যেমন– আমার কাছে পঞ্চাশটি টাকা আছে। এখন এই টাকাগুলো দ্বারা আমি বাজার থেকে খাওয়ার জন্য আটাও ক্রয় করতে পারি, আবার কাপড়ও ক্রয় করতে পারি। হোটেলে বসে চা-নাস্তা খেয়েও শেষ করে ফেলতে পারি, আবার হলে ঢুকে সিনেমা দেখেও ব্যয় করতে পারি। এই চার-পাঁচটি প্রয়োজন ও চাহিদা-ই আমার সামনে আছে। এখন প্রশ্ন হলো, টাকা যেহেতু কম এবং একটি করতে গেলে বাকিগুলো করা সম্ভব হবে না, তাই এর মধ্য থেকে আমি কোনটিকে প্রাধান্য দেব? এই পঞ্চাশটি টাকা আমি কোন খাতে ব্যয় করব? এই প্রশ্নের উত্তরই খুঁজে বের করার নাম 'অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ' বা 'ডিটারমিনেশন অফ প্রায়রিটি'।

এই প্রশ্নটি একদিকে যেমন কোনো ব্যক্তির বেলায় দেখা দিতে পারে, তেমনি গোটা দেশ ও সমগ্র পৃথিবীর বেলায়ও দেখা দিতে পারে। সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনেও এই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। যেমন– আমাদের দেশে কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। কিছু মানবীয় উপকরণ আছে। কিছু খনিজ উপকরণ আছে। কিছু নগদ অর্থ আছে। এখন এই উপকরণকে কাজে লাগিয়ে আমরা ক্ষেতে গমও উৎপন্ন করতে পারি, আবার ধানও উৎপাদন করতে পারি, তামাকও উৎপাদন করতে পারি। এমনও হতে পারে যে, এই সমুদয় উপকরণকে আমরা বিলাসিতায় ব্যয় করে ফেললাম। এই একাধিক সুযোগ ও সুবিধা আমাদের সামনে বিদ্যমান আছে। কিন্তু প্রশ্ন আসছে, এখন এর কোনটিকে প্রাধান্য দেব এবং তার জন্য আমরা কী পন্থা অবলম্বন করব?

২. উপকরণ বিভাজন (Alocation Of Resources)

দ্বিতীয় সমস্যাটির নাম অর্থনীতির পরিভাষায় 'উপকরণ বিভাজন' বা 'এ্যালকেশন অফ রিসোর্স'। এর অর্থ হলো, কিছু উপকরণ আমাদের কাছে আছে। জমি আছে, অর্থ আছে। কারখানাও আছে। এসব উপকরণ আমাদের কাছে আছে। এর কতটুকু উপকরণ কোন কাজে ব্যয় করব।

যেমন– আপনি অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ করে নিলেন যে, আমার গম উৎপন্ন করা দরকার। এটিও আমার প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আমাকে চাল উৎপন্ন করতে হবে। এটিও আমার প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। কাপড় তৈরি করতে হবে। এটিও আমার প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু কী পরিমাণ জমিতে গম উৎপন্ন করব, কী পরিমাণ জমিতে চাল উৎপন্ন করব, কী পরিমাণ জমিতে তুলা উৎপন্ন করব, কী পরিমাণ জমিতে চা উৎপন্ন করব, কী পরমাণ জমিতে তামাক উৎপন্ন করব? অনুরূপভাবে কাপড় তৈরির জন্য কটি কারখানা স্থাপন করব, জুতার জন্য কটি কারখানা স্থাপন করব, অস্ত্র তৈরির জন্য কটি কারখানা স্থাপন করব?

অর্থনীতির পরিভাষায় একে 'উপকরণের বিভাজন' বা 'এ্যালকেশন অফ রিসোর্স' বলা হয় যে, কোন উপকরণকে কোন কাজে ও কী পরিমাণে নির্ধারণ করা হবে।

৩. 'আয় বণ্টন' (Distribution Of Income)

তৃতীয় সমস্যাটি হলো, যখন উৎপাদন শুরু হয়ে যাবে, তখন তাকে সমাজে কীভাবে বণ্টন করা হবে। অর্থনীতির পরিভাষায় এর নাম 'আয় বণ্টন' বা 'ডিস্টিবিউশন অফ ইনকাম'।

৪. উন্নয়ন (Development)

চতুর্থ সমস্যাটি, যাকে অর্থনীতির পরিভাষায় 'উন্নয়ন' বা 'ডেভেলপমেন্ট' বলা হয়। তার অর্থ হলো, আমাদের যেসব অর্থনৈতিক তৎপরতা আছে, সেগুলোকে কীভাবে উন্নত করা হবে? যাতে যেসব উৎপাদন আমরা পাচ্ছি, তার মান কীভাবে আরও ভালো করা যাবে এবং পরিমাণ কীভাবে বৃদ্ধি করা যাবে। কীভাবে আরও উন্নতি করা যাবে এবং কী করে নতুন-নতুন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করা যাবে, যাতে মানুষ আরও বেশি উপকরণ দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

এ হলো চারটি বিষয়, প্রত্যেক অর্থনীতিকে যার সম্মুখীন হতে হয়। এবার আমাদেরকে দেখতে হবে, বর্তমানে প্রচলিত অর্থব্যবস্থাগুলো এই সমস্যাগুলোকে

কীভাবে সমাধান করেছে। তারপর আমাদের বুঝে আসবে, ইসলাম এই সমস্যাগুলোর সমাধান কীভাবে করে। কারণ, আরবিতে একটি প্রবাদ আছে :

وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ

'বস্তুর পরিচয় লাভ করা যায় তার উল্টোটির পরিচয় জানার দ্বারা।'

কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত একটি বস্তুর বিপরীতটি সামনে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রকৃত সৌন্দর্য সামনে আসে না। রাত যদি অন্ধকার না হতো, তা হলে দিনের আলোর কোনো মূল্য হতো না। যদি গ্রীষ্ম না থাকত, তা হলে বর্ষার কোনো মজা আমরা পেতাম না।

সেজন্য আগে সংক্ষেপে হলেও আমাদেরকে জেনে নিতে হবে, প্রচলিত অর্থব্যবস্থাসমূহ এই চারটি সমস্যার সমাধান কীভাবে প্রদান করে।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় এই সমস্যাগুলোর সমাধান

সবার আগে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকেই আলোচনায় আনা যাক। এই সমস্যাগুলোর সমাধানে পুঁজিবাদী অর্থনীতি (ক্যাপিটালিজম) একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির দর্শন হলো, এই চারটি সমস্যার সমাধান করার একটি-ই পদ্ধতি। আর তা হলো, প্রতিজন মানুষকে বেশি-বেশি মুনাফা অর্জনের সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে হবে। অর্থাৎ– প্রতিজন মানুষের এই অধিকার থাকবে যে, সে যত বেশি ইচ্ছা অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করতে পারবে। যুক্তিসঙ্গত সীমানার মধ্যে অবস্থান করে যত খুশি সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা করা প্রত্যেক মানুষের থাকতে হবে। তা হলে আপনা-আপনি-ই এই চার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

এর উত্তর হলো, মূলত এই বিশ্বচরাচরে কতগুলো প্রাকৃতিক শক্তি সক্রিয় আছে, যাকে 'সরবরাহ' ও 'চাহিদা' (Supply And Demand) বলা হয়।

অর্থনীতির ছাত্র ছাড়াও সকলেই এই বিধানটি জানে যে, যখন কোনো পণ্যের সাপ্লাই বেড়ে যায় আর ডিমান্ড কমে যায়, তখন তার দাম পড়ে যায়। আর যখন পণ্যের সাপ্লাই কমে যায় আর ডিমান্ড বেড়ে যায়, তখন তার মূল্য বেড়ে যায়।

যেমন– বাজারে আম আছে এবং তার ক্রেতাও বেশ আছে। কিন্তু চাহিদার মোকাবেলায় আমের সরবরাহ কম। তো তার ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, বাজারে আমের দাম বেড়ে যাবে। কিন্তু সেই আমই যদি এমন কোনো এলাকায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়, যেখানকার মানুষ আম তেমন পছন্দ করে না, এবং তাদের মাঝে আম খাওয়ার আগ্রহ নেই, তা হলে ওখানে আমের দাম কমে যাবে।

সারকথা হলো, সরবরাহের চেয়ে চাহিদা বেড়ে গেলে দাম বেড়ে যায় আর চাহিদা কমে গেলে দামও কমে যায়। এটি একটি সাধারণ নিয়ম, যা সব মানুষেরই জানা আছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির বক্তব্য হলো, কোন পণ্যটি উৎপাদন করতে হবে, কী পরিমাণ উৎপাদন করতে হবে এবং উপকরণের বিভাজন কীভাবে করা হবে, তার নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ মূলত সরবরাহ ও চাহিদার উপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে। তাই যখন আমরা প্রতিজন মানুষকে বেশি-বেশি উপার্জনের জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেব, তখন প্রত্যেকে আপন-আপন স্বার্থে সেই পণ্যটি-ই উৎপাদন করবে, বাজারে যার চাহিদা বেশি।

আজ যদি আমি একটি কারখানা চালু করি, তা হলে আগে জেনে নেব, বাজারে কোন জিনিসটির চাহিদা বেশি, যাতে আমি ওই পণ্যটি বাজারে বিক্রয় করে অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারি।

কাজেই মানুষ যখন আপন স্বার্থের সঞ্চালকের অধীনে কাজ করবে, তখন সে সেই জিনিসটি-ই বাজারে আনবে, যার চাহিদা বেশি। আর যখন সেই জিনিসটির চাহিদা কমে যাবে, তখন মানুষ তার উৎপাদনও এজন্য কমিয়ে দেবে যে, এখন আর এই পণ্যটির দ্বারা লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ, বাজারে এখন এই পণ্যের চাহিদা কম।

সেজন্যই বলা হয়, চাহিদা ও সরবরাহ নীতিটি বাজারে এমনভাবে কার্যকর আছে যে, তার মাধ্যমেই অগ্রগণ্যতা আপনা-আপনি নির্ধারিত হয়ে যায় যে, কোন জিনিস উৎপাদন করা হবে এবং কী পরিমাণ উৎপাদন করা হবে।

আবার উপকরণের বিভাজনও এভাবেই হয়ে যায় যে, মানুষ তাদের জমি ও কারখানাগুলোকে সেসব বস্তুর উৎপাদনে ব্যবহার করবে, যেগুলোর চাহিদা বেশি, যাতে এর মাধ্যমে তারা অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারে। কাজেই মুনাফা অর্জনের সঞ্চালকের মাধ্যমে এই চারটি সমস্যার সমাধান করা হয়। এই সিস্টেমকে Price Mechanism (প্রাইজ মেকানিজম) বলা হয়। এই প্রাইজ মেকানিজমের মাধ্যমেই এই সবগুলো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

আয় বণ্টনের ব্যবস্থাপনাও অনুরূপ। এ ব্যাপারে পুঁজিবাদী অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি হলো, চাহিদা ও সরবরাহ নীতিরই অধীনে আয়ের বণ্টন হয়ে থাকে। যেমন– একলোক একটি কারখানা স্থাপন করেছে এবং তাতে একব্যক্তিকে শ্রমিক নিযুক্ত করেছে।

এখন প্রশ্ন হলো, এই শ্রমিক এই কারখানার আয়ের কত অংশ পাবে আর কারখানার মালিক কত অংশ পাবে? এটিও মূলত সরবরাহ ও চাহিদা নীতির অধীনেই নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ– শ্রমিকের চাহিদা যত বেশি হবে, তাদের

পারিশ্রমিকও তত বেশি হবে। তাদের চাহিদা যত কম হবে, পারিশ্রমিকও সেই অনুপাতে কমে যাবে। তো এই নীতিরই উপর আয়ের বন্টন হবে।

বাকি থাকল উন্নয়ন। এই উন্নয়ন সমস্যারও সমাধান এভাবে হবে যে, যখন প্রতিজন মানুষ বেশি-বেশি উপার্জনের ধান্ধায় লেগে যাবে, তখন তারা মুনাফা অর্জনের নতুন-নতুন পথ বের করে নেবে, নতুন-নতুন পন্থা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে নেবে এবং এমন-এমন পণ্য উৎপাদন করবে, যার মাধ্যমে তারা অধিক-থেকে-অধিকতর মানুষকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে।

কাজেই প্রতিজন মানুষকে উপার্জনের জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হবে, তখন তার মাধ্যমে চারটি সমস্যারই সমাধান আপনা-আপনি হয়ে যাবে। তারই মাধ্যমে অগ্রগণ্যতা নির্ধারিত হবে। তারই মাধ্যমে উপকরণের বিভাজন হয়ে যাবে। তারই মাধ্যমে আয়ের বণ্টন হবে এবং তারই মাধ্যমে অর্থনীতিতে উন্নয়ন সাধিত হবে। এ হলো পুঁজিবাদী অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি।

সমাজতন্ত্রে এগুলোর সমাধান

সমাজতন্ত্র মাঠে এল। সে বলল, জনাব, আপনি অর্থনীতির এমন গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়টিকে চাহিদা ও সরবরাহের অন্ধ ও বধির শক্তিগুলোর হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ, চাহিদা ও সরবরাহের শক্তিগুলো অন্ধ ও বধিরই হয়ে থাকে। আর এই যে আপনি বললেন, মানুষ সেই জিনিসটি-ই উৎপাদন করবে, যার চাহিদা আছে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত চাহিদা থাকবে; আপনার এই দৃষ্টিভঙ্গি নীতিগতভাবে যদিও সঠিক; কিন্তু মানুষ যখন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তখন তাকে এই তথ্য জানতে অনেক সময় লাগে যে, এই বস্তুটির চাহিদা কম হবে, নাকি বেশি হবে। একটি সময় এমন থাকে, যখন পণ্যের চাহিদা কম থাকে; কিন্তু উৎপাদনকারী মনে করে, এর চাহিদা বেশি। ফলে সে উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে বাজার মন্দা হয়ে যায়। তারপর বাজারের এই মন্দা পরিস্থিতির ধ্বংসাত্মক ফলাফল অর্থনীতিকে ভোগ করতে হয়। কাজেই এই সমস্যাগুলোকে অন্ধ ও বধির শক্তিগুলোর হাতে অর্পণ করা যায় না।

পুঁজিবাদী অর্থনীতি একটি জাদুর কাঠি উপস্থাপন করেছিল। এবার সমাজাবাদ আরেকটি কাঠি উপস্থাপন করল যে, এই চার সমস্যার একমাত্র সমসাধান হলো, উৎপাদনের যত উপকরণ আছে, ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে এগুলোকে সামষ্টিক মালিকানায় নিয়ে আসতে হবে।

তার পদ্ধতি হলো, এসব উপরকরণকে রাষ্ট্রের মালিকানায় দিয়ে দিতে হবে। তারপর সরকার পরিকল্পনা করে এগুলোকে কাজে লাগাবে। সরকার ঠিক

করে দেবে, কী পরিমাণ জমিতে গমের চাষ করা হবে, কী পরিমাণ জমিতে ধান চাষ করা হবে, কী পরিমাণ জমিতে তুলা চাষ করা হবে, কতগুলো কারখানায় কাপড় তৈরি হবে, কতগুলো কারখানায় জুতা তৈরি হবে ইত্যাদি। এসব পরিকল্পনা সরকার ঠিক করবে।

আর যেসব লোক জমি কিংবা কারখানায় কাজ করবে, তাদেরকে শ্রমিক হিসেবে বেতন প্রদান করা হবে। আর সেই বেতন-ভাতার পরিমাণও পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারই প্রস্তুত করবে।

কাজেই এই ব্যবস্থায় অগ্রগণ্যতা নির্ধারণও সরকার করবে, উপকরণের বিভাজনও সরকার করবে, আয়ের বন্টনও সরকার করবে এবং উন্নয়নের পরিকল্পনাও সরকারই ঠিক করবে।

যেহেতু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে এ সকল কাজ সরকার ও পরিকল্পনার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তাই এই অর্থনীতিকে 'পরিকল্পিত অর্থনীতি'ও (Planned Economy) বলা হয়।

পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী অর্থনীতি যেহেতু তার সমস্যাগুলোকে বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের শক্তিগুলোর উপর ছেড়ে দিয়েছে, সেজন্য এই অর্থনীতিকে 'বাজার অর্থনীতি' (Market Economy) বা 'অবাধ অর্থনীতি'ও (Laissez Faire Economy) বলা হয়।

এই দুটি পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি আছে, যেগুলো বর্তমানে আমাদের সামনে বিদ্যমান এবং বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত আছে।

এই ব্যবস্থার নাম । আর পুঁজিবাদেরটার নাম Market Economy।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূলকথা

পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূলনকথা, যেগুলো তার দর্শন থেকে বের হয়ে আসে, তার প্রথমটি হলো 'ব্যক্তিমালিকানা' (private Ownership)। মানে যেকোনো নাগরিক উৎপাদনের সমস্ত উপকরণের মালিক হতে পারবে।

দ্বিতীয় মূলনীতিটি হলো 'সরকারের হস্তক্ষেপ না করা' (Laisseg Faire Policy Of State)। মানে উপার্জনের জন্য প্রতিজন নাগরিককে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হবে। তাতে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তার উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা বা বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যাবে না।

তৃতীয় মূলনীতি হলো 'ব্যক্তিস্বার্থের সঞ্চালক'। মানুষ তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থগুলোকে একটি সঞ্চালক হিসেবে ব্যবহার করবে। অর্থনৈতিক তৎপরতাগুলোকে গতিশীল করার জন্য তাকে উৎসাহিত করা হবে।

এ হলো পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূলকথা।

সমাজবাদের মূলনীতি

তার বিপরীতে সমাজবাদের মূলনীতি হলো, পণ্য উৎপাদনে এবং উৎপাদনের উপকরণগুলোতে ব্যক্তিমালিকানা বলতে কিছু থাকবে না। কোনো নাগরিক না কোনো ভূমির মালিক থাকবে, না কোনো মিল-কারখানার স্বত্বাধিকারী হতে পারবে।

দ্বিতীয় মূলনীতিটি হলো 'পরিকল্পনা'।

মানে প্রতিটি কাজ পরিকল্পনার অধীনে করতে হবে।

এ হলো পরস্পরবিরোধী দুটি দৃষ্টিভঙ্গি, যেগুলো এই মুহূর্তে আপনাদের সম্মুখে রয়েছে।

সমাজবাদী ব্যবস্থার ফলাফল

বর্তমান বিশ্বে এই দুটি ব্যবস্থার পরীক্ষা ও ফলাফল সামনে এসে পড়েছে এবং সমাজবাদের চূড়ান্ত আপনারা চোখে দেখেছেন যে, মাত্র ৭২ বছরের পরীক্ষার পর এই গোটা ব্যবস্থার ইমারতটি এমনভাবে ধসে পড়েছে যে, একদম মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। অথচ ন্যাশলাইজেশন (জাতীয়করণ) এক সময় একটি ফ্যাশন হিসেবে পৃথিবীতে চালু ছিল এবং কেউ তার বিরোধিতা করলে, তার বিরুদ্ধে মুখ খুললে তাকে পুঁজিবাদের দালাল ও পশ্চাদপদ বলে গালাগাল করা হতো। কিন্তু আজ খোদ রাশিয়ার নেতারা বলছেন :

'আহ, এই সমাজবাদের পরীক্ষাটা যদি রাশিয়ার পরিবর্তে আফ্রিকার কোনো একটি ছোট রাষ্ট্রে হতো, তা হলে অন্তত আমরা তার ধ্বংসকারিতা থেকে রেহাই পেয়ে যেতাম!'

সমাজবাদ একটি অস্বাভাবিক ব্যবস্থা ছিল

বাস্তবতা হলো, সমাজবাদ আদতেই একটি অস্বাভাবিক ব্যবস্থা ছিল। কারণ, জগতে অনেক সামাজিক সমস্যা আছে। কেবল অর্থনৈতিক সমস্যাই একমাত্র সমস্যা নয়। এখন যদি আমরা সেগুলোকে পরিকল্পনার আওতায় সমাধান করতে বসে যাই, তা হলে বিশ্বাস করুন, সমাধান হবে না।

এটিও তো একটি সামাজিক ব্যাপার যে, একজন পুরুষ একজন নারীকে বিবাহ করতে হয় এবং বিবাহে পুরুষের উপযুক্ত স্ত্রী আর নারীর উপযুক্ত স্বামীর প্রয়োজন পড়ে। এখন যদি কেউ বলে, যেহেতু বিবাহের ব্যবস্থাটিকে মানুষের মর্জির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তাই তার সূত্র ধরে নানা রকম সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তালাকের ঘটনা ঘটছে, সংসার ভেঙে যাচ্ছে, উভয়ের মাঝে বিবাদ তৈরি হচ্ছে। কাজেই এসব সমস্যার সমাধানের জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা

হোক যে, এই বিষয়টিকে সরকারে হাতে তুলে দেওয়া হোক এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে ঠিক করা হোক, কোন নারী কোন পুরুষের জন্য আর কোন পুরুষ কোন নারীর জন্য উপযোগী। বলাবাহুল্য যে, কেউ যদি পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সমস্যাটির সমাধান করতে চায়, তা হলে তা অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম ব্যবস্থা বলে পরিগণিত হবে, যার কোনো সুফল আশা করা যায় না।

সমাজতন্ত্রে এই পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় যেহেতু সব সমস্যার সমাধানকে পরিকল্পনার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, ফলে প্রশ্ন দেখা দিল, পরিকল্পনাটা করবে কে? উত্তর এল, সরকার। আবার প্রশ্ন এল, সরকার জিনিসটা কী? সরকার তো কয়েকজন ফেরেশতার সমষ্টি নয়। তারাও তো মানুষ এবং এই সমাজেরই কিছু সদস্য। তা হলে সমস্যার সমাধান হলো কোথায়? এর উত্তরে সমাজবাদ বলল, পুঁজিপতিরা সম্পদের বিরাট একটি অংশকে কুক্ষিগত করে নিজেদের মনমতো ব্যবহার করে। তাই আমাদেরকে এই ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু সে দেখল না, সমাজবাদের ফলে বহুসংখক পুঁজিপতির পতন ঘটেছে ঠিক; কিন্তু বড় একটি পুঁজিপতি জন্মলাভ করেছে, যার নাম 'সরকার'।

এখন সমস্ত সম্পদ সরকারের হাতে চলে এল। কিন্তু এখন এই গ্যারান্টি কে দেবে যে, সরকার কোনো অবিচার করবে না? তারা কি আকাশ থেকে নেমে আসা ফেরেশতা, নাকি নিষ্পাপতার কোনো সার্টিফিকেট তারা পেয়ে গেছে? তার অর্থ হলো, সমস্যা এই ব্যবস্থায়ও থাকছে এবং নানা সমস্যা জন্ম দিয়েই সে মৃত্যুবরণ করেছে। সেই দৃশ্য আপনারা অবলোকন করেছেন। এই ব্যবস্থাটির এমন শোচনীয় ও অপমানকর পতন ঘটেছে যে, এখন মানুষ এর নামটিও লজ্জার সাথে উচ্চারণ করে থাকে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির দোষ-ত্রুটি

এখন সমাজবাদী অর্থনীতির ব্যর্থ হওয়ার পর পুঁজিবাদীদের গলার জোর বেড়ে গেছে। এখন পুঁজিবাদী পশ্চিমারা খুব জোরেশোরে বগল বাজাচ্ছে, যেহেতু সমাজতন্ত্র ফেল হয়ে গেছে, কাজেই প্রমাণিত হয়ে গেল, আমাদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা-ই সঠিক ও যথার্থ। এখন মানুষের জন্য এই ব্যবস্থা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এখন মানুষের সামনে আর কোনো কার্যকর অর্থব্যবস্থা চালু নেই। কাজেই পুঁজিবাদই সঠিক ও একমাত্র অর্থব্যবস্থা।

খুব ভালো করে বুঝে নিন। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মৌল দর্শন হলো, মুক্ত বাজারের অস্তিত্ব এবং মুনাফা অর্জনের জন্য মানুষকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া। তো দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে যদিও এটি যুক্তিসঙ্গত দর্শন, কিন্তু যখন এই দর্শনকে

স্বাভাবিকেরও চেয়ে বেশি কাজে লাগানো হলো, তখন দর্শন নিজেই নিজের গোড়া কেটে দিল। একথাটি সঠিক যে, মানুষকে যখন মুনাফা অর্জনের জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হবে, তখন সরবরাহ ও চাহিদার শক্তিগুলো সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং সে অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলোকে সমাধান করে দেবে। কিন্তু এ কথাটিও ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে, চাহিদা ও সরবরাহের এই শক্তিগুলো তখন সক্রিয় থাকে, যখন বাজারে প্রতিযোগিতার পরিবেশ বিদ্যমান থাকে, প্রতিযোগিতা স্বাধীন থাকে এবং মজুদদারি না থাকে।

যেমন– আমাকে বাজার থেকে একটি লাঠি ক্রয় করতে হবে এবং বাজারে অনেক লাঠি বিক্রেতা আছে, যারা বিভিন্ন দামে লাঠি বিক্রি করছে। এক দোকানদার ৫০০ টাকা দামে বিক্রি করছে। এক দোকানদার ৪৫০ টাকায় বিক্রি করছে। এখন আমার এই অধিকার আছে, মন চাইলে আমি লাঠিটি ৫০০ টাকায় ক্রয় করব কিংবা ইচ্ছা হলে ৪৫০ টাকায় ক্রয় করব। এই পরিস্থিতিতে চাহিদা ও সরবরাহের শক্তিগুলো ঠিকমতো কাজ করে থাকে এবং তাদের সঠিক কার্যকারিতা প্রকাশ পায়।

পক্ষান্তরে লাঠি বিক্রেতা যদি একজনই থাকে, তা হলে আমাকে লাঠি ক্রয় করতে হলে তার কাছ থেকেই ক্রয় করতে হবে। তখন সে আমার কাছ থেকে ইচ্ছামাফিক মূল্য আদায় করবে। আমার তাতে কিছুই করার থাকবে না। এখানে এসে চাহিদা ও সরবরাহের শক্তিগুলো নিঃশেষ হয়ে গেল। কারণ, এখানে মূল্য নির্ধারণ একতরফা হচ্ছে। আমার যাচাই করার কোনোই সুযোগ নেই, যা আজকাল মজুদদাররা নির্ধারণ করে নিয়েছে। কাজেই বোঝা গেল, চাহিদা ও সরবরাহ শক্তি সেখানে কাজ করে, যেখানে স্বাধীন প্রতিযোগিতা থাকে। কিন্তু যেখানে ইজারাদারি থাকে, সেখানে এই শক্তিগুলো কোনো কাজ করে না।

তারপর যখন মানুষকে অধিক থেকে অধিকতর মুনাফা অর্জনের জন্য একদম স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হলো যে, তোমরা যার যে পন্থাটি মন চায় গ্রহণ করো। তাতে কোনো বাধা নেই। তখন তারা এমন-এমন পন্থা আবিষ্কার করে নিল, যেগুলোর কারণে বাজারে ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। অপর দিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সুদের মাধ্যমেও মুনাফা অর্জন করা বৈধ, জুয়ার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করাও বৈধ, লটারির মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করাও বৈধ। এই ব্যবস্থা এমনসব উপায়ে অর্থ উপার্জন করাকে বৈধ সাব্যস্ত করেছে, যেগুলোকে ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করেছে।

একজন মানুষ যেকোনো পন্থা অবলম্বন করে অর্থ উপার্জন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে কোনোই বিধিনিষেধ নেই। আর বাস্তবতা হলো, এই স্বাধীনতারই কারণে

অনেক সময় ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, যার ফলে চাহিদা ও সরবরাহ শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। আর এসব কারণে পুঁজিবাদী দর্শনের কল্যাণকর দিকগুলো বাস্তব তার মুখ দেখতে পায় না। এই ব্যবস্থার কোনো সুফল মানুষ ভোগ করতে পারে না।

মুনাফা অর্জনে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের ফলে আরও যে সমস্যাটি তৈরি হয়েছে, তা হলো, সমাজের জন্য কোন পণ্যটি উপকারী হবে আর কোনটি ক্ষতিকর হবে, এই ভাবনা ভাববার মতো ন্যূনতম নৈতিকতাবোধটুকুও মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। এই ব্যবস্থা মানুষকে শুধুই মুনাফা অর্জন করা শিখিয়েছে। এই তো কিছুদিন আগে আমেরিকার টাইম্‌স ম্যাগাজিনে আমি পড়েছি, একজন মডেলগার্ল পণ্যের বিজ্ঞাপনে ছবি দিয়ে এক দিনে ২৫ মিলিয়ন ডলার আদায় করে থাকে।

এখন প্রশ্ন হলো, পণ্য উৎপাদনকারী কারখানা কিংবা পণ্যবিক্রেতা ব্যবসায়ী এই টাকাগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করবে? বলাবাহুল্য যে, এই টাকাগুলো সে গরিব জনসাধারণ থেকেই উসুল করে নেবে। কারণ, এই পণ্যটি যখন বাজারে আসবে, তখন বিজ্ঞাপনের এই ব্যয়টিও তার মূল্যের সঙ্গে যোগ হয়ে আসবে এবং মূল্যের নামে আমার-আপনার থেকে উসুল করে নেবে।

এই যে ফাইভস্টার হোটেলগুলো, যেগুলোর এক দিনের ভাড়া আড়াই থেকে তিন হাজার ডলার। একজন মধ্যবিত্ত মানুষ এদিকে তাকাতেও ভয় পায়। কিন্তু এগুলো অস্তিত্বে এসেছে গরিব জনসাধারণের টাকায়। আর এখানে থাকে কারা? এখানে থাকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সরকারি খরচে। তারা বিলটা পরিশোধ করে কোথা থেকে? সরকারের কোষাগার থেকে। অর্থাৎ এই ব্যয় সরকার বহন করে থাকে। আর সরকার হলো জনগণের কমিটি। সরকার জনসাধারণ থেকে কর আদায় করে এই বিল পরিশোধ করে থাকে। এসব হোটেলে আর যারা থাকে, তারা হলেন ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি। তারা তাদের ব্যবসায়িক কাজে এসে এসব হোটেলে অবস্থান করেন। কিন্তু তারা এই ব্যয় কোথা থেকে সংগ্রহ করেন? এই টাকা তারা নিজেদের পকেট থেকে ব্যয় করেন না। তারা যে পণ্য উৎপাদন বা বিক্রি করেন, এই ব্যয় তার মূল্যের সঙ্গে যোগ করে নেন আর পণ্যটির বিক্রয়ের মাধ্যমে এই ব্যয়টিও জনগণের নিকট থেকে আদায় করে নেন।

কাজেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মুনাফা অর্জনে অবাধ স্বাধীনতার কারণে জনসাধারণের উপকার-অপকার বা সমাজের লাভ-ক্ষতির ন্যূনতম

নৈতিকতাবোধটুকুও উপস্থিত থাকে না। ফলে সমাজে অনৈতিকতা, অবিচার ও অনাচার ছড়িয়ে পড়ছে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা

এবার আমি ইসলামের অর্থব্যবস্থা নিয়ে কথা বলতে চাই। এতক্ষণ যা-কিছু আলোচনা করেছি, সেকথাগুলো মনে রাখলে অর্থনীতি বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে সহজ হবে। 'আর্থিক উপকরণগুলোর বণ্টন রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার পরিবর্তে বাজারশক্তিগুলোর অধীনে ছেড়ে দেওয়া উচিত' এই দর্শন ইসলাম স্বীকার করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন :

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ

'আমি পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দিয়েছি এবং স্তরগতভাবে তাদের একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, যাতে তারা পরস্পর পরস্পরের সেবা করতে পারে।'[১৪০]

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহপাক কী চমৎকার একটি কথা বলেছেন!

لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ

'যাতে তোমরা একজন আরেকজন দ্বারা কাজ নিতে পার।'

এর সারমর্ম হলো, আল্লাহপাক এই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি ব্যবস্থাপনা ঠিক করে দিয়েছেন। তিনি মানুষের জীবিকাকে বণ্টন করে দিয়েছেন। অর্থাৎ– উপকরণের বণ্টন, মূল্য নির্ধারণ ও সম্পদ বণ্টনের নিয়মনীতিগুলো মানুষের পরিকল্পনার মাধ্যমে অস্তিত্বে আসতে পারে না। বরং স্বয়ং আল্লাহপাক এই বাজার আর এই জগতের ব্যবস্থাপনা-ই এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, অর্থ-সম্পদ আপনা-আপনিই বণ্টিত হয়ে যাবে।

এই যে, আল্লাহপাক বললেন, 'আমি তোমাদের জীবিকাকে বণ্টন করে দিয়েছি' এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহপাক ভাগ করে দিয়েছেন, এই নাও; তোমার এত, এই নাও; তোমার এত। বরং এর অর্থ হলো, আমি প্রকৃতিতে এমন নিয়ম ঠিক করে দিয়েছি, যার আলোকে সম্পদ বণ্টনের কাজটি মানুষের মাঝে আপনা-আপনিই হয়ে যাবে।

এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অর্থনীতি বিষয়ে অনেক উঁচুমাপের একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন।

---

১৪০. সূরা যুখরুফ : ৩২

তিনি বলেছেন :

دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ

'তোমরা লোকদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দাও। আল্লাহপাক তাদের একজন দ্বারা আরেকজনকে জীবিকা দান করে থাকেন।'[১৪১]

অর্থাৎ– তাদের উপর অযথা বিধিনিষেধ আরোপ করো না। বরং তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দাও।

আল্লাহপাক এ এক বড় বিস্ময়কর ও বিরল ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছেন। যেমন– আমার অন্তরে এই মুহূর্তে ভাবনা জাগল, আমি বাজারে গিয়ে লিচু ক্রয় করব। আবার বাজারে যারা ফল বিক্রি করে, তাদের কারও-কারও মনে আল্লাহপাক চিন্তা ঢেলে দিলেন যে, তুমি বাজারে গিয়ে লিচু বিক্রি করো। ফলে আমি যখন বাজারে গেলাম, তখন দেখলাম, একব্যক্তি লিচু বিক্রি করছে। আমি তার কাছে গেলাম এবং দরদাম করে তার থেকে লিচু নিলাম আর তাকে টাকা দিলাম। তো এটিই আলোচ্য হাদীসের মর্ম যে, তোমরা মানুষকে স্বাধীন ছেড়ে দাও। কারণ, আল্লাহ একজনকে আরেকজনের দ্বারা জীবিকা দান করে থাকেন।

যাহোক, এই যে বলা হচ্ছে, বাজারশক্তি অর্থনীতির মূল বিষয়গুলোকে নির্ধারণ করে দেয়, ইসলাম পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার এই দর্শনকে স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু অর্থনীতিকে বাজারের শক্তিগুলোর উপর একদম স্বাধীন ছেড়ে দাও; পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই মূলনীতিটি ইসলাম স্বীকার করে না। বরং ইসলামের বিধান হলো, মুনাফা অর্জনের জন্য মানুষকে এত স্বাধীন ছেড়ে দিয়ো না যে, একজনের স্বাধীনতা আরেকজনের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নেবে। অর্থাৎ– একজনকে এত স্বাধীনতা দিয়ো না যে, সে ইজারাদার সেজে বসবে আর বাজারে তার ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং তার ফলে অন্যদের স্বাধীনতা ছিনতাই হয়ে যাবে।

তাই এই স্বাধীনতার উপর ইসলাম কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। সেই বিধিনিষেধগুলো কী? আমি সেগুলোকে তিনভাগে ভাগ করি।

এক. শরয়ী ও ইলাহী বিধিনিষেধ। অর্থাৎ– আল্লাহপাক এই বিধিনিষেধ আরোপ করে দিয়েছেন যে, তোমরা মুনাফা অর্জন করো; কিন্তু অমুক কাজটি করো না। একে ধর্মীয় বিধিনিষেধও বলা হয়।

---

১৪১. সহীহ মুসলিম কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং–২৭৯৯; সুনানে তিরমিযী কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং–১১৪৪; সুনানে নাসায়ী কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং–৪৪১৯; সুনানে ইবনে মাজা কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং–২১৬৭

দুই. নৈতিক বিধিনিষেধ।

তিন. রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ।

এই তিন প্রকারের বিধিনিষেধ আছে, যেগুলো ইসলাম মানুষের উপর আরোপ করেছে।

১. দ্বীনি বিধিনিষেধ

প্রথম প্রকারের বিধিনিষেধ হলো 'ধর্মীয় বিধিনিষেধ'। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা ইসলামকে অন্য অর্থব্যবস্থাগুলোতে থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি যদিও আপন মূলনীতিগুলো পরিহার করে এত নিচে নেমে এসেছে যে, এখন সরকারের পক্ষ থেকে তাতে কিছু-না-কিছু হস্তক্ষেপ হয়ই। কিন্তু সরকারের এই হস্তক্ষেপ ব্যক্তিগত বিবেক ও ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ইসলাম যে বিধিনিষেধ আরোপ করে, তা হলো ধর্মীয় বিধিনিষেধ। কী সেই ধর্মীয় বিধিনিষেধগুলো? তা হলো, ইসলাম বলছে, তুমি বাজারে মুনাফা অর্জন করো; কিন্তু সুদের মাধ্যমে আয় করা তোমার জন্য বৈধ নয়। যদি তা কর, তা হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। অনুরূপভাবে ইসলাম জুয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। জুয়ার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা বৈধ নয়। ইসলাম মজুদদারিকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। লটারিকে হারাম সাব্যস্ত করেছে।

ইসলামের বিধান হলো, যখন দুজন মানুষ কোনো লেনদেনে সম্মত হয়ে যায়, তখন সেই লেনদেন আইনের আওতায় চলে আসে। সেই লেনদেন বৈধ লেনদেন বলে স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু যদি দুই ব্যক্তি এমন কোনো লেনদেনে সম্মত হয়, যেটি সমাজের ধ্বংসের কারণ, তাহলে সেই লেনদেনের অনুমতি নেই। যেমন– দুজন লোক কোনো সুদী লেনদেনে সম্মত হলো। তো যেহেতু সুদী লেনদেনের মাধ্যমে সমাজে অর্থনৈতিক অনাচার তৈরি হয়, সমাজের ধ্বংসের কারণ হয়, তাই ইসলামে এই লেনদেনের বৈধতা নেই। অবশ্য সুদের কারণে সমাজে কী ধ্বংস নেমে আসে, সে এক স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। এ বিষয়ে বাজারে অনেক বই আছে। কিন্তু আমি আপনাদের সম্মুখে সরল একটি উদাহরণ পেশ করছি, যার মাধ্যমে আপনারা এর ধ্বংসযজ্ঞের কিছুটা ধারণা নিতে পারেন।

সুদী ব্যবসার ভিত্তি-ই হলো এর উপর যে, একজনের আমদানি নিশ্চিত আর অপরজনের আমদানি ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিশ্চিত। যেমন– একব্যক্তি কারও থেকে সুদের উপর ঋণ নিল। এখন তার জন্য সুদী মহাজনকে নির্দিষ্ট অংকের সুদ পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু যে লোক ঋণ নিল, সে যখন এই টাকা দ্বারা

কারবার করবে, তখন তার কারবারে মুনাফা হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে, কারবারের মাধ্যমে তার এই মূলধনই খোয়া যাবে। তো ঋণগ্রহীতার যদি লোকসানও হয়, তবু ঋণদাতাকে ১৫ ভাগ সুদ দিতে সে বাধ্য। এটা না করে তার কোনোই উপায় নেই। কাজেই ঋণগ্রহীতা লোকসানের মধ্যে রইল।

আবার এর বিপরীত ঘটনাও ঘটে। ঋণগ্রহীতা লাভের মধ্যে থাকে আর ঋণদাতা লোকসানের মধ্যে থাকে। যেমন– একব্যক্তি ব্যাংক থেকে দশ কোটি টাকা ঋণ নিল এবং তার দ্বারা কারবার শুরু করল। অনেক ব্যবসা এমনও আছে যে, তাতে শতকরা একশো ভাগও মুনাফা হয়। মনে করুন, এই ব্যক্তির পঞ্চাশ ভাগ মুনাফা হলো। কিন্তু তারপও সে ব্যাংকে নির্দিষ্ট অংকের সুদ পরিশোধ করবে। অবশিষ্ট সমস্ত টাকা সে নিজের পকেটে রাখবে।

এখানে দেখুন, এই লোকটি যে অর্থ দ্বারা ব্যবসা করল, তা কার ছিল? ছিল জনসাধারণের। তার মাধ্যমে সে মুনাফা অর্জন করল। আর সেই মুনাফার ৩৫ ভাগ মাত্র এক ব্যক্তির পকেটে চলে গেল। বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাংক পেল মাত্র ১৫ ভাগ। তারপর ব্যাংক সেখান থেকে নিজের অংশ রেখে অবশিষ্ট সামান্য অংশ (বড়জোর ১০ ভাগ) ডিপোজিটারদের মাঝে বণ্টন করে দিল। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, জনসাধারণের অর্থে যে মুনাফা হলো, তার মাত্র ১০ ভাগ তাদের মাঝে বণ্টিত হলো আর ৩৫ ভাগ একজনের পকেটে ঢুকে গেল। কিন্তু জনসাধারণ এই দশ ভাগ পেয়েই বেশ আনন্দিত যে, আমি ব্যাংকে একশো টাকা রেখেছিলাম। এখন বছর শেষে একশো দশ টাকা পেয়েছি। কিন্তু বেচারার জানা নেই যে, এই দশ টাকাও পুনরায় সেই পুঁজিপতি ব্যবসায়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ, সে সুদের আদলে ব্যাংককে যে মুনাফা প্রদান করেছিল, তাকে সে তার পণ্যের উৎপাদনব্যয়ের সঙ্গে যোগ করে নেবে। আর তা সেই পণ্যের মূল্যের অংশ হয়ে যাবে। পরে সেই মূল্য সে জনসাধারণের কাছ থেকে আদায় করে নেবে। কাজেই এখানে দেখা যাচ্ছে, সব দিক থেকেই সে লাভের মধ্যে আছে।

তাছাড়া তার লোকসানেরও কোনো ঝুঁকি নেই। ব্যবসায় লোকসান হয়ও যদি, তার প্রতিকারের জন্য আছে ইন্সুরেন্স কোম্পানি। ইন্সুরেন্স কোম্পানি তাদের কাছে আমানত রাখা জনসাধারণের অর্থ দ্বারা উক্ত পুঁজিপতি ব্যবসায়ীর লোকসানের প্রতিকার করে দেবে।

যাহোক, এখানে আমি সুদী ব্যবস্থার অবিচারমূলক কিছু আচরণের প্রতি ইঙ্গিত করলাম। কাজেই সুদের মাধ্যমে অর্থনীতিতে অবিচার ও অসমতা তৈরি হওয়া বাধ্যতামূলক। এজন্য ইসলাম একে নিষিদ্ধ ও হারাম করেছে।

শিরকত ও মুদারাবার উপকারিতা

এই ব্যবসা-ই যদি সুদের পরিবর্তে শিরকত ও মুদারাবার ভিত্তিতে করা হয়, তখন ব্যাংক ও অর্থ গ্রহণকারীর মাঝে এই চুক্তি হবে না যে, ব্যাংকে তার ১৫% সুদ পরিশোধ করতে হবে। বরং তখন চুক্তিটা এই হবে যে, অর্থ গ্রহণকারী যা মুনাফা অর্জন করবে, উভয় পক্ষ তা আধা-আধি ভাগ করে নেবে। অর্ধেক বিনিয়োগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পাবে আর বাকি অর্ধেক ব্যবসায়ী পাবে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে সম্পদের প্রবাহ নিচ থেকে উপর দিকে চড়ার পরিবর্তে উপর থেকে নিচের দিকে গড়াবে। কারণ, তখন ব্যাংকের মাধ্যমে ডিপোজিটাররা ১০ ভাগের স্থলে ২৫ ভাগ মুনাফা পাবে।

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, সুদের কুপ্রভাব সম্পদ বণ্টনের উপরও পড়ে থাকে এবং অর্থনীতির পিঠে তার কুফলের ছাপ পরিদৃশ্য হয়।

জুয়া হারাম

অনুরূপভাবে ইসলাম 'জুয়াকে'ও হারাম সাব্যস্ত করেছে। 'জুয়া' অর্থ, একব্যক্তি অর্থ বিনিয়োগ করেছে। এখন দুটি সুরত হতে পারে। হয় এই অর্থও ডুবে গেল কিংবা সঙ্গে করে মোটা অংকের অর্থ নিয়ে ফিরে এল। এর নাম জুয়া। এর অনেক প্রকার ও ধরন আছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, আমাদের এই পশ্চিমা সমাজব্যবস্থায় জুয়াকে (Gambling) অনেক অঞ্চলে আইনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এই জুয়া যখন সভ্যতার পোশাক পরিধান করে, তখন তা বৈধ হয়ে যায় এবং তখন আর তা বে-আইনি থাকে না। যেমন–একজন গরিব মানুষ রাস্তার পাশে বসে জুয়া খেলছে। পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যাবে। কিন্তু সভ্যতার আলখেল্লা পরিহিত অনেক জুয়া আমাদের পুঁজিবাদী সমাজে বৈধতার সনদ নিয়ে ছড়িয়ে আছে, যার মাধ্যমে অগণিত মানুষের পকেটের অর্থ সংগ্রহ করে একজনের উপর বর্ষণ করা হচ্ছে। এজন্যই শরীয়ত জুয়াকে হারাম সাব্যস্ত করেছে।

মজুদদারি

ইসলাম মজুদদারিকেও (Hoarding) হারাম ও নিষিদ্ধ করেছে। মজুদদারি ইসলামে অবৈধ। যেহেতু এ বিষয়টি সকলেরই জানা আছে, তাই এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই।

অনুরূপ সম্পদ কুক্ষিগতকরণও ইসলামে নিষিদ্ধ। 'কুক্ষিগতকরণ' মানে সম্পদ উপযুক্ত খাতে ব্যয় না করে নিজের কাছে ধরে রাখা। একজন বিত্তবান মানুষের উপর ইসলাম যেসব দায়িত্ব অর্পণ করেছে, সেগুলো পালন না করে

কেবলই সম্পদের পাহাড় গড়া। যেমন– যাকাত ইত্যাদি আদায় না করা। ইসলামের পরিভাষায় একে 'ইক্‌তিনায' বলা হয়, যার অর্থ 'কুক্ষিগতকরণ'। ইসলামে এটিও হারাম ও না-জায়েয।

আর শুনুন, হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

وَلَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

'শহরের কোনো লোক যেন গ্রামের কোনো ব্যক্তির পণ্য বিক্রয় না করে।'[১৪২]

অর্থাৎ– গ্রামের কেউ কোনো পণ্য বিক্রি করার জন্য শহরে নিয়ে আসছে। এমতাবস্থায় কোনো শহুরে লোকের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার কাছে গিয়ে বলবে, দাও; তোমার এই মালটি আমি বিক্রি করে দেব। কিংবা আমার কাছে বিক্রি করে দাও; আমি পরে অন্যের কাছে বিক্রি করব। বাহ্যত এর মধ্যে কোনো সমস্যা দেখা যায় না। কারণ, এই ক্রয়-বিক্রয়ে গ্রামের লোকও রাজী, শহরের লোকও রাজী। উভয়েই সম্মত। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজ করতে বারণ করে দিয়েছেন। তার কারণ হলো, শহরের মানুষ যখন গ্রামের লোকের মালটি ক্রয় (করে পরে অন্যের কাছে) বিক্রি করবে বা তার উপর কব্জা প্রতিষ্ঠিত করে নেবে, তখন দাম বাড়ার অপেক্ষায় সে এই পণ্যটি আটকে রাখবে। ফলে এটি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ ঘটবে।

তার বিপরীতে গ্রামের মানুষ নিজেই যদি নিজের পণ্য বিক্রি করে, তা হলে এটা নিশ্চিত যে, সে লাভ ছাড়া বিক্রি করবে না। কিন্তু তার ইচ্ছা থাকবে, যত তাড়াতাড়ি পণ্যটি বিক্রি করে বাড়ি ফিরে যাওয়া যায়। তো এভাবে প্রকৃত চাহিদা ও প্রকৃত সরবরাহের শক্তিগুলো নির্ধারিত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি মধ্যখানে কোনো মধ্যস্বত্বভোগী (Middleman)এসে পড়ে, তা হলে তার কারণে চাহিদা ও সরবরাহ শক্তিগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে না এবং মূল্য বেড়ে যাবে। তাই যত কারণে ও যত উপায়ে সমাজকে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির শিকার হতে হয়, সেগুলোর উপর ইসলাম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

এ হলো, ব্যবসার উপর শরীয়তের পক্ষ থেকে আরোপ করা বিধি-নিষেধের প্রথম প্রকার।

---

১৪২. সহীহ বুখারী কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং–২০০৬; সহীহ মুসলিম কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং–২৫৩৩; সুনানে তিরমিযী কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং–১১৪৩; সুনানে নাসায়ী কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং–৩১৮৭; সুনানে আবুদাউদ কিতাবুল বুয়ূ' : হাদীস নং–৯২৮৩

২. নৈতিক বিধিনিষেধ

স্বাধীন অর্থনীতির উপর ইসলাম দ্বিতীয় যে বিধিনিষেধটি আরোপ করেছে, তার নাম 'নৈতিক বিধিনিষেধ'। কারণ, বহু জিনিস এমন আছে, যেগুলোকে ইসলাম হারামও ঘোষণা করেনি আবার সেগুলো করতে আদেশও করেনি। তবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আর যেমনটি আমি উপরে বলে এসেছি যে, ইসলাম কোনো অর্থব্যবস্থার নাম নয়। বরং এটি একটি দ্বীনও একটি জীবনব্যবস্থা। সেখানে সর্বপ্রথম এই শিক্ষা প্রদান করা হয় যে, মানুষের মূল লক্ষ্য আখেরাতের সফলতা।

তাই ইসলাম মানুষকে এই বলে উৎসাহ প্রদান করে যে, তুমি যদি অমুক কাজটি কর, তা হলে আখেরাতে তুমি এর অনেক প্রতিদান পাবে। ইসলাম ব্যক্তিগত স্বার্থের সঞ্চালক অবশ্যই। কিন্তু সেই স্বার্থকে ইসলাম দুনিয়াবি জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না। বরং ব্যক্তিস্বার্থের মধ্যে আখেরাতের স্বার্থকেও বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত মনে করে। সেজন্য অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ইসলাম আমাদেরকে এই শিক্ষা প্রদান করেছে যে, দুনিয়াতে তুমি মুনাফা কম পেলেও আখেরাতে এর উপযুক্ত প্রতিদান পেয়ে যাবে।

যেমন– ইসলাম আমাদেরকে এই শিক্ষা প্রদান করেছে যে, এক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের জন্য বাজারে গেল। তো এই ব্যক্তি যদি নিয়ত করে, আমি এই জন্য বাজারে এসেছি, যাতে আমি সমাজের অমুক প্রয়োজনটি পূরণ করতে পারি, তা হলে এই নিয়তের কারণে তার ব্যবসার প্রতিটি কাজ ইবাদতে পরিণত হয়ে যাবে এবং তা ছাওয়াবের কারণ হয়ে যাবে। তখন এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানুষ সেই পণ্যটি বাজারে আনবে, যেটি মানুষের বেশি প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবেও সমাজে তার আবশ্যকতা থাকতে হবে।

যেমন– কোনো সমাজের অবস্থা যদি এমন হয় যে, সেখানে নাচ-গানের প্রতি মানুষের ঝোঁক খুব বেশি। এমতাবস্থায় পুঁজিবাদের চিন্তা-চেতনা হলো, অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য মানুষ নাচঘর তৈরি করুক। কারণ, তার খুব চাহিদা আছে। কিন্তু দ্বীনি পাবন্দির কারণে ইসলামে সিনেমা তৈরি করা বৈধ নয়।

কিংবা এক ব্যক্তি দেখতে পাচ্ছে, আমি যদি অমুক কারখানাটি স্থাপন করি, তা হলে তাতে আমার খুব মুনাফা হবে। কিন্তু এই সময়ে মানুষের বাড়ি-ঘরের বেশি প্রয়োজন; তবে তাতে মুনাফা কম। কিন্তু তাতে মানুষের প্রয়োজন পূরণ হবে। তো এই পরিস্থিতিতে শরীয়তের নৈতিক পাবন্দির উপর আমল করার কারণে সে আখেরাতের মুনাফার হকদার হবে।

৩. সরকারি বিধিনিষেধ

তৃতীয় প্রকারের বিধিনিষেধ হলো 'সরকারি বিধিনিষেধ'। আল্লাহপাক যে বিধিনিষেধগুলো আরোপ করেছেন, অনেক মানুষ এমন থাকবে, যারা সেগুলোর কোনো পরোয়া করবে না এবং তার পরিপন্থী কাজ করবে কিংবা সমাজে কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি করবে, যার ফলে এসব বিধিনিষেধ যথেষ্ট না-ও হতে পারে।

তখন সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ইসলামী সরকারকে এই অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, সে কিছু বৈধ কাজের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে। তারপর সমস্ত মুসলমানকে সেই বিধিনিষেধগুলো মান্য করা অপরিহার্য হবে।

ইসলামী সরকারের এ জাতীয় আইন মান্য করা অপরিহার্য হওয়ার পক্ষে পবিত্র কুরআনে প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

আল্লাহপাক বলেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো আর তোমাদের যারা শাসক, তাদের আনুগত্য করো।'[১৪৩]

এ কারণেই ফকীহগণ বলেছেন, দেশের সরকার যদি প্রকৃত অর্থেই ইসলামী হয়, তা হলে সেই সরকার যদি যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে এই আইন ঘোষণা করে যে, অমুক দিন দেশের সমস্ত মানুষ রোযা রাখবে, তা হলে সেদিন রোযা রাখা দেশের সকল নাগরিকের জন্য কার্যত ওয়াজিব হয়ে যাবে। কোনো ব্যক্তি যদি সেদিন রোযা না রাখে, তা হলে সে রমযানের রোযা না রাখার গুনাহেরই মতো গুনাহগার হবে। কারণ, ইসলামী সরকারের আনুগত্য করা ফরজ।[১৪৪]

অনুরূপভাবে ফকীহগণ আরও লিখেছেন, সরকার যদি এই আইন জারি করে দেয় যে, দেশের জনগণের জন্য তরমুজ খাওয়া নিষেধ, তা হলে জনসাধারণের জন্য তরমুজ খাওয়া হারাম হয়ে যাবে।

যাহোক, দেশের ইসলামী সরকারের জন্য ইসলাম এই অধিকার প্রদান করেছে। শর্ত হলো, এই আইনগুলো সে মানুষের স্বার্থে জারি করবে। এটিও এক ধরনের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। যেমন– সরকার যদি বলে দেয়, মানুষ অমুক পণ্যে বিনিয়োগ করবে এবং অমুক খাতে বিনিয়োগ করবে না, তো শরীয়তের সীমানার মধ্যে অবস্থান করে সরকার এ ধরনের আইন ও বিধিনিষেধ জারি করতে পারে।

---

১৪৩. সূরা নিসা : ৫৯

১৪৪. ফাতাওয়া শামী ৩/৪৬৩; রূহুল মা'আনী ৫/৬৬

মোটকথা, পুঁজিবাদের মোকাবেলায় ইসলামের অর্থব্যবস্থায় এটি হলো মৌলিক পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র। আর মনে রাখবেন, এই যে আমরা বিধি-নিষেধের কথা বলছি, এই বিধিনিষেধ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায়ও আছে। কিন্তু সেই বিধিনিষেধ হলো মানুষের মনগড়া। ইসলামের আসল বৈশিষ্ট্য হলো দ্বীনি বিধিনিষেধ, মানুষ যা অহীর মাধ্যমে লাভ করে থাকে। আর যেখানে এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও অধিকর্তা আল্লাহপাক মানুষকে এই নির্দেশনা প্রদান করেন যে, তোমাদের জন্য অমুক জিনিসটি ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ। আর এটি মূলত এমন একটি বিষয় যে, মানবতা যতক্ষণ পর্যন্ত এই পথের উপর উঠে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির শিকার হয়েই থাকবে। একথা ঠিক যে, সমাজতন্ত্র মাঠে পরাজয়বরণ করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, পুঁজিবাদের যে দোষগুলো ছিল, যে অন্যায়-অবিচারগুলো ছিল, সেগুলো দূর হয়েছে কি? উত্তর এ ছাড়া আর কী আছে যে, আজও সেগুলো আগের ন্যায় বহাল আছে? তাতে একবিন্দুও পরিবর্তন আসেনি। আর সে সবের সমাধান যদি থেকে থাকে, তো আছে খোদায়ী বিধি-নিষেধের মধ্যে। আল্লাহর সেই আইনের কাছে এসে ধরা না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত হবে না, হওয়া সম্ভব নয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ না করা ব্যতীত মানুষ শান্তি পেতে পারে না।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা আজও আল্লাহর বিধি-নিষেধের উপর ভিত্তি করে একটি অর্থব্যবস্থার কাঠামো বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপন করতে পারিনি। এখন আমাদের জন্য এটি-ই সব চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যে, আমাদেরকে ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি কাঠামো দাঁড় করাতে হবে, যাতে বিশ্ববাসী জানতে পারবে, অন্যান্য অর্থব্যবস্থার মোকাবেলায় ইসলামী অর্থব্যবস্থার স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য কোথায় এবং কীভাবে তাকে বাস্তবায়ন করা যায়।

আল্লাহপাক আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত– খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২২-৪৭

প্রচলিত জমিদারি ব্যবস্থার ইতিহাস ও সূচনা

বিগত কয়েক শতাব্দির আগে ইউরোপে এবং তার পরে এশীয় দেশগুলোতে বিশেষ এক ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু ছিল, যাকে জমিদারি প্রথা বলা হয়।

এই জমিদারি প্রথায় নানা ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা ও অনাচার মানুষের সামনে এসেছে। আর তার উপর ভিত্তি করে এই ব্যবস্থার অনেক দুর্নাম হয়েছে এবং সমগ্র পৃথিবীতে এই প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। মানুষ এখন এ জাতীয় জমির মালিকানাকে আদতেই অস্বীকার করতে চাচ্ছে।

এক পর্যায়ে সমাজবাদ জমিদারি প্রথার দুর্নামকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। যখন প্রশ্ন উঠল, ইসলামে জমিদারি প্রথার কোনো সুযোগ আছে কি-না, তখন মানুষ চিন্তা করল, যদি বলে দেই, হ্যাঁ আছে, তা হলে এই ব্যবস্থা হালে পানি পেয়ে যায়। আর ইসলাম দ্বারা এর পক্ষে সমর্থন জোগানো খোদ ইসলামেরই দুর্নাম করার নামান্তর। তাই মানুষ দাবি করল, ইসলামে জমিদারি প্রথার কোনো ধারণা নেই। এর কোনো সমর্থন ইসলামে নেই।

অনেকের মানসিকতা হলো, যখন কোনো দৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তা-চেতনা অতিশয় জোরালোভাবে দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে, তখন এ ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা বা দৃষ্টিভঙ্গি কী, তা না জেনেই তারা ঘোষণা দিয়ে বসে, ইসলাম এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে না।

তাদের ধারণামতে এই নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে তারা ইসলামের খুব সেবা করছে, যাতে ইসলামের দুর্নাম না হয় এবং তার মাথায় যে দাগ আছে, তা যেন দূর হয়ে যায়। আর সেই দৃষ্টিভঙ্গিরই সূত্র ধরে তারা ঘোষণা দিয়ে বসল, ইসলামে জায়গির প্রথার কোনো অবকাশ নেই।

অথচ এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল।

আপনারা হাদীসে দেখতে পাবেন যে, সেখানে আনসারদেরকে জায়গির দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন সময়ে সাহাবা কেরামকে অনেক জায়গির (তালুক) প্রদান করা হয়েছে।

যেমন– আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত তামীমদারী (রাযি.)কে বাইতুল্লাহর গোটা অঞ্চলটি জায়গির দান করেছিলেন। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হাজ্‌রকে ইয়েমেনের বিরাট একটি এলাকা জায়গির হিসেবে দান করেছিলেন। হযরত বিলাল ইবনে হারিছ মুযানি ও হযরত জারীর (রাযি.)কে অনেক বড় জায়গির দান করেছিলেন। অনুরূপ হযরত আবুবকর ও হযরত ওমর (রাযি.)কেও জায়গির দান করেছিলেন। তো জায়গির দান করার অনেক ঘটনা বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে। বিশেষ করে আবু উবায়েদ (রাযি.)-এর 'কিতাবুল আহ্ওয়াল' ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর 'কিতাবুল খিরাজ' ও ইবনে আদম রহ.-এর 'কিতাবুল খিরাজ'-এ জায়গির দানের অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ আছে।

ইউরোপের জমিদারি বা তালুক প্রথার স্বরূপ

আসল ব্যাপার হলো, মানুষ শুধু 'জায়গির' শব্দটিকেই ধরে বসে গেছে। এটা বুঝবার চেষ্টা করেনি যে, যে জায়গির ব্যবস্থা ইউরোপে চালু হয়েছিল এবং যার নানা অপকারিতা ও সমস্যা সামনে এসেছিল, তাতে আর ইসলামের জায়গির দানের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি-না। তারা বিষয়টি না বুঝেই বলে বসল, ইসলামে জায়গির দানের কোনোই ধারণা নেই।

কাজেই আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে, ইউরোপের জায়গির ব্যবস্থার স্বরূপ কী ছিল। তার স্বরূপ ছিল, যাকে জায়গির দান করা হতো, যাকে জায়গিরদার বানানো হতো, ভূমিটি তাকে মালিকানাস্বরূপ দান করা হতো না যে, এই জমিটি তোমার। বরং তার নিয়ম ছিল, জায়গিরদারকে বলা হতো, তোমাকে যে ভূখণ্ডটি প্রদান করা হলো, তুমি এখানাকার সমস্ত জমির খাজনা ও ট্যাক্স আদায় করার অধিকার তোমাকে প্রদান করা হলো। যেমন– তাকে বলে দেওয়া হলো, করাচির আশপাশের গ্রামগুলোতে যত জমি আছে, সেগুলোতে যারা চাষাবাদ করে, তাদের থেকে সরকারের পরিবর্তে তুমি ট্যাক্স উসুল করবে। তার পরিমাণও তুমিই নির্ধারণ করবে। সাধারণত এই নিয়ম চালু ছিল যে, এসব জায়গির সেই লোকদের প্রদান করা হতো, যারা সরকারের জন্য বিশেষ কোনো অবদান রেখেছে। সেই সময়টি ছিল রাজতন্ত্রের যুগ। রাজা-বাদশারা তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বড়-বড় সেনা-অফিসারদেরকে এসব জায়গির দান করতেন। এমন লোকদেরকে তারা বলে দিতেন, এই পরিমাণ জায়গির তোমাকে দিয়ে দিলাম। কাজেই এখানকার খাজনাপাতি সব তুমি উসুল করো। কিন্তু তার সঙ্গে এই শর্তও আরোপ করা হতো যে, যখনই সরকারের যুদ্ধের জন্য সৈনিকের প্রয়োজন হবে, তখন তোমার জায়গির এলাকা থেকে এত পরিমাণ সৈন্য সরবরাহ করতে হবে।

যেমন–কাউকে বলে দেওয়া হলো, তুমি দশ হাজার লোক দেবে। কাউকে বলে দেওয়া হলো, তুমি পাঁচ হাজার লোক নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। বাকি যেভাবে খুশি এই ট্যাক্স আদায় করো। যে পরিমাণ খুশি ধার্য করো। তা তোমার মালিকানায় থাকবে।

আমাদের দেশে এই পরিভাষাগুলো খুব প্রসিদ্ধ ছিল যে, এটি দশ হাজারি জায়গির। এটি পাঁচ হাজারি জায়গির ইত্যাদি। তার অর্থ এই ছিল যে, যে লোক যুদ্ধের সময় দশ হাজার সৈন্য সরবরাহ করবে, সে দশ হাজারি জায়গিরদার। যে লোক পাঁচ হাজার সৈন্য সরবরাহ করবে, সে পাঁচ হাজারি জায়গিরদার। তাতে এই হতো যে, করের পরিমাণ ধার্য করার অধিকারও তাদের অর্জিত থাকত।

ফলে অনেক সময় এমনও হতো যে, নিজের স্বার্থে তারা কৃষকদের উপর মাত্রাতিরিক্ত কর ধার্য করত আর কৃষকরাও নিজেদের অপারগ মনে করে তাদের সব সিদ্ধান্ত মেনে নিত। কারণ, তারা জানত, এই কর ধার্য করার অধিকার তাদের আছে; আমরা যদি তাদের সিদ্ধান্ত মেনে না নিই, তা হলে আমাদের পিঠের চামড়া খসে যাবে। আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার হারিয়ে যাবে। সেজন্য তারা জায়গিরদারদের (জমিদারদের) যে কোনো সিদ্ধান্ত অম্লানবদনে মেনে নিত। বস্তুত এই ইউরোপীয় জায়গির (জমিদারি) ব্যবস্থায় জনসাধারণ দাসে পরিণত হয়েছিল। তাদের সঙ্গে ক্রীতদাসের মতো আচরণ করা হতো।

আর সে কারণেই পরিভাষায় তাদেরকে 'রায়ত' (প্রজা) বলা হতো। জায়গিরদাররা কৃষকদের সঙ্গে যেমন খুশি আচরণ করত আর নিরুপায় কৃষকরা চোখ বুজে তা মেনে নিত।

এর জন্য শাসকদের অনেক মাশুল গুণতে হয়েছে। এর জন্য অনেক ক্ষতি বরণ করে নিতে হয়েছে। যখন বিপুলসংখ্যক নাগরিক 'রায়ত' (প্রজা) নামে জায়গিরদারদের আয়ত্তে এসে পড়ল, তখন তারা বিরাট এক শক্তির অধিকারী হয়ে গেল। রায়ত তো নয়, যেন কেনা গোলাম। ফলে ওরা জমিদারদের সেনাবাহিনীতে পরিণত হলো। রাজা-বাদশাদের সঙ্গে তাদের প্রতিশ্রুতিও থাকত, যুদ্ধের সময় তারা দশ হাজার সৈন্য সরবরাহ করবে। তো তারা কেউ দশ হাজার সৈন্যের মালিক। কেউ বিশ হাজার সৈন্যের মালিক। কেউ পাঁচ হাজার সৈন্যের মালিক। এভাবে তারা যার-যার এলাকায় রাজার মর্যাদা লাভ করত। যেন একটি রাষ্ট্রের মধ্যে ছোট-ছোট আর অনেকগুলো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। তাদের প্রতিরক্ষা ও রাজনৈতিক শক্তিও অনেক মজবুত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তারা এখন রাজা-বাদশাদেরকেও লাল চোখ দেখাতে শুরু করল যে, তোমরা যদি আমাদের কথা না শোন, তা হলে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব। আমাদের কাছে এত সংখ্যক সৈন্য আছে। তোমরা আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না।

ফল এই দাঁড়াল যে, এই জায়গিরদাররা রাজা-বাদশাদের মাথার উপর চড়ে বসল। আট-দশটি জায়গিরদার যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেত, তা হলে রাষ্ট্রের রাজাকে তাদের সামনে অস্ত্রসমর্পণ করতে হতো এবং তাদের যেকোনো দাবি মেনে নিতে বাধ্য হতেন। রাজারা যেন তাদের অনুগত হয়ে গিয়েছিলেন।

জায়গিরদারি (জমিদারি) ব্যবস্থার এই চিত্র ইউরোপে দীর্ঘকাল যাবত বহাল ছিল।

তার কুপ্রভাব আমাদের হিন্দুস্তান-পাকিস্তানেও এসেছিল। এখনও তার অবশিষ্ট আমাদের বালুচিস্তানে প্রচলিত সরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে বহাল আছে যে, যখন যিনি সরদার হন, তিনি তার অধীন অঞ্চলের (নাউযুবিল্লাহ) একজন খোদা হয়ে বসেন। তিনিই জনগণ থেকে কর উসুল করেন। বালুচিস্তানে আজও কৃষকরা তাদের উৎপাদিত শস্যের এক ষষ্টমাংশ কর হিসেবে জায়গিরদারকে প্রদান করে, যাকে তারা 'শশক' বলে। আর সমস্ত মানুষ জায়গিরদারে অধীনে গোলামের মতো জীবনযাপন করে। সরদাররা একটি ব্যবস্থাপনা এই করে রেখেছে যে, তাদের শাসনাধীন অঞ্চলের কোনো মানুষ শিক্ষা অর্জন করতে পারবে না। কারণ, জনসাধারণ যদি শিক্ষার আলো পেয়ে যায়, তা হলে আর তাদেরকে বাগে রাখা যাবে না। সেজন্য তারা এ ব্যাপারে খুব সচেতন ও সচেষ্ট যে, তাদের অঞ্চলে যেন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠে। কোনো রাস্তা-ঘাট যেন তৈরি না হয়। সভ্যতার ছোঁয়া যেন তাদের এলাকা না পায়। জনগণ এই শিক্ষা আর সভ্যতার ছোঁয়া পেয়ে গেলে তাদের খোদাগিরি ছুটে যাবে।

এই সেই জায়গিরদারি (জমিদারি) ব্যবস্থা, যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। কোথাও-কোথাও এই প্রথা আজও বহাল আছে এবং তার প্রতি ঘৃণাও অবশিষ্ট আছে।

ইসলামে জায়গিরদানের অর্থ

এর বিপরীতে ইসলামে জায়গিরদানের অর্থ হলো, কাউকে তিন পদ্ধতির যে কোনো একটি পদ্ধতিতে জায়গির দান করা যায়। প্রথম পদ্ধতি হলো, কাউকে কিছু অনাবাদি জমি দান করা হলো আর বলা হলো, এগুলোকে আবাদ করে তুমি তোমার মালিকানায় নিয়ে নাও। তাতে শর্ত থাকে, এই জমিগুলোকে তুমি তিন বছরের মধ্যে আবাদ করতে হবে। যদি এই মেয়াদের মধ্যে আবাদ করতে পার, তা হলে তুমি এর মালিক হয়ে যাবে। অন্যথায় তোমার জায়গিরদারি বাতিল হয়ে যাবে।

আপনি দেখবেন, কাউকে যদি এই শর্তে জায়গির দান করা হয় যে, তুমি তিন বছরের মধ্যে এগুলোকে আবাদ করবে, তা হলে তাতে একটি উপকার এই

হবে যে, কিছু অনাবাদি ও পতিত জমি আবাদ হয়ে যাবে এবং দেশের উৎপাদন বেড়ে যাবে। আর বলাবাহুল্য যে, বিপুল পরিমাণ জমি একজন মানুষ একা আবাদ করতে পারে না। তার শ্রমিকের প্রয়োজন হবে। এতে কিছু মানুষের কর্মসংস্থানও হবে। যদি তিন বছরে এই উপকারিতা না আসে, তা হলে এই জায়গিরদারি শেষ। নতুন করে কাউকে জায়গির প্রদান করা হবে। ফলে এই পদ্ধতিতে সমস্যার কোনো সম্ভাবনা-ই নেই।

হযরত বিলাল ইবনে হারিছ মুযানি (রাযি.)কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জায়গির দান করেছিলেন। তিনি কিছু অংশ আবাদ করেছিলেন আর অবশিষ্টাংশ আবাদ করতে সক্ষম হননি। ফলে সেই জায়গির তাঁর থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। অনেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবক্তা। তাদের যুক্তি হলো, দেখুন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জায়গির ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। কারণ, জায়গিরদার তিন বছরের মধ্যে জমিগুলো আবাদ করতে পারেননি। যদি পারতেন, তা হলে আর ফিরিয়ে নিতেন না।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো, কাউকে সরকারি মালিকানার কিছু জমি (বর্গা হিসেবে) দান করা হলো। ইসলামের আইনে অনাবাদি জমি রাষ্ট্রের মালিকানা নয়। যে অনাবাদি জমিকে সরকার আবাদ করেছে, সেগুলো রাষ্ট্রের মালিকানা। তো দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো, সরকার এ ধরনের কোনো জমি কাউকে মালিকানাস্বত্বসহ দান করল। এখানে এমন কোনো শর্ত থাকে না যে, তিন বছরের মধ্যে আবাদ না করলে তোমার থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। কারণ, এগুলো তো আগে থেকেই আবাদ আছে। এ ধরনের জায়গির শুধু রাষ্ট্রীয় ভূমিতেই হতে পারে, যার মালিক সরকার। কিন্তু এ জাতীয় জমির পরিমাণ খুবই কম হয়ে থাকে, যেগুলোকে সরকার আগে থেকেই আবাদ করে রেখেছে। যার ফলে এ জাতীয় জমি বিপুল পরিমাণে কাউকে জায়গির প্রদান করা সম্ভব হয় না। কারণ, সরকার কোনো জমি আবাদ করার অর্থ হলো, এই জমিটি তার কোনো কাজে প্রয়োজন। আর আবাদ করার পর সেই কাজে লাগিয়ে ফেলে। কাজেই এ ধরনের পতিত জমি বলতে গেলে থাকেই না। তারপরও যদি সরকার এমন কোনো জমি কাউকে জায়গির দান করে, তাতেও জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে দিতে হয়। এমনটি হয় না যে, কাউকে ঘুষ বা উপহার হিসেবে দিয়ে দিল। বরং দিলেও এমন কাউকে দেওয়া হয়, যার এই জমিটি একান্তই প্রয়োজন। জনস্বার্থের বাইরে এমন জমি দান করা সরকারের জন্য বৈধ নয়। ভুলটা এখান থেকেই শুরু হয় যে, মানুষ সরকারি জমি বলতে ব্যক্তিমালিকানাহীন যেকোনো জমিকেই মনে করে। কিন্তু ব্যাপার তা নয়।

তৃতীয় পদ্ধতি হলো, জমির মালিকানা প্রদান করা হলো না; বরং ভোগদখল অধিকার প্রদান করা হলো। বলা হলো, এগুলো সরকারি জমি; তুমি এগুলো কাজে লাগিয়ে উপকৃত হও। এগুলোতে তুমি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চাষাবাদ করে আয় করতে পার। এই পদ্ধতি দ্বিতীয় পদ্ধতিরও চেয়ে দুর্বল। এখানেও সেসব শর্ত আরোপিত থাকে, যেগুলো দ্বিতীয় পদ্ধতিতে আরোপ করা হয়।

এ ধরনের আদান-প্রদানও বড় পরিমাণে হতে পারে না এবং এখানেও সীমাবদ্ধতা থাকে।

চতুর্থ পদ্ধতি – যার প্রচলন ইউরোপ প্রভৃতি অঞ্চলে ছিল – কাউকে নির্দিষ্ট কিছু এলাকার কর আদায়ের মালিক বানিয়ে দেওয়া হলো। ইসলামে এই পদ্ধতি জায়েয় হওয়ার জন্য শর্ত হলো, জায়গিরদার যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হতে হবে। তবেই তাকে বলা যেতে পারে যে, তুমি অমুক এলাকার উশর আদায় করে নাও। কারণ, যারা যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত নয়, তারা উশর খেতে পারে না। যাকাতের যারা মাসরাফ, ওশরেরও মাসরাফ তারা-ই।

মনে করুন, কাউকে বলে দেওয়া হলো, তুমি অমুক অঞ্চলের উশর আদায় করে নাও। আর সে যাকাত খাওয়ার উপযুক্তও বটে। কিন্তু একবার উশর আদায় করার পর এখন সে নেসাবের মালিক হয়ে গেল। এখন আর সে যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত রইল না। তা হলে পরবর্তী বছর আর তার উশর আদায় করার অধিকার থাকবে না। কাজেই এই জায়গির চলতেই পারে না।

প্রথম তিন প্রকারের জায়গির প্রথা চলতে পারে। তার মধ্য থেকে দুটি খুব সীমিত। বড় আকারে চলতে পারে প্রথম প্রকারের নিয়মটি। অর্থাৎ– অনাবাদি ভূমির জায়গির। আর ইসলামে জায়গির প্রদানের যে তথ্য আমরা পাচ্ছি, তার বেশিরভাগই এই পতিত জমি এবং তাতে এই বাধ্যবাধকতা ছিল যে, তিন বছরের মধ্যে জমিগুলো আবাদ করতে হবে।

এখানে আরও একটি বিষয় বুঝতে হবে। তা হলো, কাউকে অনাবাদি জমি জায়গির প্রদানের পর সে যদি নিজে তাকে আবাদ করে কিংবা শ্রমিক খাটিয়ে চাষাবাদ করায়, তা হলে তো ঠিক আছে; এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তা না করে যদি সে উক্ত জমি কাউকে লগ্নি বা বর্গায় দেয় যে, তুমি এই জমিতে চাষাবাদ করো; বিনিময়ে আমাকে বছরে এত টাকা দিয়ো বা যা ফসল উৎপন্ন হবে, তার এত ভাগ আমাকে দিয়ো, তা হলে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

কারণ, এ ধরনের চুক্তির জন্য শর্ত হলো, আপনাকে জমির মালিক হতে হবে। তবেই শুধু কৃষকের সঙ্গে এ ধরনের চুক্তি করা যেতে পারে। কিন্তু এখনও যেহেতু আপনি জমিগুলো আবাদ করেননি এবং তার মালিক হননি, তাই এই চুক্তি করা যাবে না।

কাজেই এই পদ্ধতিতে যে কৃষক উক্ত জমিকে চাষাবাদ করবে, সে-ই তার মালিক হয়ে যাবে। জায়গিরদার মালিক হবে না। ইসলামের বিধান হলো, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ أَحْيَىٰ أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

'যেলোক কোনো মৃত (পতিত) জমিকে জীবিত (আবাদ) করবে, সে তার মালিক হয়ে যাবে।'[১৪৫]

এই নীতি অনুসারে যেলোক জমিতে কাজ করবে, সে-ই তার মালিক হয়ে যাবে। জায়গিরদার তখনই তার দ্বারা উপকৃত হতে পারে, যখন সে নিজে চাষাবাদ করবে কিংবা পারিশ্রমিক দিয়ে অন্যলোক দ্বারা কাজ করাবে। অন্যথায় সে মালিক হবে না।

এই রীতি শত-শত বছর যাবত মুসলমানদের মাঝে চালু ছিল এবং তার ফলে বিপুল পরিমাণ জমি মানুষের হাতে এসেছে। কিন্তু সে রকম কোনো সমস্যা তৈর হয়নি, যেমনটি ইউরোপীয় জায়গির প্রথার কারণে তৈরি হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে এবং যার ফলে জায়গির প্রথার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সোচ্চার হতে হয়েছে। বরং ইসলামের জায়গির প্রথার কারণে দেশ ও দশের উপকারই সাধিত হয়েছে যে, অনাবাদি ও পতিত জমিগুলো আবাদ হয়েছে। জাতীয় উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। মানুষের উপার্জন বেড়েছে। উশর বেড়েছে, যার ফলে গরিব-মিসকিনরা উপকৃত হয়েছে।

ইসলামের জায়গির প্রথার ইতিহাসে এমনটি কখনও হয়নি যে, জায়গিরদার এমন কোনো প্রভাব তৈরি করে নিয়েছে, যার ফলে সরকার তাদের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। না কোনো রাজনৈতিক সমস্যা তৈরি হয়েছে, না কোনো অর্থনৈতিক সমস্যা।

সেজন্য ইসলামে জায়গির প্রথার যে ধারণা আছে, সেটি সেই জায়গির প্রথা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যেটি প্রথমে ইউরোপে শুরু হয়েছিল এবং পরে এশিয়াতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য আমাদের এই উপমহাদেশে যেহেতু দীর্ঘদিন যাবত ব্রিটিশের শাসন বলবত ছিল, তাই এখানকারও কিছু-কিছু এলাকায় তারা সেই জায়গির প্রথা চালু করেছিল, যেটি তাদের দেশে সমস্যা তৈরি করেছিল। যেমনটি আমি বলেছি, আমাদের বালুচিস্তানের সরদারি প্রথা তারই একটি ছায়ামাত্র, যাকে নির্মূল করা একান্ত আবশ্যক।

---

১৪৫. সুনানে তিরমিযী : হাদীস নং-১২৯৯; সুনানে আবী দাউদ : হাদীস নং-২৬৭১; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং-১৪১০৯; মুআত্তা ইমাম মালিক : হাদীস নং-১২২৯

ইংরেজদের প্রদত্ত জায়গিরসমূহ

ইংরেজ আমলে মানুষকে এমন বহু জায়গির (জমিদারি) প্রদান করা হয়েছিল, যেগুলো কি-না ইসলামের প্রথম শ্রেণীর জায়গির ছিল। অর্থাৎ মালিকানাসহ অনাবাদি জমি প্রদান করা হয়েছিল। তার দুটি দিক আছে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এই জমিগুলো ঘুষ হিসেবে প্রদান করা হয়েছিল। আবার সেই ঘুষও ছিল মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য। মুসলমানরা ইংরেজদেরকে দেশ থেকে তাড়ানোর জন্য আন্দোলনে ব্যাপৃত ছিল। ইংরেজরা মুসলমানদেরই মধ্যে তাদের কিছু গুপ্তচর ঠিক করে রেখেছিল। তারা মুসলমানদের সঙ্গে গাদ্দারি করে ইংরেজদের কাছে সংবাদ সরবরাহ করত যে, অমুক আপনাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। অমুক আপনাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পাকাচ্ছে। ইংরেজদের কাছে এই গাদ্দারির অনেক মূল্য ছিল। তারই বিনিময়ে তারা ঘুষ হিসেবে তাদেরকে বিশাল-বিশাল জায়গির (জমিদারি) প্রদান করেছিল।

গাদ্দারির বিনিময়ে প্রদত্ত জায়গিরের বিধান

শরীয়তের বিধান হলো, গাদ্দারির বিনিময়ে যে জমি বা জায়গির প্রদান করা হয়েছে, তাকে নিজের মালিকানায় রাখা জায়েয নয়। কারণ, যে কাজের বিনিময়ে এই সম্পদ পাওয়া গেল, সেটি হলো গাদ্দারি। গাদ্দারি করাও হারাম, এর বিনিময়ে প্রাপ্ত সম্পদও হারাম। কাজেই এমন সম্পদ নিজের কাছে রাখা যাবে না।

অবশ্য প্রশ্ন আসে, তারা যদি এমন জমি আবাদ করে নেয়, তা হলে তাতে তাদের মালিকানা সাব্যস্ত হবে কি-না? এর উত্তর খানিক কঠিনই বটে। ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতে এখানে মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। কারণ, আবাদ করার কারণে মালিকানা সাব্যস্ত হবে সেই জমিতে, যে জমি সরকার প্রদান করেছে। কিন্তু এখানে তো এই জমি ঘুষ বা বিশ্বাসঘাতকতার বিনিময়ে প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া যারা প্রদান করেছে, তারা কোনো বৈধ সরকার ছিল না। তারা ছিল দখলদার। কাজেই এখানে মালিকানা সাব্যস্ত হবে না।

ইংরেজদের পক্ষ থেকে কোনো সেবার প্রতিদান হিসেবে প্রাপ্ত জায়গিরের বিধান

এমন অনেক জায়গির আছে, যেগুলো গাদ্দারির বিনিময়ে প্রদান করা হয়নি। ইংরেজদের শাসন ছিল। একটি সরকারের অনেক কাজ থাকে। গাদ্দারিই তো আর একমাত্র কাজ নয়। একটি সরকারের জনস্বার্থের পক্ষেও

অনেক কাজ থাকে। সেসব জনহিতকর কাজের জন্য অনেক জায়গির প্রদান করা হয়েছে। এসব জায়গির ঠিক আছে। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে শর্ত থাকবে, জায়গিরদার জমিগুলোকে ইসলামী নিয়মে আবাদ করতে হবে। যদি সেভাবে আবাদ করে থাকে, তা হলে তার মালিকানা সঠিক। আর যদি না করে থাকে, তা হলে যতটুকু আবাদ করেছে, ততটুকুতে মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে; বাকিটুকুতে হয়নি।

একটি ভুল বোঝাবুঝির অবসান

আমাদের সময়ে কেউ-কেউ বলছেন, দ্বিতীয় প্রকারের জমিতেও (যেগুলোকে আবাদ করেছে) মালিকানা আসবে না। তাদের দলিল হলো, সব জমি মুসলমানদের ছিল। ইংরেজদের দেশ দখলের আগে এখানে মুসলমানদের শাসন ছিল। তাই এই ভূখণ্ডের সমস্ত জমি মুসলমানদের ছিল। ইংরেজরা অবৈধভাবে এই দেশ দখল করেছে। কাজেই কোনো অবস্থাতেই তাদের কাউকে জায়গির প্রদানের অধিকার ছিল না। তাই তারা যদি কাউকে জায়গির প্রদান করে থাকে, তা কার্যকর হবে না।

কিন্তু তাদের এই দলিল সঠিক নয়। এটি ফিক্হী দলিল নয় - আবেগতাড়িত দলিল। কারণ, ফিক্হ-এর সর্বজনস্বীকৃত মূলনীতি হলো, কাফেররা যদি মুসলমানদের কোনো ভূ-খণ্ডের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত করে নেয়, তা হলে তারা সেই ভূ-খণ্ডের মালিক হয়ে যায়। কাফেরদের জোরপূর্বক দখল মালিকানার কারণ হয়ে যায়। যেসব মুসলমান মক্কায় বিপুল পরিমাণ ভূ-সম্পত্তি রেখে মদীনা হিজরত করেছিল, পবিত্র কুরআন তাদেরকে 'ফকীর' আখ্যায়িত করেছে। কাফেররা তাদের সেই সম্পত্তি দখল করে নিয়েছিল।

এতে প্রমাণিত হয়েছে, ইসলাম মুশরিকদের সেই দখলকে মেনে নিয়েছিল। অন্যথায় সেই সম্পদের মালিকদেরকে 'ফকীর' আ্যখ্যায়িত করল কেন? উক্ত সম্পদ মুসলমানদের মালিকানা থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। কাজেই ইংরেজরা যখন পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের উপর কব্জা প্রতিষ্ঠিত করে নিল, তখন এখানকার ভূমি তাদের মালিকানায় চলে গিয়েছিল। এখন তারা এই জমি যাকে দান করবে, সে তার মালিক হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো, এই দান শরীয়তসম্মত উপায়ে হতে হবে। কোনো গাদ্দারি বা ঘুষের বিনিময়ে দিলে হবে না। তো ইংরেজদের প্রদত্ত জায়গিরগুলোর মধ্যে উভয় প্রকারের ভূমি-ই আছে। কিছু গাদ্দারির বিনিময়ে প্রদান করা হয়েছে, আবার কিছু সঠিক সেবার বিনিময়ে প্রদান করা হয়েছে।

ইংরেজদের প্রদত্ত সব জায়গিরই কি অবৈধ?

কাজেই এই যে বলা হচ্ছে, ইংরেজরা যত জায়গির প্রদান করেছে, তার সবগুলোই অবৈধ ছিল বিধায় এগুলো ফেরত নেওয়া দরকার; শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও একথা সঠিক নয়। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে যারা বৈধভাবে ভূমির মালিক হয়েছিল, তারাও বঞ্চিত হয়ে যাবে। এটা ঠিক নয়।

আমাদের দেশে যতগুলো রাজনৈতিক দল আছে, তারা সবাই নির্বিচারে অভিমত ব্যক্ত করেছে, সকলের কাছ থেকেই ফেরত নেওয়া উচিত। এভাবে বলা ঠিক নয়। যাচাই করে দেখা দরকার, কে কীভাবে জায়গিরের অধিকারী হয়েছে। যারা ন্যায়সঙ্গভাবে হয়েছে, তাদের সম্পত্তি বহাল রাখার আবশ্যক। অন্যদের কাছ থেকে ফেরত নিন। অনেকে বলছেন, সোয়া একর রেখে বাকিটা ফেরত নিতে হবে। আবার বলছে, পঞ্চাশ একর রেখে বাকিটা ফেরত নিতে হবে। এ এক হাস্যকর প্রস্তাব। হারাম হলে সবটাই হারাম। আর হালাল হলে সবটাই হালাল। সোয়া একর আর পঞ্চাশ একর রেখে দেওয়ার তো কোনো অর্থ হয় না। কেউ যদি গাদ্দারি করে জায়গির নিয়ে থাকে, তা হলে তার থেকে সবটাই ফেরত নেওয়া দরকার। যদি তার পরিমাণ হাজার একরও হয়, তবুও নিতে হবে। কিন্তু কেউ যদি বৈধ উপায়ে নিয়ে থাকে, তা হলে তার পরিমাণ হাজার একর হলেও ফেরত নেওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে যেসব রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা বাজারে চালু আছে, ফিক্হ ও শরয়ী বিধানের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। বাস্তবতা এটিই, যা আমি আলোচনা করেছি।

বর্গাচাষের বিধান

অনেকে জায়গির ব্যবস্থার অপকারিতার সূত্র ধরে অভিমত ব্যক্ত করছেন যে, জমিদারি ব্যবস্থাকেও তুলে দেওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবতা হলো, জমিদারি ব্যবস্থায় যে সমস্যাগুলো দেখা যাচ্ছে, সেগুলো মূলত এই ব্যবস্থার ত্রুটি নয়। এগুলো হলো ব্যক্তির ইসলামবিরোধী আচরণ ও চরিত্রের কুফল।

আমাদের কোনো-কোনো সমাজে, বিশেষ করে পাঞ্জাব ও কিছু-কিছু সীমান্ত এলাকায় এমন হয়ে থাকে যে, জমিদার কৃষকদের উপর শরীয়তপরিপন্থী নানা শর্ত আরোপ করে থাকে। যেমন– আমি তোমাকে চাষাবাদের জন্য জমি দিচ্ছি। কিন্তু তোমাকে এই-এই শর্তগুলো পালন করতে হবে। যখন আমার মেয়ের বিবাহ হবে, তখন এত পরিমাণ খাদ্যপণ্য আমাকে দিতে হবে। আমার ছেলের খতনার সময় এত পরিমাণ ঘি সরবরাহ করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাছাড়া তারা কৃষকদের বেগার খাটায়। জমিদারের বাড়ি নির্মাণ করতে হবে কিংবা অন্যকোনো কাজ করতে হবে। তাতে কৃষকদের দ্বারা কাজ নেওয়া

হয়; কিন্তু কোনো মজুরি দেওয়া হয় না। এ ধরনের অনেক সমস্যা আমাদের সমাজে ছড়িয়ে রয়েছে, যা জমিদারি ব্যবস্থাকে কলুষিত করে রেখেছে।

জমিদাররা আরও যে সমস্যাটি তৈরি করে রেখেছে, তা হলো, তারা কৃষকদেরকে সামাজিকভাবে হেয় করে রেখেছে। এমনকি আমাদের পাঞ্জাবে তাদেরকে 'কমী' বলা হয়। 'কমী' অর্থ কমীনা – মানে ইতর। জমিদাররা কৃষকদেরকে ইতর শ্রেণীর মানুষ বানিয়ে রেখেছে। তাদের হেয় প্রতিপন্ন করে অপমানিত করা হয়। এর সবই নাজায়েয ও হারাম কাজ। মূলত চাষাবাদের মধ্যে কোনো দোষ নেই। দুজন মানুষ যদি দুই ভাইয়ের মতো মিলেমিশে কাজ করে, তা হলে তাতে কোনোই সমস্যা নেই। সমস্যা তৈরি হয় অনৈতিকতা, অন্যায় শর্ত ও অমানবিক আচরণের কারণে।

সুদি বন্ধক (কট) রাখা

ব্যাপক একটি প্রচলন আছে সুদী বন্ধক (কট) রাখার। কারও কাছ থেকে ঋণ নিলেন আর তার কাছে আপনার জমি বন্ধক রাখলেন। তিনি তাতে চাষাবাদ করলেন এবং ঋণের পরিমাণেরও চেয়ে বেশি এই জমি থেকে উসুল করে নিলেন। কিন্তু তারপরও জমি ছাড়বার নাম নেই। এ ধরনের বহু সমস্যা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে, যেগুলো আমাদের ভূমি ব্যবস্থাকে তছনছ করে দিয়েছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের প্রোপাগাণ্ডা হলো, জমিদারি ব্যবস্থাটি ভালো নয়। আমি বলব, জমিদারি ব্যবস্থাকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই। আসল সমস্যা এখানে নয়।

ভূমি ব্যবস্থার যে নীতি ইসলাম আমাদের প্রদান করেছে, তার অনুসরণের মাধ্যমে আমাদেরকে এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, বিশেষভাবে আমাদের সিন্‌দে (সিন্ধু প্রদেশে) সরকারের পক্ষ থেকে ভূমিহীনদের মাঝে জমি বণ্টন করা হয়। যখন সরকার পরিবর্তন হয়, তখন আগের সরকার যাদেরকে দিল, তাদের থেকে নিয়ে জমিগুলো দলীয় লোকদের মাঝে বণ্টন করে। এর মধ্যে অনেক সময় অনাবাদি জমিও থাকে, যাকে সরকার আবাদ করেনি। প্রশ্ন হলো, এ ধরনের জমি প্রজাকে দিয়ে আবার ফেরত নেওয়া জায়েয হচ্ছে কি-না?

এর উত্তর হলে, সরকার যখন প্রজাকে অনাবাদি জমি প্রদান করছে, তখন এই জমি গ্রহণ করা ও তাকে আবাদ করা জায়েয আছে এবং এই আবাদির কারণে সে তার মালিক হয়ে যাবে। পরে আর সেই জমি ফেরত নেওয়া সরকারের জন্য বৈধ হবে না।

আমরা সুপ্রিম কোর্টে এই রায়ই প্রদান করেছি যে, যদি কোনো সরকার জনসাধারণের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ করে,তা হলে তারা আদালতে রিট করে তাদের জমি ফেরত নিতে পারে।

ভূমিতে উত্তরাধিকার চালু হওয়ার বিধান

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, উত্তরাধিকার চালু না হওয়ার কারণে আমাদের ভূমি ব্যবস্থায় বড় ধরনের একটি সমস্যা তৈরি হয়ে আছে। বিশেষ করে পাঞ্জাবে উত্তরাধিকারের ইসলামী বিধান প্রয়োগ হয় না। মেয়েদেরকে জমিতে অংশ দেওয়া হয় না।

তো উত্তরাধিকার চালু না থাকার কারণে আমাদের জমিগুলো কুক্ষিগত হয়ে আছে। এক-একজনের মালিকানায় বিপুল পরিমাণ জমি! ইসলামের উত্তরাধিকার বিধান চালু হলে এই সমস্যা থাকত না। তখন একজনের হাতে এত জমি থাকতে পারত না। যদি ইসলামে উত্তরাধিকার আইনের প্রয়োগ থাকত, তা হলে আজ কারও হাতে এক হাজার একর জমি থাকার কল্পনাও করা যেত না। বরং এই জমি আপনা-আপনিই বাটোয়ারা হয়ে যেত।

আজও যদি দেশে কোনো ইসলামী সরকার আসে, তা হলে তাদের জন্য অবশ্যকর্তব্য হবে, আজ থেকেই উত্তরাধিকার আইন চালু করে দেওয়া। কারণ, যাদের হক নষ্ট করা হয়েছে, আইনত তারা উক্ত সম্পদের মালিক রয়ে গেছে। সরকারের কর্তব্য হবে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া। যদি এমনটি হয়ে যায়, তা হলে দেখবেন, কারও কাছে আর এক হাজার একর, পাঁচশো একর জমি থাকবে না।

ইসলাম গজ আর একরের হিসাব দ্বারা মালিকানা সীমাবদ্ধ করেনি। কারণ, এই নিয়ম কখনও চলতে পারে না যে, একজন মানুষ এর বেশি জমির মালিক হতে পারবে না। এমন আইন আইউব খান করেছিলেন। ভুট্টো করেছিলেন। কিন্তু তার ফলাফল এই দাঁড়াল যে, জমির মালিকরা বলল, ঠিক আছে; আমরাও দেখব। তারা বাড়তি জমিগুলো এমন লোকদের নামে হস্তান্তর করল, যারা জানতই না যে, কেউ তাদের নামে জমি দলিল করেছে। মালিকানায় নাম বাড়ানো হয়েছে; কিন্তু জমি সেই একজনেরই হাতে রয়ে গেছে। লাভ কিছুই হলো না। মধ্যখানে মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হলো।

ভুট্টো ছাহেব সোয়া একরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিলেন। এখানেও একই ঘটনা ঘটল। নাম বদল হলো। কিন্তু জমি যারটা তারই হাতে রয়ে গেল।

তো গজ আর একরের হিসাবে সীমাবদ্ধ করা যায় না। এগুলো আইওয়াশ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলাম গজ-একরের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করেনি। কিন্তু

ব্যবস্থাপনা এমন তৈরি করেছে যে, তার ফলে বেশি জমির মালিক হওয়ার সুযোগই থাকে না।

যখন মীরাছ চালু হবে, তখন বড় একটি জমি কয়েকজনের মধ্যে বণ্টিত হয়ে যাবে। তাদের মৃত্যুর পর এই জমি আবারও তাদের উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টিত হবে। এভাবে ভূমির মালিকানার সংখ্যা বাড়তে থাকবে। ফলে এক ব্যক্তির পক্ষে বিরাট একটি ভূ-খণ্ডের মালিক থাকা সম্ভব হবে না এবং যেসব কারণে সমাজে আজ নানা অনাচার তৈরি হচ্ছে, সেগুলো আর হতে পারবে না।

আজ ইসলামের আইন কেউ মানছে না। বলছে, গজ আর একরের হিসাবে বণ্টন করে দাও আর অবশিষ্টগুলো ছিনিয়ে নাও, শরীয়তে যার কোনো বৈধতা নেই। সমস্যার সঠিক সমাধানও এটি নয়।

এখানে প্রশ্ন উঠছে, কেউ যদি সরকারে নিকট থেকে কম মূল্যে জমি ক্রয় করে, তা হলে এর বিধান কী? উত্তরের সারসংক্ষেপ হলো, সরকারিভাবে জমি একটি মূল্য নির্ধারিত থাকে। যদি সেই মূল্যে ক্রয় করা হয়, তা হলে তো কোনো সমস্যা নেই। তবে এখানে একটি শর্ত থাকবে, এই মূল্য বাজারমূল্যের চেয়ে খুব বেশি কম হতে পারবে না। অন্যথায় জায়েয় হবে না। কেউ যদি ঘুষ হিসেবে সরকারি জমি গ্রহণ করে, তা হলে তাও জায়েয হবে না।

অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, ইংরেজরা মানুষকে যে জমি প্রদান করেছে, সে একশো বছর আগের ঘটনা। তারা চলে গেছে। আজ সেই দানের কোনো রেকর্ডও নেই। এমতাবস্থায় কী করা যাবে?

এর উত্তরে আমি বলব, আমি ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি যাচাই করেছি। এক-একটি জমি ও এক-একটি ভূ-খণ্ডের রেকর্ড বিদ্যমান আছে। কাজেই একথা ভুল যে, রেকর্ড নেই। প্রথমে কাকে দেওয়া হয়েছিল, আসল নামটা কার এবং পরে কার হাতে এসেছে সব রেকর্ড বিদ্যমান আছে। ইংরেজদের শাসনব্যবস্থা খুবই সুশৃঙ্খল ছিল।

মোগল আমলের ভূমি হস্তান্তরের তেমন কোনো রেকর্ড পাওয়া যায় না। কিন্তু ইংরেজরা এক-একটি ভূ-খণ্ডের রেকর্ড তৈরি করেছে।

তাদের রেকর্ডের নিয়ম ছিল দুটি। একটি পদ্ধতির রেকর্ড বন্দোবস্ত অফিসগুলোতে বিদ্যমান আছে। আরেকটি পদ্ধতি হলো, তারা রেকর্ডগুলো বইয়ের আকারে ছাপিয়ে দিয়েছিল। তাতে প্রতিটি জেলা ও ডিভিশনের রেকর্ড লেখা ছিল। সেই ছাপানো বইগুলো আজও সংরক্ষিত আছে।

আমি যে সময় এ বিষয়টি যাচাই করছিলাম, তখন হাজারা গ্রামের একটি সমস্যা সামনে ছিল। উক্ত বিষয়টির উপর রায় লেখার প্রয়োজন ছিল। আমাকে তদন্ত করতে হলো। তখন দেখেছি, ইংরেজরা তাদের শাসনব্যবস্থায় কেমন

দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। তারা এক-একটি গ্রামের, এক-একটি গলির, এক-একটি ভূ-খণ্ডের রেকর্ড তৈরি করেছে। আর সেই রেকর্ড তারা শুধু অফিসেই সংরক্ষণ করেনি, বরং বই আকারে ছেপে জনসাধারণের হাতে-হাতে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল এবং তাতে এই তথ্যও যুক্ত করেছিল যে, অমুক অঞ্চলের এই নিয়ম ছিল, অমুক অঞ্চলের এই প্রথা ছিল ইত্যাদি।

এ ছিল তখনকার তথ্য। আর এখন কী হচ্ছে? এখন লেখা হচ্ছে, অমুক তারিখ থেকে অমুক তারিখ পর্যন্ত এই প্রথা ছিল। তারপর এই হয়েছে, ওই হয়েছে। ব্যস, এসব লিখে দায় শোধ করা হচ্ছে।

কাজেই ইংরেজ আমলের রেকর্ড বের করা কঠিন কিছু নয়। সরকার যদি একটি ভূমি কমিশন তৈরি করে দেয় যে, তোমরা এই তথ্যগুলো বের করো; তা হলে কাজটা কঠিন কিছু হবে না। অনায়াসেই সব তথ্য বেরিয়ে আসবে এবং অতি সহজেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে।

আমি বরং বলতে চাই, ভাই! এত কিছু বাদ দাও। শুধু ইসলামের উত্তরাধিকার আইনটি চালু করো। তারপর দেখো, এই জমিদাররা থাকে কীভাবে। এই বড়-বড় দাগের জমির কী হয়।

সূত্র : ইন'আমুল বারী– খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৬১-৭২

ইসলাম, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র

'ইসলাম আমাদের ধর্ম।
গণতন্ত্র আমাদের রাজনীতি।
সমাজতন্ত্র আমাদের অর্থনীতি।'

এটি একটি স্লোগান। একদল রাজনীতিক বড় সোচ্চারভাবে এই স্লোগানটি উচ্চারণ করে থাকে। মূলত যারা আধুনিক রাজনীতি করেন, এটিই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

স্লোগানের প্রথম শব্দটি হলো 'ইসলাম'। তাতে অনুমিত হতে পারে, তারা ইসলামকে সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করছে। জীবনে উল্লেখযোগ্য স্থানটি তারা ইসলামকে দিয়েছে। কিন্তু যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করা হয়, তা হলে এ বিষয়টি খোলাসা হয়ে যাবে যে, এই স্লোগানে 'ইসলামে'র দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যাকে হাত-পা কেটে রাজসিংহাসনে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

প্রথম কথাটি হলো, এই তিনটি বাক্য পাঠ করার পর যে ধারণাটি মাথায় আসে, তা হলো, আল্লাহ ক্ষমা করুন, ইসলামও খ্রিস্টবাদ, ইহুদিবাদ ও হিন্দুধর্মমতের মতোই পুজাপাটের কয়েকটি প্রথা-প্রচলনের সমষ্টির নাম এবং জীবনের অন্য কোনো বিভাগের সঙ্গে এর কোনোই সম্পর্ক নেই। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সঙ্গে ইসলামের কোনো যোগাযোগ নেই। কেউ যদি ইবাদতের কয়েকটি বিশেষ রীতি ও কর্ম রপ্ত করে নেয় এবং সেগুলো পালন করে, তা হলেই সে খাঁটি মুসলমান বলে বিবেচিত হবে। এর পর সে নিজের ইচ্ছানুযায়ী যেকোনো রাজনীতি, যেকোনো অর্থনীতি, যেকোনো সমাজনীতিকে গ্রহণ করে নিতে পারে। ইসলাম তাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। একজন মুসলমান মসজিদে বসে ইসলামী শিক্ষামালার অনুসরণে পাবন্দ। ক্ষমতার চেয়ারে বসার পর কিংবা নিজের জন্য জীবিকার অন্বেষণের সময় ইসলাম হয়ত কোনো দিকনির্দেশনা প্রদানই করেনি, নতুবা দিলেও যদি থাকে, তা এতই অসম্পূর্ণ ও অকেজো যে, তার মাধ্যমে আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে না। তাই অপারগতাবশত আমরা আমাদের রাজনীতিতে গণতন্ত্র থেকে আর অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্র থেকে 'আলো' গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

বলা বাহুল্য যে, ইসলামের মর্ম ও পরিচয় যদি এ-ই হয়, তা হলে বলতে হবে, 'ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা এবং জীবনের সব সমস্যার সমাধান ইসলামে রয়েছে' এই দাবি সঠিক হতে পারে না। এমতাবস্থায় আপনাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া দরকার যে, ইসলাম ইবাদাত-আকাইদ ছাড়া জীবনের আর কোনো সমস্যার সমাধানে আমাদেরকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেনি। ফলে আমরা বুকে কুরআন ধারণ করার পরও কার্লমার্কস ও মাওসেতুং-এর কাছে ভিক্ষা চাইতে বাধ্য।

আপনারা যদি এই দাবি করে থাকেন যে, ইসলাম শুধু ইবাদত ও আকায়িদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইসলাম জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান, তা হলে মসজিদ বলুন আর বাজার বলুন, সরকারি অফিস বলুন আর বিনোদনকেন্দ্র বলুন, সব জায়গায়ই আপনাদেরকে ইসলামের অনুসরণ করতে হবে। তা-ই যদি বাস্তবতা হয়, তা হলে এই কর্মনীতির কোনো মানে হতে পারে না যে, আপনি মসজিদে গিয়ে বাইতুল্লাহর অভিমুখী হবেন আর অফিস-বাজারে গিয়ে মস্কো ও পিকিংকে কেবলা বানাবেন।

জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আপনাকে সেই মহা মানবের অনুসরণ করতে হবে, যিনি তাঁর শিক্ষামালা দ্বারা শুধু মসজিদকেই আলোকিত করেননি, বরং তাঁর আদর্শের প্রদীপ সরকারি অফিস ও হাট-বাজারকেও সমভাবে উদ্ভাসিত করেছিল।

কিছু লোক এই স্লোগানটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে থাকেন, এখানে যে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে, সেটি ধর্মহীন সমাজতন্ত্র নয়। বরং এটি ইসলামী সমাজতন্ত্র। আর যেভাবে গণতন্ত্র ইসলামী হতে পারে, তেমনি সমাজতন্ত্রও ইসলামী হতে পারে। কাজেই 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' পরিভাষাটি অশুদ্ধ নয়।

এর উত্তরে আমি বলব, পরিভাষা হিসেবে আমাদের কাছে 'ইসলামী গণতন্ত্র'ও সঠিক নয়, 'ইসলামী সমাজতন্ত্র'ও সঠিক নয়। এই উভয় ব্যবস্থা-ই পশ্চিমাদের ধর্মহীন চিন্তা-চেতনার ফসল। এর সঙ্গে ইসলামের নাম জুড়ে দেওয়া এক দিকে ইসলামের অবমাননা, অপরদিকে এই সংশয় জন্ম দেয় যে, এই ব্যবস্থাদুটো বোধহয় ইসলামের অনুকূল। কারণ, 'ইসলামী...' বললে এমনটি মনে করা খুবই স্বাভাবিক। কাজেই পরিভাষাগতভাবে এই দুটি নাম আমার দৃষ্টিতে চরম বিভ্রান্তিকর। তাই প্রতিজন মুসলমানকে এই পরিভাষাদুটো ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

কিন্তু অর্থগত দিক থেকে 'ইসলামী গণতন্ত্র' ও 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' এই দুই পরিভাষার মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান আছে। গণতন্ত্রের দর্শনে কিছু বিষয় আছে, যেগুলো ইসলামের পরি[illegible]ী। যেমন- জনগণকে ক্ষমতার উৎস মনে

করা, (ইসলামী বিধানের অধীনে না থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে) মানুষকে আইন রচয়িতা বলে বিশ্বাস করা এবং নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমতা ও পদ দাবি করা ইত্যাদি। কিন্তু গণতন্ত্রে এমন কিছু বিষয়ও আছে, যেগুলো ইসলামের অনুকূল, যেগুলোকে সাধারণত গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি মনে করা হয়। যেমন- পরামর্শভিত্তিক সরকার পরিচালনা করা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্বাধীনভাবে মতামত প্রদান করা, জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা ইত্যাদি।

অতএব যারা 'ইসলামী গণতন্ত্র' পরিভাষাটি ব্যবহার করেন, তাদের দৃষ্টিতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শুধু সেই বিষয়গুলো, যেগুলো ইসলামের পরিপন্থী নয়। পশ্চিমা গণতন্ত্র থেকে ইসলাম পরিপন্থী বিষয়গুলো বাদ দিলে যা থাকে, তাদের মতে সেগুলো 'ইসলামী গণতন্ত্র'। তারা কখনও একথা বলেননি যে, তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর ঈমান আনয়ন করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে হুবহু গ্রহণ করে নিলে 'ধর্মহীন গণতন্ত্র' 'ইসলামী গণতন্ত্র' হয়ে যাবে। অন্য শব্দে তাদের মতে ধর্মহীন গণতন্ত্রের দোষ শুধু এটুকুই নয় যে, তার প্রবর্তকরা বস্তুবাদী ও অমুসলিম ছিলেন, যারা তাদের বস্তুতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাকে গণতন্ত্রের সঙ্গের মিশিয়ে দিয়েছিলেন। আর যদি তাওহীদবাদী লোকেরা তাকে হুবহু গ্রহণ করে নেয়, তা হলে তার সেই ত্রুটিগুলো দূর হয়ে যাবে। বরং তাদের মতে খোদ গণতন্ত্রের মূল কাঠামোতেই কিছু সমস্যা আছে। সেই সমস্যাগুলোকে দূর করার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তাকে 'ইসলামী গণতন্ত্র' নাম দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু তার বিপরীতে 'ইসলামী সমাজতন্ত্র'-এর স্লোগান উচ্চারণকারীদের বক্তব্য হলো, সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মৌলিকভাবে কোনো ত্রুটি নেই। তার ত্রুটিটা শুধু এই যে, যারা এই দর্শনটি উপস্থাপন করেছে, তারা নাস্তিক ছিল আর তারা তাদের সেই নাস্তিকতাসুলভ চিন্তাধারাকে এর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। কাজেই এখন যদি মুসলমানরা এই দর্শনটি গ্রহণ করে নেয়, তা হলে সেই সমস্যাটি আপনা-আপনি দূর হয়ে যাবে। যেন তারা বলতে চাচ্ছেন, সমাজতন্ত্র যেমন আছে, হুবহু তেমনটি রেখেই যদি মুসলমানরা তাকে গ্রহণ করে নেয় এবং তার সঙ্গে আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাতকে যুক্ত করে নেয়, তা হলে এই ধর্মহীন সমাজতন্ত্র ইসলামী হয়ে যাবে।

তারা যদি একথাও বলেন যে, আমরা সমাজতন্ত্র থেকে ইসলাম পরিপন্থী বিষয়গুলোকে বাদ দিয়ে তার নাম 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' রেখেছি, তা হলেই তার এই অর্থ দাঁড়ায়। অন্যথায় তাদের এই দাবি দুটি কারণে ভুল। এক কারণ হলো, তারা তাদের উপস্থাপিত অর্থব্যবস্থায় সমাজন্ত্রের অর্থব্যবস্থার সেই সমস্ত বিষয়কে বহাল রেখেছে, যেগুলো সুস্পষ্টভাবে ইসলামের পরিপন্থী। সমাজতন্ত্রে

মূল ভিত্তি হলো, উৎপাদনের উপকরণগুলোর উপর সরকার জোরপূর্বক দখল প্রতিষ্ঠিত করে নেবে।

এই থিওরিটি তাদের 'ইসলামী সমাজতন্ত্রে' পুরোপুরি বিদ্যমান আছে। দ্বিতীয় কারণ হলো, সমাজতন্ত্রের কেবল জাগতিক দর্শনই নয়; বরং তার অর্থব্যবস্থাও মাথা থেকে পা পর্যন্ত ইসলাম পরিপন্থী। কাজেই যদি তার মধ্য থেকে ইসলাম পরিপন্থী বিষয়গুলো বের করে দেওয়া হয়, তা হলে অবশিষ্ট এমন কিছুই থাকে না, যার গায়ে 'ইসলামী সমাজতন্ত্রে'র লেবেল সাঁটানো যেতে পারে।

তার দৃষ্টান্ত নিন। 'ইসলামী গণতন্ত্র' পরিভাষাটি এমন, যেমন 'ইসলামী ব্যাংকিং'। বর্তমান ব্যাংকিং-এর পুরো ব্যবস্থাটি সুদের উপর চলছে। সেজন্য এই ব্যবস্থাটি নিঃসন্দেহে অনৈসলামী।

কিন্তু যদি এই ব্যবস্থা থেকে সুদের কলুষতাকে বের করে দিয়ে তাকে মুদারাবার নীতির উপর পরিচালিত করা যায়, তা হলে এই ব্যবস্থাটিই ইসলামের অনুকূল হয়ে যাবে। আর তখন যদি কেউ এই ব্যবস্থার নাম 'ইসলামী ব্যাংকিং' রাখে, তা হলে তার শব্দগত দিক থেকে এর পরিভাষার উপর আপত্তি উত্থাপন করা গেলেও অর্থগত দিক থেকে তাকে ভুল বলা যাবে না।

এর বিপরীতে 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' পরিভাষাটি এমন যেমন 'ইসলামী সুদ' 'ইসলামী জুয়া'। কেউ যদি বলে, সুদ ও জুয়ায় সমস্যাটা এই ছিল যে, যারা এগুলোকে প্রবর্তন করেছে, তারা ইসলামে বিশ্বাসী ছিল না। এখন আমরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো থেকে সমস্ত অনৈসলামী বিষয়গুলোকে বের করে দেব এবং তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে মেনে নিয়ে সুদ খাব ও জুয়া খেলব। কাজেই তখন আমাদের এই সুদ-জুয়া ইসলামী হয়ে যাবে; তো বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এটি চূড়ান্ত পর্যায়ের হাস্যকর একটি বিষয়ে পরিণত হবে। কারণ, সুদ-জুয়া আপাদমস্তক ইসলাম পরিপন্থী বিষয়। এগুলোর মধ্য থেকে ইসলাম পরিপন্থী বিষয়গুলোকে বের করে দিলে বাকি আর কিছুই থাকে না, যার আপনি 'ইসলামী সুদ' 'ইসলামী জুয়া' নাম রাখতে পারেন।

কাজেই 'ইসলামী গণতন্ত্র' পরিভাষাটি শাব্দিকভাবে ভুল বটে; কিন্তু তাই বলে 'ইসলামী সমাজতন্ত্র'কে তার উপর অনুমান করা যাবে না। অনেকে এই দলিল উপস্থাপন করে থাকেন যে, আমরা 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' পরিভাষাটি এজন্য গ্রহণ করেছি যে, অতীতে অনেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ইসলামের অনুকূল সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। তাই এই পরিভাষা অবলম্বন করে আমরা একথা বোঝাতে চেয়েছি, ইসলাম পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সমর্থক নয়। কিন্তু এই যুক্তিও যারপরনাই দুর্বল ও ভঙ্গুর।

কারণ, একটি ভুল বোঝাবুঝিকে দূর করার জন্য আরেকটি ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। যদি সত্যিই একথা বোঝানো উদ্দেশ্য হয় যে, ইসলাম পুঁজিবাদের সমর্থক নয়, তা হলে এর জন্য 'ইসলামী সোশালিজম'-এর পরিবর্তে Islamic Social Justice (ইসলামী সামাজিক সুবিচার) পরিভাষাটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

তারপর এই স্লোগানে ইসলাম ও গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে অতি সরলভাবে দুধ-চিনি বানিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেন এই দুটির সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কোনোই বিরোধ নেই। অথচ ঘটনা হলো, সমাজতন্ত্র যে পথ অবলম্বন করেছে, সেটি কোনো স্টেশনে গিয়ে না ইসলামের সঙ্গে মিল খাচ্ছে, না কোনোখানে গিয়ে গণতন্ত্র তাকে স্পর্শ করে অতিক্রম করেছে। ইসলাম নিঃসন্দেহে এই কামনা করে যে, সমাজে সম্পদের সুবিচারমূলক বণ্টন হোক আর পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যে সম্পদ গুটিকতক লোকের মাঝে ঘুরপাক খায়, সেগুলো অধিকতর মানুষের কাছে পৌঁছে যাক। কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জনে সমাজতন্ত্র যে অবিচারমূলক কর্মনীতি অবলম্বন করেছে, ইসলাম তারও কোনোভাবেই সমর্থক নয়।

অনুরূপভাবে সমাজতন্ত্রের ইতিহাস সাক্ষী যে, গণতন্ত্র কখনও তাকে সঙ্গ দিতে পারেনি। গণতন্ত্রের প্রাণ 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা'র উপর প্রতিষ্ঠিত। আর জীবনব্যবস্থায় সমাজতন্ত্র এমন একটি শব্দ, বাস্তব জগতে যার কোনো অস্তিত্ব নেই। সমাজতন্ত্র যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেই জোরপূর্বক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে আজীবনই চিন্তা ও মতামতের গলা টিপে ধরে নিজের লাজ রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। তার আত্মপ্রিয় মেযাজ সেই উচ্চারণটিকেও মেনে নিতে পারেনি, যে তাকে সমালোচনার জন্য দাঁড়িয়েছিল।

তার কারণ একদম পরিষ্কার যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে পরিকল্পিত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তা কঠোর দমননীতি ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না। বিশ্বাস না হলে সেই দেশগুলোর ইতিহাস পড়ে দেখুন, যেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেসব দেশে কি সমাজতান্ত্রিক দল ছাড়া আর কোনো পার্টি রাজনীতি করতে পারে?

ওখানে কি শ্রমিকদের এই অধিকার আছে যে, তারা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য ক্ষুদ্র একটি সংগঠনও দাঁড় করাবে? ওখানে কি শ্রমিকরা সরকারের কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হরতাল করতে পারে?

ওখানে কি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে যে, তারা ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে টু-শব্দটি করতে পারে?

যদি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর 'না' দ্বারা হয়, তা হলে সেটি কোন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যার জোড়া মিলানো হয়েছে?

خرد کا جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد

جو چاہے آپ کا کرشمہ ساز کرے

বুদ্ধির নাম রেখেছে পাগলামি আর পাগলামির নাম রেখেছে বুদ্ধি। আপনার কর্তব্যপরায়ণ কৌশল যা খুশি করুক।

সূত্র : হামারা মা'আশী নেযাম– পৃষ্ঠা : ৮৩

অধিকার ও কর্তব্য

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান রহ.নিকট অতীতে আমাদের সেই ইসলামী ব্যক্তিত্বদের একজন ছিলেন, যাঁদের সংখ্যা সব যুগেই হাতেগোনা হয়ে থাকে। তাঁর লিখিত পবিত্র কুরআনের উর্দু তরজমা ও তাফসীর সমগ্র উপমহাদেশ বিখ্যাত। তা ছাড়া উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ধারাবাহিকতায় রেশমি রুমাল আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলনে তাঁর অবদান ও তৎপরতা ছিল আমাদের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র ছিলেন। শিক্ষা সমাপনের পর সেখানকারই শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং গোটা জীবন সেখানেই অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। এমনকি তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস পদেও অধিষ্ঠিত হন এবং নিকট অতীতের বহুসংখ্যক বিখ্যাত আলেমে দ্বীন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

তিনি যখন দারুল উলূম দেওবন্দে শায়খুল হাদীস পদে দায়িত্ব পালনরত ছিলেন, তখন দারুল উলূমের মজলিসে শুরা অনুভব করল, তাঁর বেতন-ভাতা তাঁর পদমর্যাদা ও যোগ্যতার তুলনায় কম। বরং তাঁকে বেতন যা প্রদান করা হচ্ছে, তা না দেওয়ারই মতো। তাছাড়া তাঁর আয়ের অন্য কোনো উৎসও নেই। সংসারের খরচ দিন-দিন বাড়ছে। সেমতে মজলিসে শূরা সর্বসম্মতক্রমে সিদ্ধান্ত নিল, মাওলানার বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হবে। মজলিসে শুরার পক্ষ থেকে এই মর্মে একটি আদেশনামাও জারি করে দেওয়া হলো।

যিনি মজলিসে শুরার পক্ষ থেকে মাওলানার কাছে এই সংবাদটি নিয়ে গেলেন, তার নিশ্চিত ধারণা ছিল, সংবাদটি শুনে মাওলানা যারপরনাই খুশি হবেন। কিন্তু ঘটনা তার উল্টো ঘটল। এই সংবাদ শুনে মাওলানা মাহমূদ হাসান পেরেশান হয়ে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ মজলিসে শুরার সদস্যদের বরাবর একটি আবেদন লিখলেন।

তাতে তিনি লিখেছিলেন :

'আমি জানতে পারলাম, দারুল উলূমের পক্ষ থেকে আমার বেতন বাড়ানো হচ্ছে। এই সংবাদটি আমার জন্য খুবই বেদনাদায়ক। কারণ, বয়স বেড়ে যাওয়া ও অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে এখন দারুল উলূমে আমার দায়িত্বে পড়ানোর

ঘণ্টা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ এর আগে আমি আরও বেশি পড়াতাম। তাই বাস্তবতার দাবি অনুসারে আমার বেতন কমিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করা আবশ্যক ছিল। অথচ মজলিসে শুরা আমার বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই সংবাদ শুনে আমি বিচলিত হয়ে পড়েছি। কাজেই আপনাদের সমীপে আমার আবেদন হলো, আমার বেতন বাড়ানোর এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক।'

এখন আমরা যে পরিবেশে বাস করছি, সেখানে যদি কোনো কর্মচারী তার পরিচালনা পরিষদের কাছে এই মর্মে কোনো আবেদন দাখিল করে, তা হলে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, কর্তৃপক্ষ ধরে নেবে, লোকটি কৌশলে আমাদের সঙ্গে উপহাস করেছে। বর্ধিত বেতনের পরিমাণ বোধহয় কম হয়েছে, তাই এভাবে সে আমাদের সঙ্গে উপহাস করল এবং এটি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তার কঠোর এক অভিযোগ।

কিন্তু শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান রহ. যে আবেদনটি লিখেছিলেন, তাতে তিরস্কারের দূরতম কোনো ঘ্রাণও ছিল না। তিনি সত্যি-সত্যিই মনে করতেন, তার জন্য এই যে বেতন বাড়ানো হলো, কাজের বিপরীতে তিনি এর প্রাপ্য নন; কাজেই এই বেতন তাঁর জন্য হালাল হবে না। কারণ, তাঁর পরিবেশে এমন বহু লোক ছিলেন, যাঁরা প্রতিটি মিনিটের হিসাব করে দায়িত্ব পালন করতেন। কর্তব্যের কিছু সময় নিজের কাজে ব্যয় করলে তার হিসাব রেখে ওই সময়ের বেতন কর্তন করাতেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. থানাভনে যে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেখানকার প্রতিজন উস্তাযের নিয়ম ছিল, মাদরাসার দায়িত্বের সময়ে যদি কারও ব্যক্তিগত বিশেষ কোনো কাজের প্রয়োজন দেখা দিত কিংবা কোনো মেহমান তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসত, তাহলে একাজে যে সময়টুকু ব্যয় হতো, তাঁরা তা নোট করে রাখতেন। মাসের শেষে সবটুকু সময় যোগ করে অফিসে আবেদন জানাতেন, এমাসে আমি আমার ব্যক্তিগত কাজে এত সময় ব্যয় করেছি। তাই আমার বেতন থেকে এই পরিমাণ টাকা কেটে রাখা হোক।

এ হলো দায়িত্বসচেতন সেই সমাজের একটি চিত্র, যাঁরা ইসলামকে জিন্দা করতে চাইতেন। আজ আমাদের সমাজে চারদিকে কেবল অধিকার আদায়ের স্লোগান কানে আসছে। এই লক্ষ্য অর্জনে অসংখ্য সংস্থা ও সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিজন মানুষ আপন-আপন অধিকার আদায়ের নামে যত বেশি সম্ভব স্বার্থ উদ্ধারের ধান্দায় লিপ্ত। কিন্তু কেউই একথাটি বুঝতে চাচ্ছে না যে, পাওনা মূলত কর্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। আগে কর্তব্যপালন, পরে পাওনা। আগে

দায়িত্ব, পরে অধিকার। কিন্তু একথাটা কারুরই জানা নেই। যেলোক তার কর্তব্য পালন করবে না, পাওনা দাবি করার কোনেই অধিকার তার নেই।

ইসলামী শিক্ষার মেজাজ হলো, সে না শুধু প্রতিজন মানুষকে কর্তব্যপালনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, বরং অন্তরে এই ভাবনাও জাগিয়ে দেয় যে, আমার কর্তব্যপালনে কোনো ত্রুটি হচ্ছে না তো। কারণ, হতে পারে, কৌশল করে আপনি আপনার ত্রুটিগুলোকে লুকিয়ে রেখে দুনিয়াবি ফলাফল থেকে নিরাপদ থাকতে পারবেন। কিন্তু এই ত্রুটি যত ক্ষুদ্রই হোক-না কেন, আল্লাহর নিকট থেকে লুকোতে পারবেন না। যখন কারও অন্তরে এই ভাবনা জাগ্রত হয়ে যাবে, তখন অধিকার আদায়ের পরিবর্তে কর্তব্যপালনই হবে তার আসল ভাবনা। তখন সে বৈধ পাওনাটিও দেখে-শুনে গ্রহণ করবে যে, পাছে আদায়কৃত পাওনা পালনকৃত কর্তব্যের চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে কিনা।

এই সেই ভাবনা, যা মাওলানা মাহমূদ হাসান রহ.কে এই আবেদনপত্র লিখতে বাধ্য করেছিল।

এই ভাবনা যদি সমাজে ব্যাপকতা লাভ করে, তা হলে সকলেরই অধিকার আপনা-আপনি আদায় হয়ে যেতে শুরু করবে এবং অধিকার হরণের ধারা দিন-দিন কমে যাবে। কারণ, একজনের কর্তব্য আরেকজনের পাওনা। যখন প্রথম ব্যক্তি তার কর্তব্য পালন করবে, তখন অপরজনের পাওনা আপনা-আপনি উসুল হয়ে যাবে। স্বামী যদি তার কর্তব্য পালন করে, তাহলে স্ত্রী তার পাওনা পেয়ে যাবে। স্ত্রী যদি তার কর্তব্য পালন করে, তা হলে স্বামী তার হক পেয়ে যায়। অফিসার যদি তার কর্তব্য পালন করে, তা হলে অধীনরা তাদের পাওনা পেয়ে যায়। অধীনরা যদি তাদের কর্তব্য পালন করে, তা হলে অফিসার তার পাওনা পেয়ে যাবে। মোটকথা, উভয় দিককার সুসম্পর্কের আসল রহস্যই হলো, সকল পক্ষ আপন-আপন কর্তব্য অনুধাবন করে যথাযথভাবে তা পালন করবে। তা হলেই কারও পক্ষ থেকে অধিকার বিনষ্টের কোনো বৈধ অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারবে না।

কিন্তু এই ভাবনা সমাজে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ-না তাতে পরকালীন ভাবনার বারি সিঞ্চিত হবে। আজ আমরা মুখে আখেরাতে বিশ্বাসের কথা দাবি করি বটে; কিন্তু বাস্তবজীবনে তার কোনোই প্রতিফলন নেই। আজ আমাদের সমস্ত দৌড়ঝাঁপ শুধুই অর্থের পাহাড় জমানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। এটি-ই আজ আমাদের জীবনের একমাত্র ধান্দা হয়ে গেছে। এছাড়া আর কোনো কাজই যেন আমাদের নেই।

আমরা কোথাও চাকরি করি। তখন আমাদের একমাত্র ভাবনা থাকে, কীভাবে আমি আমার বেতন ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি করব। কীভাবে সুযোগ-সুবিধা

বেশি পাব। আর তার জন্য আমরা ব্যক্তিগত আবেদন থেকে শুরু করে সমষ্টিগত আন্দোলন পর্যন্ত, চাটুকারিতা থেকে শুরু করে ধান্দাবাজি পর্যন্ত সব ধরনের কল-কৌশলই আমরা অবলম্বন করি।

এই ভাবনা ভাববার মানুষ আমাদের মাঝে খুবই কম যে, আমি যে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছি, তা আমার কর্তব্যের তুলনায় বেশি হয়ে যাচ্ছে না তো। আমি যা কিছু পাচ্ছি, তার সবটুকু হালাল হচ্ছে তো। বাস্তবতা হলো, যখন উসুল করার সময় আসে, তখন 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শোকানোর আগে-আগে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।' নবীজির এই হাদীস আমাদের খুব বেশি-বেশি মনে থাকে। কিন্তু এটা দেখার লোক খুব কমই পাওয়া যাবে যে, মালিকের কাজ করে আমি ঘাম ঝরিয়েছি কিনা।

এই পরিস্থিতি এজন্য তৈরি হলো যে, আমরা আমাদের অধিকারের বেলায় খুবই সচেতন। কিন্তু কর্তব্য পালনের বেলায় একদম উদাসীন। কোনো পক্ষই যখন আপন কর্তব্যের ভাবনা না ভাবে, তখন তার অনিবার্য পরিণতি এ-ই দাঁড়ায় যে, সবার অধিকারই পদদলিত হয়। সমাজে ঝগড়া-বিবাদ আর দাবির শোরগোল ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। মানুষের মুখগুলো খুলে যায় আর কানগুলো বন্ধ হয়ে যায়। বিবেককে মৃত্যুর ঘুম পাড়ানোর পর যখন কেউই শোনে না, তখন একেই শেষ উপায় মনে করা হয় যে, যে যা হাতে পাও, নিয়ে নাও। আর তখনই দেশে লুটপাটের রাজত্ব শুরু হয়ে যায়।

আপনি আপনার চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখুন। সবখানে এই দৃশ্যই দেখতে পাবেন। সবাই অস্থির, সবাই পেরেশান। কিন্তু চরম অশান্তির এই যুগে একথা চিন্তা করার সুযোগ কারুরই হয় না যে, এর সমাধান আসলে কোথায়? এই অশান্তিময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ যে আপন কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন হওয়া, সেকথা কারুরই মাথায় ঢুকছে না।

এ বিষয়ে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তার সুফল পেতে শর্ত হলো, আমাদেরকে তার অনুসরণ করতে হবে। তিনি বলেছেন :

'নিজের জন্য যা তোমার পছন্দ, তোমার ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ করো এবং যা তোমার নিজের জন্য অপছন্দ, তা তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের জন্যও অপছন্দ করো।'[১৪৬]

---

১৪৬. সহীহ বুখারী : কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং–১২; সুনানে তিরমিযী : হাদীস নং ২২২৭; সুনানে নাসায়ী : হাদীস নং–৪৯৩০; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং–২১১১৩।

এই হাদীস আমাদেরকে একটি সোনালি রীতি শিক্ষা প্রদান করেছে যে, যখনই কারো সঙ্গে কোনো লেনদেন বা আচার-আচরণ করার প্রয়োজন দেখা দিবে, তখন আগে নিজেকে তার জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেখুন, আমি যদি তার জায়গায় থাকতাম, তা হলে আমি তার কাছ থেকে কীরূপ আচরণ আশা করতাম। তার কোন ধরনের আচরণ আমার কাছে অপ্রীতিকর মনে হতো আর তার কেমন আচরণে আমি খুশি হতাম। ব্যস, এখন তুমিও তার সঙ্গে সে রকম আচরণ করো। তার সঙ্গে আচরণ করার সময় তুমি এমন ব্যবহার থেকে বিরত থাকো, যা সে তোমার সঙ্গে করলে তোমার কাছে খারাপ লাগত।

একজন অফিসার যদি তার অধীন ব্যক্তির সঙ্গে আচরণ করার সময় এই নীতি অবলম্বন করে যে, আমি যদি তার জায়গায় হতাম, তা হলে তার কীরূপ আচরণকে আমি সুবিচারে অনুকূল মনে করতাম, তা হলে তার অধীনদের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে কোনো বৈধ অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ ঘটবে না। অনুরূপ অধীনরাও যদি তাদের অফিসারদের সাথে আচরণ করার সময় এই ভাবনা ভাবে যে, আমি যদি তার জায়গায় থাকতাম আর তিনি আমার জায়গায় থাকতেন, তা হলে আমি তার সঙ্গে কেমন আচরণ করতাম, তা হলেও অফিসারে পক্ষ থেকে অধীনদের বিরুদ্ধে কোনো বৈধ অভিযোগ উত্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেবে না।

এই নীতি অধীন আর অফিসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং জগতের প্রতিটি সম্পর্কের মাঝেই এই নীতি অত্যন্ত উপকারী ও কার্যকর। পিতা-পুত্র, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, বউ-শাশুড়ি, বন্ধু-বন্ধু, ক্রেতা-বিক্রেতা, সরকার-জনগণ ইত্যাদি সব ধরনের সম্পর্কেরই জন্য এ এক সোনালি রীতি। যেকোনো সম্পর্কের মাঝে সমস্যা তখনই দেখা দেয়, যখন জীবনধারণের জন্য আমরা দুমুখো নীতি অবলম্বন করি। আমাদের চরিত্র হলো, নিজের জন্য এক নীতি আর অপরের জন্য আরেক নীতি। আমরা প্রত্যেকেই আশা করি, অন্যরা আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুক। কিন্তু কেউ অপরের সঙ্গে ভালো আচরণ করতে রাজি নই। সবাই কামনা করি, আমার পাওনাটা যেন ঠিক-ঠিক পেয়ে যাই। কিন্তু অপরের পাওনা আদায় করতে কেউ প্রস্তুত নই। আর দুমুখো নীতিরই কারণে আজ আমরা চরম অশান্তির জীবন যাপন করছি।

কাজেই আমাদের সামনে আসল প্রশ্ন হলো, অন্তরগুলোতে কীভাবে কর্তব্যের অনুভূতি সৃষ্টি করা যাবে। একথা ঠিক যে, একা একজনে একটি সমাজকে বদলে দিতে পারে না। শুধু আমি বদলালে সমাজ পাল্টে যাবে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, প্রত্যেককে এই বুঝ লালন করতে হবে যে, সমাজের পরিবর্তনের জন্য আমাকেও পরিবর্তন হতে হবে। কারণ, আমিও সমাজের একটি অংশ। আর সমাজ বদলাক আর না বদলাক, আমি তো আমাকে

বদলাতে পারি। কাজেই প্রত্যেককে এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কেউ বদলাক আর না বদলাক আমি বদলে যাব। তা ছাড়া আমি সমাজে আমার এই চেতনাকে প্রচার ও প্রসার তো করতে পারি। একজন মানুষের মধ্যে এই চিন্তা-ও জযবা তৈরি হয়ে গেলে অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, তার প্রভাব অন্যদের উপরও পড়ে। এভাবে সমাজ বদলের ধারা শুরু হয়ে যায়। যদি এই ধারাটি চালু করা যায়, তা হলে ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে গোটা রাষ্ট্রই বদলে যেতে বাধ্য হয়। পরিবর্তন অতীতেও এই নিয়মেই হয়েছিল, আজও এই নিয়মেই হবে।

আল্লাহপাক আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر

لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا

আমি তো একাই গন্তব্যপানে চলছিলাম। কিন্তু কিছু সঙ্গী জুটে গেল আর এভাবেই কাফেলার রূপ নিল।

সূত্র : যিকর ও ফিকর : পৃষ্ঠা ৯০

চুরি এটাও

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. একদিন সাহারানপুর থেকে কানপুর যাচ্ছিলেন। সঙ্গে কিছু সামান ছিল। তিনি অনুমান করলেন, যে-পরিমাণ মালের ভাড়া দিতে হয় না, তাঁর এই জিনিসপত্রের ওজন তার চেয়ে বেশি হবে। তাই তিনি মালগুলো ওজন করিয়ে অতিরিক্ত অংশটুকুর ভাড়া পরিশোধ করার জন্য ওজন করার কাউন্টারে গেলেন এবং কর্তব্যরত ব্যক্তিকে মালগুলো ওজন করতে বললেন।

এই কাউন্টারের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা যদিও একজন হিন্দু ছিল; কিন্তু সে হযরতকে চিনত এবং খুব শ্রদ্ধা করত। সে বলল, মাওলানা! আপনি গাড়িতে উঠে যান; এই মালের জন্য আপনাকে কেউ ধরবে না। এর আর আপনি কী ভাড়া দেবেন! আমি গার্ডকে বলে দেব; সে আপনাকে কিছু বলবে না।

হযরত থানভী রহ. জিজ্ঞাসা করলেন, এই গার্ড আমার সঙ্গে কোন পর্যন্ত যাবে?

অফিসার উত্তর দিল, গাজীআবাদ পর্যন্ত।

হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর গাজীআবাদের পর কী হবে?

অফিসার বলল, এই গার্ড পরবর্তী গার্ডকে বলে দেবে।

হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কী হবে? সেই গার্ড কোন পর্যন্ত যাবে?

অফিসার বলল, সে আপনার সঙ্গে কানপুর পর্যন্ত যাবে।

হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, কানপুরের পর কী হবে?

অফিসার বলল, কানপুরের পর আর কী হবে; ওখানেই তো আপনার ভ্রমণ শেষ!

হযরত বললেন, না, আমার সফর তো অনেক দীর্ঘ; কানপুরে শেষ হবে না। কারণ, আমার সফর আখেরাতে না গিয়ে শেষ হবে না। তুমি বলো, আমি যখন বিচারের জন্য আল্লাহর সামনে দাঁড়াব আর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি তোমার মালগুলো বিনা ভাড়ায় রেলে করে কীভাবে নিয়ে গিয়েছিলে? রেলটা তো তোমার নিজের ছিল না? তখন তোমার এই দুই গার্ড আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে কি?

তারপর মাওলানা তাকে বোঝালেন, এই রেল আপনার বা গার্ডদের নয়। আমি যতটুকু জানি, রেলওয়ের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে এই অধিকার দেওয়া

হয়নি যে, আপনারা যাকে খুশি বিনা টিকিটে কিংবা মালামাল ওজন না করিয়ে ভ্রমণ করাতে পারবেন। কাজেই আপনার কল্যাণে আমি যদিওবা অতিরিক্ত মালের ভাড়া পরিশোধ না করে ভ্রমণ করি, আমার ধর্মে এটি চুরি বলে পরিগণিত হবে। আর আল্লাহপাক এর জন্য আমাকে জবাবদিহি করবেন। আমাকে এর জন্য একদিন আল্লাহপাকের কাছে হিসাব ও জবাব দিতে হবে। কাজেই আপনার এই খাতির গ্রহণ করলে আমাকে অনেক মাশুল গুণতে হবে। কাজেই আমার প্রতি আপনার এটিই অপার অনুগ্রহ হবে যে, আপনি মালগুলো ওজন করিয়ে ভাড়াটা বুঝে নিন।

এই বক্তব্যের পর রেলকর্মকর্তা মাওলানার দিকে বিস্ময়ের সঙ্গে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল। তারপর মেনে নিল, আপনার কথা-ই সঠিক।

এ ধরনের- একটি ঘটনা আমার আব্বাজির সঙ্গেও ঘটেছিল। একবার রেলভ্রমণের জন্য তিনি স্টেশনে গেলেন। কিন্তু গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখলেন, তিনি যে শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করেছেন, সেই শ্রেণীর বগিতে তিলধারণের ঠাঁই নেই। গাড়িও ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। হাতে এতটুকু সময়ও ছিল না যে, কাউন্টারে ফিরে গিয়ে টিকিট পরিবর্তন করে আনবেন।

অগত্যা তিনি উচ্চ শ্রেণীর একটি বগিতে উঠে বসলেন। ভেবে রাখলেন, চেকার যখন টিকিট চেক করতে আসবে, তখন তিনি টিকিট পরিবর্তন করে নেবেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে পুরো রাস্তায় কোনো চেকার এল না। এমনকি তাঁর নামার সময় এসে পড়ল। তিনি গাড়ি থেকে নেমে সোজা কাউন্টারে চলে গেলেন এবং উভয় শ্রেণীর মাঝে ভাড়ার ব্যবধান জেনে নিলেন। তারপর ওই পরিমাণ মূল্যের একটি টিকিট ক্রয় করে সাথে-সাথে ওখানে দাঁড়িয়েই ছিঁড়ে ফেললেন।

কাউন্টার মাস্টার ঘটনাটি দেখে বিস্মিত হলো যে, ঘটনা কী; লোকটি টাকা দিয়ে টিকিট ক্রয় করল আবার এখানে দাঁড়িয়েই সেটি ছিঁড়ে ফেলল! তার মনে সন্দেহ জাগল যে, লোকটির মাথায় কোনো সমস্যা আছে বোধ হয়। কৌতূহলবশত, সে বাইরে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, হুজুর! আপনি টিকিট ক্রয় করলেন আবার সেটি ছিঁড়ে ফেললেন; ব্যাপারটা কী?

আব্বাজি তাকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে বললেন, টিকিটের চেয়ে উচ্চ শ্রেণীতে ভ্রমণ করার কারণে রেলওয়ে এই পরিমাণ অর্থ আমার কাছে পাওনা হয়ে গেছে। তাই এই প্রক্রিয়ায় আমি তাকে তার পাওনা পরিশোধ করে দিলাম। আর যেহেতু এই টিকিটটি বেকার ছিল; তাই এটি ছিঁড়ে ফেললাম।

লোকটি বলল, কিন্তু আপনি তো স্টেশনে চলে এসেছেন এবং রেল থেকে নেমে এসেছেন। এখন তো আপনার থেকে কেউ বাড়তি ভাড়া চাইত না। তারপরও আপনি এটি করলেন কেন? এর জন্য তো আপনাকে কেউ জিজ্ঞাসা করত না।

আব্বাজি উত্তর দিলেন, আপনি এটা ঠিকই বলেছেন যে, মানুষের মধ্যে এখন আর কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করবে না। কিন্তু আল্লাহপাক অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন। এর জন্য আমাকে একদিন অবশ্যই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সেজন্য একাজটি করা খুবই জরুরি ছিল।

এগুলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগের সেই সময়কার ঘটনা, যখন এই উপমহাদেশে ইংরেজদের শাসন ছিল এবং মুসলমানদের অন্তরে তাদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ছিল। ততদিনে দেশটিকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলন-সংগ্রামও শুরু হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. প্রকাশ্যে এই আকঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন যে, মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্র হওয়া দরকার, যেখানে তারা অমুসলিমদের থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামী আইন অনুসারে জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু তারপরও পরের হকের বেলায় তাঁরা এতটুকু সাবধান ছিলেন। ইংরেজ পরিচালিত রেলেও তাঁরা বিনা ভাড়ায় বা কম ভাড়ায় ভ্রমণ করা নৈতিকতার পরিপন্থী মনে করেছেন।

আসল ব্যাপার হলো, চুরির আইনি সংজ্ঞা যা-ই হোক, অন্যের সম্পদ তার অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করা-ই মূলত চুরি ও গুনাহ। কোনো আল্লাহর বান্দা এই চুরি করতে পারে না। তাই যাদের মনে আল্লাহর ভয় আছে, তারা এগুলো পরিহার করে চলেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেকগুলো হাদীসে বিভিন্ন আঙ্গিকে এই তত্ত্বটি বর্ণনা করেছেন। যেমন– এক হাদীসে তিনি বলেছেন :

حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ

'মুসলমানের সম্পদের মর্যাদাও এমন, যেমন তাদের রক্তের মর্যাদা।'[১৪৭]

এই হাদীসে যদিও 'মুসলমান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু অন্য একাধিক হাদীসের আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের জীবন ও সম্পদের মর্যাদাও অতখানি, যতখানি মর্যাদা মুসলমানদের। কাজেই এই শব্দটি দ্বারা ভুল বোঝাবুঝির শিকার হওয়ার কোনোই অবকাশ নেই যে, ইসলামে অমুসলিমদের জান-মালের কোনো মর্যাদা নেই।

আরেক হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

'কোনো মুসলমানের সম্পদ তার মনের সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্যের জন্য হালাল নয়।'[১৪৮]

---

১৪৭. কানযুল উম্মাল ১/১৪৪, হাদীস নং-৪০৪; জামিউল আহাদীস ১২/১১৬, হাদীস নং-১১৫৭; মাজমাউয যাওয়ায়িদ...২/১৩১; হিল্‌ইয়াতুল আওলিয়া ৭/৩৩৪।

১৪৮. কানযুল উম্মাল ১/৯১, হাদীস নং-৩৯৭; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং-১৯৭৭৪; জামিউল আহাদীস ১৭/৮০, হাদীস নং-১৭৬১৫; কাশ্‌ফুল খাফা ২/৩৭০, হাদীস নং-৩১০১

বিদায় হজ্বের সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনাতে যে ভাষণটি প্রদান করেছিলেন, তাতেও তিনি বলেছিলেন :

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ اَخِيْهِ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ

'কোনো মানুষের পক্ষে তার ভাইয়ের কোনো সম্পদ হালাল নয়। তবে যা সে মনের খুশিতে তাকে প্রদান করবে, তা-ই হালাল হবে।'[১৪৯]

হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী রাযি. বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَذَالِكَ لِمَا حَرَّمَ اللهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَأَنْ يَأْخُذَ عَصَا اَخِيْهِ بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ

'ন্যায্য অধিকার ছাড়া একজন মুসলমানের সম্পদ হস্তগত করা অপর মুসলমানের জন্য হালাল নয়। তার কারণ হলো, আল্লাহপাক এক মুসলমানের সম্পদ আরেক মুসলমানের, এক মুসলমানের লাঠি নিয়ে নেওয়া আরেক মুসলমানের জন্য তার সন্তুষ্টি ব্যতীত হারাম করে দিয়েছেন।'[১৫০]

এসব হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, অপরের কোনো বস্তু বা সম্পদ ব্যবহার করতে হলে তার খুশিমনে সম্মতি আবশ্যক। কাজেই যদি প্রতীয়মান হয় যে, সম্পদটির মালিক যে অনুমতি প্রদান করেছেন, তাতে তার মনের সন্তুষ্টি নেই; বরং তিনি কোনো চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে অনুমতির কথা ব্যক্ত করেছেন, তা হলে সেই সম্পদ ভোগ বা ব্যবহার করা জায়েয হবে না। এই অনুমতি অনুমতি বলে গণ্য হবে না।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণীগুলোকে সামনে রেখে যদি আমরা নিজেদের খোঁজ নিই, তা হলে দেখতে পাব, না জানি কত ক্ষেত্রে কতভাবে আমরা ইসলামের এই বিধানগুলো লঙ্ঘন করছি। আমরা তো চুরি-ছিনতাই বলতে ব্যস এ-ই বুঝি যে, কেউ অন্যের ঘরে ঢুকে চুপি-চুপি তার মালামাল নিয়ে গেল কিংবা যথারীতি শক্তি প্রয়োগ করে তার মাল ছিনিয়ে নিল। অথচ ইসলামের বিধান হলো, অন্যের সম্পদ তার মনের সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে যেভাবেই হস্তগত করা হোক-না কেন, তাও চুরি-ছিনতাই বলে বিবেচিত হবে। এই চুরি-ছিনতাই-এর নানা ধরন আমাদের সমাজে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক শিক্ষিত ও বাহ্যত ভদ্র-সজ্জন লোকও এই চুরি-ছিনতাইয়ের কাজে জড়িত।

---

১৪৯. কান্‌যুল উম্মাল ১/৯১, হাদীস নং-৩৯৭; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং-১৯৭৭৪; জামিউল আহাদীছ ১৭/৮০, হাদীস নং-১৭৬১৫; কাশ্‌ফুল খাফা ২/৩৭০, হাদীস নং-৩১০১

১৫০. মাজ্‌মাউয-যাওয়ায়িদ...২/১৩১

এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি এ জাতীয় চুরি-ছিনতাইয়ের কয়েকটি নমুনা উপস্থাপন করছি।

১. একটি পদ্ধতি তো হলো সেটি, যার প্রতি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর উল্লিখিত ঘটনায় ইঙ্গিত করা হয়েছে। আজকাল মানুষ অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলে বেড়ায় যে, আমি আমার মালামাল রেল বা জাহাজে করে বিনা ভাড়ায় বহন করেছি। পরিবহনের লোকেরা কেউই টের পায়নি। অথচ এই কাজ আর চুরির মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। এটিও একটি চুরি। যদি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার চোখ ফাঁকি দিয়ে এ কাজটি করা হয়, তা হলে তো কোনো কথাই নেই। কিন্তু যদি তার অনুমতিক্রমেও করে থাকেন, তবুও যেহেতু তার এই অনুমতি প্রদানের কোনো অধিকার ছিল না, তাই এটির চুরির অন্তর্ভুক্ত হবে। এতেও আপনি গুনাহগার হবেন।
অবশ্য কোনো কর্মকর্তার জন্য এই অধিকার থাকে যে, তিনি চাইলে কাউকে বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করাতে পারেন, তা হলে ভিন্ন কথা।

২. টেলিফোন এক্সচেঞ্জের লোকদের সঙ্গে খাতির পাতিয়ে বিনা বিলে ফোনে কথা বলাকে অনেকে শুধু যে দোষই মনে করে না, তা-ই নয়, বরং একে নিজের একটি ক্রেডিট বলেও প্রচার করে বেড়ায় যে, টেলিফোনের লোকদের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক আছে এবং আমি বিনা বিলে কথা বলতে পারি।

অথচ এটি নিম্নমানের একটি চুরি এবং এতে বড় ধরনের গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই।

৩. বিদ্যুতের লাইন থেকে বিনা অনুমতিতে সরাসরি চোরা লাইন নিয়ে বিদ্যুত ব্যবহার করা এটাও চুরির একটা প্রকার। অথচ এটিও আমাদের সমাজের একটি মারাত্মক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। আর এই অপরাধটিও অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে করা হয়।

৪. কারও একটি জিনিসের আমার প্রয়োজন। কিন্তু আমার প্রবল ধারণা, চাইলে তিনি মুখে না করবেন না বটে; কিন্তু খুশিমনে দেবেন না। এমন জিনিসের ব্যবহারও হালাল নয়। কারণ, দাতা মনের সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে কোনো চাপের কারণে আপনাকে জিনিসটি প্রদান করেছে।

৫. কারও কাছ থেকে কোনো একটি জিনিস সাময়িকের জন্য ধার নিয়েছেন। তার সঙ্গে আপনি ওয়াদা করেছেন, অমুক সময় ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু জিনিসটি সময়মতো ফেরত দিলেন না। তা হলে এখানে আপনি ওয়াদাখেলাফির দায়েও গুনাহগার হবেন। যদি এমন হয় যে, নির্দিষ্ট সময়ের পর এই জিনিসটি ব্যবহারের আর তার অনুমতি নেই, তা হলে এর জন্য আপনি জবরদখলের গুনাহেও গুনাহগার হবেন।

এই বিধান ঋণের বেলায়ও প্রযোজ্য যে, নির্ধারিত সময়ে একান্ত কোনো অপারগতা ব্যাতিরেকে ঋণ পরিশোধ না করলে ওয়াদাখেলাফি ও জবরদখলের গুনাহে গুনাহগার হবে।

৬. কারও নিকট থেকে কোনো জমি, ঘর বা দোকান একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভাড়া নিয়েছেন। এখানে বিধান হলো, মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে-সাথে সম্পদটি মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেবেন। যদি তা না করে মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তার সেই সম্পদটি তার মনের সন্তুষ্টি ছাড়া আপনার ব্যবহারে রেখে দেন, তা হলে তাও এই ওয়াদাখেলাফি ও জবরদখলের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৭. যদি ধারকরা জিনিসটিকে এমন নির্দয়তার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়, যার উপর মালিক সন্তুষ্ট নন, তা হলে এটিও জবরদখলের উল্লিখিত সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে।

যেমন কোনো ভদ্রলোক তার গাড়িটি আপনাকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেছেন। তো তার অর্থ এই নয় যে, তাকে অবহেলা ও নির্মমতার সঙ্গে ব্যবহার করবেন এবং তাকে খারাপ রাস্তায় এমনভাবে দৌড়াবেন যে, গাড়ি আপনার থেকে পানাহ চাইতে শুরু করবে। কেউ আপনাকে তার ফোনটি ব্যবহার করতে দিল। আপনি সুযোগ পেয়ে সেই যে কথা বলা শুরু করলেন আর থামবার নাম নিচ্ছেন না। এটিও অন্যায় ও হারাম কাজ।

৮. বইয়ের দোকানগুলোকে বই-ম্যাগাজিন এজন্য রাখা হয় যে, মানুষ এখান থেকে পছন্দ করে বই-ম্যাগাজিন ক্রয় করবে। আর পছন্দ করার জন্য দু-চারটি পাতা উল্টিয়ে দেখার ও দু-এক পাতা পড়ার সাধারণ অনুমতি থাকে। কিন্তু অনেকে দেখা যায় বুকস্টলগুলোতে দাঁড়িয়ে যথারীতি বই-ম্যাগাজিন পড়তে শুরু করে। আবার শেষ পর্যন্ত ক্রয়ও করে না।

এটিও ঠিক নয়। আপনি যখন ক্রয় করবেন না, তা হলে এখানে এসে পড়ার কোনো মানে হয় না। তা ছাড়া ক্রয় করার ইচ্ছা থাকেও যদি, তবুও এত সময় ধরে পড়া উচিত নয়। এটিও অন্যের হক নষ্ট করার শামিল। শরীয়ত আপনাকে এ কাজের অনুমতি প্রদান করে না।

এখানে আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলাম। আমাদেরকে এ জাতীয় অপরাধ থেকে বিরত থাকা একান্ত আবশ্যক।

সূত্র : যিক্র ও ফিক্র– পৃষ্ঠা : ১১৮

সম্পদে বরকত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
اَمَّا بَعْدُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ • فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

'ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য স্বাধীনতা থাকবে যতক্ষণ-না তারা আলাদা হবে। যদি তারা সত্য বলে আর স্পষ্ট কথা বলে, তা হলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত প্রদান করা হয়। আর যদি তারা কোনো তথ্য গোপন রাখে ও মিথ্যা বলে, তা হলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত তুলে নেওয়া হয়।'[১৫১]

এখানে আমার আলোচ্যবিষয় দ্বিতীয় বাক্য, যেখানে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

' যদি তারা সত্য বলে আর (পণ্যের) দোষ গোপন না করে, তা হলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত প্রদান করা হয়। আর যদি তারা কোনো তথ্য গোপন রাখে ও মিথ্যা বলে, তা হলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত তুলে নেওয়া হয়।'

আজকাল ব্যাপার এই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বরকতের কোনোই মূল্য নেই। মূল্য যা আছে, সবই হলো গণনার। অর্থাৎ– যেভাবেই হোক বেশি অর্থ উপার্জন করতে হবে। বরকতের মর্ম আজ মানুষের মস্তিষ্ক থেকে মুছে গেছে। মানুষ আজকাল জানেই না, 'বরকত' কী জিনিস।

'বরকত' অর্থ হলো, আপনার কাছে যা কিছুই আছে, সেসবের যার যেটা উদ্দেশ্য, যার যেটা উপকারিতা, তা পুরোপুরি অর্জিত হওয়া।

---

১৫১. সহীহ বুখারী ॥ হাদীস নং-১৯৩৭

কথাটি আরও খোলাসা করে বুঝুন। জগতে যত সম্পদ ও উপকরণ আছে, তার কোনোটি-ই সত্তাগতভাবে নিজে আরামদায়ক, শান্তিদায়ক নয়। যেমন- টাকা-পয়সা। আপনার ক্ষুধা পেয়েছে। পকেটে টাকা আছে। কিন্তু টাকা আপনার ক্ষুধা নিবারণ করতে পারবে না। পিপাসা লেগেছে। পকেটে টাকা আছে। কিন্তু এই টাকা আপনার পিপাসা নিবারণ করতে পারবে না। টাকা-পয়সার মাঝে সত্তাগতভাবে ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণের কোনো যোগ্যতা নেই। এমন কিছু রোগ আছে; আপনি যতই খাবেন, আপনার ক্ষুধা দূর হবে না। এমন কিছু রোগ আছে; আপনি যতই পান করবেন, পিপাসা আরও বাড়তে থাকবে।

তো আসল উদ্দেশ্য হলো শান্তি। কিন্তু শান্তি এসব বস্তুর মধ্যে অবশ্যম্ভাবী নয় যে, টাকা হলেই শান্তি অবধারিত হয়ে গেল। শান্তি আসে অন্য কোথাও থেকে। শান্তি অন্য কেউ দেন। তিনি চাইলে এক টাকার মধ্যেও শান্তি দিয়ে দিতে পারেন। আর তিনি না চাইলে কোটি টাকায়ও শান্তি আসে না। তো এই যে শান্তি – যেটি মানুষের মূল উদ্দেশ্য – এরই নাম বরকত। আর এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। উপকরণের গণনার সঙ্গে এর কোনোই সম্পর্ক নেই।

একলোক কোটিপতি। তার মিল-কারখানা আছে। কুঠি-বাংলো আছে। বাড়ি আছে। গাড়ি আছে। বিশাল ব্যাংক-ব্যালেন্স আছে। কাড়ি-কাড়ি টাকা আছে। কিন্তু রাতে যখন বিছানায় গিয়ে শোয়, তখন ঘুম আসে না। এপাশ-ওপাশ করে রাত কাটাতে হয়। ঘরে এয়ারকন্ডিশন। পিঠের নিচে নরম বিছানা। কিন্তু সাহেবের চোখে ঘুম আসছে না। তার মানে হলো, এই উপকরণগুলো তার জন্য আরাম ও শান্তির কারণ হলো না। তিনি অস্থিরতার মধ্য দিয়ে রাত কাটালেন। সকালে উঠে ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার ঘুমের বড়ি দিলেন; এগুলো নিয়ে সেবন করুন।

অপর দিকে একজন দিনমজুর আট ঘণ্টার হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর ঘামঝরা শরীর নিয়ে ঘরে ফিরল। হাত-মুখ ধুয়ে চারটা ডাল-ভাত খেয়ে ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর শরীরটা এলিয়ে দিল। অমনি রাজ্যের ঘুম এসে তাকে ঝাপটে ধরল। তারপর একটানা আট ঘণ্টা আরামের ঘুম ঘুমানোর পর সকালে জাগ্রত হলো।

বলুন, এই দুজনের মধ্যে কে শান্তি পেল? কে সুখ পেল? নিশ্চয় দ্বিতীয়জন। অথচ প্রথমজন কোটিপতি আর দ্বিতীয়জন ছাপোষা দিনমজুর। কিন্তু আল্লাহপাক তার এই দরিদ্রতার মধ্যেও শান্তি দান করেছেন। আর ওই কোটিপতিকে শান্তি দেননি। এটি একমাত্র মহান আল্লাহর দান।

আজকাল মানুষ এই বাস্তবতাকে ভুলে গেছে। তারা বলছে, গণনায় বেশি হওয়া দরকার। ব্যাংক-ব্যালেন্স দরকার। বিত্তের পাহাড় দরকার। তাই ঘুষের মাধ্যমে, সুদের মাধ্যমে, ধোঁকা-প্রতারণার মাধ্যমে অর্থের পাহাড় জমাল। কোটি টাকার মালিক হয়ে গেল। কিন্তু এই সম্পদ তাকে শান্তি দিল না, সুখ দিল না।

কেউ হারাম-হালাল বিবেচনা না করে অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে বাড়ি ফিরল। দেখতে পেল, পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে হাসপাতাল নিয়ে গেলেন। ফলে যা কামাই করে আনলেন, সব তার চিকিৎসার পেছনে ব্যয় হয়ে গেল। বরং তার চেয়েও বেশি খরচ হয়ে গেল। অফিসে ঘুষ খেয়ে পকেটভর্তি টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। খেতে বসলেন। টেবিলে রকমারি খাবার প্রস্তুত দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু পেটে সমস্যা; ফলে খেতে পারলেন না। বিছানায় ঘুমোতে গেলেন; কিন্তু চোখে ঘুম এল না।

একটি শিক্ষামূলক ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এক ওয়াজে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাঁর চোখে দেখা ঘটনা। এক নবাব ছিলেন। নবাব মানে একটি রাজ্যের প্রধান। জগতের এমন কোনো নেয়ামত নেই, যা তার ঘরে ছিল না।

কিন্তু ডাক্তার তাকে যে খাবার দিয়েছিলেন, তাতে তার জীবনটাই মিছে হয়ে গিয়েছিল। একটা ফর্মুলা শিখিয়ে বলে দিলেন, আপনি যে কদিন বেঁচে থাকবেন, এই খাবারই খাবেন। এ ছাড়া আর কিছু খেলে মরে যাবেন। আর তা হলো, ছাগলের গোশতের কিমা বানিয়ে সেগুলোকে চিকন সুতি কাপড়ে ভরে তাতে পানি ঢেলে নিংড়াবেন। তাতে যে-পনিটুকু বের হবে, ব্যস, এটুকুই আপনি পান করতে পারেন। জগতের আর কোনো কিছু আপনি খাবেন না। অন্যথায় মারা যাবেন। অগত্যা নবাব ছাহেব এই খাবার খেয়েই গোটা জীবন কাটিয়ে দিলেন। না রুটি, না গোশত, না সব্জি, না শাক, না ডাল, না অন্য কিছু।

এবার বলুন, কোটিপতি কী কাজে আসে? কাড়ি-কাড়ি টাকা কী কাজে আসে যদি-না আল্লাহপাক বরকত দান করেন? আর এই বরকত টাকা দ্বারা কেনা যায় না।

বরকত কীভাবে অর্জন করবেন

বরকত আল্লাহপাকের দান। কিন্তু আল্লাহপাক কীসের উপর ভিত্তি করে এই বরকত দান করেন? আপনি যদি আমানতদারির সঙ্গে কাজ করেন, যদি সততার সঙ্গে কাজ করেন, যদি হারাম পরিহার করে হালাল পন্থায় উপার্জন করেন, তা হলে বরকত পাবেন। পক্ষান্তরে যদি হারাম পন্থায় ও ধোঁকা-প্রতারণার পথ অবলম্বন করেন, তা হলে আল্লাহপাক আপনার জীবন থেকে বরকত তুলে নেবেন। আপনি কাড়ি-কাড়ি অর্থের মালিক হতে পারবেন; কিন্তু জীবনে কোনো বরকত পাবেন না। সম্পদের কোনো উপকারিতা আপনার অর্জিত হবে না।

বরকত অর্জনের জন্য নবীজির দু'আ

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেছেন যে, তুমি যখন কাউকে দু'আ দেবে, তখন বলবে :

بَارَكَ اللّٰهُ

'আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন।'

এটি কোনো সাধারণ দু'আ নয়। অনেক মূল্যবান দু'আ এটি। আর আমাদের মাঝেও প্রচলন আছে যে, আমরা বলি, তুমি বাড়ি তৈরি করেছ; আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। তুমি বিবাহ করেছ; আল্লাহ তোমার জীবনে বরকত দান করুন, এগুলোও খুবই মূল্যবান দু'আ। যদি বুঝে-শুনে দেওয়া হয় এবং বুঝে-শুনে গ্রহণ করা হয়, তা হলে এটি অনেক অর্থবহ দু'আ।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম বরকতের জন্য যে দু'আটি শিক্ষা প্রদান করেছেন, এগুলো তারই প্রতিধ্বনি।

এই দু'আর মাধ্যমে মূলত একটি বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় যে, এই বস্তুগুলো কিছুই নয়। আল্লাহপাক যদি এগুলোর মাঝে বরকত দান না করেন, তা হলে এগুলোর কোনোই সারবত্তা নেই। আপনি আলিশান একটি বাড়ি তৈরি করেছেন। কিন্তু এর কোনোই মূল্য নেই যদি-না আল্লাহপাক এর মাঝে বরকত দান করেন। আল্লাহ যদি বরকত দেন, তা হলে আপনি শান্তি পাবেন। অন্যথায় এই সাধের বাড়ি-ই আপনার জন্য অশান্তির কারণ হয়ে যাবে।

জগত আজ গণনার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। বরকতের খবর কেউ রাখে না। বরকতের প্রতি কেউ তাকায় না। মানুষ যদি দেখে, অমুকের বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, মিল-কারখানা আছে, তা হলে তাতেই অভিভূত হয়ে যায়। আর মনে-মনে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, আমারও যদি এমন হতো। কিন্তু এর মাঝে বরকত আছে কি-না, কেউ দেখার চেষ্টা করে না। বুঝবার চেষ্টা করে না, এই সম্পদ তার সুখের উপরকণ, না দুঃখের কারণ। তার ভেতরটা আনন্দে চিকচিক করছে, নাকি নানা সমস্যায় জর্জরিত। মানুষ আজ বরকতের কথা ভুলে গেছে।

বাহ্যিক চাকচিক্য কিছুই নয়

আমার কাছে অনেক বড়-বড় বিত্তশালী মানুষের আগমন ঘটে থাকে। এমন-এমন মানুষ আসে, যাদেরকে দেখে মানুষ একথা-ই বলে যে, আহ, আমিও যদি এর মতো বড়লোক হতাম! এর মতো সম্পদ যদি আমারও হতো! কিন্তু যখন তারা তাদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করেন, তখন সত্যিই আমি শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি যে, এই সম্পদকে আল্লাহপাক তাদের জন্য আযাব বানিয়ে রেখেছেন।

এক মহিলা নানা দ্বীনি বিষয় জানতে প্রায়ই আসা-যাওয়া করে। তার স্বামীর জন্য মিলিয়নপতি অভিধাও কম। ফলে অন্য নারীরা যখন এই মহিলাকে দেখে, তখন তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠে। পরিধানে তার কেমন দামি পোশাক! কত মূল্যবান গাড়ি হাঁকিয়ে আসছে! কী সুন্দর ঘরে থাকে! কত সুখ এই মহিলার জীবনে! কিন্তু মহিলা আমার কাছে এসে শিশুর মতো ফুফিয়ে-ফুফিয়ে কাঁদে আর বলে, আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি এই সম্পদ আমার থেকে ছিনিয়ে নেন আর আমাকে সেই শান্তি দান করেন, যা কুঁড়েঘরে বাস করে একজন মানুষ পেয়ে থাকে।

তো যারা দূর থেকে দেখছে, তারা তো এই মহিলাকে নিয়ে ঈর্ষা করছে যে, আল্লাহ তাকে কত সুখ দান করেছেন। কিন্তু আসল খবর সে জানে আর আমি জানি যে, এই মহিলা কেমন দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে!

কাজেই এই বাহ্যিক চাকচিক্য আর বাহ্যিক টিপটপের পেছনে পড়ো না। সব সময় মনে রাখতে হবে, সম্পদ আর সুখ এক জিনিস নয়। সুখ একটি স্বতন্ত্র বিষয়, যা সরাসরি আল্লাহপাক মানুষকে দান করে থাকেন। আর এই সুখ আসে আল্লাহর আনুগত্যের পথ ধরে, যার নাম বরকত।

আল্লাহপাক আমাদেরকে আমাদের জীবনে ও সম্পদে বরকত দান করুন।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. একটি ঘটনা লিখেছেন। এক বুযুর্গ ছিলেন। তিনি যখন যে দু'আ করতেন, আল্লাহপাক তা-ই কবুল করতেন। এক গরিব লোক তার কাছে গিয়ে বলল, হযরত! আপনি আমার জন্য দু'আ করুন, যেন আল্লাহপাক আমাকে সম্পদশালী বানিয়ে দেন। আমি অনেক সমস্যায় আছি। আমার মনে বড় সাধ জেগেছে, আমি সব চেয়ে বড় ধনী হব।

বুযুর্গ প্রথমে নীতিকথা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, ওসব তোমার দরকার নেই; যেমন আছ, তেমনই ভালো। এই চক্করে তুমি পড়ো না। আল্লাহর কাছে শান্তি চাও আর ব্যস, এর চেয়ে বেশি কিছু দরকার নেই।

কিন্তু লোকটি মানল না। বলল, না বড়লোক আমাকে হতেই হবে। অগত্যা বুযুর্গ বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে; তুমি বড়সড় দেখে একজন ধনী মানুষ খুঁজে বের করো। পরে এসে আমাকে বলো; আমি দু'আ করে দেব, আল্লাহ যেন তোমাকে তার মতো বানিয়ে দেন।

লোকটি বড়লোকের খোঁজে শহরে বেরিয়ে পড়ল। খুঁজতে-খুঁজতে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে পেল এবং তাকেই পছন্দ করল যে, আমি এই ব্যক্তির মতো হবো।

তার একটি দোকান আছে। দোকানটা সোনায় পরিপূর্ণ। পাঁচ-ছয়টি ছেলে আছে। তার মধ্যে একটি ছেলে খুবই সুন্দর এবং সে পিতাকে তার ব্যবসায় সহযোগিতা করছে। একজন মানুষের জীবনে সুখের উপকরণ যা-যা থাকা দরকার, সবই তার আছে। এক কথায় দুনিয়ার সব নেয়ামত আল্লাহপাক তাকে দান করেছেন।

লোকটি মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিল, ব্যস, আমি এর মতো হব।

গরিব লোকটি ফিরে এল। বুযুর্গকে বলল, হযরত! আমি দেখে এসেছি। বড়লোক একজন পেয়েছি। এক সোনা ব্যবসায়ী। অনেক বড় ধনী মানুষ। আপনি দু'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তার মতো বানিয়ে দেন।

বুযুর্গ তাকে সাধ্যপরিমাণ বোঝালেন। বললেন, দু'আ করলেই তো করে ফেললাম। তুমি আরও বোঝো। আমি এখনও মনে করি, তুমি অনেক ভালো আছ। আল্লাহপাক তোমাকে অনেক সুখে রেখেছেন। তুমি যার মতো হতে চাচ্ছ, হতে পারে, তুমি তার চেয়েও সুখী।

লোকটি বলল, না, আপনি দু'আ করে দিন; আমি তার মতো হতে চাই।

বুযর্গ বললেন, ঠিক আছে করব। তার আগে তুমি আবার তার কাছে যাও। তুমি তো তার বাহ্যিক অবস্থাটা দেখে এসেছ। এবার গিয়ে ভেতরের খবরটাও নিয়ে আসো, আসলে সে কেমন সুখী। তুমি আবার গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলো আর জিজ্ঞেস করো, আপনি জীবনে কতটুকু সুখ পেয়েছেন।

লোকটি আবার গেল এবং সোনা ব্যবসায়ীর সঙ্গে একান্তে আলাপ করল। জিজ্ঞাসা করল, আমি তো আপনার বাহ্যিক অবস্থা দেখেছি। দোকান দেখেছি যে, সেটি খুবই উন্নত। বাড়িও দেখেছি। বেশ চমৎকার বাড়িতে আপনি বাস করেন। সন্তানদেরও দেখেছি। বাহ্যিক অবস্থা হিসেবে তো আপনাকে বেশ সুখী বলে মনে হয়। কিন্তু এখন আমি আপনার মুখ থেকে জানতে চাই, আপনি আসলে কেমন আছেন। আপনার জীবনটা কীভাবে কাটে। আমি আপনার মতো ধনী হতে চাই। নমুনা হিসেবে আমি আপনাকে পছন্দ করেছি। অমুক বুযুর্গ আমাকে ওয়াদা দিয়েছেন, তিনি আমার জন্য দু'আ করবেন, যেন আল্লাহ আমাকে আপনার মতো বানিয়ে দেন।

ব্যবসায়ী দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, মিয়া, কোন চক্কর পড়েছ তুমি! আমার মতো হতে চাও? কপালটা পুড়ে না থাকলে এই বাসনা পরিত্যাগ করো। আমার মতো দুঃখী আর বিপদগ্রস্ত মানুষ জগতে দ্বিতীয় আরেকজন নেই। আমার সোনার ব্যবসা আছে। বেশ ভালোই চলছিল। আয়-উপার্জন ভালোই ছিল। হঠাৎ একবার আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ল। অনেক চিকিৎসা করালাম। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। স্ত্রী সুস্থ হলো না।

আমি চরম এক অশান্তি ও পেরেশানিতে পড়ে গেলাম। অবশেষে সেও হাল ছেড়ে দিল। নিরাশ হয়ে গেল। আমি তাকে খুব ভালবাসতাম। সেই অবস্থায় সে আমাকে বলল, আমি মরে গেলে তো তুমি আরেকটি বিয়ে করে নেবে আর আমাকে ভুলে যাবে, না?

বললাম, তোমাকে ওয়াদা দিচ্ছি, আমি আর কোনো বিয়ে করব না। সে বলল, তার নিশ্চয়তা কী? আমি কী করে বিশ্বাস করব যে, তুমি আবার বিয়ে করবে না?

আমি বললাম, আমি এই কথাটি তোমাকে কসম খেয়েও বলতে রাজী আছি। সে বলল, তোমার কসমে আমি বিশ্বাস করি না। অবশেষে তাকে নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য আমি আমার যৌনাঙ্গটা কেটে ফেললাম যে, এবার বিশ্বাস করো, তুমি মারা গেলে আমি আর কাউকে বিবাহ করব না, তোমাকে স্মরণ করেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেব।

কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় সে আর মরল না এবং পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেল। কিন্তু আমি তো যৌনশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম।

এই অবস্থায় আমরা বেশ কিছু দিন অতিবাহিত করলাম। কিন্তু আমার স্ত্রীর বয়স ছিল কম। যৌনকামনা নিবারণে আমার থেকে নিরাশ হয়ে কিছু দিন ধৈর্যধারণ করে সে পাপের পথ অবলম্বন করল। এই যে দোকানে সুদর্শন ছেলেটি দেখতে পাচ্ছেন, এর জনক আমি নই; কিন্তু জননী আমার স্ত্রী। এ আমার স্ত্রীর অবৈধ সন্তান। আমি সব দেখি আর কাতরাই। জীবনটা আমার একেবারেই মিছে হয়ে গেছে। এত সম্পদের মালিক হয়েও আমি একটি জীবন্ত লাশ। জীবনটা আমার অশান্তির একটি সাগর। সেই সাগরেই আমি সব সময় হাবুডুবু খাই। তুমি দুনিয়া ঘুরে দেখো; আমার চেয়ে দুঃখী মানুষ বোধহয় তুমি আরেকজন পাবে না।

কাজেই উপরে-উপরে এই যে চাকচিক্য দেখা যাচ্ছে, তার ভেতরটায় একটু উঁকি দিয়ে দেখো। তাহলে বুঝতে পারবে, এর ভেতরটায় কত অন্ধকার। তাই আল্লাহর কাছে চাওয়ার জিনিস হলো শান্তি, সুখ। দু'আ করতে হবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সুখ দান করুন, আমাকে শান্তি দান করুন। আর সম্পদ যা কিছু দান করেছেন, তাতে বরকত দিন।

দেখুন, হাদীসে বারবার বরকতের দু'আ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا أَعْطَيْتَنَا

'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যা-কিছু দান করেছেন, তাতে আমার জন্য বরকত দান করুন।'

কিন্তু বরকতের মূল্য ও মর্যাদা আজ দুনিয়া থেকে উঠে গেছে। এখন চলছে গণনার প্রতিযোগিতা যে, কে কত টাকার মালিক। সবাই বেশি-বেশি অর্থের অধিকারী হতে ব্যস্ত। বরকত যেন কারুরই প্রয়োজন নেই।

কিন্তু ইসলাম আমাদেরকে এই শিক্ষা প্রদান করেছে যে, আসল বিষয় হলো বরকত।

সূত্র : ইন'আমুল বারী– খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৩৫-১৩৯

ঘুষ খাওয়ার গুনাহ মদপান এবং ব্যভিচার অপেক্ষাও মারাত্মক

কোনো-কোনো অপরাধ এমনও থাকতে পারে যে, সেসবের ব্যাপারে মানুষের ভিন্নমত থাকে। একজনের কাছে সেটি অপরাধ; কিন্তু আরেকজনের দৃষ্টিতে অপরাধ নয়। কিন্তু ঘুষ এমন একটি কাজ, যার অপরাধ হওয়ার ব্যাপারে সমগ্র বিশ্ব একমত। এমন কোনো ধর্ম, এমন কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা ঘুষকে ঘৃণ্যতর অপরাধ মনে করে না। মজার ব্যাপার হলো, যারা দিনের বেলা অফিসে বসে মানুষের সঙ্গে ঘুষের লেনদেন করে, তারাও সন্ধ্যায় যখন কোনো অনুষ্ঠানে সমাজের সমস্যা ও দোষত্রুটি নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন তাদেরও মুখ থেকে ঘুষের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা বের হয় এবং এই মন্দ চরিত্রটির মন্দত্বের সমর্থনে নিজের সহকর্মীদের দু-চারটি ঘটনা শুনিয়ে দেন। সেসব শুনে শ্রোতারা হয় হাততালি দিয়ে তার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে এবং এই চরিত্রের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে কিংবা ঘুষখোর বক্তার মুখ থেকে ঘুষবিরোধী বক্তৃতায় মুখ টিপে হাসে। কিন্তু পরদিন সকালেই অফিসে গিয়ে যথারীতি সেই কারবারে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মানবতাবিধ্বংসী এই অপরাধটি পরিত্যাগ করতে কেউ প্রস্তুত নয়। যদি এ-ব্যাপারে কাউকে কিছু বলা হয়, তা হলে সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে দেয়, আরে ভাই, বলে আর লাভ কী; সবাই তো খাচ্ছে। আমি একা ছেড়ে দিয়ে আর কী হবে! যেন তাদের কাছে ঘুষ পরিত্যাগ করার জন্য শর্ত হলো, আগে অন্যরা ছাড়তে হবে; তারপর আমি ছাড়ব। আগে অন্য সবাই তাওবা করুক; তারপর আমি চিন্তা শুরু করব। অন্যথায় কেউ ছাড়তে রাজী নয়। ঘুষখোরদের এটিই একমাত্র অজুহাত যে, সবাই খায়, তাই আমিও খাই। কাজেই এটি একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি মহামারির আকাড়ে সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। পার্থক্য হলো শুধু এটুকু যে, দেশে যখন কোনো ব্যাধি মহামারির আকারে ছড়িয়ে পড়ে, তখন কেউ তার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে না যে, সবাই যখন আক্রান্ত হয়েছে; আমি বাদ যাব কেন? কিংবা আক্রান্তদের কেউ একথা বলে না যে, সবাই আগে ভালো হয়ে যাক; আমি পরে চিকিৎসা নেব। কিন্তু

ঘুষের ব্যাপারে সবাই এই নীতি অবলম্বন করেছে যে, সবাই আগে ছাড়ুক; আমি পরে ছাড়ব।

বলাবাহুল্য যে, এটি যুক্তিসঙ্গত কোনো দলিল নয়। এটি একটি বাহানা। এটি কুযুক্তি। এটি আত্মপ্রবঞ্চনা। আসলে ব্যাপার হলো, ঘুষখোররা তাদের এই চরিত্রের ফলে নগদ-নগদ অর্থ হাতে পায়। প্রতিনিয়ত বিনা পারিশ্রমিকে কাড়ি-কাড়ি কচকচা টাকা হাতে আসে। সেজন্যই এই সুযোগটিকে ধরে রাখার জন্য তারা নানা বাহানা ও অজুহাত তৈরি করে নেয়।

কিন্তু আসুন, আমরা খতিয়ে দেখি, ঘুষ খাওয়ার মধ্যে আসলেই কোনো উপকারিতা আছে কি-না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো দেখা যায়, এর মাধ্যমে কোনো পরিশ্রম ছাড়াই আয় বেড়ে যায়। টাকা কেবল আসতেই থাকে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে প্রতীয়মান হবে, এই সাময়িক উপকারিতার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন টাইফয়েডে আক্রান্ত একজন শিশু রোগীর কাছে ঝাল খাবার খুব মজা লাগে। কিন্তু তার পিতামাতা ও ডাক্তার জানেন, এই ক্ষণিকে স্বাদ তার সুস্থতাকে অনেক দূর সরিয়ে দেবে ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেবে এবং এর পরিণতিতে সে দীর্ঘ সময়ের জন্য সুস্বাদু খাদ্য-খাবার থেকে বঞ্চিত হবে।

এই দৃষ্টান্ত শুধু ঘুষের পরকালীন ক্ষতির বেলায়ই প্রযোজ্য নয়; বরং একটুখানি মাথা খাটালে বোঝা যাবে, এর জাগতিক অপকারিতাও ততটুকুই সত্য ও সুদূরপ্রসারী।

প্রথম কথা হলো, সমাজে যখন এই অভিশাপটি ছড়িয়ে পড়ে, তার একটি অনিবার্য পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, এক ব্যক্তি কোনো এক জায়গা থেকে ঘুষ আদায় করছে। কিন্তু তাকে দশ জায়গায় ঘুষ দিতে হচ্ছে। কারণ, তার টেবিলে যেমন ঘুষ ছাড়া অন্যদের কাজ হয় না, তেমনি অন্যদের টেবিলেও ঘুষ ছাড়া তার কাজ হবে না। এটা সম্ভব যে, আজ আপনি একশো টাকা ঘুষ খেলেন। কিন্তু কাল যখন আপনি নিজের কোনো কাজের জন্য অন্য কারও কাছে যাবেন, তখন সেই একশো টাকা না-জানি আরও কশো টাকা নিয়ে আপনার পকেট থেকে বেরিয়ে যাবে।

তারপর ঘুষের নগদ এই ক্ষতিটিও কম কিসের যে, তার কারণে গোটা সমাজ অনাচার ও অশান্তিতে ভরে যায় এবং সমাজটা একটা জাহান্নামে পরিণত হয়? কারণ, একটি দেশের জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা হলো সেই দেশের আইন ও আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু যেখানে ঘুষের বাজার গরম হয়ে যায়, সেখানে ভালো-ভালো আইনও একদম বেকার ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। সেখানের আইনের শাসনের পরিবর্তে আইনকে পুঁজি বানিয়ে

ঘুষবাণিজ্য রমরমা হয়ে ওঠে আর জনজীবন থেকে সুখপাখিটি চিরতরে হারিয়ে যায়। আইনের শাসন তখন নিভৃতে কাঁদে।

আজ আমরা যখন সমাজে অশান্তি ও অপরাধ দূর করার জন্য কোনো আইন তৈরি করতে বসি, তখন সব চেয়ে বড় যে প্রশ্নটি সামনে এসে দাঁড়ায়, সেটি হলো, এই আইনকে ঘুষের বিষ থেকে কীভাবে রক্ষা করব? আজ একটি দেশের শান্তিপ্রিয় প্রতিজন মানুষ চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, অপহরণ, প্রতারণা ইত্যাকার নানা মানবতাবিধ্বংসী অপরাধের শিকার। কিন্তু কেউই একথা চিন্তা করে না যে, এসব অপরাধের উৎস কী। মনে রাখবেন এবং খুব ভালো করে মনে রাখবেন, এই অপরাধপ্রবণতার মূল কারণ ও উৎস হলো ঘুষ। ঘুষ অনেক ভালো-ভালো আইনকে কয়েকটি টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে গোটা সমাজকে তার উপকারিতা থেকে বঞ্চিত করে দিচ্ছে, জনসাধাণের জীবনের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এই ঘুষকে আমরা রোজকার কর্মনীতিতে মাতৃদুগ্ধের মতো বানিয়ে রেখেছি।

আমরা যদি কোনো অপরাধী থেকে ঘুষ নিয়ে তাকে আইনের হাত থেকে মুক্ত করে দেই, তা হলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমরা অপরাধের ভীতি, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও শাস্তির ভয়কে মানুষের অন্তর থেকে বের করে দেওয়ার কাজে মদদ দিলাম এবং সেই অপরাধীদেরকে উৎসাহিত করলাম, যারা কাল স্বয়ং আমাদেরই ঘরে ডাকাতি করতে পারে।

একজন সরকারি অফিসার কোনো সরকারি ঠিকাদার থেকে ঘুষ খেয়ে তার ক্রটিপূর্ণ নির্মাণকাজের বিল পাস করিয়ে দেয় আর আত্মতৃপ্তি অনুভব করে যে, আজ আমার এত টাকা বাড়তি আয় হয়েছে। কিন্তু তিনি এই চিন্তা করেন না যে, আজ ক্রটিপূর্ণ যে পুলটির বিল তিনি ঘুষের বিনিময়ে ছাড় করিয়ে দিলেন, কাল যখন সেটি ভেঙে পড়বে, তখন তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরাই তাতে আক্রান্ত হতে পারেন। ক্রটিপূর্ণ যে সড়কটি তিনি ঘুষ খেয়ে পাস করিয়ে দিলেন, সেটি কাল তারই জীবনহানির কারণ হতে পারে।

সব চেয়ে বড় কথা হলো, সরকারি কাজে ঘুষের সাধারণ লেনদেনের ফলে আমরা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের যে ক্ষতিটা করছি, তার দায় কোনো সরকারই বহন করে না। বরং তার ফলাফল বাড়তি করের আদলে দেশের নাগকিকদেরই উপর গিয়ে পড়ে। এই দায় জনগণকেই বহন করতে হয়। আর এই ঘুষখোর লোকগুলোও সেই জনগণেরই অংশ। তাতে দেশে নানা ধরনের সংকট দেখা দেয়। দেশের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত ও ব্যাহত হয়। স্বনির্ভরতার স্বপ্ন দূরে সরে যায়। বিজাতিরা আমাদের প্রতি শকুনি চোখে তাকাতে সাহস পেয়ে যায়। দেশ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

এখানে আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলাম মাত্র। আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি, তা হলে দেখতে পাব, এই এক ঘুষের কারণে আমাদের ইহলৌকিক জীবন ও সমাজ চরম এক অশান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে আছে।

ঘুষের এই দুনিয়াবি অপকারিতা তো হলো সামগ্রিক ও সামাজিক। আর এগুলো আমাদের একেবারে চোখের সামনে রয়েছে। যে কেউ চোখ খুললেই এই অপকারিতা দেখতে পায়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, স্বয়ং ঘুষখোর লোকটির ব্যক্তিজীবনও ঘুষের মারাত্মক অপকারিতা থেকে নিরাপদ নয়। হাদীসে আছে; এক সাহাবী বর্ণনা করেন :

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ يَعْنِيْ الَّذِيْ يَمْشِيْ بَيْنَهُمَا

'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুষদাতা, ঘুষখোর ও ঘুষের কাজে মধ্যস্থতাকারীকে অভিশাপ দিয়েছেন।' [১৫২]

যে মহান ব্যক্তিত্ব কোনো শত্রুর জন্যও বদ-দু'আ করেননি, যিনি শত্রুকেও কল্যাণের দুআ দিয়েছেন, তাঁর কোনো ব্যক্তিকে অভিশাপ দেওয়া সাধারণ কোনো ব্যাপার নয়। তার পুরোপুরি ক্রিয়া ও কুফল পরকালে সামনে আসবে। কিন্তু এরা দুনিয়াতেও এই অভিশাপের ক্রিয়া থেকে রক্ষা পাবে না। যারা সমাজকে ধ্বংসের পথে তুলে দিয়ে ন্যায্য পাওনাদারদের মনে কষ্ট দিয়ে, গরিবদের হক কেড়ে নিয়ে এবং জাতির কিশতিতে ছিদ্র তৈরি করে ঘুষ খায়, বাহ্যত তাদের সম্পদের পাহাড় যতই উঁচু হোক-না কেন, তাদের পকেট যতই ভারী হোক-না কেন, সুখের দেখা তারা পায় না।

বিপুল অর্থ, সম্পদের পাহাড়, আলিশান বাড়ি, শানদার কুঠি-বাংলো, দামি গাড়ি আর নতুন-নতুন ফার্নিচারের নাম সুখ নয়। বরং সুখ হলো মনের সেই প্রশান্তি ও আত্মার সেই স্থিরতার নাম, যাকে বাজার থেকে ক্রয় করা যায় না। সুখ বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয় না। এটি শুধু এবং শুধুই আল্লাহর দান।

এই দৌলত আল্লাহপাক যাকে দান করেন, ঝুপড়িঘর, খেজুর পাতার চাটাই আর শাক-রুটিতেও দান করেন। আর যাকে দেন না, আলিশান কুঠি-বাংলোতে বাস করেও তাকে এর থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। আজ ঘুষের মাধ্যমে আপনি কিছু বাড়তি উপার্জন করলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আপনার একটি সন্তানও অসুস্থ হয়ে পড়ল। তো এই বাড়তি আয় কি আপনাকে কোনো সুখ দিতে পারবে? ঘুষের কল্যাণে আপনার মাসিক আয় এখন অনেক – বেহিসাব। কিন্তু যদি সেই হারে ঘরে ডাক্তার আর ঔষধও আসতে শুরু করে, তা হলে লাভটা কী হলো?

---

১৫২. সুনানে তিরমিযী ॥ হাদীস নং-১২৫৬; সুনানে আবী দাউদ ॥ হাদীস নং-৩১০৯; সুনানে ইবনে মাজা ॥ হাদীস নং-২৩০৪; মুসনাদে আহমাদ ॥ হাদীস নং-৬২৪৬

এই উপার্জনের মাধ্যমে আপনি কী পেলেন? মনে করুন, এক ব্যক্তি ঘুষের উপার্জন দ্বারা সিন্দুক ভরে ফেলেছে। কিন্তু ছেলেরা অবাধ্য হয়ে সংসারটিকে উজাড় বানিয়ে দিয়েছে। জামাতারা আপনার আরামের ঘুমকে হারাম বানিয়ে দিয়েছে। কিংবা এ জাতীয় অন্যকোনো পেরেশানি এসে দাঁড়িয়ে গেছে। তা হলে বলুন, সমুদয় সম্পদও আপনাকে সুখ দিতে পারবে কি?

বাস্তবতা হলো, একজন মুসলমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়ে সম্পদ উপার্জন করতে পারে বটে। সেই সুযোগ আল্লাহপাক মানুষকে দান করেছেন। কিন্তু সেই সম্পদ দ্বারা সুখ অর্জন করা তার সাধ্যের বিষয় নয়। সাধারণত এমনটিই হয়ে থাকে যে, হারাম পন্থায় উপার্জিত অর্থ-সম্পদ অশান্তি, অস্থিরতা ও বিপদাপদের এমন চক্কর নিয়ে আসে যে, মানুষকে সারা জীবন তার পাল্লায় পড়ে থাকতে হয়।

পবিত্র কুরআন স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে, যারা অন্যায়ভাবে এতিমের সম্পদ ভোগ করে, তাদেরকে এমন-এমন কঠিন বিপদে আপতিত করে দেওয়া হয় যে, পরম সুস্বাদু খাবারও তাদের কাছে আগুন বলে প্রতীয়মান হয়। কাজেই ঘুষখোরদের উঁচু-উঁচু বাড়ি আর শানদার উপকরণ দেখে প্রবঞ্চিত হওয়ার কোনোই আবশ্যকতা নেই যে, তারা ঘুষ খেয়ে সুখময় জীবন যাপন করছে। বরং তাদের ভেতরের জীবনটায় একটু উঁকি মেরে দেখুন। তা হলে জানতে পারবেন, এই চরিত্রের অধিকাংশ মানুষই কোনো-না-কোনো কঠিন বিপদে আপতিত।

তার বিপরীতে যারা হারাম থেকে পরহেয করে আল্লাহপ্রদত্ত সামান্য হালাল সম্পদ নিয়ে তুষ্ট থাকে, প্রথম-প্রথম তাদের জীবনে কিছু কষ্ট আসতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা দুনিয়ার জীবনও সুখে-স্বাচ্ছন্দে অতিবাহিত করে। তাদের সামান্য উপার্জনেও অনেক কাজ আঞ্জাম হয়ে যায়। তাদের সময় ও কাজে বরকত থাকে। সব চেয়ে বড় কথা হলো, তারা মনের সুখ ও অন্তরের প্রশান্তিতে সমৃদ্ধ হয়।

আমি উপরে ঘুষের যে কটি অপকারিতার কথা বর্ণনা করলাম, তার সব কটিই ইহজাগতিক ক্ষতি। কিন্তু এই অভিশাপের সব চেয়ে বড় ক্ষতিটা হলো আখেরাতের ক্ষতি। দুনিয়াতে অন্য হাজারো বিষয়ে মতভিন্নতা থাকতে পারে; কিন্তু কোনো ধর্ম, কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির এ ব্যাপারে কোনোই মতভেদ নেই যে, প্রতিজন মানুষকে একদিন-না-একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। যদি স্বীকার করে নিই, একজন মানুষ ঘুষ খেয়ে, ঘুষের উপার্জন দিয়ে কটা দিন বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দে অতিবাহিত করল।

কিন্তু তার শেষ পরিণতি কী হবে? বিশ্বনবীর ভাষায় শুনুন :

الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ فِي النَّارِ

'ঘুষদাতা ও ঘুষখোর জাহান্নামে যাবে।'[১৫৩]

এই হিসেবে ঘুষের গুনাহ মদপান ও ব্যভিচার অপেক্ষাও মারাত্মক। কারণ, কোনো ব্যক্তি যদি মদপান করে কিংবা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পরে সত্যমনে তাওবা করে নেয়, তা হলে সে ততক্ষণাৎই ক্ষমা পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু ঘুষের সম্পর্ক যেহেতু বান্দার হকের সঙ্গে, তাই এক-একজন পাওনাদারকে যার-যার পাওনা ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত তার এই পাপের প্রতিকারের কোনোই সুযোগ নেই। সাধারণত যখন মত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন মানুষ আখেরাতের ভাবনা ভাবতে শুরু করে। কিন্তু মনে রাখুন, যদি এই যৌবনকালে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের মোহে পড়ে এ জাতীয় পাপ করতে থাকেন, তা হলে বিশ্বাস রাখুন, আপনার এই কর্ম দুনিয়ার প্রতিটি আরাম ও প্রতিটি সুখকে স্বতন্ত্র একটি আযাবে পরিণত করে দেবে এবং ভবিষ্যতে যখন শেষ বয়সে আখেরাতের কথা মনে পড়ে যাবে, তখন কোনো প্রতিকার খুঁজে পাবেন না।

অনেকে ভাবে, একা আমি যদি ঘুষ পরিত্যাগ করি, তাহলে তা সমাজের উপর তেমন কী আর প্রভাব ফেলবে। মনে রাখবেন, এটি শয়তানের ধোঁকা, যা কিনা সমাজ থেকে এই অভিশাপটিকে ঝেটিয়ে বিদায় করার পথে প্রধান অন্তরায়। সবাই যদি অপরের অপেক্ষায় বসে থাকে, তা হলে সমাজ কোনো দিনও এই অভিশাপ থেকে পবিত্র হবে না। আপনি ছেড়ে দিন আর অন্তত আপনি এর ইহকালীন ও পরকালীন অপকারিতা থেকে নিজেকে নিরাপদ করে ফেলুন। তারপর আপনি অন্যদের জন্য নমুনা হবেন যে, আমি ছেড়েছি; তোমরাও ছেড়ে দাও। অসম্ভব কি যে, আপনার দেখাদেখি অন্যরাও এই অপরাধ থেকে তাওবা করে সাধু হয়ে যাবে! বাতি থেকে বাতি জ্বলে। বাতি থেকে বাতি জ্বলার এই ধারা এতই সুদূরপ্রসারী হতে পারে যে, এই প্রক্রিয়ায় গোটা একটি সমাজ আলোকিত হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া আল্লাহর কোনো বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রবৃত্তির কোনো চাহিদাকে পরিত্যাগ করে, তখন আল্লাহর সাহায্য তার সঙ্গী হয়ে যায়। একটি কাজকে দূর থেকে কঠিন মনে করার চেয়ে বরং কাজটি করে দেখুন। আল্লাহর কাছে আসানির দু'আ করুন।

---

১৫৩. আল-মু'জামুল আওসাত ২/২৯৫, হাদীস নং-২০২৬; আল-মু'জামুস সাগীর ১/৫৭, হাদীস নং-৫৮; মুসনাদুল বায্যার ৩/২৪৭, হাদীস নং-১০৩৭; মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৪/১৫৮

তা হলে ইনশাআল্লাহ সফল হবেন। আল্লাহর সাহায্য আপনার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যাবে।

অসম্ভব কী যে, সমাজকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহপাক আপনাকেই নির্বাচন করেছেন।

অতএব আজই সিদ্ধান্ত নিন।

সূত্র : ফারূদ কী এসলাহ– পৃষ্ঠা : ৯৭

যাকাত কীভাবে আদায় করবেন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ۗ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝

'যারা সোনা ও রুপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে, সেদিন বলা হবে, এই সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে, তা আস্বাদন করো।'[১৫৪]

বুযুর্গানে মুহতারাম ও বেরাদারানে আযীয!

আজকের এই সমাবেশ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন যাকাতের উপর আলোচনার জন্য আয়োজন করা হয়েছে। আর এই আয়োজনটি রমযানের দিনকতক আগে করার উদ্দেশ্য হলো, সাধারণত মানুষ রমযান মাসেই যাকাত আদায় করে থাকে। যাহোক, এই সমাবেশের উদ্দেশ্য হলো, যাকাতের গুরুত্ব, তার ফযীলত ও প্রয়োজনীয় বিধিবিধান নিয়ে আলোচনা করা, যাতে এ বিষয়গুলো আমাদের জানা হয়ে যায় এবং আমরা যাকাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হই।

যাকাত আদায় না করার ভয়াবহতা

এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমি আপনাদের সম্মুখে দুটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। এই আয়াতদুটিতে আল্লাহপাক সেই লোকদের সম্পর্কে খুবই কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন, যারা যথাযথভাবে হিসাব করে

---

১৫৪. সূরা তাওবা : আয়াত ৩৪, ৩৫

নিজেদের সম্পদের যাকাত আদায় করে না। অত্যন্ত কঠোর ভাষায় আল্লাহপাক তাদের হুঁশিয়ারি প্রদান করেছেন। যেমন– বলেছেন, যারা নিজেদের কাছে সোনা-রুপা সঞ্চিত করে রাখে এবং সেগুলোকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তা হলে হে রাসূল! আপনি তাদেরকে একটি বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ প্রদান করুন। অর্থাৎ– যারা টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ ও সোনা-রুপা সঞ্চয় করতে থাকে এবং সেগুলোকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, আল্লাহপাক তাদের উপর যে কর্তব্য আরোপ করেছেন, সেগুলো পালন করে না, তাদেরকে এই সুসংবাদ জানিয়ে দিন যে, একটি বেদনাদায়ক কঠোর শাস্তি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

তারপর দ্বিতীয় আয়াতে এই বেদনাদায়ক শাস্তির বিবরণ প্রদান করেছেন যে, এই শাস্তি সেদিন প্রদান করা হবে, যেদিন এই সোনা-রুপাকে আগুনে গরম করা হবে এবং তাদের কপালে, পাঁজরে ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। আর তাদেরকে বলা হবে :

هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ۝

'এ হলো সেই ধনভাণ্ডার, যাকে তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চিত করেছিলে। আজ সেই সম্পদরাশির স্বাদ উপভোগ করো, যাকে তোমরা সঞ্চিত করেছিলে।'

আল্লাহপাক প্রতিজন মুসলমানকে এই পরিণতি থেকে রক্ষা করুন।

আল্লাহপাক এটি সেই লোকদের পরিণতির বর্ণনা করেছেন, যারা সম্পদ ও অর্থ-বিত্ত সঞ্চিত করে; কিন্তু আল্লাহপাক ত.দের উপর যে কর্তব্য আরোপ করেছেন, সেগুলোকে ঠিক-ঠিকভাবে আদায় করে না। শুধু এই আয়াতগুলোতেই নয়; বরং আল্লাহপাক অন্য আরও বহু আয়াতেও নানা ধরনের ধমকি প্রদান করেছেন।

যেমন– সূরা হুমাযাতে আল্লাহপাক বলেছেন :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِۣ۝ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ۝ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ۝ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ۝ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ۝ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ۝ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ۝

'দুর্ভোগ প্রত্যেক সেই লোকের, যারা পেছনে ও সামনে নিন্দা করে। যে সম্পদ জমায় ও তা বারবার গণনা করে। যে ধারণা করে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। কক্ষনো না; সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। তুমি কি জান, হুতামা কী? এটি আল্লাহর প্রজ্বালিত হুতাশন, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে।' [১৫৫]

---

১৫৫. হুমাযাহ : ১-৭

সম্পদ উপার্জন করে আর প্রতিনিয়ত গণনা করে যে, কত হলো। আমি কত টাকার মালিক হলাম। আর গণনা করে যখন দেখে অনেক হয়েছে, তখন খুব খুশি হয়। আর মনে-মনে ভাবে, এই সম্পদই আমাকে আজীবন বাঁচিয়ে রাখবে। আমাকে অমর করে রাখবে। কিন্তু সম্পদের মালিক হওয়ার সুবাদে আল্লাহপাক তার উপর যেসব কর্তব্য আরোপ করেছেন, সেগুলো আদায় করে না। এই অপরাধে তাকে আগুনে পোড়ানো হবে। এমন আগুনে, যেটি প্রজ্বালন করেছেন স্বয়ং মহান আল্লাহ। সেই আগুন মানুষের জ্বালানো আগুন হবে না যে, পানি বা বালি ছিটিয়ে নেভানো যাবে কিংবা ফায়ার ব্রিগেড এসে নিভিয়ে দেবে। সেটি হবে আল্লাহর জ্বালানো এমন আগুন, যে কিনা মানুষের হৃদয়গুলোকে পর্যন্ত গ্রাস করে ফেলবে।

এত বড় হুঁশিয়ারি ও শাস্তির কথা আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহ প্রতিজন মুসলমানকে এর থেকে নিরাপদ রাখুন। আমীন।

এই ধনরাশি কোথা থেকে আসছে?

যাকাত আদায় না করার দায়ে আল্লাহপাক এমন শাস্তির ব্যবস্থা কেন করলেন? তার কারণ হলো, এই জগতে মানুষ নানা উপায়ে অর্থ উপার্জন করে থাকে। কেউ ব্যবসার মাধ্যমে, কেউ চাকুরির মাধ্যমে, কেউ কৃষিকাজ ইত্যাদির মাধ্যমে। তো এই যে মানুষ ধনরাশি উপার্জন করছে, এগুলো আসছে কোথা থেকে? তোমার মাঝে এমন কোনো শক্তি আছে কি যে, তুমি বাহুবলে এসব সম্পদ অর্জন করছ? এ তো মহান আল্লাহরই তৈরিকরা কৌশলি ব্যবস্থাপনা। এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই আল্লাহপাক তোমার কাছে জীবিকা পৌছিয়ে দিচ্ছেন।

ক্রেতা কে পাঠাচ্ছেন?

তুমি তো মনে করছ, আমি কিছু পুঁজির ব্যবস্থা করে দোকান খুলে বসেছি। এখানে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। আর তাতেই আমি লাভবান হচ্ছি আর সম্পদের মালিক হচ্ছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই যে দোকানে ক্রেতা আসছে; এদেরকে কে পাঠাচ্ছেন? এমন যদি হতো যে, তুমি দোকান খুলে বসেছ; কিন্তু কোনো ক্রেতা আসছে না, তা হলে কি বিক্রি হতো? তখন কি তোমার কোনো মুনাফা হতো? তা হলে ইনি কে, যিনি তোমার কাছে ক্রেতা পাঠাচ্ছেন? আল্লাহপাক ব্যবস্থাপনা-ই এমন তৈরি করেছেন যে, একজনের প্রয়োজন আরেকজনের দ্বারা পূরণ হয়। তিনিই একজনের অন্তরে এই ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে, তুমি গিয়ে দোকান খুলে বসো। আবার আকেজনের মনে এই চিন্তা ঢেলে দিয়েছেন যে, তুমি গিয়ে তার দোকান থেকে পণ্য ক্রয় করো।

একটি শিক্ষামূলক ঘটনা

আমার এক বড় ভাই ছিলেন। তাঁর নাম যাকী কাইফী। লাহোরে 'এদারায়ে ইসলামিয়াত' নামে তার ধর্মীয় পুস্তকের একটি দোকান ছিল। বেশ নামকরা দোকান ছিল এটি। এখনও আছে। একবার তিনি বললেন, ব্যবসায় আল্লাহপাক তাঁর রহমত ও কুদরতের বিরল ও বিস্ময়কর লীলা দেখিয়ে থাকেন। একদিন আমি সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম। তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। রাস্তায় কয়েক ফুট পানি জমে গিয়েছিল। আমার দোকানে যাওয়ার সময় হয়ে গেল। কিন্তু ভাবলাম, এই বর্ষার মধ্যে দোকান খুলে লাভ কী হবে। কোনো ক্রেতা তো আজ বাজারে আসবে না। বৃষ্টির কারণে তো মানুষ ঘর থেকে বেরই হতে পারছে না। রাস্তা-ঘাট পানিতে থৈ-থৈ করছে। এমতাবস্থায় কে আসবে কিতাব কিনতে। তাও দুনিয়াবি বা সিলেবাসের বই হলে না হয় কথা ছিল। আমার লাইব্রেরী তো নিছক ধর্মীয় বইয়ের। এগুলো পড়েইবা কজনে, এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে এসে ক্রয় করবার গরজ বোধ করবার মতো মানুষই বা আছে কে। দ্বীনি বই তো মানুষ ক্রয় করে সবার পরে। সব কেনাকাটা শেষ করে যদি কটা টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তখন হয়ত ভাবে, চলো, দু-একটি ধর্মীয় বই কিনে নিই। আজকালকার হিসাবে ধর্মীয় বই-পুস্তক তো একটি অপ্রয়োজনীয় পণ্য। এসব বই দ্বারা তো না ক্ষুধা মিটে, না পিপাসা নিবারণ হয়। না এসবের দ্বারা দুনিয়ার কোনো প্রয়োজন পূরণ হয়। আমি ভাবলাম, এমতাবস্থায় এই বর্ষার মধ্যে কেউ আমার কিতাব ক্রয় করতে আসবে না। কাজেই আজ দোকানে যাব না – আজ ছুটি কাটাব।

কিন্তু তিনি ছিলেন বুযুর্গদের সাহচর্যপ্রাপ্ত। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর সাহচর্যে তিনি ধন্য ছিলেন। তাই আবার চিন্তা করলেন, না, যাব। কোনো ক্রেতা আসুক বা না আসুক, গিয়ে দোকান খুলে বসতে দোষ কী। এটি আল্লাহপাক আমার জন্য জীবিকার মাধ্যম বানিয়েছেন। আমার কাজ হলো, বাজারে যাব আর দোকান খুলে বসব। ক্রেতা পাঠানো তো আমার কাজ নয়। এটি অন্য কারও কাজ। কাজেই আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে হবে। এখানে আমার কোনো ত্রুটি করা চলবে না। বৃষ্টি হচ্ছে হোক; আমি গিয়ে দোকান খুলে বসব।

ছাতাটা হাতে নিয়ে এই মুষলধারা বৃষ্টির মধ্যে আমি বাজারে গেলাম। দোকান খুলে বসলাম। এবার ভাবলাম, আজ কোনো ক্রেতা তো আসবে না; তাই অযথা বসে থেকে লাভ কী; বসে-বসে কুরআন তিলাওয়াত করি। আমি সবে কুরআন খুলে বসলাম। এখনও পড়া শুরু করিনি। দেখলাম, এক ব্যক্তি ছাতা মাথায় দিয়ে আমার দোকানের দিকে আসছে। এসে তিনি আমার দোকান

থেকে এমন কিছু কিতাব ক্রয় করে নিলেন, যেগুলোর আজই তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এমন কোনো আইটেম নয় যে, এগুলো আজ না হলে চলবেই না। তারপর দিনভর আরও অনেক ক্রেতা আসলেন। সাধারণত প্রতিদিন যে পরিমাণ বিক্রি হয়, আজ তার চেয়ে অনেক বেশি বিক্রি হলো।

তখন আমার মনে ভাবনা এল, এই ক্রেতারা আপনা থেকে আসছে না। কেউ এদেরকে পাঠাচ্ছেন। আর এজন্য পাঠাচ্ছেন যে, তিনি এই প্রক্রিয়ার মধ্যে আমার জীবিকা নিহিত রেখেছেন।

কাজের বণ্টন আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে

যাহোক, এটি মূলত মহান আল্লাহরই সৃষ্ট ব্যবস্থাপনা। সেই ব্যবস্থাপনার অধীনেই আপনার কাছে ক্রেতা আসছে। এই ব্যবস্থাপনা-ই আপনার অন্তরে প্রেরণা ঢেলে দিচ্ছে যে, তুমি অমুকের দোকানে গিয়ে মালামাল ক্রয় করো। আচ্ছা, পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও এমন কোনো কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, এত লোক কাপড় বিক্রি করবে, এত লোক জুতা বিক্রি করবে, এত লোক থালা বিক্রি করবে আর এভাবে মানুষের প্রয়োজন পূরণ হবে? না এমন কোনো কনফারেন্স আজ পর্যন্ত কোথাও অনুষ্ঠিত হয়নি। বরং আল্লাহপাকই কারও অন্তরে এই ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়েছেন, তুমি কাপড় বিক্রি করো, তুমি জুতা বিক্রি করো, তুমি রুটি বিক্রি করো, তুমি গোশত বিক্রি করো। আর তার ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে, জগতের প্রয়োজনীয় এমন কোনো পণ্য নেই, যেটি বাজারে গেলে কিনতে পাওয়া যায় না।

অপর দিকে ক্রেতাদের মনে এই চিন্তা ঢেলে দিয়েছেন যে, তোমরা গিয়ে এই জিনিসগুলো কিনে নিয়ে আসো এবং তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করো। এটি আল্লাহপাকেরই সৃষ্ট ব্যবস্থাপনা যে, প্রতিজন মানুষকে তিনি এভাবে জীবিকা দান করছেন।

মাটি থেকে ফসল উৎপাদনকারী কে?

ব্যবসা হোক, কৃষি হোক কিংবা চাকুরি হোক - দাতা মূলত আল্লাহ। দেখুন-না, কৃষিতে মানুষ যা করে, তা হলো, তারা জমিকে চষে নরম বানিয়ে তাতে বীজ বপন করে আর পানি সিঞ্চন করে। এই বীজ জিনিসটা কী? সামান্য একটু জিনিস। ওজন নেই বললেই চলে, যার কোনো সারবত্তা নেই। হিসাবে আসবার মতো বস্তু নয়। এই বীজের মধ্য থেকে অংকুর গজায়। অংকুর এই শক্ত মাটির বুক চিড়ে বেরিয়ে আসে। এই অংকুর এমন নরম ও স্পর্শকাতর হয় যে, একটি শিশুও যদি তাকে ডলা দেয়, তা হলে পিষে যায়। কিন্তু এই অংকুর

ঋতুর কঠোরতা ও সমস্ত ধকল সহ্য করে, গরম, ঠাণ্ডা ও প্রবল বাতাস সয়ে নিয়ে চারায় পরিণত হয়ে যায়। তারপর সেই চারা থেকে ফুল বের হয়। ফুল থেকে হয় ফল। এভাবে এই ফল দুনিয়ার সব মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তো কোন সেই সত্তা, যিনি এই কাজটি করেন?

তিনি হলেন মহান আল্লাহ।

মানুষের মাঝে সৃষ্টি করার যোগ্যতা নেই

কাজেই উপার্জনের যে কোনো মাধ্যম – ব্যবসা, কৃষি বা চাকুরি যেটি-ই হোক, মানুষ কাজ করে একটি সীমিত পরিধির মধ্যে। আল্লাহপাক মানুষকে সীমিত পরিধির মধ্যে অবস্থান করে কাজ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। ব্যস, মানুষ সেই সীমিত কাজটুকু করে দেয়। কিন্তু তার মাঝে সৃষ্টি করার যোগ্যতা নেই। এটি করেন আল্লাহ। মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আল্লাহপাক সৃষ্টি করেন এবং আমাদেরকে দান করেন। কাজেই ওহে মানুষ! তোমাদের কাছে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর দান।

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

'আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর।'[১৫৬]

প্রকৃত মালিক আল্লাহ

আর আল্লাহপাক সেই জিনিসগুলো দান করে তোমাদেরকে একথাও বলে দিয়েছেন যে, নাও; তোমরাই এগুলোর মালিক।

যেমন– সূরা ইয়াসীনে আল্লাহপাক বলেছেন :

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ۝

'তারা কি দেখে না, আমি তাদের জন্য নিজহাতে সৃষ্ট বস্তুগুলোর মধ্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি আর এখন তারা সেগুলোর মালিক হয়ে বসেছে?'[১৫৭]

প্রকৃত মালিক আমি ছিলাম; কিন্তু আমি তোমাদেরকে মালিক বানিয়ে দিয়েছি।

তো এই যে তোমাদের হাতে সম্পদ আসছে, এগুলোর আসল মালিক আমি। এগুলোর প্রকৃত মালিক আমি। এখানে মূল অধিকার আমার। কাজেই এগুলোকে আমারই আইন অনুসারে ব্যবহার করতে হবে। যদি তা কর, তা হলে তোমার হাতে যত সম্পদ আছে, সব তোমার জন্য হালাল ও পবিত্র।

---

১৫৬. সূরা বাকারা : ২৮৪
১৫৭. সূরা ইয়াসীন : ৭১

এই সম্পদ আল্লাহর অনুগ্রহ। এই সম্পদ আল্লাহর নেয়ামত। এই সম্পদ বরকতওয়ালা।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমার জন্য যা ফরজ করেছেন, তুমি যদি তোমার সম্পদ থেকে তা আদায় না কর, তা হলে এই সম্পদ তোমার জন্য আগুনের অঙ্গার। কিয়ামতের দিন দেখতে পাবে, তোমার কাড়ি-কাড়ি সম্পদ তোমার জন্য আগুন হয়ে গেছে। সেই আগুন দ্বারা তোমাকে দাগানো হবে আর তোমাকে বলা হবে, এই সেই সম্পদ, যাকে তুমি জমিয়ে রেখেছিলে, তুমি যার পাহাড় গড়েছিলে।

মাত্র আড়াই শতাংশ দিয়ে দাও

আল্লাহপাক যদি বলতেন, তোমার হাতে এই যে-সম্পদ আছে; এগুলোর মালিক আমি। এগুলো আমি তোমাকে দান করেছি। কাজেই এখান থেকে একশো ভাগের আড়াই ভাগ রেখে বাকিগুলো সব আমার পথে ব্যয় করে ফেলো, তা হলে এটিও অবিচার হতো না। বান্দার সমস্ত সম্পদই আল্লাহর দান এবং তারই মালিকানা। কিন্তু তা না করে তিনি বান্দার উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং বলে দিয়েছেন, আমি জানি, তোমরা দুর্বল আর তোমাদের সম্পদের প্রয়োজন আছে। আমি জানি, সম্পদের প্রতি তোমাদের আগ্রহ আছে। কাজেই এই সম্পদের সাড়ে সাতানব্বই শতাংশই তোমার। অবশিষ্ট আড়াই শতাংশে আমার দাবি আছে। তুমি যদি এই আড়াই শতাংশ আমার পথে ব্যয় কর, তা হলে তোমার অংশেরটুকু তোমার জন্য হালাল, পবিত্র ও বরকতওয়ালা।

আল্লাহপাক এই সামান্য দাবি জানিয়ে বাদ বাকি সমস্ত সম্পদ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন যে, এগুলোকে তুমি প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করো।

যাকাতের গুরুত্ব

এই আড়াই শতাংশই হলো যাকাত, যার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন :

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ

'তোমরা সালাত কায়েম করো আর যাকাত আদায় করো।'[১৫৮]

আল্লাপাক যেখানেই নামাযের কথা বলেছেনে, সেখানেই যাকাতের কথাও বলেছেন। ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব অধিক। তো একদিকে বান্দার প্রতি আল্লাহপাকের এত অনুগ্রহ যে, আমাদেরকে সম্পদ দান করেছেন এবং তার

১৫৮. সূরা বাকারা : ৪৩

মালিক বানিয়ে দিয়েছেন, অপরদিকে যাকাতের নামে মাত্র আড়াই শতাংশ দাবি করেছেন যে, মুসলমানগণ! অন্ততপক্ষে তোমার সম্পদ থেকে আড়াই ভাগ ঠিক-ঠিকভাবে আ.ার নির্দেশনা অনুসারে ব্যয় করো। তাতে তোমার বিরাট কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে না। তাতে তোমার মাথার উপর আকাশটা ভেঙে পড়বে না।

যাকাত হিসাব করে আদায় করতে হবে

অনেক মানুষ তো এমন আছে, তারা আদৌ যাকাত আদায় করে না। যাকাত নিয়ে তাদের কোনোই ভাবনা বা পরোয়া নেই। আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন। তারা যাকাত দেয়ই না। তাদের চিন্তা হলো, আড়াই শতাংশ অর্থ দেব কেন? আমার টাকা অন্যকে দেব কেন? ব্যস, সম্পদ যা আসছে, সবই তার থেকে যাচ্ছে। আবার কিছু লোক আছেন, যারা যাকাত একেবারে দেয় না যে তা নয়। যাকাত আদায় করে; কিন্তু তার জন্য যে নিয়ম আছে, তার অনুসরণ করে না। অর্থাৎ– যাকাত হিসাব করে আদায় করে না। কিন্তু বিধান হলো, আল্লাহপাক যেহেতু নির্দিষ্ট একটি অংকের যাকাত ফরজ করেছেন, তখন ঠিক-ঠিক হিসাব করেই আদায় করতে হবে।

অনেকে মনে করে, হিসাব আবার করবে কে। সমস্ত স্টক চেক করে কে হিসাব বের করে দেবে। কাজেই তারা অনুমান করে যাকাত আদায় করে। কিন্তু এই অনুমানে ভুলও হতে পারে। বরং ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। আর তার ফলে যাকাত আদায়ে কম হয়ে যেতে পারে। যদি অনুমান করতে গিয়ে যাকাত বেশি আদায় করা হয়, তা হলে ইনশাআল্লাহ যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং এর জন্য কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু যদি একটি টাকাও কম হয়ে যায়, তা হলে আপনি যাকাত এক টাকা কম আদায় করলেন। এমতাবস্থায় মনে রাখবেন, এর জন্যও আল্লাহপাক আপনাকে ধরতে পারেন। আর তখন এই একটি টাকা আপনার সমস্ত সম্পদকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে।

সেই সম্পদ ধ্বংসের কারণ

এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন সম্পদের সঙ্গে যাকাতের অর্থ মিশে যাবে, তখন সেই সম্পদ মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। অর্থাৎ– যদি যাকাত পুরোপুরি আদায় করা না হয় এবং কিছু যাকাত অনাদায়ী রয়ে যায়, তা হলে এই বাদ-যাওয়া-যাকাতের অর্থ অন্যান্য সম্পদের ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়।

তাই খুবই যত্নের সঙ্গে নিখুঁত হিসাব করে যথাযথভাবে যাকাত আদায় করতে হবে। এ ছাড়া যাকাত পুরোপুরি আদায় হয় না। মোটকথা,

মুসলমানদের মধ্যে কিছু মানুষ এমনও আছেন, যারা যাকাত দেন বটে; কিন্তু হিসাবটা নিখুঁতভাবে করেন না। ফলে তাদের সম্পদের মধ্যে যাকাতের অর্থ থেকে যায়, যা তাদের সম্পদ ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়।

যাকাতের জাগতিক উপকারিতা

যাকাত এই নিয়তে আদায় করতে হবে যে, এটি আল্লাহপাকের বিধান, তাঁর সন্তুষ্টির দাবি ও একটি ইবাদত। আমাদের জাগতিক কোনো উপকার হোক বা না হোক আল্লাহর বিধান হিসেবে যাকাত আদায় করতেই হবে। যাকাত আদায়ের আসল উদ্দেশ্য এটিই। কিন্তু আল্লাহপাকের বিশেষ অনুগ্রহ যে, যখন কোনো বান্দা যাকাত আদায় করে, তখন তিনি বান্দাকে জাগতিক কিছু উপকারিতাও দান করে থাকেন। বিশেষ উপকারিতা হলো, এর দ্বারা সম্পদে বরকত আসে। যেমন– আল্লাহপাক বলছেন :

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ

'আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন আর যাকাত-সদকাকে বাড়িয়ে দেন।'[১৫৯]

এক হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো বান্দা যখন যাকাত আদায় করে, আল্লাহর ফেরেশতাগণ তার জন্য এই দু'আ করেন :

اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَاَعْطِ مُمْسِكًا مَالًا تَلَفًا

'হে আল্লাহ! যেলোক তোমার পথে ব্যয় করে, তুমি তাকে আরও বাড়িয়ে দাও। আর যে ব্যক্তি দান না করে সম্পদকে ধরে রাখে, তার সম্পদকে তুমি ধ্বংস করে দাও।'[১৬০]

আর সেজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَالٍ

'দান সম্পদ কমায় না।'[১৬১]

আর সেজন্যই অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনো মুসলমান একদিকে যাকাত আদায় করল আর অপরদিকে আল্লাহপাক তার জন্য আমদানির নতুন

---

১৫৯. সূরা বাকারা : ২৭৬

১৬০. সহীহ বুখারী ॥ হাদীস নং-১৩৫১; সহীহ মুসলিম ॥ হাদীস নং-১৬৭৮; মুসনাদে আহমাদ ॥ হাদীস নং-৭৭০৯

১৬১. সুনানে তিরমিযী ॥ হাদীস নং-১৯৫২; সহীহ মুসলিম ॥ হাদীস নং-৪৬৮৯; মুসনাদে আহমাদ ॥ হাদীস নং-৬৯০৮; মুআত্তা মালেক ॥ হাদীস নং-১৫৯০

কোনো পথ খুলে দিলেন। তো এক হিসাবে গণনায় যদিও সম্পদ কমে যায়; কিন্তু অবশিষ্ট সম্পদে আল্লাহপাক এত বরকত দিয়ে দেন যে, তার ফলে অল্প সম্পদেও অনেক উপকারিতা অর্জিত হয়ে যায়।

সম্পদে বরকতহীনতার পরিণতি

আজকের জগত হলো গণনার জগত। বরকতের মর্ম মানুষের বুঝে আসে না। বরকত বলা হয়, অল্প জিনিসে বেশি উপকারিতা অর্জিত হওয়া। যেমন- আজ আপনি অনেকগুলো টাকা কামাই করেছেন। কিন্তু সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখতে পেলেন, বাচ্চা একজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। তার চিকিৎসায় সব ব্যয় হয়ে গেল। তার অর্থ এই দাঁড়াল যে, আপনি যে অর্থ আজ উপার্জন করলেন, তাতে বরকত পাননি। কিন্তু বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করে আপনি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে গেলেন। তারা পিস্তল ঠেকিয়ে সবগুলা টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তার অর্থ হলো, আজ আপনি যে অর্থগুলো উপার্জন করলেন, তাতে আপনি বরকত পাননি। কিংবা আপনি উপার্জন করে তার দ্বারা খাদ্য ক্রয় করে খেলেন। কিন্তু তাতে বদহজম হয়ে গেল। তার অর্থ হলো, এই উপার্জনে আপনি বরকত পাননি।

এসব হলো বরকতহীনতার আলামত। বরকত হলো, আপনি কামাই অল্প করেছেন। কিন্তু আল্লাহপাক তার দ্বারা আপনার অনেক কাজ উদ্ধার করে দিয়েছেন এবং সবগুলো অর্থ যথাযথভাবে কাজে লেগেছে। এর নাম বরকত। যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে, এই বরকত আল্লাহপাক তাদের দান করেন।

কাজেই আমরা যথাযথ হিসাবের মাধ্যমে যাকাত আদায় করব। এমনভাবে আদায় করব, যেভাবে আদায় করতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের শিক্ষা প্রদান করেছেন। নিছক অনুমানের ভিত্তিতে নয় – হিসাব করে যাকাত আদায় করব।

যাকাতের নেসাব

তার সামান্য বিশ্লেষণ এই যে, আল্লাহপাক যাকাতের একটি নেসাব নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, যাদের সম্পদের পরিমাণ এই নেসাবের চেয়ে কম, তাদের উপর যাকাত ফরজ নয়। কেউ যদি এই নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, তা হলে তার উপর যাকাত ফরজ হবে। সেই নেসাবটি হলো সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা বা তার মূল্যের সমপরিমাণ নগদ অর্থ বা অলংকার বা ব্যবসাপণ্য ইত্যাদি। যার কাছে এই পরিমাণ সম্পদ থাকবে, তাকে পরিভাষায় 'ছাহেবে নেসাব' বলা হয়।

প্রতিটি টাকার উপর বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরি নয়

তারপর এই নেসাবের উপর একটি বছর অতিক্রান্ত হতে হবে। অর্থাৎ- কেউ যদি এক বছর পর্যন্ত ছাহেবে নেসাব থাকে, তা হলে তার উপর যাকাত ফরজ হয়। এ বিষয়ে সাধারণত এই ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকে যে, মানুষ মনে করে, প্রতিটি টাকার উপর স্বতন্ত্রভাবে বছর অতিবাহিত হতে হবে। তবেই তার উপর যাকাত ফরজ হয়। এই ধারণাটি সঠিক নয়। বরং বিধান হলো, ছাহেবে নেসাব হওয়ার পর এক বছরের মাথায়ও সে ছাহেবে নেসাব থাকে। তাহলে তার উপর যাকাত ফরজ হয়ে যাবে।

এখন যদি এমন হয় যে, শুরুতে তার কাছে যে পরিমাণ অর্থ ছিল, পরে তার সঙ্গে আরও এসে যুক্ত হয়েছে, তা হলে বিধান হলো, বছরপূর্তির সময় তার মালিকানায় যে পরিমাণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থাকবে, তার পুরোটারই যাকাত দিতে হবে। পরে এসে-এসে যে অর্থ যুক্ত হয়েছে, তাতে বছরপূর্তি শর্ত নয়। এমনকি বছরপূর্তির এক দিন আগেও যদি কিছু অর্থ এসে যুক্ত হয়, তারও যাকাত দিতে হবে। যেমন- আপনি রমযান মাসের এক তারিখে ছাহেবে নেসাব হয়েছেন। পরবর্তী রমযানের এক তারিখেও আপনি ছাহেবে নেসাব থাকলেন। তা হলে যাকাত আদায়ের সময় আপনার মালিকানায় যে পরিমাণ অর্থ থাকবে, তার পুরোটার যাকাত দিতে হবে। মধ্যখানে যে অর্থ আসল-গেল, তা ধর্তব্য হবে না। যাকাত আদায় করার সময় দেখতে হবে, এখন কত আছে। তার যাকাত আদায় করতে হবে।

যাকাত প্রদানের তারিখে যে পরিমাণ অর্থ থাকবে, তার উপর যাকাত দিতে হবে

যেমন- মনে করুন, এক ব্যক্তির কাছে রমযানের এক তারিখে এক লাখ টাকা ছিল। পরবর্তী বছর পহেলা রমযানের দুদিন আগে তার হাতে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা এসেছে। ফলে পহেলা রমযানে তার হাতে অর্থের পরিমাণ দাঁড়াল দেড় লাখ টাকা। এখন তাকে দেড় লাখ টাকারই যাকাত দিতে হবে। একথা বলা যাবে না যে, এই দেড় লাখের পঞ্চাশ হাজার তো মাত্র দুদিন আগে এসেছে; এর উপর যাকাত ফরজ হবে কেন? এর উপর দিয়ে তো বছর অতিবাহিত হয়নি।

বিধান হলো, এর উপরও যাকাত ফরজ হবে। 'ছাহেবে নেসাব' হওয়ার পর যে অর্থ হাতে আসবে, তার জন্য বছরপূর্তি শর্ত নয়। এক বছরের যে তারিখে আপনি 'ছাহেবে নেসাব' হয়েছেন, পরবর্তী বছরের সেই তারিখে আপনার হাতে

যে পরিমাণ অর্থ থাকবে, তার সবটুকুর উপর যাকাত ফরজ হবে। এই পরিমাণ বিগত বছরের এই তারিখের তুলনায় কমও হতে পারে আবার বেশিও হতে পারে। বিগত বছর এক লাখ ছিল; এখন দেড় লাখ আছে। তা হলে দেড় লাখের যাকাত আদায় করতে হবে। কিংবা বিগত বছর এক লাখ ছিল; এখন পঞ্চাশ হাজার আছে। তা হলে আপনাকে পঞ্চাশ হাজারের যাকাত আদায় করতে হবে। মধ্যখানে যে অর্থ জমা বা খরচ হয়ে গেছে, তার কোনো হিসাব নেই। মধ্যখানে ব্যয়-হওয়া-অর্থের উপরও যাকাত ফরজ হবে না, আবার নতুন করে যোগ হওয়া অর্থও বাদ যাবে না।

কাজেই মধ্যখানে আসা সম্পদের আলাদা হিসাব রাখা জরুরি নয় যে, সেগুলো কোন তারিখে এসেছিল এবং কবে তার উপর বছর অতিবাহিত হবে। বরং যাকাত আদায় করার তারিখে আপনার কাছে যে অর্থ থাকবে, আপনি তার যাকাত আদায় করবেন। বছরপূর্তির অর্থ হলো এই।

কোন-কোন সম্পদের উপর যাকাত ফরজ হয়?

এটিও আমাদের উপর আল্লাহপাকের বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর যাকাত ফরজ করেননি। অন্যথায় সম্পদ তো অনেক রকমই আছে। কিন্তু আল্লাহপাক কিছু সম্পদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন।

সেগুলো হচ্ছে :

১. নগদ অর্থ। তা যে আকারেই থাকুক-না কেন। চাই তা নোট হোক বা মুদ্রা।

২. সোনা ও রুপা। তা অলংকারের আদলে থাকুক বা মুদ্রার আকারে থাকুক। অনেকের ধারণা, মহিলারা যেসব অলংকার ব্যবহার করে, সেগুলোতে যাকাত ফরজ নয়। এই ধারণা সঠিক নয়। সঠিক কথা হলো, সোনা-রুপা যেভাবেই থাকুক, তার উপর যাকাত ফরজ যদিও তা ব্যবহার করা হয়। তবে যাকাত ফরজ শুধু সোনা ও রুপার অলংকারের উপর। এই দুটো ছাড়া অন্য কোনো ধাতুর অলংকারের উপর যাকাত ফরজ নয়। হোক তা প্লাটিনাম। অনুরূপ হিরা-জহরতের উপরও যাকাত ফরজ হবে না যতক্ষণ-না তা ব্যবসার জন্য রাখা হবে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

এখানে 'কেন?' প্রশ্ন তোলা যাবে না

এখানে একথাটিও বুঝে নেওয়া দরকার যে, যাকাত একটি ইবাদত এবং মহান আল্লাহর আরোপিত একটি ফরজ বিধান। কিন্তু অনেকে যাকাত বিধানের ক্ষেত্রে যুক্তির অবতারণা করে এবং প্রশ্ন তোলে যে, অমুক জিনিসের উপর যাকাত ফরজ আর এটির উপর ফরজ নয়; এর কারণ কী?

মনে রাখবেন, যাকাত আদায় করা একটি ইবাদত। আর ইবাদত অর্থ হলো, চাই তা আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক, যেহেতু এটি আল্লাহপাকে বিধান, তাই মান্য করতে হবে। আল্লাহর বিধানের উপর 'কেন?' প্রশ্ন উত্থাপন করার কোনোই সুযোগ নেই। কিন্তু আল্লাহর বিধানের বেলায় মানুষের প্রশ্ন ও কৌতূহলের অন্ত নেই। মানুষ প্রশ্ন তোলে, সফরের অবস্থায় জোহর, আসর ও ঈশার নামাযে কসর আছে – চার রাকাতের জায়গায় দু রাকাত পড়তে হয়। তা হলে মাগরিব ও ফজর নামাযে কসর নেই কেন? আবার কারও মনে প্রশ্ন জাগে, কেউ বিমানে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করল। বড় আরামদায়ক সফর, যেখানে কষ্টের লেশমাত্র নেই। এই ব্যক্তির নামায অর্ধেক হয়ে যায়। আর আমি করাচিতে বাসে অনেক কষ্ট করে ভ্রমণ করি; আমার নামায অর্ধেক হয় না কেন? আর যাকাতের বেলায় প্রশ্ন তোলা হয়, সোনা-রুপার অলংকারের উপর যাকাত আছে; কিন্তু হিরা-জহরতের অলংকারের উপর যাকাত নেই কেন?

এই সবগুলো প্রশ্নের একটি-ই উত্তর যে, এগুলো ইবাদত সংক্রান্ত স্বয়ং আল্লাহপাকের বিধান। আর ইবাদতে আল্লাহপাকের যে কোনো বিধান মান্য করা জরুরি। অন্যথায় কাজগুলো ইবাদত থাকে না।

ইবাদত করা আল্লাহপাকের আদেশ

কিংবা কেউ প্রশ্ন তুলল, যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখে হজ্ব হয় কেন? আমার জন্য তো সহজ হয় যে, আজ গিয়ে আমি হজ্ব করে আসব আর এক দিনের পরিবর্তে তিন দিন আরাফাতে অবস্থান করব। তো সেই ব্যক্তি যদি এক দিনের বদলে তিন দিনও ওখানে বসে থাকে, তবু তার হজ্ব হবে না। কারণ, আল্লাহপাক ইবাদতের যে পদ্ধতি শিক্ষা প্রদান করেছেন, লোকটি সেই অনুপাতে হজ্ব করেনি। কিংবা কোনো ব্যক্তি বলল, হজ্বের তিন দিনে জামারাতের রমী করতে খুব ভিড় ঠেলতে হয়। তাই আমি এই তিন দিনে না করে চতুর্থ দিন একসঙ্গে সবগুলো রমী করে নেব। কিন্তু তার এই রমী দুরস্ত হবে না। কারণ, এটি ইবাদত। আর ইবাদতের জন্য জরুরি হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে পদ্ধতি শিক্ষা প্রদান করেছেন, ইবাদতগুলোকে সেই অনুপাতে আঞ্জাম দিতে হবে। তবেই কেবল ইবাদত সঠিক হবে। অন্যথায় সঠিক হবে না।

কাজেই সোনা-রুপার অলংকারে যাকাত কেন আছে; হিরা-জহরতের অলংকারে কেন যাকাত নেই প্রশ্ন তোলা ইবাদতের দর্শনের পরিপন্থী।

যাহোক বলছিলাম, আল্লাহপাক সোনা-রুপার উপর যাকাত ফরজ করেছেন। যদিও তা ব্যবহার করা হয়, তবুও। আর নগদ অর্থের উপর তো যাকাত আছেই।

ব্যবসাপণ্যের মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি

দ্বিতীয় যে জিনিসটির উপর যাকাত ফরজ, সেটি হলো 'ব্যবসাপণ্য' । কারও দোকানে বিক্রির জন্য যত মাল আছে, তার পুরো স্টকের উপর যাকাত ফরজ । তবে স্টকের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার জন্য এই সুযোগ আছে যে, হিসাবটা এভাবে করবে, আমি যদি পুরো স্টকটি একসঙ্গে বিক্রি করি, তা হলে বাজারে এর মূল্য কত আছে । কারণ, এক আছে খুচরা মূল্য, আরেক আছে পাইকারী মূল্য । কিন্তু পুরো স্টক একসঙ্গে বিক্রি করলে তার জন্য তৃতীয় আরেকটি মূল্যের প্রশ্ন দেখা দেয় । তো যাকাত দেওয়ার জন্য মূল্য নির্ধারণের সময় এই তৃতীয় পদ্ধতিটি গ্রহণ করা যেতে পারে । এভাবে মূল্য নির্ধারণ করে তার থেকে আড়াই শতাংশ যাকাতের জন্য বের করে নেবে । তবে সাবধানতার খাতিরে সাধারণ পাইকারী মূল্যে হিসাব করা-ই বেশি নিরাপদ ।

ব্যবসাপণ্যের মধ্যে কী-কী অন্তর্ভুক্ত?

ব্যবসাপণ্যের মধ্যে সেসব জিনিস অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোকে মানুষ বিক্রি করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে রাখে । কাজেই কেউ যদি বিক্রি করার জন্য কোনো প্লট, জমি, ফ্ল্যাট বা বাড়ি ক্রয় করে এবং ক্রয়টা এই নিয়তে করে যে, এটি বিক্রি করে আমি মুনাফা অর্জন করব, তা হলে এসব জিনিস ব্যবসাপণ্যের অন্তর্ভুক্ত । এগুলোর মূল্যমানের উপর যাকাত দিতে হবে । কিন্তু কেউ যদি এই নিয়তে প্লট ক্রয় করে যে, যদি কখনও সুযোগ পাই, তা হলে এর উপর বসবাসের জন্য বাড়ি নির্মাণ করব কিংবা সুযোগ পেলে ভাড়া দেব বা প্রয়োজন বোধ করলে বিক্রি করে দেব । এক কথায় ক্রয় করার সময় সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না, তা হলে এই প্লটের উপর যাকাত ফরজ হবে না । এমনকি যদি এমন হয় যে, ক্রয় করার সময় নিয়ত ছিল, এর উপর আমি বাড়ি নির্মাণ করব; কিন্তু পরে নিয়ত পরিবর্তন করে সিদ্ধান্ত নিল, এটি আমি বিক্রি করে ফেলব, তা হলে নিয়তের এই পরিবর্তনের কারণে কোনো হেরফের হবে না । সেটি বিক্রি করে হাতে অর্থ না আসা পর্যন্ত তার উপর যাকাত ফরজ হবে না ।

মোটকথা, যেসব জিনিস ক্রয়ের সময় তাকে বিক্রি করার উদ্দেশ্য থাকে, সেগুলোই ব্যবসাপণ্য, যার মূল্যমানের উপর আড়াই শতাংশ যাকাত ফরজ হবে ।

কোন দিনের মূল্যমান গ্রহণযোগ্য হবে?

একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, মূল্যমান সেই দিনেরটি গ্রহণযোগ্য হবে, যেদিন আপনি যাকাতের হিসাব করবেন । যেমন– আপনি একটি প্লট ক্রয়

করেছিলেন এক লাখ টাকায়। এখন তার দাম দশ লাখ টাকা। কাজেই এখন যখন আপনি এই প্লটের যাকাত আদায় করবেন, তখন দশ লাখ মূল্য ধরেই যাকাত দিতে হবে। এক লাখ ধরলে চলবে না।

কোম্পানীর শেয়ারের উপর যাকাতের বিধান

অনুরূপভাবে কোম্পানীর শেয়ারও ব্যবসাপণ্যের অন্তর্ভুক্ত। শেয়ারের দুটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। একটি পদ্ধতি হলো, আপনি কোনো কোম্পানীর শেয়ার এই উদ্দেশ্যে ক্রয় করেছেন যে, তার মাধ্যমে আপনি কোম্পানীর মুনাফার অংশ পাবেন এবং বাৎসরিক হিসাবের ভিত্তিতে আপনি কোম্পানীর পক্ষ থেকে এই মুনাফা পেতে থাকবেন।

আরেকটি পদ্ধতি হলো, কোনো কোম্পানির শেয়ার আপনি পুঁজি বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ক্রয় করেছেন। অর্থাৎ– ক্রয়ের সময় আপনার নিয়ত ছিল, যখন বাজারে এর মূল্য বেড়ে যাবে, তখন বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করব।

এখন আপনার শেয়ার ক্রয়ের উদ্দেশ্য যদি দ্বিতীয়টি হয়, তা হলে বাজার মূল্যের হিসাবে এই শেয়ারের উপর যাকাত দিতে হবে। যেমন– আপনি পঞ্চাশ টাকা মূল্যে কতগুলো শেয়ার ক্রয় করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল, দাম বাড়লে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করবেন। পরে যেদিন আপনি যাকাতের হিসাব করতে বসলেন, সেদিন এই শেয়ারের মূল্য ষাট টাকা। কাজেই এখন আপনাকে প্রতিটি শেয়ারের ষাট টাকা মূল্য ধরেই যাকাত দিতে হবে।

কিন্তু পদ্ধতি যদি প্রথমটি হয়, তা হলে আপনাকে দেখতে হবে, এই শেয়ারগুলো যে কোম্পানির, তার স্থাবর সম্পত্তি কী-কী আছে। যেমন– ভবন, মেশিনারি ও গাড়ি ইত্যাদি। আর কী পরিমাণ সম্পদ নগদ টাকা, ব্যবসাপণ্য ও কাঁচা মালের আদলে আছে।

এসব তথ্য আপনি কোম্পানী থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। মনে করুন, কোম্পানীর ষাট ভাগ সম্পদ নগদ অর্থ, ব্যবসাপণ্য ও কাঁচা মাল ও প্রস্তুত মালের আদলে আছে। আর অবশিষ্ট চল্লিশ ভাগ আছে ভবন, মেশিনারি ও গাড়ি ইত্যাদির আদলে। এমতাবস্থায় আপনাকে আপনার শেয়ারের মূল্যমান নির্ধারণ করে তার ষাট ভাগের উপর যাকাত প্রদান করতে হবে। যেমন– আপনার শেয়ারের বাজারমূল্য ষাট টাকা। আর কোম্পানীর ষাট শতাংশ সম্পদ যাকাতযোগ্য। অবশিষ্ট চল্লিশ শতাংশ যাকাত-অযোগ্য। এমতাবস্থায় আপনি আপনার শেয়ারের পুরো মূল্য তথা ষাট টাকার স্থলে ছত্রিশ টাকার যাকাত আদায় করবেন।

কিন্তু যদি কোনো কোম্পানীর সম্পদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হয়, তা হলে তখন শেয়ারের মূল্যমান নির্ধারণ করে সাবধানতার খাতিরে পুরো শেয়ারের উপর যাকাত আদায় করে দেবে। শেয়ার ছাড়া আর যত ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টস (আর্থিক লেনদেনের দলিল) আছে, চাই তা বন্ড আকারে থাকুক বা সার্টিফিকেট আকারে থাকুক এগুলো নগদ অর্থের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর আসল মূল্যের উপর যাকাত দিতে হবে।

কারখানার কোন কোন বস্তুর উপর যাকাত দিতে হবে?

কোনো ব্যক্তি যদি কারখানার মালিক হন, তা হলে কারখানার প্রস্তুতকৃত পণ্যের মূল্যের উপর যাকাত ফরজ। অনুরূপভাবে যে মাল তৈরির নানা প্রক্রিয়ায় রয়েছে কিংবা কাঁচা মালের আদলে রয়েছে, তার উপরও যাকাত ফরজ। তবে কারখানার মেশিনারি, ভবন ও গাড়ি ইত্যাদির উপর যাকাত ফরজ নয়। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি যদি কারও কারবারে অংশীদারত্বের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করে এবং সেই কারবারে তার সুনির্দিষ্ট কোনো অংশের মালিকানা থাকে, তা হলে উক্ত কারবারের যত অংশ তার মালিকানায় আছে, তার বাজারমূল্য হিসাব করে তাকে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

মোটকথা, নগদ অর্থ – যার মধ্যে ব্যাংক ব্যালেন্স এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টসও অন্তর্ভুক্ত – এগুলোর উপর যাকাত ফরজ। ব্যবসাপণ্য – যার মধ্যে প্রস্তুত মাল, কাঁচা মাল ও তৈরি প্রক্রিয়াধীন মাল অন্তর্ভুক্ত। আবার কোম্পানীর শেয়ারও ব্যবসাপণ্যের আওতাভুক্ত। তা ছাড়া বিক্রি করার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পণ্যও ব্যবসাপণ্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর উপর যাকাত ফরজ। এগুলোর মোট মূল্যমান বের করে তার উপর যাকাত আদায় করবে।

আপনার ঋণ বাদ দিন

আবার অপর দিকে দেখুন, আপনার জিম্মায় অন্যদের যত পাওনা আছে, আপনার যাকাতযোগ্য মোট সম্পদ থেকে সেগুলো বাদ দিয়ে নিন। বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট যা থাকবে, তার উপর যাকাত দিন। উত্তম হলো, হিসাব করার পর যাকাতের যা অংক দাঁড়াবে, সেই অর্থগুলো আলাদা করে হেফাযত করুন। তারপর সময়ে-সময়ে উপযুক্ত খাতে সেগুলো ব্যয় করতে থাকুন।

এ হলো যাকাতের হিসাব করার নিয়ম।

ঋণ দুই প্রকার

ঋণের ব্যাপারে আরও একটি কথা বুঝে নিন। তা হলো, ঋণ দুই প্রকার। একটি হলো সাধারণ ঋণ। এই ঋণ মানুষ বিশেষ কারণে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে

বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে থাকে। আরেক প্রকারের ঋণ হলো, যা বড়-বড় পুঁজিপতিরা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নিয়ে থাকে। যেমন- অনেকে মিল-কারখানা গড়া, মেশিনারি ক্রয় করা, বিদেশ থেকে ব্যবসাপণ্য আমদানির জন্য ঋণ নিয়ে থাকে। আবার অনেক সময় এমনও হয় যে, কোনো পুঁজিপতির আগে থেকেই দুটি কারখানা আছে। এখন তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আরও একটি কারখানা স্থাপন করলেন। এমতাবস্থায় যদি তিনি এই দ্বিতীয় প্রকারের ঋণকে তার মোট সম্পদ থেকে বাদ দেন, তাহলে তার উপর যাকাত ফরজ হওয়া তো দূরের কথা, উল্টো তিনি নিজে যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবেন। কারণ, তার কাছে যে পরিমাণ সম্পদ আছে, তিনি ব্যাংক থেকে তার চেয়ে বেশি ঋণ নিয়ে রেখেছেন। এখন বাহ্যত তিনি মিসকিন বলে প্রতীয়মান হচ্ছেন। সেজন্য ঋণ বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রেও শরীয়ত পার্থক্য রেখেছে। যেকোনো ঋণ সম্পদের হিসাব থেকে বাদ দেওয়া যাবে না।

বাণিজ্যিক ঋণ কখন বাদ দেওয়া হবে

এখানে বিশ্লেষণ হলো, প্রথম প্রকারের ঋণ মোট সম্পদ থেকে বাদ হয়ে যাবে এবং তাকে বাদ দেওয়ার পরই কেবল যাকাত হিসাব করতে হবে। দ্বিতীয় প্রকার ঋণের ব্যাপারে বিশ্লেষণ হলো, কোনো ব্যক্তি ব্যবসার জন্য ঋণ নিল এবং সেই অর্থ দ্বারা এমন কিছু জিনিস ক্রয় করল, যেগুলো যাকাতযোগ্য। যেমন- সেই অর্থ দ্বারা কাঁচামাল ক্রয় করল কিংবা ব্যবসার পণ্য ক্রয় করল। তা হলে এই ঋণকে মোট সম্পদ থেকে বাদ দিয়ে দেবে। পক্ষান্তরে যদি ঋণের সেই অর্থ দ্বারা এমন কোনো জিনিস ক্রয় করে, যেগুলো যাকাতের যোগ্য নয়, তা হলে এই ঋণকে মোট সম্পদ থেকে বাদ দেওয়া যাবে না।

ঋণের দৃষ্টান্ত

যেমন- এক ব্যক্তি ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা ঋণ নিল এবং এই অর্থ দ্বারা বিদেশ থেকে একটি প্ল্যান্ট (মেশিনারি) ইমপোর্ট করল। তো মেশিনারি হওয়ার কারণে প্ল্যান্ট যেহেতু যাকাতযোগ্য জিনিস নয়, তাই এই পদ্ধতিতে ঋণের অর্থ মোট সম্পদ থেকে বাদ যাবে না। কিন্তু যদি তিনি সেই অর্থ দ্বারা কাঁচামাল ক্রয় করেন, তা হলে কাঁচামাল যেহেতু যাকাতযোগ্য জিনিস, তাই এই ঋণ মোট সম্পদ থেকে বাদ যাবে। কারণ, যাকাতযোগ্য সম্পদ হওয়ার কারণে এই মাল আরেক দিক দিয়ে যাকাতের মোট সম্পদের হিসাবে আগেই ঢুকে গেছে।

মোটকথা, সাধারণ ঋণ পুরোপুরি মোট সম্পদের হিসাব থেকে বাদ যাবে। আর যে ঋণ উৎপাদনি খাতে ব্যয় করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে, তার জন্য বিশ্লেষণ হলো, যদি তার দ্বারা যাকাতযোগ্য মাল ক্রয় করা হয়ে থাকে, তা হলে সেই ঋণ হিসাব থেকে বাদ যাবে। অন্যথায় সম্পদের হিসাব থেকে এই ঋণ বাদ দেওয়া যাবে না।

যাকাত হকদারদের প্রদান করতে হবে

অপর দিকে যাকাত আদায় করার ব্যাপারেও শরীয়ত বিধান বলে দিয়েছে। আমার আব্বাজি মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ. বলতেন, আল্লাহপাক একথা বলেননি যে, যাকাত বের করো। একথাও বলেননি যে, যাকাত নিক্ষেপ করো। বরং বলেছেন, 'তোমরা যাকাত আদায় করো।' অর্থাৎ– দেখতে হবে, যাকাত যাকে দেওয়ার কথা, তাকে দেওয়া হলো কিনা। যাকাত তার উপযুক্ত খাতে ব্যয় হলো কিনা। অনেকে যাকাত বের করে বটে; কিন্তু পরে সঠিক খাতে ব্যয় হলো কিনা তার কোনোই পরোয়া করে না। আজকাল দুনিয়াতে অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। তাদের অনেকেরই বেলায় এই অভিযোগ আছে যে, যাকাতের অর্থ এনে তারা সেই অর্থকে যথাস্থানে ব্যয় করে না।

তো আল্লাহপাক বলেছেন, তোমরা যাকাত আদায় করো। অর্থাৎ– আমি যাদেরকে যাকাতের মাসরাফ বানিয়েছি, যাকাত তাদের হাতে পৌঁছিয়ে দাও।

যাকাতের হকদার কারা?

এজন্য শরীয়ত মূলনীতি ঠিক করে বলে দিয়েছে, যাকাত শুধু সেই লোকদেরই প্রদান করা যাবে, যারা ছাহেবে নেসাব নয়। এমনকি যাদের মালিকানায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতটুকু সম্পদ আছে, যার মূল্যমান সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্যের সমান হয়ে যায়, তা হলে সেও যাকাতের উপযুক্ত নয়। যাকাতের উপযুক্ত সেই লোক, যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্যমানের সম্পদও নেই। অর্থাৎ– যাকাতের উপযুক্ত হতে হলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের পরিমাণ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্যমানের কম হতে হবে।

হকদারকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে

এখানেও শরীয়তের বিধান হলো, যাকাতের হকদারকে যাকাতের অর্থ বা সম্পদের মালিক বানিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ– কোনো ব্যক্তি বিশেষকে এমনভাবে মালিক বানিয়ে দিতে হবে যে, তাতে তার পুরোপুরি অধিকার

প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং উক্ত সম্পদকে সে তার ইচ্ছামাফিক ব্যয় করতে পারবে। সেজন্য কোনো ভবননির্মাণে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায় না। কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন-ভাতায় যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায় না। কারণ, যদি এসব খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার অনুমতি প্রদান করা হতো, তা হলে এই অর্থকে সবাই লুটে-পুটে খেয়ে ফেলত। কেননা, একটি প্রতিষ্ঠানের বেতন-ভাতা সীমাহীন হয়ে থাকে, একটি ভবননির্মাণে লাখ-লাখ টাকা ব্যয় হয়ে যায়।

তাই আদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, নেসাবের মালিক নয় এমন ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে যাকাত আদায় করো। এই যাকাত ফকির, মিসকিন ও গরিবদের হক। তাই যাকাতের অর্থকে তাদের হাতে পৌছিয়ে দাও। যখন এসব লোককে মালিক বানিয়ে দেওয়া হবে, তখনই কেবল যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

কোন-কোন আত্মীয়কে যাকাত দেওয়া যায়?

যাকাত আদায় করার এই বিধান মানুষের মাঝে আপনা-আপনি এই প্রেরণা জাগিয়ে তোলে যে, আমার কাছে যাকাতের এত টাকা আছে; এগুলোকে সঠিক খাতে ব্যয় করতে হবে। সেজন্য একজন ছাহেবে নেসাব অনুসন্ধান করে ফেরেন যে, কারা-কারা যাকাতের হকদার আছে। তারা এই হকদারদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে নেন এবং পরে তাদের কাছে যাকাতের অর্থ পৌঁছিয়ে দেন। এটিও মানুষের একটি কর্তব্য। আপনার পাড়ায়, আপনি যাদের সঙ্গে ওঠাবসা করেন, তাদের মাঝে, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে যারা যাকাত খাওয়ার যোগ্য, তাদেরকে যাকাত দিন। এদের মাঝে সব চেয়ে বেশি যোগ্য হলো আপনার আত্মীয়-স্বজন। আত্মীয়দের মাঝে যারা যাকাতের হকদার, তাদেরকে যাকাত দিলে দ্বিগুণ সাওয়াব পাওয়া যায়। যাকাত দানের সাওয়াব ও আত্মীয়বাৎসল্যের সাওয়াব।

আপনি আপনার সকল আত্মীয়কে যাকাত দিতে পারেন। মাত্র দুটি সম্পর্ক এমন আছে, যাদেরকে যাকাত দেওয়া যায় না। এক হলো জন্ম সম্পর্ক। ফলে পিতামাত পুত্র-কন্যাকে যাকাত দিতে পারে না এবং পুত্র-কন্যা পিতামাতাকে যাকাত দিতে পারে না। আরেক হলো বৈবাহিক সম্পর্ক। ফলে বিবাহ বহাল থাকা অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে যাকাত দিতে পারে না এবং স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারে না। এ ছাড়া সকল আত্মীয়কে যাকাত প্রদান করা যায়। কাজেই ভাই, বোন, চাচা, খালা, ফুফী ও মামা প্রমুখকে যাকাত দিতে কোনো বাধা নেই। শর্ত শুধু একটি যে, যাকে দেবেন, তিনি যাকাতের উপযুক্ত হতে হবে এবং 'ছাহেবে নেসাব' হতে পারবে না।

বিধবা ও এতিমকে যাকাত দেওয়ার বিধান

অনেকে মনে করে, একজন মহিলা বিধবা হলে তাকে অবশ্যই যাকাত দেওয়া দরকার। এখানেও শর্ত হলো, মহিলা যাকাত খাওয়ার যোগ্য হতে হবে এবং 'ছাহেবে নেসাব' হতে পারবে না। বিধবা যদি যাকাতের উপযুক্ত হয়, তা হলে তাকে সাহায্য করা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ। কিন্তু যদি এমন হয় যে, একজন মহিলা বিধবা বটে; কিন্তু সে যাকাতের উপযুক্ত নয়, তা হলে শুধু বিধবা হওয়ার কারণে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না। স্রেফ বৈধব্যের কারণে একজন নারী যাকাতের মাসরাফ হয়ে যায় না।

অনুরূপভাবে এতিমকে যাকাত দেওয়া এবং তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করা অনেক ভালো কাজ। কিন্তু যাকাত দিতে হলে দেখতে হবে, সে ছাহেবে নেসাব কিনা এবং যাকাত খাওয়ার যোগ্য কিনা। এতিম যদি ছাহেবে নেসাব হয়, তা হলে সে এতিম হওয়া সত্ত্বেও যাকাত খাওয়ার যোগ্য নয়। এমন এতিমকে যাকাত দেওয়া যাবে না।

এই বিধানগুলোকে সামনে রেখে হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে।

ব্যাংক থেকে যাকাত কেটে রাখার বিধান

কিছুদিন যাবত আমাদের দেশে সরকারিভাবে যাকাত উসুল করার নিয়ম চালু আছে। এই নিয়মের আওতাও সরকার অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যাকাত উসুল করে থাকে। এ বিষয়ে কিছু বিশ্লেষণ জানা দরকার।

এই যে সরকার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যাকাত কেটে রাখছে, এতে যাকাত আদায় হয়ে যায়। সরকার যাকাত নিয়ে গেলে পুনরায় যাকাত আদায় করার আবশ্যকতা নেই। তবে সাবধানতার খাতিরে একটি কাজ করা দরকার যে, রমযান শুরু হওয়ার আগে মনে-মনে নিয়ত করে নিন যে, সরকার আমার অর্থ থেকে যে যাকাত কেটে নেবে, সেটি আমি আদায় করছি। এভাবে আপনার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। পুনরায় যাকাত দিতে হবে না।

এখানে অনেকের মনে সন্দেহ তৈরি হয় যে, আমার পুরো অর্থের উপর তো বছর অতিবাহিত হয়নি; অথচ পুরো ফান্ড থেকে যাকাত কেটে নেওয়া হলো। এ ব্যাপারে আমি আগেও বলে এসেছি যে, প্রতিটি অর্থের উপর বছর অতিক্রান্ত হওয়া জরুরি নয়। বরং দেখার বিষয় হলো, আপনি যদি ছাহেবে নেসাব হয়ে থাকেন, তা হলে বছর পূর্ণ হওয়ার এক দিন আগেও আপনার হাতে যে অর্থ আসবে, তার উপরও যাকাত ফরজ হবে।

কাজেই সরকার যদি বছরপূতির এক দিন আগে আসা অর্থ থেকেও যাকাত কেটে নিয়ে থাকে, তা হলে সরকার কোনো অন্যায় বা অনিয়ম করেনি। কারণ, আপনার সেই অর্থের উপরও যাকাত ফরজ হয়ে গিয়েছিল।

একাউন্টের অর্থ থেকে ঋণ কীভাবে বাদ দেবে?

অবশ্য যদি এমন হয় যে, কোনো ব্যক্তির সমুদয় সম্পদই ব্যাংকে রাখা আছে। নিজের কাছে কিছুই নেই। অপর দিকে তার কিছু ঋণ আছে; মানুষ তার কাছে টাকা পাবে। তো এই সুরতে ব্যাংক তো তারিখমতো যাকাত কেটে নেয় বটে; কিন্তু ঋণ বাদ দেয় না। যার ফলে যাকাত বেশি কাটা হয়ে যায়। এর সমাধান কী?

এর সমাধান হলো, হয়ত আপনি যাকাত কর্তনের তারিখ আসবার আগে টাকাগুলো ব্যাংক থেকে সরিয়ে ফেলবেন কিংবা কারেন্ট একাউন্টে স্থানান্তর করে ফেলবেন। বরং প্রত্যেক মানুষের জন্যই উচিত, অর্থ কারেন্ট একাউন্টে রাখা – সেভিংস একাউন্ট একদম ব্যবহার করবেন না। কারণ, এটি হলো সুদি একাউন্ট। আর কারেন্ট একাউন্ট থেকে যাকাত কাটা হয় না।

মোটকথা, আপনি আপনার টাকাগুলো সময় আসার আগে কারেন্ট একাউন্টে স্থানান্তর করে ফেলুন। তখন আর সরকার আপনার টাকার যাকাত কাটবে না। বরং আপনি নিজে হিসাব করে ঋণ বাদ দিয়ে নিজের মতো করে যাকাত আদায় করুন।

আরেকটি সমাধান হলো, আপনি ব্যাংককে জানিয়ে দিন, আমি ছাহেবে নেসাব নই। আর সে কারণে আমার উপর যাকাত ফরজ নয়। যদি ব্যাংককে লিখিতভাবে জানিয়ে দেন, তা হলে এরপর আইনত সরকার আর আপনার টাকা থেকে যাকাত কাটতে পারবে না।

কোম্পানীর শেয়ারের যাকাত কর্তন করা

একটি সমস্যা আছে কোম্পানীর শেয়ারের। কোনো কোম্পানী যখন বাৎসরিক মুনাফা বণ্টন করে, তখন উক্ত কোম্পানী যাকাত কেটে রাখে। কিন্তু কোম্পানী এই কর্তন করে শেয়ারের ফেস ভ্যালুর উপর ভিত্তি করে। অথচ শরীয়তের বিধান হলো, শেয়ারের মার্কেট ভ্যালুর উপর যাকাত ফরজ। কাজেই শেয়ারের ফেস ভ্যালুর উপর যে যাকাত কর্তন করা হলো, তার যাকাত আদায় হয়ে গেল বটে; কিন্তু ফেস ভ্যালু আর মার্কেট ভ্যালুর মধ্যখানে যে ব্যবধানটা হিসাব করে আপনাকে তার যাকাত পরিশোধ করতে হবে।

শেয়ারের যাকাতের আলোচনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন– একটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু ছিল পঞ্চাশ টাকা। এখন তার মার্কেট ভ্যালু ষাট টাকা। কোম্পানী আপনার শেয়ারের বিপরীতে পঞ্চাশ টাকার যাকাত কর্তন করেছে। অবশিষ্ট দশ টাকার যাকাত অনাদায়ী রয়ে গেছে। এই

দশ টাকার যাকাত আপনাকে আলাদা পরিশোধ করতে হবে। কোম্পানীর শেয়ার ও এনআইটি ইউনিট এই উভয় ক্ষেত্রে একই নিয়ম।

কাজেই যেখানে ফেস ভ্যালুর উপর যাকাত কর্তন করা হয়, সেখানে মার্কেট ভ্যালুর হিসাব করে অবশিষ্ট অর্থের যাকাত পরিশোধ করতে হবে।

যাকাতের তারিখ কী হওয়া উচিত?

আরও একটি কথা বুঝে নিন। ইসলামী আইনে যাকাতের কোনো নির্ধারিত দিন-তারিখ নেই যে, এই সময়ে বা এই তারিখে যাকাত আদায় করতে হবে। বরং প্রত্যেকের যাকাতের তারিখ আলাদা-আলাদা। শরীয়তমতে যাকাতের আসল তারিখ হলো সেটি, যেদিন আপনি প্রথমবার নেসাবের অধিকারী হয়েছেন। যেমন– এক ব্যক্তি মহররম মাসের এক তারিখে প্রথমবার নেসাবের অধিকারী হয়েছে। এই ব্যক্তির যাকাতের তারিখ হলো পরবর্তী বছরের পহেলা মহররম। এখন পরবর্তী প্রতি বছর পহেলা মহররম তাকে তার যাকাতের হিসাব করতে হবে।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মানুষের মনেই থাকে না, সে সর্বপ্রথম কোন তারিখে নেসাবের অধিকারী হয়েছিল। ফলে অগত্যা এমন একটি তারিখ ঠিক করে নিতে হবে, যে তারিখে যাকাত আদায় করা তার জন্য সহজ হয়। তারপর পরবর্তী প্রতি বছর এই তারিখে যাকাত আদায় করবে। তবে যেহেতু সঠিক তারিখটি মনে নেই, তাই সাবধানতার খাতিরে যাকাতের পরিমাণে কিছু বেশি আদায় করবে।

যাকাত আদায়ের জন্য রমযানকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া

সাধারণত মানুষ রমযান মাসকে যাকাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করে থাকে। এর কারণ হিসাবে দেখানো হয়, হাদীসে আছে, রমযান মাসে একটি ফরজের সাওয়াব সত্তর গুণ বেড়ে যায়। কাজেই যাকাত যেহেতু একটি ফরজ আমল, তাই এই আমলটি যদি রমযান মাসে করা হয়, তা হলে এর সাওয়াবও সত্তর গুণ বেড়ে যাবে।

কথাটি আপন জায়গায় একদম সঠিক। আর অধিক সাওয়াব অর্জনের এই স্পৃহাও বেশ ভালো। কিন্তু কোনো ব্যক্তির যদি তার ছাহেবে নেসাব হওয়ার তারিখ মনে থাকে, তা হলে শুধু এই সাওয়াবের জন্য রমযান মাসকে তারিখ হিসেবে স্থির করে নেওয়া তার জন্য ঠিক হবে না। তাকে ঠিক তারিখ অনুযায়ীই যাকাত আদায় করতে হবে। অবশ্য যদি কারও তারিখ মনে না থাকে, তা হলে তার জন্য রমযানকে তারিখ হিসেবে স্থির করে নেওয়ায় কোনো দোষ নেই।

তারপর যখন একটি দিনকে তারিখ হিসেবে স্থির করে নেওয়া হয়, তখন তাকে প্রতি বছর ঠিক ওই তারিখেই হিসাব করে যাকাত বের করতে হবে এবং দেখতে হবে, এই তারিখে আমার কী-কী সম্পদ আছে, কী পরিমাণ নগদ অর্থ আছে। যদি সোনা থাকে, তা হলে তারও ওই তারিখের মূল্য হিসাব করতে হবে। যদি শেয়ার থাকে, তা হলে ওই তারিখে শেয়ারগুলোর মূল্য কত, সেই হিসাব বের করতে হবে। যদি পণ্যের স্টকের মূল্য নির্ধারণ করতে হয়, তা হলে ওই তারিখের মূল্য ধর্তব্য হবে। প্রতি বছর এই তারিখে হিসাব করে যাকাত বের করতে হবে। এই তারিখ বাদ দিয়ে অন্য তারিখে যাওয়া ঠিক হবে না।

যাকাতের ব্যাপার এই সামান্য আলোচনা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করলাম। আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে এই বিধানগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সূত্র : ফার্‌দ কী এসলাহ- পৃষ্ঠা : ৯৭

যাকাত আদায় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

চাঁদের তারিখ স্থির করা

প্রশ্ন : যাকাতের হিসাব করার জন্য ইংরেজি তারিখ স্থির করা যাবে কি? নাকি চাঁদের তারিখই স্থির করা জরুরি?

উত্তর : চাঁদের তারিখই স্থির করা জরুরি। ইংরেজি তারিখ স্থির করা দুরস্ত নয়।

অলংকারের যাকাত কার যিম্মায়?

প্রশ্ন : অনেক মহিলা তাদের স্বামীদের বলে, আমাদের অলংকারের যাকাত আপনি আদায় করে দিন। কারণ, আমাদের কাছে যাকাত আদায় করার জন্য পয়সা নেই। এমতাবস্থায় যদি স্বামী যাকাত আদায় করে দেয়, তাহলে যাকাত আদায় হবে কি?

উত্তর : আগে একটি কথা বুঝুন। যেলোক ছাহেবে নেসাব এবং যার উপর যাকাত ফরজ, তিনি নিজেই তার যাকাতের যিম্মাদার, যেমন প্রতিজন মানুষ আপন-আপন নামাযের যিম্মাদার। স্বামী যেমন স্ত্রীর নামাযের যিম্মাদার নয়, তেমনি স্বামী স্ত্রীর যাকাতের যিম্মাদারও নয়। স্ত্রী যদি নিজে ছাহেবে নেসাব হয়, তাহলে যাকাত আদায় করা তারই যিম্মায় ফরজ। আর স্ত্রী যে বলছে, আমার কাছে পয়সা নেই, তার একথাটা এজন্য সঠিক নয় যে, পয়সা যদি না-ই থাকত, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হলো কেন? স্ত্রীর কাছে যদি শুধু অলংকার থাকে আর অলংকারের কারণে সে ছাহেবে নেসাব হয় এবং তার কাছে আলাদা কোনো অর্থ না থাকে, তাহলে সে অলংকার বিক্রি করে যাকাত আদায় করবে। কিন্তু স্বামী যদি খুশিমনে তার এই আবেদন গ্রহণ করে নেয় এবং তার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করে দেয়, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য মনে রাখতে হবে, স্ত্রীর যিম্মায় সেই অলংকারের যাকাত ফরজ, যেটি তার মালিকানায় আছে।

কিন্তু যে অলংকারের মালিকানা স্বামীর; যদিও স্ত্রী সেগুলো ব্যবহার করে, তার যাকাত স্ত্রীর উপর ফরজ নয়। এমন অলংকারের যাকাত স্বামীকে আদায় করতে হবে।

মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি

প্রশ্ন : এমন অনেক বিত্তবান লোক আছেন, যাদের অঞ্চলে হাজার-হাজার গরিব মানুষ আছে। কিন্তু তারা যাকাতের অর্থ কোনো সংস্থাকে দিয়ে দেয়। তারপর সেই সংস্থা হিলা করে কবরস্তানের জমি ক্রয় বা বিয়ের হল ইত্যাদির নির্মাণের কাজে ব্যয় করে আর গরিব মানুষগুলো তাদের যাকাত থেকে বঞ্চিত হয়। এই পদ্ধতি জায়েয কি?

উত্তর : এর উত্তর আমি আগেই দিয়েছি যে, যে গরিব লোক ছাহেবে নেসাব নয়, তাকে মালিক বানিয়ে যাকাত দেওয়া জরুরি। যেসব কাজে তামলীক (মালিক বানিয়ে দেওয়া) পাওয়া যাওয়া না, সেসব কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না। যেমন– কোনো ইমারত নির্মাণ করা কিংবা কবরস্তানের জন্য জমি ক্রয় করে ওয়াক্ফ করা বা মসজিদ তৈরি করা। আর এই যে তামলীকের একটি হিলা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে যে, যাকাতের অর্থ কোনো গরিবকে দিয়ে দিল এবং তাকে বলল, তুমি এই টাকাগুলো অমুক কাজে ব্যয় করো; সেই গরিব লোকটিও জানে, এ আমার সঙ্গে তামাশা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে যাকাতের এই অর্থে আমার একটা কড়িরও অধিকার নেই। এটা নিছক একটা বাহানা এবং এর দ্বারা বিধানে কোনো পরিবর্তন আসে না।

প্রচারের কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা

প্রশ্ন : বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠান যাকাত ও অন্যান্য দান সংগ্রহের জন্য বিপুল অর্থ প্রচারের কাজে ব্যয় করে। প্রশ্ন হলো, যাকাতের অর্থ এভাবে প্রচারকাজে ব্যয় করা জায়েয আছে কি?

উত্তর : প্রচারের কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েয নয়।

মাদরাসার ছাত্রদের যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : যাকাতের সর্বোত্তম খাত হলো গরিব ও মিসকিন শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু আমাদের অঞ্চলে ধর্মীয় মাদরাসাগুলো যাকাত নিয়ে থাকে। তারপর তারা মসজিদের কাজেও যাকাত ব্যয় করার জন্য তামলীক করিয়ে নেয়। এমতাবস্থায় যেসব গরিব মানুষ ছেলেমেয়েদের বিবাহ ও অন্যান্য কাজ আঞ্জাম দিতে যাকাতের আশায় সারা বছর অপেক্ষায় থাকে, তাদের উপায় কী হবে?

উত্তর : যেসব প্রতিষ্ঠানে সঠিকভাবে ও সঠিক খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার ব্যবস্থা নেই, সেসব প্রতিষ্ঠানে যাকাত না দেওয়াই উচিত। তাদের না দিয়ে বরং গরিবদের মালিক বানিয়ে যাকাত আদায় করা দরকার। অবশ্য কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি যথারীতি শরীয়তের বিধান অনুসারে যাকাত ব্যয় করার ব্যবস্থা থাকে, সেসব প্রতিষ্ঠানে যাকাত দেওয়া শ্রেয়। কারণ, অন্যান্য গরিব-মিসকিনরা যেমন যাকাতের হকদার, তেমনি যেসব গরিব ছেলেমেয়ে দ্বীনি ইল্‌ম অধ্যয়নরত, তারাও যাকাতের হকদার। বরং এদের অধিকার অন্যদের চেয়ে বেশি। কারণ, এরা নিজেদেরকে দ্বীন শেখার কাজে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে। কাজেই যেসব প্রতিষ্ঠানে সঠিক ব্যবস্থাপনা আছে, সেসব প্রতিষ্ঠানে নির্দ্বিধায় যাকাত দেওয়া যায়। তবে নিজের আত্মীয় ও প্রতিবেশীর মাঝে যদি যাকাতের হকদার থাকে, তাহলে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তাদের দেওয়ার পর সেসব প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া ভালো।

যাকাতের তারিখে সম্পদ নেছাবের কম হওয়া

প্রশ্ন : যদি এমন হয় যে, যাকাতের তারিখ নির্ধারিত আছে; এখন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যখন সেই তারিখটি এল, এখন সম্পদ নেছাব অপেক্ষা কম। এমতাবস্থায় যাকাত আদায় করতে হবে কি-না?

উত্তর : যদি এমন হয়, যাকাতের হিসাব করার জন্য আপনি যে তারিখটি নির্ধারণ করেছেন, সেই তারিখে আপনার কাছে নেছাব পরিমাণ সম্পদ নেই, তাহলে আপনার যিম্মায় যাকাত ওয়াজিব নয়।

'প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ' মানে কী?

প্রশ্ন : 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ'-এর সজ্ঞা কী? প্রয়োজন তো এক-একজনের ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে।

উত্তর : 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ' বলতে বোঝায়, বাড়িতে যা কিছু খাদ্যদ্রব্য, ব্যবহারের থালা-বাসন ও অন্যান্য জিনিসপত্র, পরিধানের পোশাক ইত্যাদি বস্তু আছে, এসবই প্রয়োজনীয় জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। আবার এক-একজনের প্রয়োজন এক-এক রকম হয়। অনেক মানুষ এমনও আছে যে, তাদের কাছে মেহমান খুব বেশি আসে। ফলে এর জন্য তাদের অনেক জিনিসপত্র রাখতে হয়। অনেক লোক আছে, তাদের কাছে এভাবে মেহমান আসে না। মোটের উপর সংসারের যেসব জিনিস কখনও ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না, সেগুলোকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনে করতে হবে।

টেলিভিশন প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস

প্রশ্ন : টেলিভিশন কী প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস?

উত্তর : টেলিভিশন নিঃসন্দেহে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস।

ভবন নির্মাণের কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার বিধান

প্রশ্ন : যদি হাসপাতাল ও দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণে যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে চাই, তাহলে এর সঠিক পদ্ধতি কী?

উত্তর : মূলত ভবন নির্মাণের কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েয নয়। আজকাল মালিক বানানোর জন্য যে হিলা করা হয়, যেখানে উভয় পক্ষেরই জানা থাকে, এটি আসলে তামলীক নয়; এমন হিলা গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য একটি পদ্ধতি এই হতে পারে যে, যাদের জন্য ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে, সত্যিকার অর্থে তাদেরকে যাকাতের অর্থের মালিক বানিয়ে দেওয়া হবে। আর যেহেতু তারা জানে, এই অর্থ আমাদের জন্য এবং আমাদের খাতেই ব্যবহার হবে, এমতাবস্থায় তারা যদি খুশিমনে এই নির্মাণকাজে ব্যয় করার জন্য প্রাপ্ত যাকাতের অর্থ দিয়ে দেয়, তাহলে কোনো সমস্যা থাকবে না।

যাকাত আদায়ের নিয়তে খাবার খাওয়ানো

প্রশ্ন : যাকাত আদায়ের নিয়তে খাবার রান্না করে খাওয়ানো জায়েয আছে কি?

উত্তর : খাবার রান্না করে যাকাতের হকদারকে মালিক বানিয়ে দেওয়া জায়েয আছে।

যাকাত হিসেবে কিতাব দেওয়া

প্রশ্ন : ধর্মীয় কিতাবাদির প্রচার-প্রসারে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েয আছে কি?

উত্তর : ধর্মীয় কিতাবাদির প্রচার-প্রসারে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না। তবে যদি কিতাবগুলো যাকাত হিসেবে যাকাতের হকদারদের মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

ব্যবসার মালের মূল্য নির্ধারণ

প্রশ্ন : যদি ব্যবসার কোনো পণ্যের মূল সুনিশ্চিত না হয় এবং বাজারে সেই পণ্যটি সচরাচর ক্রয়-বিক্রয় না হয়, তাহলে বিবেক অনুযায়ী তার মূল্য ঠিক করে তার উপর যুক্তিসঙ্গত মুনাফা রেখে বিক্রি করা নিয়ম। কিন্তু যে পণ্য এখনও

বিক্রি হয়নি এবং এখনই বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তার মূল্য কীভাবে নির্ধারণ করব?

উত্তর : ব্যবসাপণ্যের মূল্য নির্ধারণের সম্পর্ক যদি অভিজ্ঞতার সঙ্গে হয়, তাহলে অভিজ্ঞতার আলোকে ফয়সালা করে নেবে এবং ইনসাফ ও সাবধানতার সঙ্গে তার আনুমানিক মূল্য ঠিক করে নেবে যে, যখন এই পণ্যটি বিক্রি হবে, তখন এর বিনিময়ে আমরা এত টাকা পাব। এভাবে মূল্য নির্ধারণ করে হিসাব করে যাকাত আদায় করবে।

ব্যবসার পণ্যকেই যাকাত হিসেবে দান করার বিধান

প্রশ্ন : আমার কাছে একটি ব্যবসাপণ্য আছে; কিন্তু পণ্যটি বিক্রি হচ্ছে না। এমতাবস্থায় এই পণ্যটিকেই যাকাত হিসেবে দান করতে পারব কি?

উত্তর : হ্যাঁ; পারবেন। যাকাত হিসেবে সেই বস্তুটিই দান করা যেতে পারে, যার উপর যাকাত ফরজ। কাজেই ব্যবসাপণ্যের যাকাতে এটা জরুরি নয় যে, নগদ অর্থই দিতে হবে। বরং যে ব্যবসাপণ্যের যাকাত দেওয়া হচ্ছে, তারই একটি অংশ যাকাত হিসেবে দান করা যেতে পারে। তবে সেই পণ্যটি যদি সাধারণ ব্যবহার্য জিনিস না হয় এবং বোঝা যায়, তার দ্বারা গরিব লোকদের কোনো উপকার হবে না, তাহলে এই সুরতে ইনসাফের সঙ্গে অনুমান করে মূল্য নির্ধারণ করে তার যাকাত আদায় করবে।

আমদানিকৃত মালে যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : আমি বিদেশ থেকে একটি ব্যবসাপণ্য ক্রয় করেছি। কিন্তু এখনও আমার কব্জায় এসে পৌঁছায়নি। এই পণ্যের মূল্য কোন হিসাবে নির্ধারণ করব?

উত্তর : এ ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, সেই পণ্যটি যদি আপনার মালিকানায় এসে পড়ে; চাই তা এখনও আপনার কব্জায় আসুক বা না আসুক, এই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। কিন্তু যদি তা আপনার মালিকানায় না আসে, তাহলে এই সুরতে যে পরিমাণ অর্থ আপনি এই পণ্যটির ক্রয়ে ব্যয় করেছেন, শুধু তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যেমন– মনে করুন, আপনি একটি পণ্য আমদানি করেছেন এবং সেই পণ্যটি আপনার মালিকানায় এসে পড়েছে। যদিও সেটি এখনও পথে আছে; এখনও আপনার কব্জায় আসেনি; তাহলে এই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে যাকাত আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি এখনও সেই পণ্য আপনার মালিকানায় না এসে থাকে, তাহলে এই সুরতে এই পণ্যটির ক্রয়ে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। এই পণ্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

সৌর তারিখ থেকে চান্দ্র তারিখের দিকে পরিবর্তনের পদ্ধতি

প্রশ্ন : শুরু থেকেই আমি ইংরেজি তারিখের হিসাবে যাকাত আদায় করে আসছি। এখন আমি চান্দ্রতারিখে আদায় করতে চাই। কীভাবে করব?

উত্তর : ভবিষ্যতের জন্য আপনি কোনো একটি চান্দ্রতারিখ নির্ধারণ করে নিন। আর এতকাল সৌরতারিখ অনুযায়ী হিসাব করে যাকাত আদায় করার দরুণ যে হেরফের হয়েছে, হিসাব বের করে তার প্রতিকারের জন্য অতিরিক্ত যাকাত আদায় করুন।

যাকাত কি শুধু খাঁটি সোনারই আদায় করতে হবে?

প্রশ্ন : সোনার অলংকারে খাদ থাকে এবং পাথর ইতাদির মূল্য ও ওজন অন্তর্ভুক্ত থাকে। এমতাবস্থায় যাকাত কি অলংকারের পুরো ওজনের উপর ওয়াজিব হবে, নাকি খাদের ওজন ও তার মূল্য বাদ দিয়ে হিসাব করতে হবে?

উত্তর : যাকাত আদায় করার সময় অলংকারে ব্যবহৃত পাথরের মূল্য ও খাদ আলাদা করে ফেলবে। শুধু খাঁটি সোনার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

মুজাহিদদের যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : জিহাদের মাঠে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধরত মুজাহিদদের যাকাত দেওয়া যায় কি?

উত্তর : হ্যাঁ; দেওয়া যায় যখন তাঁরা জিহাদের কাজে ব্যাপৃত থাকে। কেননা, মুজাহিদগণও যাকাতের একটি মাসরাফ।

অল্প-অল্প করে যাকাত আদায় করা

প্রশ্ন : অনেকে যাকাতের হিসাব বের করে একমুঠে আদায় করে না। বরং যাকাতের অর্থগুলো আদায়যোগ্য খাতায় লিখে রাখে এবং পরে অল্প-অল্প করে আদায় করে। পুরোপুরি আদায় হওয়া পর্যন্ত এই অর্থ কারবারে খাটানো থাকে। এই সুরত জায়েয আছে কি?

উত্তর : যাকাত অল্প-অল্প করে আদায় করা জায়েয আছে। তবে চেষ্টা করতে হবে, যাতে যাকাত তাড়াতাড়ি পরিশোধ হয়ে যায়। কারণ, যাকাত তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম।

একাধিক গাড়ির উপর যাকাত

প্রশ্ন : কারও কাছে যদি একটির বেশি গাড়ি থাকে, তাহলে সেগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর : একাধিক গাড়ি যদি নিজেদের ব্যবহারের জন্য হয়, তাহলে সেগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি গাড়িগুলো বিক্রির উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়, তাহলে এই গাড়ির উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

ভাড়ায় দেওয়া বাড়ির যাকাত

প্রশ্ন : ভাড়ায় দেওয়া বাড়ির উপর যাকাত আছে কি?

উত্তর : ভাড়ায় দেওয়া বাড়ির উপর যাকাত আসবে না। তবে প্রতি মাসে যে ভাড়া আসবে, সেগুলো আপনার নগদ অর্থের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং বছর শেষ হওয়ার পর ছাহেবে নেছাব হওয়ার সুরতে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

ঋণ প্রার্থনাকারীকে যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি ঋণ চায় আর সম্ভাবনা আছে, এই লোক ঋণ নিয়ে ফেরত দেবে না, তাহলে ঋণ বলে মনে যাকাতের নিয়ত করে যদি যাকাতের অর্থ দেওয়া হয়, তাহলে যাকাত আদায় হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ; হবে। এভাবে দেওয়ার দ্বারাও যাকাত আদায় হয়ে যায়। শর্ত হলো, অর্থ দেওয়ার সময়ই যাকাতের নিয়ত করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখতে হবে, যদি সে ফেরত নিয়ে আসেও, তবু রাখব না। এভাবেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

ব্যাংক যদি সঠিক খাতে যাকাত ব্যয় না করে

প্রশ্ন : যেমনটি আপনি বলেছেন যে, ব্যাংক যদি যাকাত কেটে রাখে, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যায়। কিন্তু আমি তো জানি না, ব্যাংক আমার যাকাতের অর্থ সঠিক খাতে ব্যয় করে কিনা। ব্যাংক যদি যাকাতের অর্থ সঠিক খাতে ব্যয় না করে, তাহলে আমার যাকাত আদায় হবে কি? এমনটা হলে আমার যিম্মায় যাকাত অনাদায়ী রয়ে যাবে না তো আবার?

উত্তর : যে যাকাত সরকার উসুল করে, তো সরকার উসুল করামাত্রই যাকাত আদায় হয়ে যায়। এখন সরকারের কর্তব্য হলো একে সঠিক খাতে ব্যয় করা। সরকার যদি সঠিক খাতে ব্যয় করে, তাহলে তার যিম্মাদারি আদায় হয়ে যাবে। আর যদি সঠিক খাতে ব্যয় না করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু আপনার যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

যাকাতের তারিখ পরিবর্তন করার বিধান

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি তার যাকাতের তারিখ পরিবর্তন করতে চায়, তাহলে পরিবর্তন করতে পারবে কি?

উত্তর : যেমনটি আগেই বলেছি, প্রত্যেক ব্যক্তির যাকাতের তারিখ সেটি, যখন সে প্রথমবার নেছাবের মালিক হয়েছিল। কিন্তু যখন একটি তারিখ স্থির হয়ে গেছে, তখন ভবিষ্যতের জন্য সেটিই রাখা উচিত। একে পরিবর্তন করা দুরস্ত নয়।

নিজের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে নেওয়া ঋণের বিধান

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি নিজের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে ঋণ গ্রহণ করে, তাহলে এটি ঋণ বলে গণ্য হবে কি?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি নিজের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে, তাহলে যেহেতু এগুলো তার নিজেরই অর্থ, তাই এই ঋণকে তার মোট অর্থ থেকে ঋণ হিসেবে কর্তন করা হবে না।

যাকাত আদায়ের জন্য নিয়ত জরুরি

প্রশ্ন : আমি আমার এক কর্মচারীকে তার বিয়ে উপলক্ষ্যে ২৫ হাজার টাকা দিয়েছি এবং বলেছি, এর ১০ হাজার টাকা তোমাকে দিলাম আর ১৫ হাজার টাকা ঋণ, যা তোমাকে পরিশোধ করতে হবে। এই ১৫ হাজার টাকা যদিও যাকাতেরই অর্থ ছিল; কিন্তু ভেবে রেখেছি, তার থেকে ফেরত নিয়ে এই অর্থ অন্য কাউকে যাকাত হিসেবে দিয়ে দেব। আমার এই সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ; সঠিক হয়েছে। আপনি যদি শুরুতেই এই নিয়ত করে থাকেন যে, এর থেকে ১০ হাজার টাকা যাকাত হিসেবে তাকে দিয়ে দিলেন আর বাকিগুলো ঋণ, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। ১০ হাজার আপনার যাকাত হিসেবে আদায় হয়ে যাবে। অবশিষ্ট ১৫ হাজার টাকা যাকাত হিসেবে আদায় হয়নি। উসুল হওয়ার পর যখন সেগুলো পুনরায় যাকাতের নিয়তে দান করবেন, তখন আদায় হয়ে যাবে।

নিজের কর্মচারীকে যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : আমি কি আমার কর্মচারীকে যাকাত দিতে পারি? তারও কি ছাহেবে নেসাব না হওয়া জরুরি?

উত্তর : কর্মচারী হোক বা না হোক; আপনি যাকে যাকাত দেবেন, তার জন্য জরুরি হলো, সে ছাহেবে নেসাব হতে পারবে না। কোনো ছাহেবে নেসাবকেই যাকাত দেওয়া যাবে না। চাই সে কর্মচারীই হোক-না কেন। তবে কর্মচারীকে দেওয়া যাকাত কোনোমতেই তার বেতন-ভাতায় যুক্ত করা যাবে না। বরং যদি কখনও তার বেতন-ভাতা বাড়ানোর দাবি ওঠে, তখন একথা বলে তা নাকচ

করা যাবে না যে, আমি তো তোমাকে যাকাতও দিচ্ছি। অর্থাৎ- যাকাত যেন তার বেতন-ভাতার উপর কোনো প্রভাব সৃষ্টি না করে।

ছাত্রদের ভাতা হিসেবে যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : দ্বীনি মাদরাসার ছাত্রদের যদি ভাতা হিসেবে যাকাতের অর্থ দেওয়া হয় এবং পরে মাসিক ফি হিসেবে তাদের থেকে সেই অর্থ আদায় করা হয়, তাহলে এই পদ্ধতিতে যাকাত আদায় হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ; যাকাত আদায় হয়ে যাবে। আর এই প্রক্রিয়ায় যাকাত আদায় করায় কোনো সমস্যা নেই।

শেয়ারের বিপরীতে প্রাপ্ত বার্ষিক মুনাফার উপর যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : শেয়ারের বিপরীতে প্রাপ্ত বার্ষিক মুনাফার উপর যাকাত ওয়াজিব কি?

উত্তর : যাকাতের তারিখে যে নগদ অর্থ আপনার কাছে বিদ্যমান থাকবে, সেই অর্থ যে প্রক্রিয়ায়ই আসুক-না কেন তার উপর যাকাত ওয়াজিব। চাই তা শেয়ারের বিপরীতে প্রাপ্ত মুনাফা হোক বা কেউ আপনাকে হাদিয়া দিক কিংবা দোকানের আমদানি থেকে অর্জিত হোক।

শেয়ারের কোন মূল্য ধর্তব্য হবে?

প্রশ্ন : শেয়ার যদি বিক্রি করার নিয়তে ক্রয় করা হয়; কিন্তু বাজারে তার বড় ধরনের মূল্যপতনের ফলে আর বিক্রি না করে, তাহলে যাকাতের তারিখে এই শেয়ারের যাকাত বাজারদর অনুযায়ী আদায় করা হবে, নাকি ক্রয়মূল্য অনুপাতে দিতে হবে?

উত্তর : বাজারদর অনুযায়ীই যাকাত দিতে হবে। চাই বাজারে দর পড়ে যাক বা বেড়ে যাক।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামান থাকা সত্ত্বেও যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : যদি কারও ঘরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামান, যেমন টিভি, ভিসিআর ইত্যাদি আছে; কিন্তু লোকটা অভাবী। যেমন- চিকিৎসার জন্য, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বা বিয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু লজ্জার কারণে মুখ খুলে কারও কাছে চাইতেও পারছে না। এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : এই লোকটার যদি বাস্তবিকই এসব কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহলে সবার আগে টিভি-ভিসিআর ইত্যাদি জিনিসগুলো বিক্রি করে অর্থ

জোগাবে। যখন সে এ জাতীয় জিনিসগুলো বিক্রি করে ফেলবে এবং তার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামান না থাকবে, তখন তাকে যাকাত দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে – তার আগে নয়। আরও একটি সূক্ষ্ম বিষয় হলো, যে ব্যক্তির মালিকানায় টিভি-ভিসিআর আছে, তাকে যাকাত দেওয়া যায় না বটে; কিন্তু তার স্ত্রী বা বালেগ সন্তানদের মধ্যে যদি কেউ যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হয়, তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া যেতে পারে।

যাকাতের ফাণ্ড থেকে রোগীদের ঔষধ সরবরাহ করা

প্রশ্ন : রোগী যদি গরিব হয় এবং সাইয়্যেদ না হয়, তাহলে ডাক্তার যাকাতের ফাণ্ড থেকে তাকে ঔষধ সরবরাহ করতে পারেন কি?

উত্তর : এমন রোগীকে ডাক্তার যাকাতের ফাণ্ড থেকে ঔষধ সরবরাহ করতে পারেন।

মেয়েদের অলংকারের উপর যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : অনেক সময় পিতামাতা তাদের অবিবাহিতা অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের অলংকার দেয় এবং তাদের আয়-উপার্জনের কোনো মাধ্যমও থাকে না। কিন্তু মেয়েরা এসব অলংকারের মালিক হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা এসব অলংকারের যাকাত কিভাবে আদায় করবে?

উত্তর : মেয়ে যদি নাবালেগা হয় আর পিতামাতা এসব অলংকার তাকে মালিক বানিয়ে এমনভাবে প্রদান করে যে, এখন আর অলংকারগুলো না তার থেকে নেওয়া যাবে, না অন্য কাউকে দেওয়া যাবে, তাহলে এই অলংকারের উপর যাকাত নেই। কারণ, নাবালেগের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। কিন্তু মেয়ে যদি বালেগা হয় আর পিতামাতা তাকে অলংকারের মালিক বানিয়ে দেন, তাহলে স্বয়ং মেয়ের উপর এই অলংকারের যাকাত ফরজ। তার যদি আয়ের কোনো উৎস না থাকে, তাহলে তার অনুমতিক্রমে পিতামাতা তার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করে দেবেন। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে কিছু অলংকার বিক্রি করে যাকাত আদায় করতে হবে।

অলংকার বিক্রি করে যাকাত আদায় করবে কি?

প্রশ্ন : যদি এভাবে প্রতি বছর অলংকার বিক্রি করে যাকাত আদায় করতে থাকে, তাহলে তো একদিন তার সমস্ত অলংকারই শেষ হয়ে যাবে?

উত্তর : সমস্ত অলংকার শেষ হবে না। বরং সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমমূল্যের সোনা অবশ্যই অবশিষ্ট থাকবে। কারণ, তার অলংকারের পরিমাণ

যখন সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমমূল্যের চেয়ে কমে যাবে, তখন তার যাকাতের নেছাব খতম হয়ে যাবে এবং তার উপর আর যাকাত থাকবে না।

যাকাতের তারিখে অবশ্যই হিসাব করে নেবে

প্রশ্ন : বিয়ের সময় উপহার-উপঢৌকন পেয়ে একব্যক্তি নেছাবের মালিক হয়ে গেছে। পরবর্তী বছরও যদি সে নেছাবের মালিক থাকে, তাহলে পরবর্তী বছরের সেই তারিখে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, পরবর্তী বছর যখন সেই তারিখটি এল, তখন রমযান আসতে এখনও পাঁচ মাস বাকি। এমতাবস্থায় কি সে রমযান মাসে এক বছর পাঁচ মাসের যাকাত আদায় করবে, নাকি সে অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করবে?

উত্তর : সে এমনটি করবে যে, যে তারিখে বছর পূর্ণ হবে, সেই তারিখে হিসাব বের করবে, আমার যিম্মায় এত পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব হয়েছে। তারপর প্রয়োজন অনুপাতে আদায় করতে থাকবে। যদি রমযান পর্যন্ত কোনো উপযুক্ত মাসরাফ না পায়, তাহলে রমযানে আদায় করবে। কিন্তু যদি তাৎক্ষণিক কোনো খাত বিদ্যমান থাকে, তাহলে কোনো অবস্থাতেই যাকাত রমযান পর্যন্ত বিলম্ব করা উচিত হবে না। সর্বাবস্থায়ই তাৎক্ষণিকভাবে অভাবীদের দান করায় অধিক ছাওয়াব পাওয়া যাবে না ইনশাআল্লাহ।

পজিশনের মূল্যের উপর যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : একব্যক্তি পজিশনে বাড়ি ক্রয় করেছে এবং কিছুদিন পর ভাড়ায় দিয়ে দিয়েছে। এর যাকাত কিভাবে আদায় করবে?

উত্তর : পজিশনে বাড়ি ক্রয় করা যায় না; বরং ভাড়া নেওয়া যায়। শরীয়তের আইনে এর বিধান হলো, পজিশন যাকাতযোগ্য কোনো বস্তু নয়। বরং যে বাড়িটি ভাড়ায় দেওয়া হয়েছে এবং তার বিনিময়ে যে ভাড়া আসছে, সেই অর্থ যখন আমদানির আদলে সঞ্চিত হবে এবং বছর শেষে যাকাতের তারিখে যা অবশিষ্ট থাকবে, তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

গুডউইল বা সুনামের ভিত্তিতে বিক্রিকরা ভবনের যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : একব্যক্তির একটি ভবন আছে। সে গুডউইল বা সুনামের ভিত্তিতে বাড়িটি বিক্রি করে দিয়েছে। এখন সে এই ভবনের যাকাত দেবে কিনা?

উত্তর : ইমারত বা ভবন যদি গুডউইল বা সুনামের ভিত্তিতে কিংবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে বিক্রি করা হয়, যখন এর নগদ মূল্য তার হাতে চলে আসবে,

তখন নগদ অর্থের যে বিধান, এর উপরও সেই বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ– বছর শেষে যে অর্থ অবশিষ্ট থাকবে, তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

যে ঋণ ফেরত পাওয়ার আশা নেই, তার বিধান

প্রশ্ন : একব্যক্তি বাকিতে পণ্য বিক্রি করেছে এবং ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করছে না। এর যাকাতের বিধান কী? আবার এর মধ্যেও দুটি সুরত আছে। একটি হলো, দেনাদার বরাবরই বলে চলছে, আমি পরিশোধ করব; কিন্তু দিচ্ছে না। আরেকটি সুরত হলো, দেনাদার ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে কিংবা ধরা দিচ্ছে না অথবা মারা গেছে। তো এই সুরতগুলোতে যাকাতের বিধান কী?

উত্তর : যদি এমন হয় যে, কোনো ব্যক্তির যিম্মায় আপনার কিছু অর্থ ছিল; কিন্তু সে আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছে বা উধাও হয়ে গেছে আর এখন আপনি এই অর্থের আশা রাখতে পারছেন না, তাহলে এই অর্থের যাকাত আসবে না। কিন্তু দেনাদার যদি বলে, আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব এবং বাহ্যত প্রতীয়মান হচ্ছে, সে ভালো নিয়তেই বলছে; এখন পারছে না বলে দিচ্ছে না; পরে যখন সুযোগ পাবে, দিয়ে দেবে, তাহলে এই সুরতে এই অর্থের উপর যাকাত ওয়াজিব। আপনাকে এই অর্থেরও যাকাত আদায় করতে হবে। অবশ্য এখনই তার যাকাত আদায় করতে হবে না; যখন উসুল হবে, তখন আদায় করলেও চলবে। তবে যখন উসুল হবে, তখন পেছনের সেই বছরগুলোরও যাকাত আদায় করতে হবে, যে বছরগুলোতে এই ঋণ উসুল হয়নি এবং তার যাকাতও আদায় করা হয়নি।

– ৩য় খণ্ড সমাপ্ত –
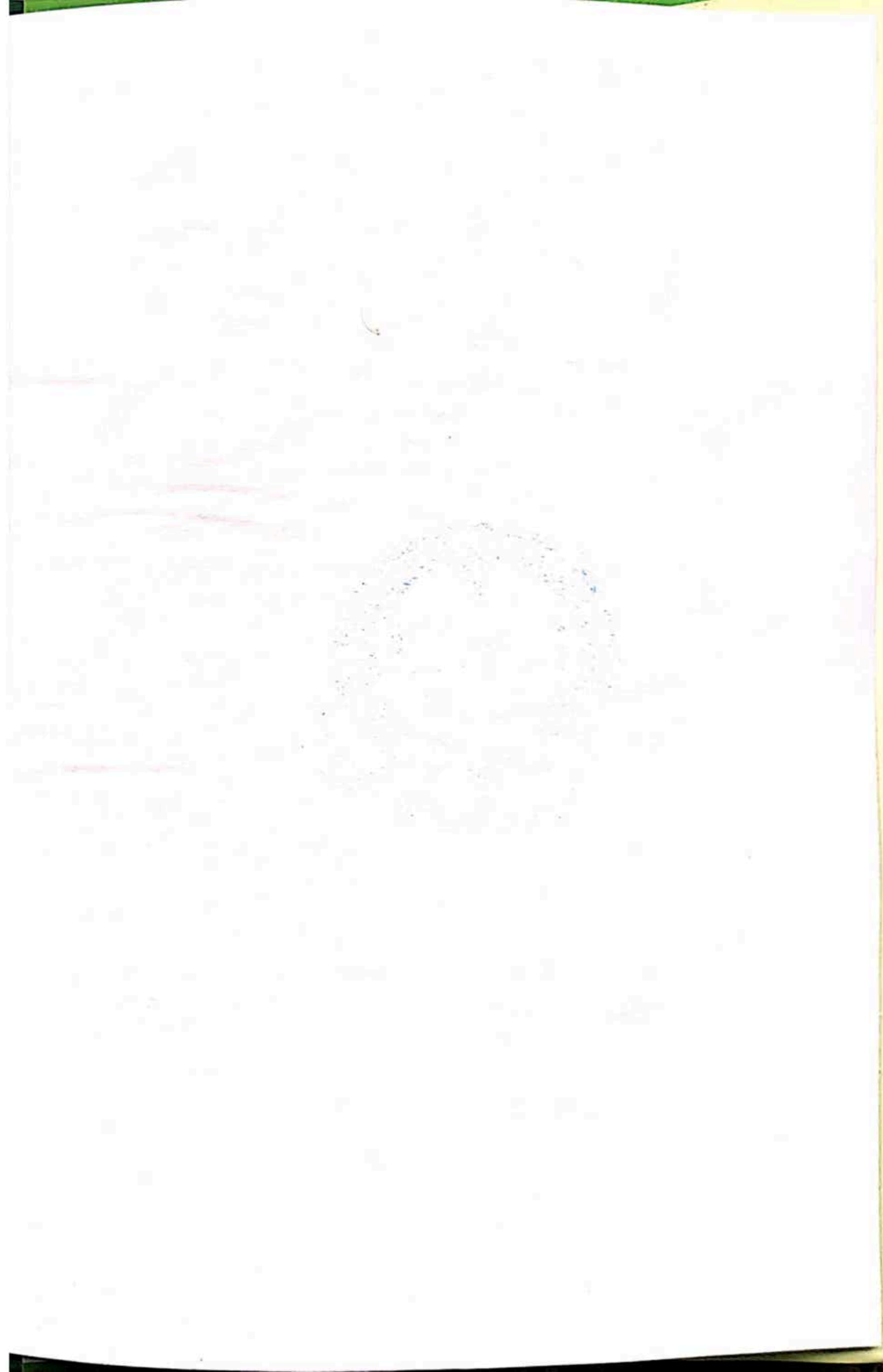
আপনার সংগ্রহে রাখার মত
আরও কয়েকটি কিতাব